প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

প্রথম পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, 2013

ভারত সরকারের দূর শিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক ইতিহাস | **স্নাতক পাঠক্রম (সাবসিডিয়ারি)**

পাঠক্রম ঃ পর্যায়

SHI - 02 : 1-4

পর্যায়	একক		রচনা	সম্পাদনা
পর্যায় 1	একক - 1(ক), 1(খ)	—	অধ্যাপক সিদ্ধার্থ গুহ রায়	অধ্যাপক হিমাদ্রি ব্যানার্জী
	একক - 2(ক), 2(খ)	—	অধ্যাপিকা শুভলক্ষ্মী পাণ্ডে	—
	একক - 3	—	অধ্যাপিকা গুঞ্জা সেনগুপ্ত (ব্যানার্জী)	—
	একক - 4	—	অধ্যাপক অমিয় ঘোষ	অধ্যাপক রাধামাধব সাহা
পর্যায় 2	একক - 1	—	অধ্যাপক গৌতম চন্দ্র রায়	অধ্যাপক সুরঞ্জন দাশ
	একক - 2(ক), 2(খ)	—	অধ্যাপিকা স্বপ্না সেন	অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত
	একক - 3	—	শ্রীমতী কঙ্কনা ধারা	ঐ
পর্যায় 3	একক - 1(ক)	—	অধ্যাপক সমর মল্লিক	অধ্যাপক হিমাদ্রি ব্যানার্জী
	একক - 1(খ)	—	অধ্যাপিকা স্নিগ্ধা সেন	ঐ
	একক - 2(ক)	—	ঐ	ঐ
	একক - 2(খ)	—	অধ্যাপিকা উত্তরা চক্রবর্তী	ঐ
	একক - 3(ক), 3(খ)	—	অধ্যাপক কিংশুক চ্যাটার্জী	ঐ
	একক - 4	—	অধ্যাপক শুভাশিষ বিশ্বাস	ঐ
	একক - 5	—	ঐ	ঐ
পর্যায় 4	একক - 1	—	অধ্যাপক দেবাশীষ চক্রবর্তী	অধ্যাপক প্রাঞ্জল ভট্টাচার্য
	একক - 2	—	অধ্যাপিকা মন্দিরা চৌধুরী (সরকার)	ঐ
	একক - 3	—	অধ্যাপক সুব্রত গুপ্ত	ঐ
	একক - 4	—	অধ্যাপক শান্তনু চক্রবর্তী	ঐ

পরিমার্জন, বিন্যাস, সম্পাদনা
ড. চন্দন বসু
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ,
স্কুল অফ হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস

ঘোষণা

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

SHI – 02

(স্নাতক পাঠক্রম – সাবসিডিয়ারি–ইতিহাস)

পর্যায় 1

একক	1(ক)	❑ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম সোপান—বাংলা	1-15
একক	1(খ)	❑ বাংলা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো—আদিযুগ	16-33
একক	2(ক)	❑ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন/কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার—উত্তর ভারত, মহীশূর ও মহারাষ্ট্র	34-51
একক	2(খ)	❑ ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের বিস্তার : ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে ডালহৌসী	52-66
একক	3	❑ ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের পরিবর্তনশীল ধারা—আর্থিক নিষ্ক্রমণ—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ : ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রভাব—অবশিল্পায়ন	67-84
একক	4	❑ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন; ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা, রাজস্বনীতি, সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের কারণ; বাংলায় তিনটি রাজস্ব-সংক্রান্ত গৃহীত বন্দোবস্ত	85-105

পর্যায় 2

একক	1	❑ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ : প্রেক্ষাপট এবং ইতিহাসচর্চার ধারা	106-115

একক 2(ক) ❑ সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী পর্বে ১৮৫৮ সালের মহারানীর শাসনের ঘোষণা এবং ১৮৬১ সালের আইন 116-122

একক 2(খ) ❑ ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন ও উপজাতি বিদ্রোহ 123-141

একক 3 ❑ সমাজ সংস্কার আন্দোলন 142-164

পর্যায় 3

একক 1(ক) ❑ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সামাজিক উৎস 165-186

একক 1(খ) ❑ আদি কংগ্রেস এবং নরমপন্থী জাতীয়তাবাদের আদর্শগত কাঠামো 183-203

একক 2(ক) ❑ চরমপন্থা, স্বদেশি আন্দোলন এবং সুরাটে কংগ্রেসের ভাঙন 204-232

একক 2(খ) ❑ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ 233-266

একক 3(ক) ❑ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতের রাজনীতি এবং গান্ধী 267-285

একক 3(খ) ❑ গান্ধী এবং জনমুখী রাজনীতি ১৯২১-৪২ 286-307

একক 4 ❑ কংগ্রেসে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব 308-320

একক 5 ❑ পাকিস্তান দাবি 321-327

পর্যায় 4

একক 1 ❑ গণপরিষদ ও ভারতের সংবিধান রচনা 328-366

একক 2 ❑ স্বাধীনোত্তর যুগের ইতিহাস : নেহেরু 367-411

একক 3 ❑ পরিকল্পনা এবং ভারতীয় অর্থনীতি 412-441

একক 4 ❑ নেহেরুর পররাষ্ট্রনীতি—জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন 442-453

পর্যায় ১

একক ১(ক) ❑ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম সোপান—বাংলা

গঠন

১(ক).০ উদ্দেশ্য

১(ক).১ প্রস্তাবনা

১(ক).২ সিরাজউদ্‌দৌল্লা ও পলাশীর যুদ্ধ

১(ক).৩ মীরজাফর ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৭৫৭-১৭৬০)

১(ক).৪ মীরকাশিম ও বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৫-১৭৬৪)

১(ক).৫ ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভ

১(ক).৬ সারাংশ

১(ক).৭ অনুশীলনী

১(ক).৮ গ্রন্থপঞ্জী

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

১(ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সিরাজউদ্‌দৌল্লার বিরোধের কারণ ও পলাশীর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট।
- মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক ও বাংলার নবাব পদ থেকে মীরজাফরের অপসারণ।
- মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির বিরোধ ও বক্সার যুদ্ধের প্রেক্ষাপট।
- ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক বাংলার দেওয়ানি লাভ ও তার তাৎপর্য।

১(ক).১ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার ফলে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ভারতীয় শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিতে এগিয়ে এসেছিল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। মুনাফা ও

বাজারের লোভে ইংরেজরা ভারতবর্ষে একটি গ্রাসী নীতি গ্রহণের অপেক্ষায় বসেছিল। যে মুহূর্তে ভারতীয় শক্তিসমূহের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেই মুহূর্তে তাদের আগ্রাসনমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইংরেজ শক্তি ভারতবর্ষকে একটি লাভজনক উপনিবেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। তারা জানত যে, ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সেখানে তাদের অর্থনৈতিক লুণ্ঠন চালানো অনেক সহজ হবে। কূটনৈতিক দক্ষতা, সামরিক উৎকর্ষ এবং ভারতীয় শক্তিবর্গের অনৈক্যকে পুঁজি করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব—ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ সচেতনভাবে কী করে বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। নিজেদের স্বার্থে নবাব বদলের পালায় অংশ নিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত বাংলাদেশে নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

১(ক).২ সিরাজউদ্‌দৌল্লা ও পলাশীর যুদ্ধ

সমৃদ্ধশালী ও সম্পদশালী বাংলাদেশে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত ছিল। ১৭১৭ খ্রিঃ থেকে তৎকালীন মোগল সম্রাট ফারুখশিয়ারের ফর্মানের সুবাদে ইংরেজ কোম্পানি কতগুলি বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করত। এই ফর্মান অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানি আমদানিকৃত ও রপ্তানিকৃত পণ্যের ওপর কোনোরকম শুল্ক দিত না এবং এই পণ্য পরিবহনের জন্য কোম্পানি দস্তক প্রকাশ করার অধিকার লাভ করেছিল। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বেসরকারি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো সুযোগ-সুবিধা এই ফর্মান দেয়নি। ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য পণ্যসামগ্রী পরিবহনের সময় প্রায়ই দস্তকের অপব্যবহার করত। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে তাই বাংলার নবাবদের তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। মুর্শিদকুলি খান থেকে আলিবর্দী খাঁন পর্যন্ত সমস্ত দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোরতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

মৃত্যুর আগে আলিবর্দি খান তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্‌দৌল্লাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। ১৭৫৬ সালের এপ্রিল মাসে আলিবর্দি খান মারা গেলে বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত হন সিরাজউদ্‌দৌল্লা। কিন্তু সিরাজের সিংহাসন আরোহণ অনেককেই অসন্তুষ্ট করেছিল। আলিবর্দির আর এক দৌহিত্র পূর্ণিয়ার ফৌজদার সৌকত জং বাংলার মসনদ লাভ করার জন্য লালায়িত ছিলেন। সিরাজের এক মাসি ঘসেটি বেগমও বাংলার মসনদ পেতে আগ্রহী ছিলেন। ঘসেটি বেগম মুর্শিদাবাদের কাছে মতিঝিল অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তি ও সুদক্ষ সৈন্যবাহিনীর অধিকারী ছিলেন। আলিবর্দি খানের প্রধান সেনাপতি বা 'বক্সি' মীরজাফরও সিরাজের প্রতি বিরূপ ছিলেন। সিংহাসনে বসেই সিরাজ বুঝতে পারেন যে তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করেছে।

একই সঙ্গে সিরাজউদ্‌দৌল্লা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। সিংহাসন আরোহণের অল্প কিছু দিন পরেই, ১৭৫৬ সালের ১০ই এপ্রিল সিরাজ কৃষ্ণদাসকে তাঁর হাতে অর্পণ করার দাবি জানিয়ে ইংরেজ কোম্পানিকে একটি চিঠি দেন। কৃষ্ণদাস ছিলেন ঢাকার জায়গীরদার রাজবল্লভের পুত্র। কৃষ্ণদাস সরকারি কোষাগার থেকে ৫৩ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে ইংরেজ কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি কৃষ্ণদাসকে সিরাজের হাতে অর্পণ করেনি। সিরাজ ক্রমে জানতে

পারেন যে ইংরেজরা তাঁর দুই প্রতিপক্ষ সৌকত জং এবং ঘসেটি বেগমের সঙ্গে গোপন আঁতাত গড়ে তুলেছে। সৌকত জং-এর উপদেষ্টা গোলাম হোসেন খানের লেখা থেকে জানা যায় সৌকত জং তাঁর নবাব হবার প্রচেষ্টায় ইংরেজদের সাহায্য পাবার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন।

নিজ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সিরাজ কতকগুলো পদক্ষেপ নেন। তিনি ঘসেটি বেগমের প্রচুর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। মীরজাফরকে 'বক্সি' পদ থেকে অপসারিত করা হল। পরিবর্তে সিরাজ তাঁর বিশ্বস্ত মীরমদনকে 'বক্সি' পদে নিয়োগ করেন। সিয়ের-উল-সুতাক্ষারিণের লেখক গোলাম হোসেন খানের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই সময় আলিবর্দির সময়ের সামরিক নেতা ও শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা সিরাজের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। নবাবের দেওয়ান রায়দুর্লভও নবাবের বিরুদ্ধে চলে যান এবং তিনি পশ্চিমবাংলার জমিদারদের সিরাজের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে শুরু করেন। ১৭৫৭ সালের গোড়ার দিকে বর্ধমান, বীরভূম ও নদীয়ার জমিদারেরা সিরাজউদ্‌দৌল্লার বিরোধী হয়ে ওঠেন। সি. এ. বেইলি (C. A. Baily) বলেছেন—বড় ব্যবসায়ী ও জমিদারদের কাছ থেকে নবাব বলপূর্বক অর্থ আদায় করতেন তাই তাঁরা নবাবের বিরোধিতা করেছিলেন। অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী অবশ্য মনে করেন—জমিদার, মহারাজ ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সিরাজের বলপূর্বক অর্থ আদায়ের স্বপক্ষে সমসাময়িককালে ফার্সি ভাষায় রচিত কোনো প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায় না। তবে একথা সত্যি যে, সিরাজ সে যুগের বাংলার অত্যন্ত ধনী মহাজন জগৎ শেঠের কাছ থেকে সৌকৎ জংকে দমন করার জন্য ৩০,০০০,০০০ টাকা দাবি করেছিলেন। জগৎ শেঠের সংস্থা এই টাকা দিতে অস্বীকার করলে নবাব তাকে আঘাত করেন। তখন থেকেই বাংলার শেঠরা সিরাজের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেন।

১৭৫৭ সালের গোড়াতে দেখা গেল বাংলার অভিজাততন্ত্রের একটাই উদ্দেশ্য ছিল—সিরাজকে যেভাবে হোক নবাব পদ থেকে বিতাড়িত করা। ইতিমধ্যে সিরাজউদ্‌দৌল্লার সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধিতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছিল। কৃষ্ণদাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। তারপর সিরাজ দেখলেন যে বেসরকারি ইংরেজ বণিকেরা দস্তকের অপব্যবহার ঘটিয়ে নবাবকে শুল্ক ফাঁকি দিচ্ছে। তারপর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় এশিয়ান বণিকেরাও দস্তক অপব্যবহারের সুযোগ নিয়ে বাংলার নবাবকে বাণিজ্য শুল্ক ফাঁকি দিতে লাগলেন। তদুপরি ভারতীয় পণ্য যখন ইংরেজ নিয়ন্ত্রণাধীন কলকাতায় প্রবেশ করত, তখন সেইসব পণ্যের ওপর ইংরেজ কোম্পানি শুল্ক ধার্য করতে শুরু করে। ফলে সিরাজের পক্ষে ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

নবাব ও ইংরেজ শক্তির মধ্যে সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে উঠল যখন নবাব জানতে পারলেন যে ইংরেজরা তাঁর কোনো অনুমতি ছাড়াই কলকাতায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেছে। সিরাজ অত্যন্ত সঠিকভাবেই এই ঘটনাকে তাঁর সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ বলে মনে করেছিলেন। এত ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সিরাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘাতে যেতে চাননি। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য নারায়ণ দাসকে কলকাতায় পাঠান। কলকাতার ইংরেজ কোম্পানির প্রধান রজার ড্রেক নারায়ণ দাসকে অপমান করলেন।

সিরাজ তৎক্ষণাৎ ইংরেজ শক্তিকে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নেন। সিরাজের সেনাবাহিনী কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করেন। ইংরেজরা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সিরাজের বাহিনী ইংরেজদের

ওপর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড বা লুণ্ঠন কোনোটাই চালায়নি। ঐতিহাসিক ব্রিজিন গুপ্তকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে ইংরেজরা নবাবের কাছ থেকে উদার ও মানবিক ব্যবহার পেয়েছিলেন। কোলেট ও ওয়াট্‌স—এই দুই ইংরেজকে সঙ্গে নিয়ে নবাব কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। নবাবের বাহিনী ইংরেজ শক্তিকে পরাস্ত করে ১৭৫৬ সালের ২০ জুন কলকাতা দখল করে। কোলকাতার ইংরেজ কোম্পানির গভর্নর ড্রেক ও তার অনুচরেরা কলকাতার দক্ষিণে ফলতা নামক স্থানে আশ্রয় নেন।

সিরাজউদ্‌দৌল্লা এবং ইংরেজ কোম্পানির বিরোধের সূত্রপাত নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে মতপার্থক্য আছে। এস. সি. হিল (S. C. Hill)-এর মতে সিরাজের "ব্যক্তিগত অহংকার এবং অর্থলিপ্সা" (Personal vanity and avarice) এই বিরোধের জন্য দায়ী। কেমব্রিজ ঐতিহাসিক পিটার মার্শাল Peter Marshall) তাঁর *Bengal : The British Bridgehead* প্রায় একই ধারণার বশবর্তী হয়ে বলেছেন—ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যই সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করে ব্রিজিন গুপ্ত বলেছেন—ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ধৃষ্টতা সিরাজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। নিজ সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যেই নবাব ইংরেজদের কার্যকলাপে বাধা দিয়েছিলেন। ব্রিজিন গুপ্তের ভাষায়—একশত বছরের সম্পদশালী বাণিজ্য কতকগুলি ছোট ইংরেজ বণিককে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতে পরিণত করেছিল (A century of opulent trade converted the petty foggying merchants into imperialist swashbucklers)।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের জয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরাজিত ইংরেজরা ফলতায় পালিয়ে গিয়ে মাদ্রাজ থেকে সাহায্য আসার অপেক্ষায় বসেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে একটি অত্যন্ত সুদক্ষ ও পেশাদার ইংরেজ বাহিনী কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। ১৭৫৭ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় ইংরেজরা কলকাতা পুনর্দখল করে। ১৭৫৭ খ্রিঃ ৯ই ফেব্রুয়ারি নবাব সিরাজ উদ্‌দৌল্লা ইংরেজদের সঙ্গে আলিনগরের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইংরেজদের ফ্যাক্টরি এবং বাণিজ্যিক অধিকারগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ইংরেজ কোম্পানি কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের এবং 'সিক্কা' টাকা তৈরির অনুমতি লাভ করে। নবাব কলকাতা আক্রমণের জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হন।

সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য জগৎ শেঠ, মানিক চাঁদ, উমি চাঁদ, রায় দুর্লভ প্রভৃতিরা যে সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিলেন, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা ধরনের বিতর্ক আছে। এস. সি. হিল বলেছেন—জগৎ শেঠ সংস্থা ও তার অনুগামীদের সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছিল তৎকালীন হিন্দু সমাজের স্বৈরতান্ত্রিক মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। সি. এ. বেইলির বক্তব্যও মোটামুটি একরকম। তাঁর মতে—ইংরেজ শক্তি যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ১৭৫৭ সালে বাংলা দখল করেছিল, তা ছিল হিন্দু বাণিজ্যিক শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবের ফল। নবাব বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করুক এটা তাঁরা চাননি। বেইলি আরও বলেছেন—অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় ইংরেজ কোম্পানির সাথে বাংলার হিন্দু ও জৈন বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে জড়িত ছিল। কে. এন. চৌধুরী ও ওমপ্রকাশ অষ্টাদশ শতকীয় ভারতের বাণিজ্যিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—১৭৪০ খ্রিঃ থেকেই জগৎ শেঠ সহ অন্যান্য ভারতীয় বণিকদের ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য অত্যন্ত লাভজনক হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু অধ্যাপক সুশীল চৌধুরীর সাম্প্রতিক গবেষণা উপরোক্ত বক্তব্যকে খারিজ করেছে। প্রথমত, কেবলমাত্র ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিই যে ভারতে বুলিয়ন (সোনা-রূপা) আমদানি করত এ কথা ঠিক নয়। এমনকি তারা বৃহত্তম বুলিয়ন আমদানিকারীও ছিল না। দ্বিতীয়ত, পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, বাংলায় আর্মেনীয় বণিকসহ এশিয়ান বণিকদের বাণিজ্যের পরিমাণ ইউরোপীয় বণিকদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তৃতীয়ত, জগৎ শেঠ, উমি চাঁদ, খাজা ওয়াজিদ এই তিনজন ধনী বণিকের (এরাই সিরাজের বিরুদ্ধে প্রধানত ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন) আয়ের উৎস ঠিকমতো অনুধাবন করলে দেখা যায় ইউরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবসা করে তাঁরা যে অর্থ উপার্জন করতেন, অন্যান্য সূত্র থেকে তাঁদের আয়ের তুলনায় সেই আয় ছিল নিতান্ত কম। উমি চাঁদ ও খাজা ওয়াজিদের সম্পদ বৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিল লবণ ও সোরার একচেটিয়া বাণিজ্য। জগৎ শেঠ তাঁর বাৎসরিক আয় ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকাই সুদের কারবার ও মুদ্রা তৈরির মাধ্যমে উপার্জন করতেন।

সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেইলি, মার্শাল প্রমুখ কেমব্রিজ ঐতিহাসিকের বলেছেন—এটি ছিল মূলত হিন্দুদের মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্র। ইংরেজরা ঘটনাচক্রে এই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছিল। এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন সুশীল চৌধুরী। তিনি সঠিকভবেই বলেছেন—ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আড়াল করার স্বার্থেই এ ধরনের বক্তব্যের অবতারণা করা হয়েছে। তাছাড়া এই ষড়যন্ত্রকে কেবল হিন্দুদের ষড়যন্ত্র হিসাবে দেখাও ইতিহাস সম্মত নয়। আর্মেনীয় এবং মুসলমান বণিকরাও সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। রবার্ট ওর্মের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খাজা পেক্রুস নামে এক আর্মেনীয় বণিক ইংরেজ কোম্পানির ওয়াট্‌সকে জানিয়েছিলেন যে, মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলাতে চান।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ইংরেজ কোম্পানি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বারা তাড়িত হয়ে সিরাজের সিংহাসন আরোহণের পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে। একই সাথে সিরাজের উচ্চাভিলাষী আত্মীয়স্বজন, বাংলার ধনী বণিক ও মহাজনেরা এবং জমিদারেরা সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। উভয়পক্ষ তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য (সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করা) চরিতার্থ করার জন্য একে অপরের সাথে হাত মেলায়। ১৭৫৭ সালের ৪ জুন উভয়পক্ষের মধ্যে একটি বোঝাপড়া হয়। জুন মাসেই সিরাজ এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন। কিন্তু বিরোধীদের দমন করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সিরাজ মীরজাফরকে নিজের দিকে নিয়ে আসার জন্য তাঁকেই আবার 'বক্সি' পদে নিয়োগ করেন। সমসাময়িক ইংরেজ লেখক লিউক স্ক্র্যাফটন (Luke Scrafton) এই 'ভ্রান্ত' পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিরাজউদ্দৌল্লার সমালোচনা করেছেন।

ইংরেজরা প্রথম থেকেই সিরাজকে তাড়াতে চেয়েছিল, কারণ তারা জানত যে, নবাব হিসাবে সিরাজের অস্তিত্ব তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি বিঘ্নিত করবে। মীরজাফর ও জগৎ শেঠরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের জাল বুনে ইংরেজদের কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছিলেন। মীরজাফরের লক্ষ্য ছিল বাংলার মসনদ। জগৎ শেঠ ও তাদের ঘনিষ্ঠরা মনে করেছিল সিরাজের পরিবর্তে অন্য কেউ নবাব হলে রাষ্ট্রের যাবতীয় দাবি না মেটালেও চলবে।

১৭৫৭ সালের ১৩ জুন রবার্ট ক্লাইভ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। মুর্শিদাবাদের কাছে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ সৈন্য ২৩শে জুন নবাবের বাহিনীর মুখোমুখি হয়। পলাশীতে নামমাত্র যুদ্ধ হয় এবং ইংরেজ শক্তি সহজেই নবাবের বাহিনীকে পরাজিত করে। তবে সম্প্রতি ডেনমার্কের মহাফেজখানায় (Danish Archives) প্রাপ্ত নথিপত্র থেকে মনে হয় যে, যত সহজে ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল বলা হয়ে থাকে তত সহজে ইংরেজরা জয়লাভ করেনি। তাছাড়া রিয়াজ উস্ সালাতিনের লেখক গোলাম হোসেন সলিম বলেছেন—নবাবের পক্ষেই জয়ের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। হঠাৎ কামানের গোলায় নবাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মীরমদন নিহত হলে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ইংরেজ লেখক লিউক স্ক্র্যাফটন (Luke Scrafton) পলাশীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তাঁর বিবরণে লিখেছিলেন, "One great cause of our success was that......we had the good fortune to kill Mir Madan." অর্থাৎ আমাদের সাফল্যের অন্যতম বড় কারণ ছিল যে, আমাদের মীরমদনকে হত্যা করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মীরজাফর ও রায়দুর্লভের নেতৃত্বাধীন এক বিরাট সংখ্যক নবাবী সৈন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেদের যুদ্ধের প্রক্রিয়া থেকে বিরত রেখেছিল। ফলে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ অনেকটাই সহজ হয়েছিল। পলাশীতে পরাস্ত সিরাজ মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন। পথে মীরজাফরের লোকেরা তাঁকে হত্যা করে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহায্যে মীরজাফর বাংলার নতুন নবাব পদে আসীন হলেন।

১(ক).৩ মীরজাফর ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৭৫৭—১৭৬০)

জগৎ শেঠের সংস্থা বাংলার রাজস্ব বিষয়ে নতুন নবাব মীরজাফরের অংশীদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মীরজাফরের নিরাপত্তার জন্য এই মিত্রতা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ক্লাইভ মীরজাফরকে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জগৎ শেঠের মতামত নিয়ে চলেন। মীরজাফরকে বাংলার নবাব নিযুক্ত করার আগে ইংরেজ কোম্পানি তাঁর সঙ্গে কতগুলি চুক্তি করে। চুক্তিগুলো ছিল এই রকম—(১) ইংরেজ কোম্পানি বাংলাদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার এবং সবরকম বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা পাবে। (২) টাকা তৈরির একচেটিয়া অধিকার আর জগৎ শেঠের হাতে থাকল না; ইংরেজ কোম্পানিও নবাবের কাছ থেকে টাকা তৈরির অধিকার লাভ করে। (৩) কোম্পানি চব্বিশ পরগনা জেলার জমিদারী পেল এবং বলা হল ঐ অঞ্চল থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব দিয়ে কোম্পানি তার সামরিক ব্যয় নির্বাহ করবে। (৪) কলকাতার ওপর নবাবের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। (৫) মুর্শিদাবাদে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত থাকবে। (৬) প্রয়োজনে কোম্পানি বাংলার নবাবকে সামরিক সাহায্য দেবে।

চুক্তির শর্তগুলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, সরাসরি বাংলার শাসনভার গ্রহণ না করলেও ইংরেজ কোম্পানি বাংলার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজেদের আধিপত্য ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল যদুনাথ সরকার তাই পলাশীর যুদ্ধকে ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বিভাজন রেখা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে, ইংরেজদের বিজয় ভারত ইতিহাসে এক "গৌরবময় ভোরের" (Glorious Dawn) সূচনা করেছিল। কিন্তু পলাশীর বিজয় যে ইংরেজ শক্তির ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ঔপনিবেশিক শাসন গড়ে তোলার পথ উন্মুক্ত করেছিল, সে বিষয়টির ওপর যদুনাথ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ইংরেজরা ভারতীয়দের মধ্যে

পাশ্চাত্য দর্শন ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য সিরাজের বিরোধিতা করেনি। নিজেদের দেশে শিল্পবিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত করার তাগিদে বাংলা তথা ভারতের ওপর অবাধ লুণ্ঠন চালানোর উদ্দেশ্যেই তারা পলাশীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

মীরজাফর যখন বাংলার নবাব হলেন তখন বাংলার আর্থিক সঙ্কট চরমে পৌঁছেছিল। সৈন্যদের নিয়মিত বেতন দেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই তাদের মধ্যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। মীরজাফরের আমলে বাংলায় তিনটি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল—মেদিনীপুরের জমিদার রাজারাম সিংহের বিদ্রোহ, পূর্ণিয়াতে হজরৎ আলিশাহ্ ও অচল সিং-এর বিদ্রোহ এবং পাটনায় রামনারায়ণের বিদ্রোহ। প্রথম দুটি বিদ্রোহ মীরজাফর ইংরেজদের সাহায্যে দমন করেছিলেন। কিন্তু পাটনার রামনারায়ণ ক্লাইভের সঙ্গে একটি গোপন সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। ক্লাইভ মীরজাফরের হাত থেকে রামনারায়ণকে নিরাপত্তা দেবার আশ্বাস দেন। মীরজাফর জানতেন যে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলি সংগঠিত করার পেছনে রায়দুর্লভের হাত আছে। কিন্তু রায় দুর্লভের সঙ্গেও ক্লাইভের গোপন আঁতাত ছিল। মীরজাফর ইংরেজদের ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন যে, ক্লাইভের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর পক্ষে রামনারায়ণ বা রায়দুর্লভ কাউকেই দমন করা সম্ভব ছিল না। রামনারায়ণকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেবার বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানি উত্তর বিহারে সোরা ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল। স্ক্র্যাফটনের লেখা থেকে জানা যায়—মীরজাফর যাতে কখনোই ইংরেজ বিরোধী না হয়ে ওঠেন সেদিকে নজর রাখার জন্য ক্লাইভ মীরজাফরের দরবারে একটি মীরজাফর বিরোধী গোষ্ঠীকে সক্রিয় রেখেছিলেন।

মীরজাফরের শাসনকালে দিল্লীর মোগল শক্তি বিহার আক্রমণ করে। ১৭৫৯ সালে শাহ্‌জাদা (যিনি পরে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম হয়েছিলেন) বিহার আক্রমণ করেন। সিরাজের অনুগত জমিদারেরা শাহ্‌জাদাকে সমর্থন করেন। ক্লাইভের সহায়তায় মীরজদাফর এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১৭৬০ সালে সাহ্ আলম আবার বিহার আক্রমণ করেন। বিহারের জমিদারেরা ছাড়াও বীরভূম ও পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জমিদারের শাহ্ আলমের পক্ষে যোগ দেন। ইংরেজ বাহিনী মীরজাফরের হয়ে যুদ্ধ করে এবং শেষপর্যন্ত ইংরেজ বাহিনীর হাতে শাহ্ আলম পরাস্ত হন। মীরজাফর ইংরেজ শক্তির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং তাঁর দুর্বলতা স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়।

যুদ্ধ করে মীরজাফরকে রক্ষা করার বিনিময়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীরজাফরের কাছ থেকে প্রচুর টাকা দাবি করেছিল। কিন্তু বাংলার আর্থিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, মীরজাফরের পক্ষে কোম্পানির দাবি মেটানো সম্ভব ছিল না। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণ হিসাবে মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানিকে ১৭,৭০০০,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। তার ওপর কোম্পানির কর্মচারীদের বহু টাকার উৎকোচ ও মূল্যবান সমস্ত উপঢৌকন দিতে হয়েছিল। ক্লাইভ একাই ১০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। ক্লাইভ পরবর্তীকালে হিসেব করে বলেছিলেন যে, কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা বাংলার ক্রীড়নক নবাব মীরজাফরের কাছ থেকে ৩ কোটি অর্থমূল্যের সম্পদ পেয়েছিল।

কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের এত কিছু দেওয়া সত্ত্বেও এক বিরাট আর্থিক বোঝা নিয়ে মীরজাফর নবাব পদে বসেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইংরেজদের দাবি ছিল ৩০ লক্ষ স্টার্লিং। কিন্তু

সে মুহূর্তে মীরজাফরের পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। ঠিক হয় যে এই টাকার অর্ধেক জগৎ শেঠ কোম্পানিকে দেবে। বাকি অর্ধেক নবাব তিন বছর ধরে কিস্তিতে কিস্তিতে দিয়ে যাবেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ক্লাইভকে নিশ্চিত করেনি। ১৭৫৮ সালে ক্লাইভ তিনটি বড় জেলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার দাবি করেন। এপ্রিল মাসে মীরজাফর কোম্পানিকে নদীয়া ও বর্ধমানের রাজস্ব আদায়ের অধিকার ন্যস্ত করতে বাধ্য হন। ইংরেজ কোম্পানি যেহেতু সে সময় বাণিজ্য ছাড়াও রাজনৈতিক এবং সামরিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল, কোম্পানির ব্যয় অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নবাবের কাছে কোম্পানির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৫৭ সালের শেষ দিকে কোম্পানি দাবি করে যে, যতদিন কোম্পানির সৈন্যরা নবাবের হয়ে যুদ্ধ করবে, সেই সময় নবাব কোম্পানিকে মাসে ১ লক্ষ টাকা করে দিয়ে যাবেন। কোম্পানির চাপে মীরজাফর এই দাবিও মেনে নিতে বাধ্য হন। এই সময় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার ওপর কোম্পানির বম্বে ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে কোলকাতা থেকে নিয়মিত টাকা পাঠাতে হত। সামরিক খাতে কোম্পানির ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে কোম্পানি এক চরম আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়।

এই আর্থিক সঙ্কট মোচনের জন্য কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা বাংলাদেশে পুনরায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। ১৭৬০ সালের গোড়াতেই ক্লাইভ ইংল্যান্ড ফিরে যান। তখন থেকেই মীরজাফরের নবাব পদে বহাল থাকার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। ইংরেজ কোম্পানির গভর্ণর হিসাবে ক্লাইভের উত্তরসূরী হলওয়েল মীরজাফরকে পছন্দ করতেন না। তিনি ও তাঁর সহযোগী ইংরেজরা মীরজাফরের অপশাসনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার ওপর মীরজাফর যখন ইংরেজ কোম্পানির ক্রমবর্ধমান আর্থিক দাবি মেটাতে ব্যর্থ হলেন, তখন কোম্পানি কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ১৭৬০ সালের অগাস্ট মাসে ভ্যান্সিটার্ট কর্নেল ক্যালিউডকে জানিয়েছিলেন যে মীরজাফর যদি কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা বা সমমূল্যের জমি দেন, তবে তিনি নবাব হিসাবে থাকতে পারবেন। কিন্তু মীরজাফরের পক্ষে তখন কিছুই দেওয়া সম্ভভব ছিল না। তখন কোম্পানি মীরজাফরের কাছে বর্ধমানের সমৃদ্ধশালী জমিদারী এবং মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা দু'টি সরাসরি দাবি করে। মীরজাফর কোম্পানির এই প্রস্তাবে রাজী হননি। তখনই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মীরজাফরকে পদচ্যুত করে নতুন নবাব নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইংরেজরা মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে। মীরকাশিম ইংরেজদের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি কোম্পানির আর্থিক সঙ্কট মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন এবং বর্ধমানের জমিদারী সহ চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর জেলা দু'টি কোম্পানির হাতে তুলে দেবে। বিনিময়ে মীরকাশিম বাংলার ডেপুটি সুবাদারের পদ লাভ করবেন। কিন্তু মীরজাফর এই বন্দোবস্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি মীরকাশিমকে ডেপুটি সুবাদার পদে গ্রহণ করলেন না।

তখন ১৭৬০ সালের অক্টাবর মাসে ভ্যান্সিটার্ট ও ক্যালিউড শক্তি ও ভীতি প্রদর্শন করে মীরজাফরকে পদচ্যুত করেন। মীরকাশিমকে নতুন নবাব নিযুক্ত করা হয়। রক্তপাতহীন ও নিঃশব্দ এই "বিপ্লব"-এর গুরুত্ব কম ছিল না। মীরজাফরের পদচ্যুতি স্পষ্টই প্রমাণ করেছিল ইংরেজরাই বাংলাদেশে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এবং রাজা তৈরির নায়ক (King maker)। ইংরেজ কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা বুঝিয়ে দিয়েছি — যে ব্যক্তি তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এবং ক্রমবর্ধমান সম্পদ লালসা মেটাতে সাহায্য করবে, তাকেই তারা বাংলার নবাব পদে বসাবে।

১(ক).৪ মীরকাশিম ও বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬০—১৭৬৪)

১৭৬০ সালে বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত হয়েই মীরকাশিম ইংরেজ কোম্পানির হাতে বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের জমিদারী তুলে দেন। যে সমস্ত ইংরেজ তাঁকে নবাব হতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিতিন প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা মূল্যের উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কোম্পানি কর্তৃবক্ষ মনে করেছিল। মীরকাশিমকে দিয়ে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু ইংরেজরা অচিরেই আশাহত হয়েছিল।

মীরকাশিম মীরজাফরের মতো অপদার্থ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি পূর্ব ভারতে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর রাজ্যের সমস্যাগুলি বোঝার ব্যাপারে তিনি তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে বাংলাকে একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে হলে দু'টি পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমত, মারাত্মক আর্থিক সঙ্কট থেকে বাংলাকে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয়ত, একটি সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা।

নবাব হওয়ার পরেই মীরকাশিম কতকগুলি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেন। প্রথমেই তিনি ইংরেজদের প্রিয়পাত্র পাটনার দেওয়ান রামনারায়ণকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। রামনারায়ণের কাছে নবাবের প্রচুর টাকা পাওনা ছিল। কিন্তু সে টাকা মিটিয়ে দিতে রামনারায়ণ অহেতুক দেরী করেছিলেন। তাছাড়া রামনারায়ণ কখনোই নবাবের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য দেখাননি। তাই মীরকাশিম তাঁকে বিতাড়িত করে হত্যা করেন। রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য মীরকাশিম আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তিনি জায়গীরগুলির ওপর নবাবী কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নতুন করে কর ধার্য করেন। যেসব জমিদারীগুলিতে নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল অল্প, সেখানে বর্ধিত রাজস্বের বোঝা চাপানো হল। যদিও মীরকাশিম শাসনতন্ত্রের প্রত্যেক স্তরেই দক্ষতা এনে রাজস্ব বাবদ রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তবুও সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে তাঁর নির্ধারিত রাজস্বের একটা বৃহৎ অংশই আদায় করা যায়নি। ইংরেজদের পাওনা মেটানোর জন্য জগৎ শেঠদের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উপরোক্ত কার্যসিদ্ধি হবার পর মীরকাশিম জগৎ শেঠ ও তাঁর সাঙ্গপঙ্গাদের তাঁর নতুন ব্যবস্থা থেকে বাদ দিলেন।

সামরিক সংস্কারের ক্ষেত্রে মীরকাশিম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। প্রথমেই তিনি তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। ৯০,০০০ সৈন্য নিয়ে গড়ে ওঠা পুরনো নবাবী বাহিনীকে তিনি বাতিল করেন। পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের একটি সুদক্ষ বাহিনী তিনি গড়ে তোলেন। এই নতুন বাহিনীকে পাশ্চাত্য কৌশলে সুশিক্ষিত করার জন্য গুর্গিন খান নামে এক আর্মেনীয় সৈন্যাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা হয়। মুঙ্গেরে অস্ত্র নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। ইংরেজদের কাছে বিষয়টি গোপন রাখার জন্যই ইংরেজ ঘাঁটি কলকাতা থেকে বহুদূরে মুঙ্গেরে মীরকাশিম তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

ইংরেজরা প্রথম দিকে মীরকাশিমের ওপর মোটামুটি সন্তুষ্টই ছিল। কোম্পানি তিনটি জেলার জমিদারী লাভ করে এবং সিলেক্ট কমিটির সদস্যরা প্রচুর মূল্যবান উপহার পেয়ে খুশি হয়েছিল। বিহারে গৃহীত কঠোর পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে ইংরেজরা মনে করেছিল মীরকাশিম বিহারে আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ রামনারায়ণের পদচ্যুতি ও হত্যা কিছু ইংরেজকে অখুশি করলেও সাধারণভাবে বিষয়টিকে তারা কুনজরে দেখেনি, কারণ গভর্নর ভ্যান্সিটার্টই স্বয়ং রামনারায়ণের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন।

১৭৫৭ সালের পর কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বেসরকারি বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই বেসরকারি বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে মীরকাশিম ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে সম্পর্কের অবনতির সূত্রপাত। ইংরেজ বণিক ও তাদের ভারতীয় দালালেরা এমন সব এলাকায় বাণিজ্যে লিপ্ত হতে লাগলেন যেখানে তারা আগে প্রবেশ করেনি। এমন সব পণ্য তারা ক্রয়-বিক্রয় করতে লাগল যে সব পণ্যের ওপর এতদিন পর্যন্ত বাংলা সরকারের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার স্বীকৃত ছিল। লবণ ব্যবসা ছিল এরকম একটি বিষয়। লবণ তৈরির ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর ইংরেজ বণিককরা সমগ্র বাংলাদেশে লবণ বিক্রয় করার নিজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলে। লবণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের প্রক্রিয়া নবাবের একচেটিয়া কারবারের অধিকারকে সরাসরি লঙ্ঘন করেছিল। এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই মীরকাশিমকে ক্রুব্ধ করেছিল।

নবাবের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজ বণিকদের দ্বারা দস্তকের মারাত্মক অপব্যবহার। মীরকাশিম দেখলেন যে, দস্তকের অপব্যবহারের ফলে বাংলার অর্থনীতি দু'ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। (১) বাণিজ্যশুল্ক বাবদ রাষ্ট্রের আয় কমছে। (২) এক অসমপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার ফলে দেশীয় বণিকদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। নবাবের কর্মচারীরা ইংরেজ বণিকদের বেআইনী ব্যবসা বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নিলেন। বেশকিছু লবণবাহী নৌকো আটক করা হল। ১৭৬২ সালের জুন মাসে ভ্যান্সিটার্ট নিজে স্বীকার করলেন যে তিনি ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের লবণ ব্যবসায়ের জন্য দস্তক দিয়েছেন। শুধু লবণের ক্ষেত্রে নয় পান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও ইংরেজ বণিকেরা দস্তকের অপব্যবহার ঘটিয়ে নবাবকে প্রচুর বাণিজ্যশুল্ক ফাঁকি দিত। তামাক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তারা নবাবকে নামমাত্র বাণিজ্যশুল্ক দিত।

ইংরেজ বণিকদের বিনা শুল্কে বা অত্যল্প বাণিজ্য করার ফলে কেবল ভারতীয় বণিকরাই নয় আর্মেনীয় বণিরকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। বিহারের সোরা কারবারের ওপর ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম হবার ফলে আর্মেনিয় বণিকরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তার ওপর এই অসম প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ বিঘ্নিত করেছিল। মীরকাশিম বুঝেছিলেন যে আর্মেনীয়দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে তাদের ক্ষোভের নিরসন করা দরকার। তার ওপর মীরকাশিমের কাছে অভিযোগ আসে যে, ইংরেজ বণিকরা দেশীয় ব্যবসায়ীদের ওপর বলপ্রয়োগ করে বা তাদের ভীতি প্রদর্শন করে তাদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যের থেকে অনেক সস্তায় পণ্য খরিদ করতেন। ১৭৬২ খ্রিঃ মে মাসে মীরকাশিম এসব বিষয় নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির গভর্নর ভ্যান্সিটার্টকে লিখিত অভিযোগ জানান। কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। নবাব কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে একের পর এক অভিযোগ জানিয়ে গেলেন। কিন্তু দস্তকের অপব্যবহার অথবা কোম্পানি কর্মচারীদের দেশীয় বণিক ও কৃষক উৎপাদনকারীদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নিল না। তখন নবাব কঠোর পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৭৬২ সালের অক্টোবর মাসে বাংলার বিভিন্ন নদীমুখে ইংরেজ বণিকদের পণ্যবাহী নৌকো মীরকাশিমের কর্মচারীরা আটক করলেন।

এই পরিস্থিতিতে ১৭৬২ সালের শেষ দিকে নবাবের সঙ্গে আলোচনার জন্য ভ্যান্সিটার্ট মুঙ্গের যান। ভ্যান্সিটার্ট মীরকাশিমকে আশ্বাস দিলেন যে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করেও তিনি ইংরেজ বণিক ও তাঁদের গোমস্তাদের যাবতীয় অপকর্ম বন্ধ করবেন। মীরকাশিম বলেন যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকদের ওপর ৯ শতাংশ হারে। ভ্যান্সিটার্ট এই প্রস্তাব মেনে নেন এবং নবাবকে কথা দেন যে ভবিষ্যতে বাণিজ্য সংক্রান্ত কোনো বিরোধ বা সমস্যা দেখা দিলে নবাবের কর্মচারীরা তার নিষ্পত্তি করবেন। কিন্তু একগুঁয়ে কলকাতা কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে। তারা জানিয়ে দেয় যে বেসরকারি ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকরা ২১/২ শতাংশের বেশি শুল্ক দেবে না এবং ইংরেজ বণিকদের বিচার করবেন ইংরেজরা, নবাবের কর্মচারীরা নয়।

এই অবস্থায় মীরকাশিম তাঁর কর্মচারীদের অবাধ্য ইংরেজ বণিকদের কঠোর হাতে দমন করার নির্দেশ দিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ বণিক ও নবাবের কর্মচারীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। তার ওপর মীরকাশিম আরেকটি কঠোর সিদ্ধান্ত নেন। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি যাবতীয় শুল্ক তুলে দেন। অর্থাৎ ভারতীয় ও অন্যান্য বণিকদেরও আর কোন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যশুল্ক দিতে হবে না। ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর কোনো অসম প্রতিযোগিতা রইল না। এর ফলে রাষ্ট্রের আয় বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেল বটে, কিন্তু দেশীয় বণিকদের রক্ষা করার এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ইংরেজ বণিকরা নবাবের এই সিদ্ধান্তে অসম্ভব ক্রুদ্ধ হলেন। মীরকাশিম ও ইংরেজ বণিকদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকরা নানারকম মত দিয়েছেন। মীরকাশিমের সমসাময়িক এক ইংরেজ কর্তাব্যক্তি ভেরেলেস্ট মন্তব্য করেছেন—দস্তকের অপব্যবহার বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নয়, মীরকাশিমের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এই সংঘর্ষের জন্য দায়ী। ভেরেলেস্টের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে ঐতিহাসিক ডডওয়েল বলেছেন—মীরকাশিম ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে যুদ্ধের অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন মাত্র। পি. জে. মার্শাল বলেছেন—মীরকাশিম প্রথম থেকেই বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর তিন বছরের নবাবী শাসনে পূর্ব ভারতে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলার আন্তরিক প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছিল। সুতরাং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা দেখা না দিলেও অন্য কোন অজুহাতে তিনি ইংরেজ বিরোধী সংঘাতে অবতীর্ণ হতেন। কিন্তু অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী বলেছেন—মীরকাশিমের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, বা ইংরেজ নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে মুক্ত করার অভিপ্রায় নয়, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধই ইংরেজ ও মীরকাশিমের মধ্যে সংঘর্ষের জন্য দায়ী। রবার্ট ক্লাইভ বাংলায় ফিরে আসার পর ১৭৬৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি লন্ডনে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীকে পাঠানো একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "Inland trade had been the foundation of all bloodshed, massacre and confusion which have happened of late years in Bengal." অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালের বাংলায় যাবতীয় রক্তপাত, হত্যা এবং ঝামেলার মূলে রয়েছে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। ক্লাইভের এই চিঠি অধ্যাপক চৌধুরীর বক্তব্যের সত্যতাই প্রমাণ করে। মালদার রেসিডেন্ট গ্রে বেসরকারি ইংরেজ বণিক ও তাদের গোমস্তাদের নবাবকে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া এবং দেশীয় বণিক ও কৃষক-উৎপাদনকারীদের

ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর জন্য তীব্র নিন্দা করেছেন। বেসরকারি ইংরেজ বণিকদের অন্যায় আচরণ বন্ধ করার বিষয়ে মীরকাশিম যখন বদ্ধপরিকর হলেন, তখন ইংরেজ কোম্পানি তাঁর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হবার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৭৬৩ সালের জুলাই মাসে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে মীরকাশিমের যুদ্ধ শুরু হয়। মীরকাশিম পরপর কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, উদয়নালা ও মুঙ্গেরের যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। মীরকাশিম অযোধ্যায় পালিয়ে যান। যে মুহূর্তে ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশিমের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সে মুহূর্তে ইংরেজরা বাংলার মসনদ থেকে মীরকাশিমকে অপসারিত করে মীরজাফরকে বাংলার নবাব পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সমস্ত বাণিজ্যশুল্ক তুলে দেবার যে আদেশ মীরকাশিম দিয়েছিলেন, নবাব হবার পরই মীরজাফর তা প্রত্যাহার করে নেন। ইংরেজ কর্মচারীরা বিনা শুল্কে বেসরকারি বাণিজ্য করার অনুমতি পেল। বলা হল, কেবলমাত্র লবণের ওপর ইংরেজ বণিকেরা ২$^{১}/_{২}$ শতাংশ হারে বাণিজ্যশুল্ক দেবেন। তাছাড়া কোম্পানির যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য মীরজাফর কোম্পানিকে মাসিক ৫ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন। বাংলা নবাবীর স্বাধীন সত্তা বলে কিছু রইল না। বাংলার প্রতিরক্ষা পুরোপুরি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে গেল।

পরপর যুদ্ধগুলিতে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়েও মীরকাশিম হতোদ্যম হননি। তিনি ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে শেষ লড়াইএ অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্‌দৌল্লা এবং দিল্লির তৎকালীন মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি ইংরেজ বিরোধী মোর্চা তৈরি করেন। ১৭৬৪ সালের অক্টোবর মাসে এই তিন শক্তির মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ বক্সারের যুদ্ধ নামে খ্যাত। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ শক্তি ১৭৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর উপরোক্ত তিন ভারতীয় শক্তির মিলিত বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। দ্বিতীয় শাহ আলম তৎক্ষণাৎ ইংরেজ পক্ষে যোগ দেন। সুজাউদ্‌দৌল্লা রোহিলখণ্ডে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। মীরকাশিম আত্মগোপন করেন। ১৭৭৭ সালে মীরকাশিম মারা যান।

বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পলাশীর প্রান্তর থেকে ইংরেজ শক্তি যে বিজয় অভিযান আরম্ভভ করেছিল বক্সারে তা সম্পূর্ণতা লাভ করে। বাংলাদেশের ওপর ইংরেজ কোম্পানির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া এই যুদ্ধে ইংরেজরা কেবল বাংলার নবাবকে নয়, অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লির মোগল বাদশাকেও পরাস্ত করেছিল। ফলে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংরেজদের গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ক্ষমতা বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানির বিজয় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করেছিল।

১(ক).৫ ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভ

১৭৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মীরজাফর মারা যান। বাংলার নতুন নবাব হন মীরজাফর পুত্র নজমউদ্‌দৌল্লা। ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরেজরা নজমউদ্‌দৌল্লার সঙ্গে একটি চুক্তি করে। এই চুক্তিতে বলা হয় ইংরেজদের মনোনীত এক ব্যক্তি বাংলার নায়েব নাজিম বা ডেপুটি সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং তিনিই

বাংলার শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি দেখাশোনা করবেন। ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা না করে নবাব নায়েব নাজিমকে পদচ্যুত করতে পারবেন না। ইংরেজ কোম্পানি মহম্মদ রেজা খানকে নায়েব নাজিম পদে মনোনীত করে। রেজা খানের মাধ্যমে বাংলার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ইংরেজরা হস্তগত করে এবং নবাব নজমউদ্‌দৌল্লাকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৭৬৫ সালের মে মাসে ক্লাইভ বাংলাদেশে পুনরায় ফিরে আসেন।

বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানির বিজয়ের পর যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উত্থান ঘটেছিল, সেই পরিস্থিতির উত্থান ঘটেছিল, সেই পরিস্থিতিকে ক্লাইভ ইংরেজ শক্তির স্বার্থে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। যেহেতু মীরকাশিম ছাড়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্‌দৌল্লা এবং দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম ইংরেজদের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন সেহেতু ক্লাইভ বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইংরেজ আধিপত্য অনায়াসেই কায়েম করতে পারতেন। কিন্তু ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ রবার্ট ক্লাইভ সেই মুহূর্তে এই বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। তিনি ইংরেজ শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে ক্লাইভ দ্বিতীয় শাহ্ আলম এবং সুজাউদ্‌দৌল্লার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৭৬৫ সালের ১২ই অগাস্ট এলাহাবাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সুজাউদ্‌দৌল্লা তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন। বিনিময়ে তিনি ইংরেজ কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হলেন। কেবলমাত্র কারা এবং এলাহাবাদ অযোধ্যা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে মোগল সম্রাটকে দিয়ে দেওয়া হল। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে দিল্লির সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হল। বিনিময়ে শাহ্ আলম একটি ফরমানের মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি ইংরেজ কোম্পানির হাতে তুলে দেন। ইংরেজরা এর বিনিময়ে শাহ্ আলমকে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। তাছাড়া ইংরেজরা বাংলার নবাব নজমউদ্‌দৌল্লাকে বাৎসরিক ভাতা হিসাবে ৫৩ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলা দেওয়ানি লাভ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দেওয়ানি লাভ করে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ অধিকার লাভ করে। এই অধিকার লাভ করার ফলে কোম্পানি আর্থিক দিক যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল। মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোম্পানির প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। শাহ্ আলমের থেকে বাংলার দেওয়ানি লাভ করে ক্লাইভ ইংরেজ কোম্পানির আর্থিক সঙ্কট মোচন করতে চেয়েছিলেন। এই প্রয়াসে তিনি সফলও হয়েছিলেন।

তাছাড়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বাংলার প্রাদেশিক অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করার আইনি স্বীকৃতি লাভ করেছিল ইংরেজরা। আর এই অধিকার তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন স্বয়ং দিল্লির সম্রাট। নজমউদ্‌দৌল্লার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে ইংরেজরা আগেই বাংলার অভ্যন্তরীণ শাসনতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করার অধিকার লাভ করেছিল। শাহ্ আলমের ফরমান তাদের রাজস্ব আদায়ের অধিকার দিয়েছিল।

১(ক).৬ সারাংশ

বাংলার দেওয়ানি লাভ করে ইংরেজরা যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ফলে সামরিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তাদের আরও সাফল্যলাভের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক বাংলার

দেওয়ানি লাভের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা গেল যে ১৭৬৫ সালের পর থেকে ইংল্যান্ড থেকে সোনা-রূপা বা বুলিয়ন আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। পলাশীর আগে বাংলাদেশের বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার জন্য ইংরেজ বণিকরা দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে বুলিয়ন আনত। পলাশীর পর থেকে তারা যে সম্পদ আহরণ করতে শুরু করেছিল তা দিয়েই তারা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করত। ফলে তখন থেকেই ইংল্যান্ড থেকে বুলিয়ন আমদানি হ্রাস পেতে থাকে। দেওয়ানি লাভের পর বাংলার রাজস্ব বাবদ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে আয় হত, তা ছিল বিনিয়োগের পক্ষে যথেষ্ট বেশি। ১৭৬৫ সালের পর ইউরোপ থেকে সোনা, রূপা আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকেই বাংলার নবাবরা ইংরেজ শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন। বক্সারের যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজরা তাদের ক্ষমতা আরও নিরঙ্কুশ করেছিল। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলার নবাবদের সার্বভৌম কর্তৃত্বের শেষ রেখাটুকু মুছে গেল।

১(ক).৭ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১। পলাশীর যুদ্ধের কারণ ও তাৎপর্য আলোচনা কর।

২। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৪ গাল পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে বাংলাদেশে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

৩। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের তাৎপর্য আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

৪। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সিরাজউদ্দৌল্লার বিরোধের কারণগুলি লেখ।

৫। ইংরেজ কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা কেন মীরজাফরকে বাংলার নবাব পদ থেকে অপসারিত করেন?

৬। বাংলার দেওয়ানি লাভ কীভাবে ইংরেজ কোম্পানিকে উপকৃত করেছিল?

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন :

৭। সিরাজের কোন দু'জন আত্মীয় সিরাজ নবাব হবার ফলে ক্ষুব্ধ হন?

৮। আলিনগরের চুক্তি কাদের মধ্যে এবং কত সালে হয়েছিল?

৯। পলাশীর যুদ্ধের সময় ইংরেজ কোম্পানির প্রধান কে ছিলেন?

১০। মীরকাশিম বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কোথায় স্থানান্তরিত করেন?

১১। এলাহাবাদ চুক্তি কবে ও কাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়?

১(ক).৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Susil Chaudhuri : *Prosperity and Poverty in Bengal,* Delhi, 1997.

২। —— 'Sirajuddaulah, the English Company and the Plassey Conspiracy' in *Indian Historical Review,* 1986—87, Vol. 13 (1—2).

৩। P. J. Marshall : *Bengal : The British Bridgehead,* Cambridge, 1987.

৪। C. A. Bayly : *Indian Society and the Making of the British Empire,* Cambridge, 1988.

৫। Brijin Gupta : *Sirajuddaulah and the East India Company,* 1756—57, Leiden, 1962.

৬। S. C. Hill : *Bengal in 1756—57,* Vol. 1—3, London, 1905.

৭। Rajat Kanta Ray : 'Colonial Penetration and the Initial Resistance : The Mughal Ruling Class, The English East India Company and the Struggle for Bengal 1756—1800' in *Indian Historical Review,* 1985—86, Vol. 12(1—2).

৮। Benoy Chaudhury : 'Political History' in N. K. Sinha (ed.), *The History of Bengal (1757—1905),* Calcutta, 1967.

৯। Suranjan Chatterjee and Siddhartha Guha Ray : *History of Modern India,* Calcutta, 1997.

১০। রজত কান্ত রায় : *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ,* কলকাতা, ১৯৯৪।

১১। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *পলাশি থেকে পার্টিশান*

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ১(খ) ❑ বাংলায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো—আদিযুগ

গঠন

১(খ).০ উদ্দেশ্য

১(খ).১ প্রস্তাবনা

১(খ).২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩)

১(খ).৩ পিটের ভারত আইন (১৭৮৪)

১(খ).৪ বিচার বিভাগীয় সংস্কার

১(খ).৪.১ ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার

১(খ).৪.২ কর্নওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার

১(খ).৫ ভূমিরাজস্ব নীতি

১(খ).৫.১ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তারপর

১(খ).৫.২ ওয়ারেন হেস্টিংসের ইজারাদারী বন্দোবস্ত ও তার পরিণতি

১(খ).৫.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট

১(খ).৫.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলার ইতিহাসে তার প্রভাব

১(খ).৬ সারাংশ

১(খ).৭ অনুশীলনী

১(খ).৮ গ্রন্থপঞ্জী

১(খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার কথা।
- ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার।
- বাংলার ভূমিব্যবস্থায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাব।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি।

১(খ).১ প্রস্তাবনা

১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানির বাংলার দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাকে ঐতিহাসিকেরা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা (Dual system of administration) বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে দুজন শাসকের অধীনস্থ হয়। বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা সমেত যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রশাসন রইল ইংরেজ কোম্পানির হাতে। অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নিজামতের দায়িত্ব সমেত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রইল নবাব নজম উদ্দৌল্লার হাতে। কিন্তু দেওয়ানির দায়িত্ব না থাকার ফলে নবাবের রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই বলা হয়েছে এলাহাবাদ চুক্তির ফলে ইংরেজ কোম্পানি পেল দায়িত্ববিহীন অধিকার এবং বাংলার নবাব পেলেন অধিকারবিহীন দায়িত্ব। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ, যা বাংলার ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১১৭৬ বঙ্গাব্দে হয়েছিল বলে) নামে পরিচিত বাংলার অর্থনীতিতে এক বিরাট বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। বহু ইংরেজই মনে করেছিলেন বাংলার অবস্থার পরিবর্তন জরুরি। তাছাড়া বাংলায় ইংরেজ কর্মচারীদের দুর্নীতি, অসৎ উপায়ে সম্পদ আহরণ, উদ্ধত আচরণ ও অত্যাচার ইংল্যান্ডে উত্তপ্ত বিতর্কের সূচনা করেছিল। তখন থেকেই বাংলাদেশে একটি ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। বাংলাদেশে কোম্পানির কার্যকলাপে ব্রিটিশ সরকার কতটা হস্তক্ষেপ করবে তা নিয়েও বিতর্ক চলে। এই পরিস্থিতিতে কোম্পানি এবং ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে বাংলাদেশে একটি সুবিন্যস্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়; যা আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বণিক সংস্থা। তাই এই প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ছিল তারগ বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। কোম্পানির তিনটি প্রধান ঘাঁটি ছিল কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ এই ঘাঁটিগুলো স্বতন্ত্র তিনটি কাউন্সিল বা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হত। এই কাউন্সিলগুলি লন্ডনে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী বা কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্-এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে কাজ করত। কোম্পানির মালিক ও অংশীদারদের নিয়ে এই কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ গঠিত হত। প্রতিটি ভারতীয় ঘাঁটিতেই বণিকদের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস থাকত। কেবলমাত্র সফল বণিকরাই কাউন্সিলের সদস্য হতেন। এই সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে কাউন্সিলের সভাপতি করা হত। এই সভাপতি হতেন সংশ্লিষ্ট ঘাঁটির গভর্নর। কাউন্সিলগুলি তাঁদের নিজস্ব ঘাঁটির রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করত।

কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন ছিল সামান্য। কিন্তু তাঁরা ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এবং দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত থেকে নিজেদের আয় বাড়াতে পারতেন। তবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। এক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বেসরকারি বাণিজ্য চালানোর সুযোগ পেতেন না। পলাশীর পর থেকেই বাংলাদেশের কোম্পানি কর্মচারীদের সম্পদ বিপুল হারে বৃদ্ধি পায়। এই সম্পদশালী ইংরেজ বণিকের দল আঠেরো শতকের ইংল্যান্ডে একটি প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ১৭৬৭ সালের মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই গোষ্ঠীর প্রভাব

যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। দুর্নীতিগ্রস্ত এই বণিকগোষ্ঠী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রভাবশালী হয়ে ওঠার ফলে ইংল্যান্ডের নীতিজ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিবিদেরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এইসব ইংরেজ বণিকের দল প্রায়ই অসৎ উপায় অবলম্বন করে কোম্পানির শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছিলেন। কিন্তু কোম্পানি এদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেনি, কারণ কোম্পানির বেতর থেকেই বাধা এসেছিল। অসদুপায়ে বিপুল সম্পদ অর্জনকারী সকলেই ছিলেন কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের আত্মীয় অথবা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাছাড়া কোম্পানির মালিক ও অংশীদারেরাও এই বিপুল সম্পদে ভাগ বসাতে আগ্রহী ছিলেন। ১৭৬৬ সালে কোম্পানির অংশীদারদের লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ডের হার করা হয় ১০ শতাংশ। ১৭৬৭ সালে ডিভিডেন্ডের হার আরও বাড়িয়ে করা হয় ১২$^{১}/_{২}$ শতাংশ। ফলে কোম্পানি এক মারাত্মক আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করা হয়।

১(খ).২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট

১৭৭২ সালে কোম্পানির কার্যকলাপে সরকারি হস্তক্ষেপের যে তৎপরতা চলেছিল, তারই পরিণতি ১৭৭৩-এর রেগুলেটিং অ্যাক্ট। কোম্পানির কাছ থেকে ব্রিটিশরাজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম পদক্ষেপ ছিল এই আইন। এই আইনের কতকগুলি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, কোম্পানির অংশীদার ও পরিচালকদের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করা। দ্বিতীয়ত, কোম্পানির ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। তৃতীয়ত, বম্বে ও মাদ্রাজ কুঠির সঙ্গে কলকাতা তথা বাংলার সম্পর্ক কি হবে তা নির্ধারণ করা। এই আইন অনুযায়ী ৫০০ পাউন্ড শেয়ারহোল্ডারদের ভোটদানের ক্ষমতা নাকচ করা হয়। কমপক্ষে ১০০০ পাউন্ড শেয়ারহোল্ডারদের যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪টি ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। অর্থাৎ কোম্পানিতে বিত্তবানদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই আইনে বলা হয় যে, কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্ ব্রিটিশ সরকারের কাছে কোম্পানির শাসন ও অর্থনীতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পেশ করতে বাধ্য থাকবে। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির উপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল। বম্বে ও মাদ্রাজ কুঠির ওপর বাংলার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল নামে নতুন একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় বাংলার গভর্ণর, গভর্নর জেনারেল পদে আসীন হবেন। চারজন সদস্যবিশিষ্ট গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল গঠিত হয়। এই আইনেই গভর্নর জেনারেল হিসাবে ওয়ারেন হেস্টিংসের নাম এবং কাউন্সিল সদস্য হিসাবে ক্ল্যাভারিং, মনসন্, বারওয়েল এবং ফিলিপ ফ্রান্সিসের নাম ঘোষিত হয়। গভর্নর জেনারেলের শাসনকালের মেয়াদ হয় পাঁচ বছর। বলা হয় গভর্নর জেনারেল কলকাতা থেকে কোম্পানির বম্বে ও মাদ্রাজ কুঠির ওপর কর্তৃত্ব খাটাবেন। বস্তুত কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে পরিণত হয়। রেগুলেটিং অ্যাক্ট ছিল ভারতবর্ষে এককেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং কোম্পানির বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব জাহিরের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ।

১(খ).৩ পিটের ভারত আইন (১৭৮৪)

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই রেগুলেটিং অ্যাক্টের ত্রুটিগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই আইনের ফলে কোম্পানির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়নি। আবার কোম্পানির কর্মচারীদের ওপর পরিচালকমণ্ডলীর (Court of Directors) কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একইভাবে কাউন্সিলের ওপর গভর্ণর জেনারেলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বম্বে ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের ওপর বাংলার কর্তৃত্ব স্থাপনের বিষয়টিও অস্পষ্ট থেকে গিয়েছিল। তার ওপর কতকগুলি বিষয় পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছিল। কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ, কাউন্সিলের সঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের বিরোধ, প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও অন্যান্য যুদ্ধের জন্য ইংরেজ কোম্পানির বিপুল অর্থব্যয় কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তথা ইংরেজ সরকারকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এই অবস্থায় লর্ড নর্থ কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সংক্স ও বার্ক এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। ১৭৮১ সালের চার্টার আইনের মাধ্যমে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হলেও তা বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। সমস্যাগুলো থেকেই গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হন পিট। ১৭৮৪ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত ভারত আইন জারী করেন। এই আইন পিটের ভারত আইন (Pitt's India Act) নামে পরিচিত।

১৭৮৪ সালের পিটের ভারত আইন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করেছিল। ১৭৮৫ সালের ১লা জানুয়ারি ভারতবর্ষে এই আইন কার্যকর করা হয়। এই আইন অনুযায়ী একটি বোর্ড অফ কন্ট্রোল (Board of Control) গঠিত হয়। সিদ্ধান্ত হয়—ভারত সচিব (Secretary of State), অর্থসচিব (Chancellor of the Exchequer), চারজন প্রিভি কাউন্সিলার—এই ছয়জন কমিশনারকে নিয়ে বোর্ড অফ কন্ট্রোল গঠিত হবে। এই বোর্ডকে কোম্পানি কর্তৃক সামরিক ও অসামরিক শাসনকার্য পরিচালনা ও রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়গুলি দেখাশোনা ও নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়। বলা হয়—বোর্ড অফ কন্ট্রোল ইচ্ছেমতো কোম্পানির কাগজপত্র দেখতে পারবে ও নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ইংরেজ কুঠির গভর্নরদের ক্ষেত্রে কলকাতার গভর্নর জেনারেলের নির্দেশ মানা যে বাধ্যতামূলক এ বিষয়ে রেগুলেটিং অ্যাক্টে কোনো নির্দিষ্ট আইন ছিল না। পিটের ভারত আইন এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে এবং বলে যে, ভারতে কর্মরত কোম্পানির যেকোনো স্তরের প্রশাসনিক কর্তাই গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

১(খ).৪ বিচার বিভাগীয় সংস্কার

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর বাংলার রাজনীতিতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানি লাভ করে ইংরেজ কোম্পানি তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছিল। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) পর ইংরেজ কোম্পানি বাংলাদেশে আর দ্বৈত

শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায়নি। তারা সরাসরি বাংলাদেশের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নিতে চেয়েছিল। ১৭৭২ সালে ইংরেজ কোম্পানি সরাসরি বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বালাদেশে কোম্পানির গভর্নর হয়ে আসেন ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৭৩-এর রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী হেস্টিংস হন গভর্নর জেনারেল। হেস্টিংস দেখেছিলেন যে, তৎকালীন বাংলাদেশে কোন সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত বিচারব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। বাংলাদেশে কোম্পানির শাসনকে একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় রূপ দেবার জন্য বিচার বিভাগীয় সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। বিচার ক্রান্ত শাসনব্যবস্থাকে একটি চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১(খ).৪.১ ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার

১৭৭২ সালে ভ্রাম্যমাণ কমিটির (Committee of Circuit) সুপারিশ অনুসারে বাংলার প্রত্যেক জেলায় একটি করে দেওয়ানি আদালত ও একটি করে ফৌজদারি আদালত গঠিত হয়। কলকাতায় দু'টি উচ্চ আদালত গঠিত হয়েছিল। দেওয়ানি মামলার বিচারের জন্য সদর দেওয়ানি আদালত এবং ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তির জন্য সদর নিজামৎ আদালত কলকাতায় তৈরি হয়েছিল। এই দুটি আদালতই ছিল আপীল আদালত। জেলার দেওয়ানি আদালতগুলির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কালেক্টর। সদর দেওয়ানি আদালতের মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করতেন কাউন্সিলের সদস্যরা। সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন প্রেসিডেন্ট। ফৌজদারি আদালতগুলি ভারতীয় বিচারকদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ভারতীয় বিচারকেরা প্রচলিত রীতিনীতি ও নজিরের ওপর ভিত্তি করে ফৌজদারি মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। তবে প্রয়োজনে জেলা ফৌজদারি আদালতগুলির বিষয়ে কালেক্টর এবং সদর নিজামৎ আদালতের বিষয়ে কাউন্সিল সদস্যরা হস্তক্ষেপ করতে পারতেন।

১৭৭৪ সালে জেলা দেওয়ানি আদালতগুলি পরিচালনার জন্য 'আমিল' নামে একজল ভারতীয় কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমিলের বিচারে অসন্তুষ্ট হলে, যে-কোনো পক্ষই প্রাদেশিক কাউন্সিলে (Provincial Council) আবেদন করতে পারত। সেখানেও যদি কোন মামলার সঠিক নিষ্পত্তি না হত তবে সদর দেওয়ানি আদালতে আপীল করা যেত। ১৭৭৫ সালে সদর নিজামৎ আদালতকে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। নায়েব নাজিম নামক ভারতীয় পদাধিকারীর ওপর সদর নিজামৎ আদালতের দায়িত্ব অর্পিত করা হয়। নায়েব নাজিম নামক ভারতীয় পদাধিকারীর ওপর সদর নিজামৎ আদালতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। অপরাধমূলক মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন করে ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়।

১৭৮০ সালে ছয়টি প্রাদেশিক কাউন্সিলের বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ছয়টি দেওয়ানি আদালতের হাতে অর্পিত হয়। কোম্পানির উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের এই দেওয়ানি আদালতগুলির সভাপতিত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৭৮১ সালে দেওয়ানি আদালতের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৮ করা হয়। এই দেওয়ানি আদালতগুলির মধ্যে ৪টিতে কালেক্টরেরা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। অবশিষ্ট ১৪টিতে ইউরোপীয় বিচারকো বিচারের দায়িত্ব পালন করতেন। উচ্চতর আপীলের জন্য সদর দেওয়ানি আদালতে যেতে হত। জেলা আদালতের বিচারকেরা ক্রমে ফৌজদারি মামলার বিষয়েও ফৌজদারদের পরিবর্তে দেখাশোনা করতে আরম্ভভ করেন। তবে ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে নায়েব নাজিম তখনও চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ উপভোগ করতেন। দেওয়ানি বিচারের জন্য ওয়ারেন

হেস্টিংসের আমলে একটি হিন্দু আইনবিধি ও একটি মুসলিম আইনবিধি সঙ্কলিত হয়। এই আইনবিধি দুটি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

ইতিমধ্যে রেগুলেটিং অ্যাক্টের সুপারিশ অনুসারে ১৭৭৪ সালে কলকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট তৈরি হয়েছিল। এই সুপ্রীম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। ইংল্যান্ডের রানি এই আদালত তৈরি করেছিলেন। বলা হয়েছিল যে, সুপ্রীম কোর্ট কেবলমাত্র ব্রিটিশ নাগরিকদের বিচার করবে। কিন্তু এই আদালত তৈরি হবার ফলে বেশ কিছু বাস্তব অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট সবার ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করে। এই আদালত প্রায়ই কোম্পানির তৈরি করা আদালতগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে উক্ত আদালতগুলির বিচারক ও কর্মচারীদের বিচারের দায়িত্ব নিয়ে নিত। সুপ্রীম কোর্ট যে সমস্ত আইনী নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করত, তা ছিল ভারতীয়দের কাছে সম্পূর্ণ বিদেশী। ফলে সুপ্রীম কোর্টের কাজকর্ম বাংলার জনমানসে ক্ষোভ ও বিরক্তির সঞ্চার করেছিল। সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল—"এই আদালত ভারতীয়দের কাছে ভীতিজনক হয়ে উঠেছে এবং কোম্পানির সরকারকে অসুবিধায় ফেলেছে" (The Court has been generally terrible to the natives and has distracted the government of the Company.)।

১৭৮০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পেকে সদর দেওয়ানি আদালতের সভাপতি নিযুক্ত করেন। ইম্পেকে মোটা টাকার বেতনে বহাল করা হয়। কিন্তু এই কাজের জন্য হেস্টিংস কঠোরভাবে সমালোচিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি ইম্পেকে উৎকোচ প্রদান করেছেন। বস্তুত এক বিশাল পরিমাণ বেতনের বিনিময়ে এলিজা ইম্পেকে সদর দেওয়ানি আদালতের সভাপতি নিযুক্ত করা ছিল উৎকোচ প্রদানেরই নামান্তর। লন্ডনে কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ এবং হাউস অফ কমন্স সরকারের কাছে ইম্পেকে দেসে ফিরিয়ে আনার দাবি তোলে। ১৭৮২ সালে ইম্পে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে এবং তাঁর সমস্ত বেতন ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে ১৭৮১ সালের একটি আইনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট ও কাউন্সিলের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলা হয়। সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারে থাকবে না। গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিলের কোন বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কলকাতার সমস্ত অধিবাসীদের ওপর সুপ্রীম কোর্টের বিচার ক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৭৮২ সা্বে এলিজা ইম্পে ভারত ত্যাগ করার পর গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল সদর দেওয়ানি আদালতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১(খ).৪.২ কর্নওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার

ওয়ারেন হেস্টিংস ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার পর অল্প কিছুদিনের জন্য গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ম্যাকফার্সন। তারপর ১৭৮৬ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল হয়ে বাংলায় আসেন লর্ড কর্নওয়ালিস। কর্নওয়ালিসের আমলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় সংস্কার সাধিত হয়েছিল। ১৭৮৭ সালে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ ছাড়া সমস্ত জেলা আদালতগুলিকে পুনরায় কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হল। কালেক্টরদের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হল এবং তাঁরা সীমিত ভাবে ফৌজদারি মামলা

পরিচালনার অধিকারী ছিলেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারি মামলার বিচার তখনও জেলা ফৌজদারি আদালতগুলিতে এবং সদর নিজামৎ আদালতেই হত। কালেক্টররা রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করতে পারতেন না। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল রাজস্ব পরিষদে (Board of Revenue) ওপর।

১৭৯০ সালে এই ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে রাজস্ব পরিষদ বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। তখন রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির জন্য কালেক্টরের অধীনে একটি করে স্থানীয় আদালত গঠিত হয়েছিল। ফৌজদারি মামলার বিচারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ছিল আরও সুদূরপ্রসারী। সদর নিজামৎ আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে পুনরায় কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। একজন মুসলমান বিচারকের পরিবর্তে গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিল এই আদালতে সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভারতীয় আইন বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সাহায্য করতেন। জেলা ফৌজদারি আদালতগুলি তুলে দেওয়া হয়। তার পরিবর্তে কলকাতা, ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদে চারটি ভ্রাম্যমান আদালত গঠিত হয়। কোম্পানির দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভারতীয় আইন বিশেজ্ঞদের সহায়তায় এই আদালতগুলির মামলা পরিচালনা করতেন। এই বিচারকদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় তাদের বছরে দুবার ভ্রমণ করতে হত। কালেক্টরদের হাতে বিচারকের ক্ষমতা (Magistrate's Power) বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কালেক্টরেরা চারটি প্রাদেশিক ফৌজদারি বিচারালয়ের রায় অনুযায়ী অপরাধীদের শাস্তি দেবার দায়িত্ব নিতেন।

১৭৯৩ সালের মে মাসে বিখ্যাত 'কর্নওয়ালিস কোড' প্রণীত হয়। এই আইনবিধিতে আইনী পরিবর্তনগুলিকে বিশ্লেষণ করে আরও কিছু নতুন আইনের সূচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে "বিখ্যাত 'কর্নওয়ালিস কোড' ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ইস্পাত কাঠামো তৈরি করেছিল" (The famous Cornwallis Code formed the steel frame of British-Indian administration)। এই সময় মূলত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কর্নওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় নীতি নির্ধারিত হয়েছিল। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল কালেক্টরদের হাত থেকে বহুমুখী দায়িত্ব হ্রাস করা। বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব হাতে পেয়ে কালেক্টরেরা অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। কালেক্টরেরা জেলাগুলিতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। ফলে কালেক্টরদের হাত থেকে বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। পরিবর্তে জজ্ (Judge) নামে একদল নতুন অফিসারকে বিচারক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। জেলার রাজস্ব আদালতগুলি এবং বোর্ড অফ রেভেনিউ বা রাজস্ব পরিষদের বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল। এখন থেকে জজেরাই দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি করার অধিকার পেলেন। পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে তিনটি নগর আদালত এবং ২৩টি জেলা আদালতের বাইরেও অনেকগুলি নিম্ন আদালত (Lower Courts) গঠিত হল। সর্বনিম্ন আদালত ছিল মুনসিফের আদালত। সেখানে ৫০ টাকা পর্যন্ত মামলা চলত। তার ঠিক ওপরের স্তরে ছিল রেজিস্ট্রারের আদালত। এইসব আদালতের রায়ে কেউ সন্তুষ্ট না হলে সে জেলা আদালতে আপীল করতে পারত।

কর্নওয়ালিসের বিচার ক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল—শাসনতন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব যতদূর সম্ভভব হ্রাস করা। তিনি আগেই ভারতীয়দের হাত থেকে ফৌজদারি মামলার বিচারের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। নিজস্ব এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জমিদারেরা যে

ক্ষমতা উপভোগ করতেন—কর্নওয়ালিস এবার তা বাতিল করলেন। জমিদারেরা নিজস্ব পুলিশ বাহিনী বাতিল করতে বাধ্য হলেন। প্রত্যেক জেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দারোগ নামে একদল কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। দারোগা ছিল সরাসরি সরকারি কর্মচারী। দারোগারা নির্ধারিত এলাকায় ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে কাজ করত।

এইভাবে কর্নওয়ালিস প্রত্যেক জেলার শাসনতন্ত্র দু'জন ইউরোপীয় অফিসারের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। একজন ছিলেন কালেক্টর। তাঁর দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ করা। অন্যজন ছিলেন একাধারে জজ ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর কাজ ছিল বিচারকের দায়িত্ব পালন করা ও এলাকার অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমন করা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতান্ত্রিক পদগুলি থেকে ইচ্ছাকৃতভাবেই ভারতীয়দের অপসারিত করেছিলেন কর্নওয়ালিস।

১(খ).৪ ভূমিরাজস্ব নীতি

বাংলাদেশে ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করার পরই তাদের মনোনীত নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খানকে নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত করে তার ওপর ভূমিরাজস্ব আদায়ের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৭৬৫ সালের পর থেকে ইংরেজ কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভভব রাজস্ব আদায় করা। নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হয়েই রেজা খান বুঝে যান যে তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করছে অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করার দক্ষতার ওপর সেই সময় ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্য আমিলদের নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব কোম্পানি মনোনীত নায়েব দেওয়ানের হাতে তুলে দিতে বলা হয়েছিল। আমিলদের উদ্দেশ্যই ছিল কৃষকের ওপর চরম উৎপীড়ন চালিয়ে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও নায়েব দেওয়ান তথা ইংরেজ কেম্পানিকে সন্তুষ্ট রাখা। দ্বৈত শাসনব্যবস্থার যুগে উৎপাদন অনুপাতে ভূমিরাজস্ব আদায়ের হার এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে কৃষিক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সঙ্কট দেখা দিল।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইংরেজ কোম্পানির তৎকালীন গভর্নর ভেরেলেস্ট ১৭৬৯ সালে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় সুপারভাইজার নামে একদল কোম্পানির কর্মচারী নিয়োগ করেন। আমিলদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটে। নবনিযুক্ত সুপারভাইজারদের নিজ নিজ জেলাগুলির আর্থিক অবস্থা ও সেখানের অধিবাসীদের রাজস্ব দেবার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়। এই কর্মচারীদের রায়তরা বিভিন্ন জেলায় কী ধরনের অধিকার উপভোগ করেন এবং তাদের কাছ থেকে কী হারে রাজস্ব দাবী করা হয়, সে সম্পর্কেও একটি তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নায়েব দেওয়ানের মতো সুপারভাইজাররাও মুর্শিদাবাদ দরবারে নিযুক্ত ইংরেজ রেসিডেন্টের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। ১৭৭০ সালের মধ্যেই সুপারভাইজারী প্রথা একটি অদক্ষ ব্যবস্থায় পরিণত হয়। কারণ প্রতেক সুপারভাইজারই তাঁর জেলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর তার একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৭৭০ সালের জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দুটি "রাজস্ব নিয়ামক পরিষদ" (Comptrolling Council of Revenue) গঠিত হয়।

১(খ).৫.১ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তারপর

নায়েব দেওয়ান রেজা খানের আমলে আমিলদারী ব্যবস্থা বাংলার কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছিল। কৃষকদের করভারে জর্জরিত করে চরম উৎপীড়ন চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় করা হত। এর সঙ্গে যুক্ত হল অজন্মা। ১৭৬৮ ও ১৭৬৯ সালে অনাবৃষ্টির জন্য ফসল উৎপাদন বিঘ্নিত হল। মারাত্মক হারে খাদ্যদ্রবের মূল্যবৃদ্ধি এবং বণিক ও সুপারভাইজারের গোমস্তাদের কালোবাজারি মানুষের দুর্দশার মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছিল। এইসব ঘটনার অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই ১৭৭০ সালে অর্থাৎ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই দুর্ভিক্ষ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত। মন্বন্তরের পরেই এলো এক সর্বগ্রাসী মহামারী। পূর্ণিয়া, নদীয়া, বীরভূম রাজশাহী, বর্ধমানের একাংশ, রাজমহল, ভাগলপুর, হুগলী, যশোর, মালদা ও চব্বিশ পরগনা ছিল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা। ১৭৭০ সালের মে মাসে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী বলেছিল—বাংলার সমগ্র জনসংখ্যার ১/৩ অংশ মানুষের জীবনহানি ঘটেছিল এই মন্বন্তরের ফলে। ১৭৭২ সালে বাংলার বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন ওয়ারেন হেস্টিংস। উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন—সমগ্র জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ এবং কৃষিজীবী মানুষের অর্ধেক এই দুর্ভিক্ষের ফলে মারা গেলেও কোম্পানি সরকার ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি মেনে নেয়নি।

১৭৬৫-৬৬ সাল থেকে ১৭৬৮-৮৯ সাল পর্যন্ত কোম্পানি সরকারের রাজস্ব আদায় ৫৩.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। হেস্টিংসের সরকার ১৭৭৩ সালে স্বীকার করেছিল যে, সরকার রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্তরণ বজায় রেখেছিল বলেই এতবড় দুর্ভিক্ষের পরও আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পায়নি। হান্টার লিখেছেন—"এমনকি ৫ শতাংশও ভূমিরাজস্বের হারে ছাড় দেওয়া হয়নি এবং পরের বছরের জন্য তা ১০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল। ত্রাণব্যবস্থা ছিল অমানবিক রকমের অপর্যাপ্ত" (Not even 5 per cent of the land revenue was remitted and 10 per cent was added to it next year. The relief measures were inhumanly inadequate.)। কুখ্যাত "নাজাই" বন্দোবস্ত রাজস্ব ক্ষেত্রে সরকারি কঠোর নিয়ন্ত্রণের নগ্নতম রূপ উদঘাটিত করেছিল। এই ব্যবস্থায় বলা হয়েছিল—জেলাগুলির নিকৃষ্ট ও অনুর্বর অঞ্চলে যারা বসবাস করছে তাদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হবে, কারণ তাদের মৃত বা পলাতক প্রতিবেশীদের জন্য রাজস্বের যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা তাদেরই পূরণ করতে হবে। কোম্পানির বর্ধিত রাজস্ব চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকেরা আরও কঠোর পরিশ্রম করে উৎপাদন বাড়াতে মনযোগী হল। তাছাড়া দুর্ভিক্ষের পরই সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবার ফলে কৃষিপণ্যের মূল্য কমতে থাকে। একদিকে অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং অন্যদিকে কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। কৃষিপণ্য বিক্রি করে সঠিক দাম না পাওয়ার জন্য কৃষকরা সরকারের রাজস্ব চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য ও রাজস্ব খাতে কোম্পানির আয় বাড়ানোর জন্য নুতন ভাবনাচিন্তা শুরু করেন।

১(খ).৫.২ ওয়ারেন হেস্টিংসের ইজারদারী বন্দোবস্ত ও তার পরিণতি

১৭৭২ সালের এপ্রিল মাসে লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব কোম্পানিকে সরাসরি গ্রহণ করার নির্দেশ পাঠায়। এই নির্দেশ অনুযায়ী কোম্পানির ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খানকে এবং বিহারের দেওয়ান সিতাব রাইকে বিতাড়িত করেন। রাজস্ব নিয়ামক পরিষদ তুলে দেওয়া হয় এবং সুপারভাইজাররা কালেক্টর হিসাবে পরিচিত হন। ভূমিরাজস্ব বিষয়ে নজরদারী করার জন্য ১৭৭২ সালে একটি ভ্রাম্যমান কমিটি (Committee of Circuit) গঠিত হয়। ১৭৭৩ সালে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, বর্ধমান ও ঢাকায় পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ (Provincial Council) গঠিত হয়।

এই পরিস্থিতিতে ওয়ারেন হেস্টিংস ভূমিরাজস্ব খাতে সরকারের আয় বাড়ানোর তাগিদে বাংলাদেশে একটি নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জমির নিলাম ডাকা হল। সর্বোচ্চ নিলামদারকে জমি পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাই 'ইজারাদারী বন্দোবস্ত' (Farming system) নামে পরিচিত। পাঁচ বছরের জন্য জমি ইজারা দেওয়া হত বলে এই ব্যবস্থাকে 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত' (Five year settlement) নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরের জন্য ইজারাদারদের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব তুলে দেবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। বাংলার বহু এলাকায় পুরনো জমিদারদের বাতিল করা হয়। পরিবর্তে সর্বোচ্চ নিলামদারকে ইজারদার হিসাবে বসানো হয়। যেসব এলাকায় জমিদারেরাই সর্বোচ্চ নিলামদার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে সব জায়গায় অবশ্য জমিদাররাই পাঁচ বছরের জন্য ইজারাদারী লাভ করেছিল। এই ব্যবস্থার অন্যতম বড় ত্রুটি ছিল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধার্যকৃত রাজস্বের পরিমাণ বেশি হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ নিলামদারই ছিল কলকাতা শহরের লোক এবং গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে তারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। জমির ইজারাদারী লাভের আশায় তারা কোনো কিছু চিন্তা না করেই দেয় রাজস্বের পরিমাণ সর্বোচ্চ নিলাম হিসাবে হেঁকে দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এই অতিরিক্ত পরিমাণ রাজস্ব কোম্পানি সরকারকে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। অনেক ইজারাদারই রাজস্বের প্রথম কিস্তির টাকা সরকারকে দিতে পারেনি। কোনো কোনো জমিদার বাংলার ভূমিব্যবস্থায় বানিয়াদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার তাগিদে উচ্চতর নিলাম হেঁকে নিজস্ব জমিদারি বজায় রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু তারাও তাদের প্রতিশ্রুত রাজস্ব কোম্পানি সরকারকে দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে ভূমিরাজস্ব খাতে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি পেল না।

ইজারাদারী ব্যবস্থা বাংলার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে হেস্টিংসের ব্যর্থতা সূচিত করেছিল। হেস্টিংসের নতুন ব্যবস্থায় রায়তদের পাট্টা দেবার কথা ছিল। কিন্তু পাট্টা ব্যবস্থা সুদক্ষভাবে কার্যকর করা যায়নি। যেহেতু নতুন পাট্টা দেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করার ব্যাপারে কারও কোনো উৎসাহ ছিল না সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই পাট্টা নথিভুক্ত হত না। ঐতিহাসিক নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ বলেছেন—অনেক সময়ই এর সুযোগ নিয়ে রায়তরা তাদের কৃষিজমির এলাকা বাড়িয়ে নিত বা খাজনার পরিমাণ কমিয়ে নিত। অপেক্ষাকৃত ধনী রায়তরা প্রায়ই ইজারাদারকে উৎকোচ দিয়ে নিজস্ব দেয় খাজনার হারে ছাড় নিয়ে নিত। ফলে দরিদ্র রায়তদের

ওপর অতিরিক্ত খাজনার বোঝা চাপানো হত। খাজনার ন্যায্য ও সঠিক হারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল। হেস্টিংসের নয়া বন্দোবস্তের মারাত্মক কুফল হিসাবে বাংলার গ্রামাঞ্চলে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ইজারাদারী ব্যবস্থা বেনিয়াদের জমির সঙ্গে তাদেরস্বার্থ জড়িত করার সুযোগ উন্মুক্ত করেছিল। বেনিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল তাদের ইংরেজ প্রভুরা। ১৭৭৩ সালে "পার্লামেন্টারি কমিটি অফ সিক্রেসী" তার প্রতিবেদনে লিখেছিল—কোম্পানি কর্মচারীরা প্রায়ই বেনিয়াদের সঙ্গে জমির খাজনা থেকে আসা লাভ ভাগ করে নিচ্ছে। ১৭৭৫ সালে ফিলিপ ফ্রান্সিস অভিযোগ করেন যে, গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ কর্মচারী ও বেনিয়াদের মধ্যে অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে এবং তার ফলে কোম্পানির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ১৭৭৬ সালে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী স্বীকার করে যে, গ্রামবাংলার ভূমিব্যবস্থায় তথা রাজস্ব ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক গোষ্ঠী স্বার্থের উল্লেখযোগ্য অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ইজারাদারী ব্যবস্থার ব্যর্থতার কথা বুঝতে পেরে হেস্টিংস ১৭৭৭ সালের এপ্রিল মাসে ইজারাদারদের বাতিল করে জমিদারদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিটি জেলার রাজস্ব দেবার ক্ষমতা মূল্যায়ন করার জন্য ১৭৭৬ সালে আমিনী কমিশন বসানো হয়। তাছাড়া লন্ডনের পরিচালকমণ্ডলী নির্দেশ পাঠায় যে, ইংরেজ কোম্পানিকে রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদের সঙ্গে একটি বার্ষিক চুক্তি করতে হবে। তাই করা হল। রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদের সঙ্গে কোম্পানির এক বছরের চুক্তি হত বলে এই ব্যবস্থাকে বলা হত একসালা বন্দোবস্ত।

এই নতুন ব্যবস্থা অনুসারে সিদ্ধান্ত হয় যে জমিদারের সঙ্গে কোম্পানির চুক্তি হবে শেষ কথা। অন্য কেউ যদি জমিদারের থেকে বেশি রাজস্ব দেবার প্রস্তাব দেয়, তবে তা গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে আগের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিই বহাল রাখা হল। ইজারাদারী ব্যবস্থায় রাজস্ব নির্ধারণের সময় জমির উৎপাদিকা শক্তি বা সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকদের খাজনা দেবার ক্ষমতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা না করেই নিলাম ডেকে ভূমিরাজস্ব স্থির করা হয়েছিল। নূতন ব্যবস্থাতেও ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। বিগত তিন বছরে সরকারি কোষাগারে যে পরিমাণ রাজস্ব জমা পড়েছিল তার নীট গড় বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ হিসাবে জমিদারদের ওপর ধার্য করা হয়। সেহেতু ইজারাদারী ব্যবস্থার রাজস্ব নির্ধারণের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি এ ক্ষেত্রেও বহাল রাখা হয়েছিল, সেহেতু মানুষের ওপর অতিরিক্ত খাজনার বোঝা চাপানোর প্রবণতা থেকে গেল। বহু জমিদারই নির্ধারিত রাজস্ব দিতে পারলেন না। ফলে তাদের জমির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কোম্পানি সরকারকে নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব জমা দেওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারেরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁরা রায়তদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করতে থাকেন। দরিদ্র রায়তদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ভূমিরাজস্ব নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওয়ারেন হেস্টিংসের দ্বিতীয় পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

এই অবস্থায় হেস্টিংস একটি কেন্দ্রীভূত রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৭৮১ সালে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি বাতিল করে একটি "রাজস্ব কমিটি" (Committee of Revenue) গঠিত হয়। তা সত্ত্বেও রাজস্ব আদায় বাড়ল না। রাজস্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কমিটির অন্যতম সদস্য

স্যার জন শোর। রাজস্ব ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে জোরালো বক্তব্য শোর জেলা স্তরে একজন করে ইউরোপীয় কালেক্টর রাখার কথা বলেন। হেস্টিংসের ভূমিরাজস্ব নীতি বাংলার রায়তদের খাজনার ভারে জর্জরিত করেছিল। ফলে গ্রামীণ সমাজে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। হিংসাত্মক ঘটনার বৃদ্ধি রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলেছিল। অভিজ্ঞতা থেকে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করে যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার তাগিদে বাংলার জমিদারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা দরকার এবং এর অত্যাবশ্যক শর্ত ছিল জমিদারদের আদিম ও ঐতিহ্যগত অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল হয়ে ১৭৮৬ সালে কলকাতায় আসেন লর্ড কর্নওয়ালিস।

১(খ).৫.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট

ফরাসি ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যতম কাউন্সিল সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্র কেবলমাত্র ভূমিমর ওপর কর দাবি করতে পারে। ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৬ সালে বাংলার জমিদারদের সঙ্গে ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গড়ে তোলার স্বপক্ষে তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—জমির প্রকৃত মালিক জমিদারেরা, ফলে সরকারের সরাসরি রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজন নেই। জমিদারেরা রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে তার একাংশ সরকারি কোষাগারে জমা দেবেন। পাট্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছিল যে, এটা হবে জমিদার ও তাঁর প্রজাদের মধ্যে স্বেচ্ছামূলক একটা চুক্তি। জমিদার ও প্রজারা পারস্পরিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন। প্রথম থেকেই ফ্রান্সিসের বক্তব্য ছিল—অতিরিক্ত মাত্রায় রাজস্বের বোঝা না চাপিয়ে সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী যুক্তিগ্রাহ্য একটি রাজস্বের হার ধার্য করা উচিত। কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিসের উদ্দেশ্য ছিল যত বেশি সম্ভব ভূমিরাজস্ব খাতে সরকারি আয় বৃদ্ধি করা। পিটের ভারত আইনে (১৭৮৪) জমিদারদের ক্ষোভের কারণগুলি অনুসন্ধান করে সেগুলিকে প্রশমিত করতে ও রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে জমিদারদের সঙ্গে চুক্তি সংক্রান্ত চিরস্থায়ী আইন প্রণয়ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৭৮৬ থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত নানা ধরনের অনুসন্ধান চালানোর পর এখন ১৭৮৪-এর পিটের ভারত আইনের নির্দেশ মাথায় রেখে কর্নওয়ালিস ১৭৮৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে জমিদারদের সঙ্গে একটি দশসালা বন্দোবস্ত গড়ে তোলেন। বলা হয়—এই পরিকল্পনা দশ বছরের জন্য গৃহীত হবে। পরবর্তীকালে লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্-এর অনুমোদন সাপেক্ষে এই বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়া হবে। কিন্তু জন শোর কর্নওয়ালিসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন—এই বন্দোবস্ত দশ বছর বহাল রাখার ব্যাপারে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এই বন্দোবস্ত অপরিবর্তিত থাকবে, এখনই এরকম প্রস্তাব নেওয়া ঠিক নয়। জেমস্ গ্র্যান্ট বাংলায় রাজস্বের হার কম ধার্য করা হয়েছে এই যুক্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেছিলেন। গ্র্যান্টের এই যুক্তি অবশ্য জন শোর গ্রহণ করেননি। জন শোর তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করেছিলেন যে—এই বিষয়ে চট্‌জলদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থ ভূমিব্যবস্থায় কতকগুলি অসুবিধাকে জিইয়ে রাখা। তাঁর বক্তব্য ছিল ধীরে ধীরে ক্রমিক পদক্ষেপের

মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা উচিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হবার প্রাক্-মুহূর্তে শোর মন্তব্য করেছিলেন—বহু পুরনো জমিদার তাঁদের অক্ষমতা ও অলসতার জন্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারেন। শোরের এই রক্তব্যের উত্তরে কর্নওয়ালিস বলেছিলেন—অলস জমিদারদের অদক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁদের মালিকানাধীন ভূসম্পত্তি যদি অধিকতর পরিশ্রমী ও উদ্যোগী মানুষের হাতে যায়, তবে তা রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

কর্নওয়ালিস জন শোরের প্রস্তাব গ্রহণ না করে নিজস্ব পরিকল্পনা মোতাবেক এগোতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ভারত সচিব হেনরী ডান্ডাসের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজ করা বা একটি বাস্তবসম্মত বন্দোবস্ত গড়ে তোলা—এরগ কোনটিই ডান্ডাসের বিবেচনাধীন ছিল না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানিরস্বার্থ রক্ষা করা ও ভূমিরাজস্ব খাতে কোম্পানি সরকারের আয় বৃদ্ধি করা। ১৭৯২-এর ২৯শে অগাস্ট কর্নওয়ালিসের পরিকল্পনা লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ বা পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদন লাভ করে। ১৭৯৩ সালে এই অনুমোদন পত্র কর্নওয়ালিসের হাতে এসে পৌঁছয়, অর্থাৎ ১৭৮৯ সালের দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিণত করার নির্দেশ পাঠানো হয়। ১৭৯৩-এর ২২শে মার্চ কর্নওয়ালিস বাংলার জমিদারদের সঙ্গে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" (Permanent Settlement) ঘোষণা করেন।

১(খ).৫.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলার ইতিহাসে তার প্রভাব

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী বাংলাদেশে নীট রাজস্বের পরিমাণ সাব্যস্ত হল ২৬,৮০০,৯৮৯ টাকা। বলা হল—জমির ওপর জমিদারদের বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য অধিকার কোম্পানি স্বীকার করে নেবে। বিনিময়ে বৎসরান্তে জমিদার তাঁর ওপর ধার্য রাজস্ব কোম্পানির কোম্পানি সরকারকে মিটিয়ে দেবে। কোনো জমিদার কোম্পানির পাওনা রাজস্ব সময়মতো মিটিয়ে দিতে ব্যর্থ হলে, তার জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং নিলামের মাধ্যমে সেই জমিদারি অন্য জমিদারের কাছে বিক্রি করা হবে। রাজস্বের হার নির্ধারণ নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। বারবার রাজস্বের হার নির্ধারণের সমস্যা এড়ানোর জন্য কর্নওয়ালিস সুপারিশ করেন—১৭৮৯-৯০ সালে জমিদারেরা তাদের প্রজাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ খাজনা আদায় করেছিলেন, তার নয়-দশমাংশ তাঁরা সরকারকে রাজস্ব হিসাবে দেবেন। এই রাজস্বকে চিরস্থায়ী রাজস্ব হিসাবে ধরে নেওয়া হবে। পরবর্তীকালে জমিদারের আয় বৃদ্ধি পেলেও রাজস্বের এই পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে এবং সরকার বর্ধিত রাজস্ব দাবী করবে না। এই হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বাংলার ভূমিব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হবার পরই লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ একটি প্রতিবেদনে বলেছি—উৎপাদনশীল নীতির (Productive Principles) সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল হিসাবে বাংলায় কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতি ঘটবে এবং সাধারণভাবে সম্পদ ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ঘটবে।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী এবং বাংলার গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানির স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন। প্রথমত, ঔপনিবেশিক শাসকেরা এদেশে একদল রাজনৈতিক মিত্র পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব ছিলেন। তাঁরা সঠিকভাবেই মনে করেছিলেন যে,

জমিদারদের ভূ-সম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার এবং অপরিবর্তনীয় ও চিরকালীন ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত করার ফলশ্রুতি হিসাবে জমিদারেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার খাতিরে ব্রিটিশরাজকে সমর্থন করবে এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান সহায়ক স্তম্ভে পরিণত হবে। রাষ্ট্র ও সাধারণ মানুষের মধ্যবর্তী এলাকায় একটি সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক স্তর হিসাবে জমিদারেরা বিরাজ করবে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ কোম্পানিকে ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত সমস্যা ১৭৬৫ সাল থেকেই বিব্রত রেখেছিল। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন করে ভূমিরাজস্ব খাতে একটি স্থিতিশীল ও নির্দিষ্ট আয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, কর্নওয়ালিস সহ বহু ইংরেজই মনে করেছিলেন যে, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নিলে কৃষির উন্নতি ও সম্প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী। খোদ ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে এ ধরনের চিন্তা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। কারণ অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডের বহু জমিদার ও বর্ধিষ্ণু চাষীর উদ্যোগে কৃষি উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছিল। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এই ঘঠনা "কৃষি বিপ্লব" (Agricultural Revolution) নামে বিখ্যাত। ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম পূর্বশর্ত ছিল এই কৃষি বিপ্লব। ১৭৯৩ সালের মার্চ মাসে কর্নওয়ালিস আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, ভূ-সম্পত্তির ওপর জমিদারদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নিলে জমিদারেরা বনাঞ্চল ও পতিত জমিগুলিকে কৃষিজমিতে পরিণত করার উদ্যোগ নেবেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী হয়ে পড়েছিল। কোম্পানির আশা ছিল জমিদারি উদ্যোগ এই অঞ্চলগুলিকে কৃষিযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করবে। চতুর্থত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের সময় নিয়ম করা হয়েছিল জমিদারকে তার রাজস্ব দেবার নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে কোম্পানির কাছে রাজস্ব জমা দিতে হবে। অপারক হলে তাঁর জমি নিলাম করে হস্তান্তরিত হবে। এই আইন সূর্যাস্ত আইন (Sunset Law) নামে পরিচিত। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের তরফে আশা করা হয়েছিল জমিদারি পরিচালনায় ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি দেখা দিলে অদক্ষ জমিদারের পরিবর্তে দক্ষ জমিদারের মালিকানা জমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। পঞ্চমত, অসংখ্য রায়তের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় সংখ্যক জমিদারের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে দিয়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ মনে করেছি —রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে সরল ও সস্তা প্রক্রিয়া।

বাংলার জমিদারেরা খুশি মনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের পরই দেখা গেল যে দীর্ঘদিন ধরে চলা কৃষিপণ্য মূল্যের স্বল্পতা জমিদারদের বেশ অসুবিধা ফেলেছিল। ১৭৯৪-১৭৯৭ সালের মধ্যে কৃষিপণ্যের দাম বিশেষ বাড়েনি। সর্বাধিক সংখ্যক জমিদারি বিক্রির ঘঠনা সম্ভবত এই সময়েই ঘটেছিল। পুরনো জমিদারেরা প্রায়ই কোম্পানির রাজস্ব চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জমিদারি সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী নিলাম হত ও অন্য জমিদারের হাতে চলে যেত। অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি ও ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে দেখা গেল যে বহু প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী জমিদারিগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোম্পানিকে রাজস্ব জমা দিতে না পেরে হস্তান্তরিত হয়েছিল। এইসব জমিদারিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজশাহী, নদীয়া, দিনাজপুর, বীরভূম, বিষ্ণুপুর ও চন্দ্রদ্বীপের জমিদারি। ঐতিহাসিক সিরাজুল ইসলাম তাই বলেছেন—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে বৃহৎ জমিদারিগুলির অস্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ সঙ্গাতিবিহীন। ছোট জমিদারীগুলি কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

কোম্পানির তরফ থেকে অবশ্য বড় জমিদারিগুলি ধ্বংস হবার কারণ হিসাবে জমিদারদের অমিতব্যয়িতা ও জমিদারীগুলির অদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থাকে দায়ী করা হয়েছিল। এই বক্তব্যের সত্যতা আংশিক। নরেন্দ্র কৃষ্ম সিংহ মনে করেন—সে সময়ের নিরিখে (১৭৯৩—৯৪) নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত বেশি।

প্রাপ্ত ঐতিহাসিক দলিল থেকে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার বড় ও ঐতিহ্যশালী জমিদারিগুলিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। এই ধ্বংস রোধ করার জন্য এবং জমিদারি নিজের হাতে রাখার জন্য বড় জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের কিছুদিনের মধ্যেই এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেন। প্রজাদের কাছ থেকে দ্রুত খাজনা আদায়ের জন্য তাঁরা তাঁদের জমিদারি ভাগ করে দিতেন। এইভাবে বাংলার কৃষিসমাজে এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল। বড় জমিদাররা যাদের মধ্যে জমিদারি ভাগ করে দিয়ে ভূমিরাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিতেন তাদের বলা হয় মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার (Intermediary landlords)। ১৭৯৯ সালে বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র সঙ্কট এড়ানোর তাগিদে মধ্যত্বাধিকারীদের মধ্যে তাঁর জমিদারি ভাগ করে দিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হত পত্তনি ব্যবস্থা। পত্তনি ব্যবস্থার ফলে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় জমিদার ও রায়তের মাঝখানে একাধিক মধ্যবর্তী স্তরের সৃষ্টি হল। জমিদার একজন মধ্যস্বত্বভোগীর হাতে তাঁর জমিদারির একাংশ তুলে দিতেন। সেই মধ্যস্বত্বভোগী আবার তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন উপস্বত্বভোগী, যথা—পত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতির হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে দিতেন। বহু ক্ষেত্রে জমিদারেরা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে অর্পণ করে কলকাতায় চলে গিয়ে সেখানে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতেন। ফলে অনুপস্থিত জমিদারের (Absentee Landlord) সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতি হিসাবে পুরাতন ঐতিহ্যশালী বহু জমিদারিগুলি হস্তান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু জমিদারি হস্তান্তরের ফলে নতুন জমিদার হয়ে বসেছিল কারা? অর্থাৎ জমিদারিগুলি কারা কিনেছিল? জেমস মিল এরকম একটি ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই জমিদারিগুলি পুরনো জমিদারদের থেকে কিনে নিয়েছিল। এই বক্তব্য সঠিক নয়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন যে—কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই জমিদারিগুলি পুরনো জমিদারদের থেকে কিনে নিয়েছিল। এই বক্তব্য সঠিক নয়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন যে—কেবল ব্যবসাদার নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদারের আমলা, উকিল ও কর্মচারী এবং পেশাদার মানুষ সুদের কারবারি এরা সকলেই সূর্যাস্ত আইনের শিকার জমিদারিগুলি ক্রয় করে নতুন জমিদার হয়ে বসেছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমির বারকে এক ব্যাপকতর ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবাধীন এলাকাগুলিতে দু'টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছিল—বাজারী অর্থনীতির অনুপ্রবেশ এবং কৃষির বাণিজ্যকরণ। রাজস্ব ও খাজনার অতিরিক্ত বোঝা কৃষির বাণিজ্যকরণ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। মাত্রাতিরিক্ত খাজনার ভারে জর্জরিত কৃষকেরা ক্রমেই বেঁচে থাকার তাগিদে গ্রামীণ মহাজনদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। বর্ধিত খাজনার চাহিদা মেটানোর জন্য তারা প্রায়ই ঋণ নিত। মহাজনেরা নিজেদের পছন্দমত শস্য ফলাতে অধমর্ণ কৃষকদের বাধ্য করেছি । বর্ধমান ও নদীয়ার চাষীরা নীল, আখ, তুলা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল ফলাতে বাধ্য হয়েছিল এবং তাদের ওপর খাজনার হার আরও বাড়ানো হয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল বাংলার রায়তদের। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় কোম্পানি সরকারের সঙ্গে জমিদারদের যেমন চুক্তি হয়েছিল, জমিদারদের সঙ্গে রায়তদের সেরকম কোনো চুক্তি হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল যে পরিকল্পনা ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৬ সালে পেশ করেছিলেন তাতে কিন্তু রায়তদের পাট্টা দেবার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কর্নওয়ালিসের ব্যবস্থায় রায়তদের পাট্টা দেওয়া হয়নি বা জমিদার ও রায়দের মধ্যে কোন চুক্তি হয়নি। ফলে জমিদার রায়তদের ওপর খাজনার হার নির্দ্বিধায় বৃদ্ধি করতে পারত। বর্ধিত খাজনার চাপে জর্জরিত রায়তেরা খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের ওপর চলত নিষ্ঠুর জমিদারি উৎপীড়ন। ১৭৯৯ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংশোধিত আইনের ৭ নম্বর রেগুলেশনে বলা হল—খাজনা দিতে ব্যর্থ রায়তকে জমিদার ইচ্ছেমত জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে। এই আইন রায়তকে তার জমিদারের করুণার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে তুলেছিল. ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ম সিংহ বলেছেন—এই আইন জমিদারদের অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করেছিল। সিরাজুল ইসলামের মতে এই আইন ছিল ব্রিটিশ ভারতের "প্রথম কালা কানুন"। পত্তনি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর জমিতে যখন বিভিন্ন স্তরের উপস্বত্বভোগী বসল তখন কৃষকদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৬০ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বাংলার কৃষকের ওপর মধ্যবর্তী ভূস্বামীদের শোষণ সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছিলেন। নির্ধারিত খাজনার বাইরেও নানা বেআইনি কর এবং আবওয়াব কৃষকদের ওপর বসানো হয়েছিল, যার অনিবার্য পরিণতি ছিল উনিশ শতকের বাংলায় একের পর এক জঙ্গি কৃষক বিদ্রোহ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থে আংশিক সাফল্য এসেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ব্যবস্থা বাংলার রায়তদেরবা সার্বিকভাবে বাংলার কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে কর্নওয়ালিসের দুটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছিল। প্রথমত, কোম্পানির সরকার ভূমিরাজস্ব খাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, জমিদারদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির রাজনৈতিক মিত্রতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু "উৎপাদনশীল নীতি" (Productive Principle) কথাটিকে কর্নওয়ালিস ও তার সহযোগীরা ১৭৯৩ সালের আগে ব্যাপক প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উৎপাদশীল নীতির পরিপন্থী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেরই আশা ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় কৃষি বিপ্লব নিয়ে আসবে। কিন্তু তা আসেনি। উনিশ শতকে বাংলার জমিদারদের আয় বেড়েছিল মূলত রায়তের ওপর চাপানো বর্ধিত খাজনার জন্য। কৃষির উন্নতির ফলে জমিদারের আয় বৃদ্ধি পায়নি। কৃষি থেকে আসা আয় জমিদারেরা বিলাস-বৈভব বাদান-খয়রাতিতে ব্যয় করত; সেই আয় কৃষি বা শিল্পের উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করা হয়নি। জমিদারদের পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মঙ্গালজনক হয়েছিল। একদিকে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্যদিকে বিভিন্ন ব্যাপারে বাংলার জমিদারেরা ব্রিটিশ রাজশক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাই ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত এক ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির দ্বারা বাংলায় জমিদারদের আচ্ছন্ন করেছিল।

১(খ).৬ সারাংশ

১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলার দেওয়ানি লাভ বাংলাদেশে কোম্পানির অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল। দ্বৈত শাসনব্যবস্থার যুগে বাংলার নবাবের অস্তিত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ১৭৭২ সালে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সরাসরি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোকে সুবিন্যস্ত করার জন্য রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩) এবং পিটের ভারত আইন ১৭৮৪) পাশ হয়। এই আইনগুলির উদ্দেশ্য ছিল ভারতে কোম্পানির শাসনক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ উন্মুক্ত করা এবং বম্বে ও মাদ্রাজে কোম্পানির কুঠির ওপর বাংলার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে বিচার-সংক্রান্ত সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত 'কর্নওয়ালিস কোড' (১৭৯৩) ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থাকে অনেকটাই পরিণত রূপ দিতে পেরেছিল। একইভাবে রাজস্ব শাসনের ক্ষেত্রেও হেস্টিংস নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। কোম্পানির রাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্য ছিল যেভাবে হোক্ রাজস্ব খাতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আয় বাড়ানো। ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে কোম্পানির সংস্কার পরিণতি লাভ করেছিল কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) মধ্যে। পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি কোম্পানির স্বার্থ কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে জমিদারদের সঙ্গে ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গড়ে তুলতে বাধ্য করেছিল।

১(খ).৭ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা কর।

২। ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিরাজস্ব নীতির ব্যর্থতার কারণ আলোচনা কর।

৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার গ্রামীণ সমাজের ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

৪। রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও পিটের ভারত আইনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

৫। বাংলার কৃষির ওপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাব আলোচনা কর।

৬। বাংলার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেন প্রবর্তিত হয়েছিল?

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন :

৭। কোন্ আইনের দ্বারা গভর্নর জেনারেল পদটি সৃষ্টি হয়?

৮। কোন্ আইনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সচিব পদটি সৃষ্টি হয়?

৯। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ভূমিরাজস্ব বিষয়ে কী কমিশন কত সালে বসানো হয়?

১০। সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?

১১। চিরস্থায়ী প্রবর্তনের সময় কার সঙ্গে কর্নওয়ালিসের মত বিরোধ হয়?

১(খ).৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Percival Spear : *The Oxford History of Modern India.* Delhi, 1965.

২। R. C. Majumdar. H. C. Raychaudhury and K. K. Datta : *An Advanced History of India,* London, 1985.

৩। A. C. Banerjee : *Constitutional History of India.* Calcutta, 1963.

৪। B. H. Baden Powell : *The Land Systems of British India,* Oxford, 1982.

৫। N. K. Sinha : *The Economic History of Bengal (3 Vols.), 1956—63.*

৬। —— (Ed.), *The History of Bengal* (1737—1905), Calcutta, 1967.

৭। Sirajul Islam : *The Permanent Settlement of Bengal :* A Study of its Operations, *Dhaka, 1979.*

৮। Ranajit Guha : *Towards a Rule of Property for Bengal,* Hague, 1967.

৯। S. C. Gupta : *Agrarian Relations and Early British Rule in India,* Bombay, 1963.

১০। Suranjan Chatterjee and Siddhartha Guha Ray : *History of Modern India,* Calcutta, 1997.

১১। সব্যসাচী ভট্টাচার্য : *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি,* কলকাতা, ১৩৯৬ (বঙ্গাব্দ)।

১২। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় : *বাংলার আর্থিক ইতিহাস : অষ্টাদশ শতাব্দী,* কলকাতা, ১৯৮৫।

১৩। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *পলাশি থেকে পার্টিশান।*

একক ২(ক) ❑ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন ঃ কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার—উত্তর ভারত, মহীশূর ও মহারাষ্ট্র

গঠন

২(ক).০ উদ্দেশ্য

২(ক).১ প্রস্তাবনা

২(ক).২ আঠারো শতকের মধ্যভাগে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

২(ক).২.১ ব্রিটিশ আগ্রাসনের পিছনে মূল অভিঘাত কী ছিল?

২(ক).৩ ব্রিটিশ কোম্পানি ও উত্তর ভারত

২(ক).৩.১ অযোধ্যা ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

২(ক).৩.২ অযোধ্যার ওপর কোম্পানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের পর্যায় (১৭৬৪-১৮০৫)

২(ক).৩.৩ কোম্পানি ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল : পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আফগানিস্তান

২(ক).৪ মহীশূর ও ব্রিটিশ শক্তি

২(ক).৪.১ হায়দার আলি ও ব্রিটিশ

২(ক).৪.২ টিপু সুলতান ও ব্রিটিশ

২(ক).৫ মারাঠা শক্তির উত্থান

২(ক).৫.১ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধোত্তর মারাঠা শিবির (১৭৬১-১৭৭৩)

২(ক).৫.২ মারাঠা গণরাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সলবঈ-এর চুক্তি (১৭৭৩-১৭৯৯)

২(ক).৫.৩ বেসিনের চুক্তি ও পেশবাতন্ত্রের সমাপ্তি (১৮০১-১৮১৮)

২(ক).৬ ঔপনিবেশিকতায় উত্তরণ : প্রতিরোধ ও সহযোগিতা

২(ক).৭ অনুশীলনী

২(ক).৮ গ্রন্থপঞ্জী

২(ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভেঙে পড়া কাঠামোয় গড়ে-ওঠা দেশীয় রাজ্যগুলি কীভাবে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের শিকার হয়।
- ব্রিটিশ আগ্রাসনের মূল প্রেরণাগুলি;
- দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে কোম্পানির শক্তি বিস্তার;
- কোন্ কোন্ শক্তি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ক্ষমতার বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল।

২(ক).১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্যতে বিধৃত হয়েছে যে এই এককটিতে মধ্য-আঠারো শতকের মুঘল-পরবর্তী যুগের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কীভাবে দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, মূলত অর্থনৈতিক আগ্রাসনের সূত্র ধরে, ক্রমে রাজনৈতিক বৃত্তেও, কোম্পানি সক্রয় হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। মূলত, ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের একটা বির্তনের চিত্র, বিভিন্ন এলাকায় তার রাজনৈতিক গ্রাসনের বিবরণসহ তুলে ধরা হয়েছে এই এককে।

২(ক).২ আঠারো শতকের মধ্যভাগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা

মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর মুঘল শাসনব্যবস্থার অনুকরণে কয়েকটি স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। এগুলি ছিল বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও মারাঠা রাজ্য। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই শক্তিগুলি ভারতের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশ শক্তির সার্বভৌম ক্ষমতা বিস্তারের রোধের চেষ্টা চালায়। এই রাজ্যগুলির মধ্যে অধিকাংশই মুঘল শক্তি অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা স্বাধীন ও শক্তিশালী হতে শুরু করে—যদিও তা সবসময়ই মুঘল সম্রাটের মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করেই হত। এই রাজ্যগুলির শাসকরা নিজ নিজ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা এবং কার্যকরী শাসন ও আর্থিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে উপরোক্ত কোনো রাজ্যই স্ব-সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় করতে সক্ষম হয়নি। এই রাজ্যগুলিতে অন্তর্বাণিজ্য ব্যবস্থার ভাঙন রোধ করার চেষ্টা হয়েছিল, এমন বহির্বাণিজ্য বিস্তারেরও চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু কাঠামোগত আধুনিকীকরণের অভাবে তা ব্যর্থ হয়।

২(ক).২.১ ব্রিটিশ আগ্রাসনের পিছনে মূল অভিঘাত কী ছিল?

আঠারো শতকের শেষার্ধে মুঘল-পরবর্তী দেশীয় রাজ্যগুলির জায়গা ক্রমশ নিতে থাকে ব্রিটিশ আধিপত্য

১৭৫০ ও ১৭৬০-এর দশকের দুটি যুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশ কর্তৃক বাংলা-বিজয় দিয়ে এই ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের শুরু হয়। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাঞ্জাব দখল করা ও অযোধ্যা রাজ্য গ্রাসের মাধ্যমে, ১৮৪০ ও ১৮৫০-এর দশকে, এই আধিপত্যবাদের বৃত্ত পূর্ণ হয়। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন ও সুসংহত প্রতিরোধ এসেছিল মহীশূর রাজ্য, মারাঠা যুক্তরাজ্য ও শিখশক্তির মতো দেশীয়, আঞ্চলিক শক্তিগুলির তরফে। কিন্তু এই প্রতিরোধের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী—বিশেষত, দেশীয় বণিক ও পুঁজিপতি শ্রেণী ব্রিটিশ বণিকবাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সাহায্য কালক্রমে সেই দেশীয় রাজ্যের স্বাধীন বনিয়াদকে দুর্বল করে দেয়, যে দেশীয় রাজ্যের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এই দেশীয় পুঁজিপতির দলই ছিল প্রধান স্তম্ভ। বণিকগোষ্ঠী থেকে রাজনৈতিক প্রভুত্বে এই বিবর্তনের সহযোগী কারণ হিসাবে যে অভিঘাতগুলি কাজ করেছিল তা হল—

(ক) বিশ্বের অন্যান্য অংশে ‘পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদী’ আগ্রাসনের মাধ্যমে ‘প্রভাবিত অঞ্চল’ তৈরির চেষ্টা চলছিল অন্যান্য পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির তরফে। কিন্তু ভারতে ইংরেজ কোম্পানি ‘প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকেই অস্ত্র করে উপনিবেশ স্থাপন করে।

(খ) তার পিছনে ছিল মূলত ভারতে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইউরোপের এই দুটি দেশের পারস্পরিক হানাহানি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের সূত্রপাত করে কর্ণাটকের যুদ্ধ নামে (১৭৪৬—৪৮, ১৭৫১—৫৪ ও ১৭৫৬—৬৩ সালে)। এই দ্বন্দ্বে দেশীয় শক্তিগুলি, তাদের পারস্পরিক অন্তর্কলহের ও সংঘাতের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কেউ ইংরেজ, কেউ ফরাসিদের পক্ষ নেয়। একদিকে দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে, অন্যদিকে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই কৌশল শেখে যে কীভাবে রাজনৈতিক প্রয়োজনে তার উন্নত সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করা যায়। একই সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির অঢেল সম্পদ ও অর্থনৈতিক কাঠামোটিকে সুপরিকল্পিতভাবে শোষণ ও ধ্বংস করার কৌশলটিকেও ব্যবহার করতে শুরু করে (অর্থাৎ, দেশীয় বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাত রাজনৈতিক চক্রান্ত ও অস্থিরতার সঞ্চার করে সামরিক হস্তক্ষেপের এক সুচতুর বিন্যাস।)

(গ) কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার বেইলির মতে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ইউরোপে বিপ্লবের হাওয়া ও নেপোলিয়নের যুদ্ধের পরিবেশ ব্রিটেনে এক নতুন জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সৃষ্টি করে। বিশ্বব্যাপী অবাধ বাণিজ্যের জোরদার আদর্শের পাশাপাশি উন্নত ব্রিটিশ জাতির সার্বিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাটিকে বাইরের জগতে বলপূর্বক ছড়িয়ে দেওয়ার একটা তাগিদ বিশেষত লর্ড ওয়েলেসলির মতো সাম্রাজ্যবাদী শাসকের প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বেইলি এই প্রেরণাকে *‘nationalistic imperialism’* বা *‘জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদ’* বলে আখ্যাত করে বলেছেন, ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে জোরদার করতে এই আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ছিল অন্যতম ইন্ধন।

২(ক).৩ ব্রিটিশ কোম্পানি ও উত্তর ভারত

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়; পাশাপাশি স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন অযোধ্যা রাজ্যের উত্থান; ১৭৬৯ সালে মহাদজী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্তর-ভারত অভিযান, দিল্লি অধিকার ও মুঘল সম্রাটকে মারাঠা সুরক্ষা-

বলয়ে নিয়ে আসা—এ সবই গভর্নর হিসাবে ওয়ারেন হেস্টিংসকে প্রণোদিত করে লর্ড ক্লাইভের আমলের বিদেশনীতিকে পরিবর্তিত করতে।

২(ক).৩.১ অযোধ্যা ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

আঠারো শতকের মধ্যভাগ অব্দি অযোধ্যা ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। বস্তুতপক্ষে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ অব্দি ভারতে কোম্পানির কার্যকলাপ মূলত উপকূলীয় বাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (মাদ্রাজ—১৬৪০-এ কোম্পানির দখলে আসে, বোম্বাই—১৬৬৮-তে ও কলকাতা—১৬৯০-তে স্থাপিত হয়) একটি Joint Stock Company হিসাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রাথমিকভাবে তার অংশীদারদের সন্তোষজনক লভ্যাংশ দিতেই বেশি মনোযোগী ছিল।

অন্যদিকে অযোধ্যা রাজ্যও দিল্লির সম্রাটকে প্রায় ক্রীড়নক বানিয়ে প্রধান ক্ষমতাবান সুবা হিসাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৭৬৪ সালে প্রথম ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও অযোধ্যা রাজ্য মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হয়।

২(ক).৩.২ অযোধ্যার উপর কোম্পানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের পর্যায় (১৭৬৪-১৮০৫)

১৭৬৪ সালে অযোধ্যার তৎকালীন নবাব সুজাউদ্দৌলা মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে বাংলার নবাব মীরকাশিম-এর সহযোগী হিসাবে কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। বক্সারের যুদ্ধে কোম্পানি জয়ী হয়। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিতে অযোধ্যার মতো বিশাল রাজ্যকে কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে নিয়ে আসার জন্য ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন বা প্রয়োজনীয় অর্থ, রসদ, প্রশাসনিক কর্মচারী অথবা সেনাবাহিনী কোনোটাই ছিল না। অতএব, একজন 'অধীনস্থ মিত্রের' মর্যাদা নিয়ে নবাব সুজাউদ্দৌলাকেই পুনরায় অযোধ্যার সিংহাসনে বসানো হয় ও ভবিষ্যতে মারাঠা বা আফগান শত্রুদের আক্রমণে অযোধ্যা রাজ্যকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হতে লাগল। অযোধ্যার বিপুল আর্থিক সম্পদকেও প্রয়োজনমতো কোম্পানির কাজে ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া গেল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুযায়ী অযোধ্যার কিয়দংশ কোম্পানি আত্মসাৎ করল ও বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে অযোধ্যার বাকি অংশ নবাবকে প্রত্যর্পণ করা হল। এছাড়াও, কোম্পানির প্রতি আনুগত্যের সূচক হিসাবে, এই চুক্তির দ্বারা নবাব তাঁর রাজ্যের প্রতিরক্ষার ভার এবং অযোধ্যায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার কোম্পানিকে দিয়ে দিলেন। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোম্পানি অযোধ্যাকে এতটাই নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল যে, ইউরোপীয় কায়দায় ও সজ্জায় নবাব তাঁর সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করে তুলতে চাইলে, কোম্পানি ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে আর একটি চুক্তি অযোধ্যার ওপর বলবৎ করে। এর বলে অযোধ্যার সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতম আয়তন ও সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয় ও তার এক-তৃতীয়াংশেরও কম সংখ্যাকে ইউরোপীয় কৌশলে শিক্ষিত করা যাবে—এই শর্ত চাপানো হয়। পুনরায়, ১৭৭৩ সালে, বেনারসের চুক্তির দ্বারা অযোধ্যার সেনাবাহিনীর আয়তন কমিয়ে তার এক অংশকে কোম্পানির অধীনস্থ সেনাবাহিনীতে (subsidiary force) পরিণত করা হয়, যার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব চাপানো হয় অযোধ্যার ওপরে। ক্রমশ, এইভাবে অযোধ্যার

অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কোম্পানি হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে।

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কোম্পানির বিদেশনীতিতে অযোধ্যাই ছিল মূলস্তম্ভ। ১৭৭৩ সালের চুক্তির ফলে সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ড নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে দর-কষাকষিতে প্রবৃত্ত হন। হিমালয়ে দক্ষিণপ্রান্ত বরাবর এক বিস্তীর্ণ উর্বর এলাকা জুড়ে ছিল রোহিলা আফগানদের গণরাজ্য। এর ভৌগোলিক অবস্থান যে কোম্পানির কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা ওয়ারেন হেস্টিংসের লেখায় বোঝা যায়,—"রানি এলিজাবেথের শাসনের পূর্বে ইংল্যান্ডের কাছে স্কটল্যান্ডের যে গুরুত্ব ছিল, অবিকল সেই ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে অযোধ্যার নিরাপত্তার প্রশ্নে রোহিলাখণ্ডকে দেখা উচিত।" অতএব অযোধ্যা-সুবার সুরক্ষাবলয়কে দৃঢ় করতে রোহিলাখণ্ডকে গ্রাস করা দরকার, এই উপলব্ধিতে নবাব সুজাউদ্দৌলা ও কোম্পানি সহমত ছিল।

রোহিলা যুদ্ধ : (১৭৭৪)—১৭৭২ সালে রোহিলা উপজাতির প্রধান হাফিজ রহমত খান, নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে কোম্পানির প্রতিনিধি স্যর রবার্ট বার্কারের উপস্থিতিতে, এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এর শর্তানুসারে, রোহিলা ভূখণ্ড থেকে মারাঠা সৈন্যকে অপসারিত করতে পারলে সুজাউদ্দৌলা রোহিলাদের কাছ থেকে ৪০ লক্ষ (চল্লিশ লক্ষ) টাকা পাবেন।

মারাঠা সৈন্য রোহিলাখণ্ড ত্যাগ করেও ১৭৭৩ সালে পুনরায় ফিরে আসে। কিন্তু পেশবা প্রথম মাধবরাও-এর মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মারাঠারা সেখানে ফিরে যায়। সুজাউদ্দৌলা এইবার রোহিলাদের কাছে চুক্তির শর্তমতো অর্থ দাবি করলে তারা তা দিতে অস্বীকার করে। অতএব ১৭৭৩ সালে বেনারসে সম্পাদিত কোম্পানি ও অযোধ্যার মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুযায়ী সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডের বিরুদ্ধে কোম্পনির সৈন্য সাহায্য দাবি করেন। এর বিনিময়ে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করা ছাড়াও তিনি কোম্পানিকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৭৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কর্নেল চ্যাম্পিয়নের নেতৃত্বে কোম্পানির সৈন্য রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করে ও অযোধ্যা সেনাবাহিনীর সহায়তায় রোহিলানেতা হাফিজ রহমত খানকে মিরানকাট্রা-র যুদ্ধে নিহত করেন (এপ্রিল, ১৭৭৪)। রোহিলাখণ্ড অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়।

রোহিলা-যুদ্ধের পিছনে অযোধ্যার নবাবের ব্যক্তিগত লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রবণতাকেই দায়ী করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে এই আগ্রাসনে সহযোগী থাকলেও খানিকটা দূরত্ব রেখে সুজাউদ্দৌলাকে সমর্থন দেন। সাময়িকভাবে সুজাউদ্দৌলাও যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকেন ও হেস্টিংসের সম্মতি পান। কিন্তু ১৭৭৪ সালে নবাব পুনরায় হেস্টিংসকে চাপ দিলে অবশেষে কোম্পানির সৈন্য রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করে। আলফ্রেড লায়াল কোম্পানির অপরিণত বিদেশনীতিতে রোহিলাযুদ্ধ যে দুর্বল কৌশলেরই পরিণাম, তা লিখে এই বলে সমালোচনা করেছেন যে, দ্বিধাদীর্ণ-নীতি বস্তুতপক্ষে দুর্বল সীমান্তের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর [A shifty line policy is far more unsafe than a weaker frontier.]

এই আগ্রাসন যেভাবে বিনা প্ররোচনায় রোহিলাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল ও নবাব যে সুকৌশলে কোম্পানির সৈন্যকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন, তার জন্যই ওয়ারেন হেস্টিংসকে কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্য সমালোচিত হতে হয়। 'Indeed, some company officers complained that their troops bore the brunt of the fighting while the Awadh party gained all the spoils and subsequent advantages'.

অতএব, ১৭৭৪ সালের পরবর্তীতে অযোধ্যার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক শক্ত হাতে পরিচালিত করতে কোম্পানি একজন রেসিডেন্ট নিয়োগ করে। ক্রমশ, কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে যাবতীয় যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এই রেসিডেন্ট ও প্রকৃপক্ষে অযোধ্যা রাজ্যের যাবতীয় আর্থিক ও বৈদেশিক নীতি পরিচালন ও নিয়ন্তরণের ভার চলে যায় রেসিডেন্টের হাতে। ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ কায়েমের পরম্পরায় প্রথম দৃষ্টান্ত হয় অযোধ্যা। সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর অযোধ্যা কোনোরকমে মুঘল সুবার পরিচয়টুকু টিকিয়ে রেখে ক্রমশই কোম্পানির দখলে চলে যায়।

নতুন নবাব আসফউদ্দৌলার আমলে, ১৭৭৫ সাল থেকে লক্ষ্ণৌ হয় অযোধ্যা রাজ্যের নুতন রাজধানী। একদিকে উত্তর ভারতে একরটি গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় রাজ্য হিসাবে অযোধ্যা কোম্পানির কাছে জরুরি কেন্দ্র হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তার সামরিক বাহিনীকে পুরোপুরি রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কোম্পানির নিয়মিত সৈন্যদের সরিয়ে একটি স্বতন্ত্র 'Oudh Auxiliary Force' বা একটি ভাড়াটে বাহিনী তৈরি করা হয় যার পুরো ব্যয়ভারই অযোধ্যার তহবিল থেকে কাটা যাবে স্থির করা হয়। এর পরোক্ষ ফল হল, নবাবের নিজস্ব সৈন্যবাহিনীকে অব্যবহৃত রেখে ক্রমশ অকেজো করে দেওয়া।

আসফউদ্দৌলা-র মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা অযোধ্যাকে আরও দুর্বল করে তোলে। প্রথমদিকে ক্ষমতার অন্যতম দাবীদার ওয়াজির আইলকে (১৭৯৭-৯৮) সমর্থন জানালেও তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাব কোম্পানিকে অসন্তুষ্ট করে। ফলে দীর্ঘ বাইশ বছর কোম্পানির আশ্রয়ে রাজনৈতিকভাবে নির্বাসিত থাকা সাদাত আলি খানকে কোম্পানি সিংহাসনে বসায়।

এই ক্ষমতা লেনদেনের ব্যবসায়ে কোম্পানি আর্থিকভাবে আরও লাভবান হয়। আরও রাজ্যাংশ গ্রাস করা ছাড়াও কোম্পানি তার রেসিডেন্টের মাধ্যমে অযোধ্যার বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপেও দখলদারির হাত বসালো—বিশেষত, যুদ্ধের প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ তৈরির কাঁচামাল সোরা (Saltpetre), বিভিন্ন হস্তশিল্প, যেমন বস্ত্র ও অন্যান্য শৌখিন সামগ্রী; খাদ্য ও বিবিধ পণ্যশস্য—যেমন নীল উৎপাদন—যা ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্পের জন্য দরকার ছিল—এ সবই কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে এল। এছাড়াও নগদ অর্থ, যা অযোধ্যার ভূখণ্ডে অবস্থিত কোম্পানির পোষ্য সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ বাবদ তারা আদায় করত; কিংবা স্বল্পসুদে কোম্পানির ঋণ গ্রহণ; কিংবা নবাবের তরফে কোম্পানির তহবিলে (বাধ্যতামূলক) সরকারি বা বেসরকারিভাবে দেয় দান (donation)—বিভিন্ন প্রকারে অযোধ্যা কোম্পানির তহবিলে অর্থদানে বাধ্য হয়। [১৭৬৪ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ অব্দি কোম্পানি কেবল জরিমানা বাবদ ৬০,০০,০০০ টাকা; ঋণ বাবদ ৫২,০০,০০০ টাকা ও ভর্তুকি বাবদ ৮০,০০০,০০০ থেকে শুরু করে ১০০,০০০,০০০ টাকা আদায় করে।

এতদসত্বেও নবাব সাদাত আলি খান অযোধ্যার প্রশাসনে স্বনির্ভরতা ও স্বাধিকার ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হলে নতুন গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫) কোম্পানির আগ্রাসী ভূমিকাকে তীব্রতর করেন। তাঁর রেসিডেন্টের মাধ্যমে অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত গোরক্ষপুর ও রোহিলাখণ্ড এবং দেয়াবের কিছু উর্বর এলাকা প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানির এলাকাভুক্ত করেন। এছাড়াও তিনি অযোধ্যার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে সংস্কারের দাবী জানান। সাদাত আলি খান কোম্পানির আর্থিক দাবিদাওয়া পূরণ করলেও রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে

কোম্পানির ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। অতএব লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০১ সালের এক নতুন চুক্তি দ্বারা অযোধ্যার নবাবের ওপর কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ কায়েম করলেন। নবাবের প্রবল আপত্তি সত্ত্বে অযোধ্যার সীমার বাইরে যাবতীয় ভূখণ্ড, যার বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৩,০০০,০০০ টাকা, কোম্পানির সেনাবাহিনীর চিরস্থায়ী ভাতা হিসাবে অধিকার করে নেওয়া হল। কোম্পানির দখলিকৃত এলাকা চতুর্দিক দিয়ে অযোধ্যাকে ঘিরে রইল। অযোধ্যাকে 'কুশাসনের' একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরে কোম্পানি তার ভূসম্পদ, বাণিজ্য, শ্রমসম্পদ ও অর্থসম্পদ—সবদিকেই শোষণের জাল বিস্তার করে।

পরবর্তী নবাব গাজীউদ্দিন হায়দারের আমলেও (১৮১৪-২৭) ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানির নেতৃত্বে অযোধ্যা গ্রাসের চক্রান্ত বহাল থাকে।

২(ক).৩.৩ কোম্পানি ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল : পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আফগানিস্তান

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতি ১৮০৩ সালে চরমে পৌঁছায়, যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লি দখল করে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্যভারতের পিণ্ডারী অশ্বারোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যখন ব্রিটিশরা অভিযান চালাল তখন স্বাভাবিকভাবেই মারাঠা জনজাতি কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠল। অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ মারাঠা জাতি কোম্পানির বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা চালানো সত্ত্বে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তাদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে।

আঠারো-শতকের আর একটি যোদ্ধা জাতি হিসাবে বাকি ছিল পাঞ্জাবের শিখরা। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে রণজিৎ সিংহ যে রাজনৈতিক আধিপত্য গড়ে তুলেছিল তার অন্যতম ভিত্তি ছিল ইউরোপীয় কায়দায় শিক্ষণপ্রাপ্ত একটি সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত, শক্তিশালী সেনাবাহিনী। প্রতিবেশী রাজ্য সিন্ধুর মতোই পাঞ্জাবও উত্তর ভারতের মূল ভরকেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থানের কারণে কোম্পানির আগ্রাসী নজরে পড়েনি। সমৃদ্ধ কৃষি ও বাণিজ্যিক অর্থনীতি পাঞ্জাবে একটি শক্তিশালী সরকার গঠনে সাহায্য করে। সিন্ধুপ্রদেশের অর্থনীতিও সিন্ধুনদ-ভিত্তিক বাণিজ্যের যথেষ্ট লাভ তুলেছিল। ১৮৩০-র দশকের শেষদিকে কোম্পানি তার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন হলে এই দুটি দেশের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে।

চার্লস নেপিয়ার ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু অঞ্চল জয় করার পর সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন "আমি পাপ করেছি"। সিন্ধু দখলের ক্ষেত্রেও, বাংলার মহাজন জগৎ শেঠের মতো বণিক হটচাঁদ সেখানে কোম্পানির দখলের রাস্তা সুগম করেন। কোম্পানি অবশ্যই তার প্রতিদান দেয় জাহাজ শিল্প ও সমুদ্র বাণিজ্যের কারবার থেকে হটচাঁদকে হটিয়ে দিয়ে। পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ দখল করার অন্তর্বর্তী সময়ে কোম্পানি আফগানিস্তানে একটি বিপর্যয়কারী অভিযান চালায়, যার ফলে ব্রিটিশদের প্রায় ১৬,০০০ সৈন্য কাবুল দখল করতে গিয়ে প্রাণ হারায়।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর (১৮৩৯) পাঞ্জাবের সমাজ ও রাজনৈতিক বৃত্তে দলাদলির সুযোগ নিতে কোম্পানি দেরি করেনি। পূর্ব-পাঞ্জাবের কিছু শিখ সর্দারের সক্রিয় সহযোগিতায়, দুটি ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের পরে, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব ব্রিটিশদের দখলে যায়। জম্মুর ডোগরা-শাসকদের প্রতিভূ গুলাব সিং, যিনি লাহোর

দরবারের একজন সভাসদও ছিলেন, পাঞ্জাব দখলে কোম্পানিকে সাহায্য করেন। তারই পুরস্কারস্বরূপ ১৮৪৬ সালের অমৃতসরের চুক্তিতে, গুলাব সিং ও তার বংশধররা 'চিরকালের জন্য' কাশ্মীর লাভ করেন। গুলাব সিং প্রতিদানে ব্রিটিশ সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্য ঘোষণায় দ্বিধা করেননি।

পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আফগানিস্তান অভিযান ও অগ্রাসন কোম্পানির প্রচুর আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় তার ক্ষতিপূরণে 'অধিক অর্থবলে সমৃদ্ধ' অধীন কিছু রাজ্যকে কোম্পানি লর্ড ডালহৌসির মস্তিষ্কপ্রসূত 'স্বত্ববিলোপ নীতির' দ্বারা গ্রাস করে, যেমন ১৮৪৮-তে মাতারা, ১৮৫৩-তে ঝাঁসি ও ১৮৫৪-য় নাগপুর। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যাকে চূড়ান্তভাবে গ্রাস করা হয়, এবং এরপর ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২(ক).৪ মহীশূর ও ব্রিটিশ শক্তি

২(ক).৪.১ হায়দার আলি ও ব্রিটিশ

হায়দ্রাবাদের পরেই দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল সেটি ছিল মহীশূর। এটি গড়ে উঠেছিল হায়দার আলির নায়কত্বে। মহীশূর সৈন্যবাহিনীর নীচুস্তরের সৈন্য হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করে তাঁর সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও উদ্যমের দ্বারা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে নান্জারাজকে পরাজিত করে হায়দার আলি মহীশূর রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করেন। বিদ্রোহী পলিগার (জমিদার)-দের শায়েস্তা করে তিনি বিদনুর, সুণ্ডা, সেরা, কানাড়া ও মালাবার অঞ্চল জয় করেন। একটি কলহ-দীর্ণ রাজ্য থেকে অল্পকালের মধ্যেই হায়দার মহীশূরকে ভারতবর্ষের একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মারাঠাপেশবা, নিজাম ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তাঁকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। ১৭৬৪-৬৫, ১৭৬৬-৬৭ ও ১৭৬৯-৭২ খ্রিস্টাব্দে পেশবা মাধব রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা-মহীশূর যুদ্ধ হায়দারের পক্ষে বেশ ক্ষতিকর হয়। কিন্তু মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর মারাঠা দুর্বলতার সূত্রে তিনি বেলারি, গুটি, চিতলদ্রুগ ও কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী মারাঠা এলাকা দখল করেন।

ইংরাজদের অন্যতম মিত্র আর্কটের নবাব মুহম্মদ আলির প্রতিদ্বন্দ্বী মাহ্ফুজ আলিকে হায়দার আশ্রয় দেন। এছাড়া আর্কট ও মহীশূরের মধ্যে এলাকা দখল নিয়েও দ্বন্দ্ব ছিল। মাদ্রাজের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হায়দারের প্রত্যক্ষ সংঘাতের সূত্র জোগায় মালাবার উপকূল মহীশূরের দখলে চলে যায়, যেখানে ব্রিটিশদের ফ্যাক্টরি ছিল। অতএব ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি যখন নিজামের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করলেন, হায়দার স্বভাবতই কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হলেন। নিজাম কোম্পানির সাহায্যকারী সৈন্য নিয়ে এমন সময়ে মহীশূর আক্রমণ করলেন যখন অন্যদিকে পেশবা মাধবরাও-এর সঙ্গে হায়দার যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত। পেশবা ও নিজামকে কূটনীতির দ্বারা নিজপক্ষে এন হায়দার নিজাম-সহ আর্কটের বিরুদ্ধে আক্রমণ এগোলেন। শুরু হল প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৬৭-৬৯)।

কোম্পানির সেনাধ্যক্ষ কর্নেল স্মিথ হায়দার ও নিজামের যৌথবাহিনীকে চান্গামা ও ত্রিনোমালির (১৭৬৭) যুদ্ধে পরাস্ত করলে নিজাম মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন (১৭৬৮)। হায়দার যুদ্ধ চালিয়ে যান ও একক কৃতিত্বে আকস্মিক আক্রমণে মাদ্রাজের উপকণ্ঠে এসে উপনীত হন (১৭৬৯)। মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ

হতচকিত হয়ে হায়দার আলির সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক একটি চুক্তি করেন (১৭৬৯)।

এর পরবর্তীকালে হায়দার তাঁর বিদেশনীতিতে রক্ষণাত্মক নীতি অবলম্বন করেন। ১৭৬৯-৭২ খ্রিস্টাব্দে মারাঠারা যখন পুনরায় তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে তখন তিনি কোম্পানির সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু ধূর্ত ব্রিটিশরা সাড়া দেয়নি। পরর্তীকালে (১৭৭৫-৮৩) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনাকালে মারাঠারা হায়দারের সাহায্য ভিক্ষা করলে তিনি ইংরেজ শক্তির সমবেত বিরোধিতার প্রয়েনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ শক্তিকে কর্ণাটক থেকে মুছে ফেলার ইচ্ছা ছিল হায়দারের। ইংরেজ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ফরাসীরা (মাহে থেকে) হায়দারকে তাঁর সৈনবাহিনীকে শিক্ষিত করা ও প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ সরবরাহ করে সাহায্য করেছিল। ইউরোপে ফ্রান্স-ইংলন্ডের যুদ্ধ শুরু হলে ১৭৭৯-তে ইংরেজরা এদেশে মাহে দখল করে। মালাবার উপকূলে তাঁর কর্তৃত্ব থাকায় হায়দার ইংরেজদের মাহে দখলে বাধা দেন।

ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সুবাদে দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ-বিরোধী এক ত্রিশক্তি-আঁতাত গড়ে ওঠে, যার শরিক ছিল মারাঠা-নিজাম ও মহীশূর। এই শক্তি-সমবায়ের সুযোগে হায়দার পুনরায় তাঁর পুরোনো শত্রু আর্কটের মুহম্মদ আলিকে আক্রমণ করলে (১৭৮০) ইংরেজদের সঙ্গেও সংঘাত বাধে। পরপর যুদ্ধে বিখ্যাত ইংরেজ সেনাধ্যক্ষরা পিছু হটেন (বক্সার-বিজয়ী মান্রো, কর্নেল ব্রেথওয়েট প্রমুখ)। এইসময়ে সলবঈ-এর (১৭৮২) সন্ধির মাধ্যমে মারাঠারা যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু হায়দার একাই ব্রিটিশ-বিরোধিতা চালিয়ে যান। হায়দারের সুযোগ্য পুত্র টিপু-ও যুদ্ধে অংশ নেন। ফরাসি নৌবহরের একটি অংশ ১৭৮২-তে মহীশূরের সমর্থনে এগিয়ে আসে। সিংহলের অংশ ত্রিঙ্কামালি ফরাসি দখলে চলে যায়।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই (১৭৮০-৮৪) হায়দার মারা যান (১৭৮২)। টিপু সুলতান মহীশূরের পরবর্তী শাসক হিসাবে ঘোষিত হন। অচিরেই ইউরোপে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধ সমাপ্ত হলে ভারতেও ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থামে। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে টিপু ও ইংরেজদের মধ্যে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর সমাপ্তি হয়।

২(ক).৪.২ টিপু সুলতান ও ব্রিটিশ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের কাছে টিপু সুলতান ছিলেন একজন অবৈধ (usüper) ও গোঁড়া ইসলাম-মনোভাবাপন্ন-অত্যাচারী-শাসক, যিনি প্রায় ষোল বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ স্বার্থস্থাপনে বাধা দিয়ে গেছেন। তাঁদের মতে টিপু শেষমেশ ফরাসি শক্তির সাহায্য নেওয়ার মতো অবিমৃষ্যতা ও ঔদ্ধত্য দেখানোর জন্য নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনেন।

অপরদিকে মুসলিমদের কাছে টিপু সুলতান ছিলেন একজন শহীদ যিনি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। পরের দিকে এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হয় 'জাতীয়তাবাদী' মাত্রা—যা টিপুকে একজন 'আলোকপ্রাপ্ত' ও 'আধুনিক' শাসক হিসাবে চিত্রিত করেছে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন ঠেকাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ টিপু কালের সঙ্গে সমতালে চলার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। নতুন ধরনের পঞ্জিকা, নতুন মুদ্রাব্যবস্থা ও ওজনের মান প্রবর্তনের আগ্রহী ছিলেন টিপু। ফরাসি বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা ছিল। শ্রীরঙ্গপত্তমে তিনি 'স্বাধীনতা-বৃক্ষ' রোপণ করেন। 'জ্যাকেবিন ক্লাবের'ও সদস্য হন তিনি। টিপুর সেনাবাহিনী শেষপর্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে লড়াই করে তাঁর প্রতি

আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। টিপু জায়গীর প্রথা লোপের চেষ্টা করেন যার ফলে রাজকোষের আয় বেড়েছিল। পলিগারদের পুরুষানুক্রমিক ভাবে সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার বিলোপের চেষ্টাও তিনি করেন। তাঁর ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বেশ চড়া ছিল—মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ। অষ্টাদশ শতকের যে কোনো ভারতীয় শাসকদের চেয়ে আগে ও পরিপূর্ণভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ শক্তি শুধু দাক্ষিণাত্যে নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই বিপদের কারণ। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির শত্রুরূপে অবিচল দৃঢ়তা সহকারে তিনি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে ইংরেজরা তাঁকে ভারতে তাদের ভয়ঙ্করতম শত্রুরূপে গণ্য করত।

টিপু সুলতানের শাসনকালকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে—প্রাক্ ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ ও উত্তর ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ। প্রথম পর্যায়ে টিপু সাফল্যের সঙ্গে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটান; ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি স্বাক্ষর করেন; কুর্গের বিদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে দুটি অভিযান পাঠান (১৭৮৫)। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের শেষাশেষি ও ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের শুরু দিকে মারাঠা-মহীশূর যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন ও মারাঠাদের সঙ্গে গজেন্দ্রগড়ের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এছাড়াও টিপু ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের ইস্তম্বুলে অটোমার সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদের কাছে এবং ১৭৮৭ সালে ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশীয় সম্রাট ষোড়শ লুই-এর কাছে দূত প্রেরণ করেন। ১৭৮৮ সালে কুর্গের অধিবাসীরা ফের বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং মহীশূরের বিরুদ্ধে এবারের অভ্যুত্থানে তারা অনেকটাই সফল হয়। যাইহোক, ১৭৯০ সাল অব্দি টিপু তাঁর সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন খুবই মনোযোগী ছিলেন, বিশেষত, বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মের উন্নয়নে। কিন্তু ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দেরই মাঝামাঝি থেকে মহীশূরের সমৃদ্ধির চাকা ঘুরে যায়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টিপুর প্রথম সংঘাত হয় দেশীয় ক্ষুদ্র রাজা ত্রিবাংকুরে সঙ্গে। ১৭৬৪ সালে ত্রিবাংকুরের রাজা রামবর্মা তাঁর রাজ্যের উত্তর সীমানা সুরক্ষিত করার সময় অবৈধভাবে মহীশূরের করদ রাজ্য কোচিনের সীমা লঙ্ঘন করেন। এছাড়া মালাবার উপকূল এলাকায় কিছু দ্বীপভূমি ও সংলগ্ন দুর্গ রামবর্মা ডাচদের কাছ থেকে ক্রয় করেন, যার ওপর টিপুর বহুদিনের নজর ছিল। ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে সংকট ঘনীভূত হয়। ব্রিটিশদের মিত্রশক্তি হিসাবে ত্রিবাংকুর-রাজ টিপুর বিরোধী কিছু বিদ্রোহী শক্তিকেও আশ্রয় দেন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি টিপু ত্রিবাংকুর রাজ্য আক্রমণ করলে তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস একেই উপলক্ষ করে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধের সূচনা করেন।

১৭৯০ সালের শেষাশেষি মহীশূর-বিরোধী সমস্ত দক্ষিণী শক্তিগুলির সঙ্গে (মারাঠা, নিজাম, কান্নান্নোর, কুর্গ ও কোচিনের রাজা ও মালাবারের শাসকবর্গ) লর্ড কর্নওয়ালিস মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষর করেন। মহীশূরের হিন্দু রাজবংশের সঙ্গেও কর্নওয়ালিসের গোপন সমঝোতা হয়। কর্ণাটকের বিরুদ্ধে টিপু বহু যুদ্ধে জয়লাভ করলেও মালাবার এলাকায় ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। ১৭৯২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কর্নওয়ালিস মহীশূর রাজ্যে প্রবেশ করেন, মার্চে ব্যাঙ্গালোরের দুর্গ দখল করে নেন, এবং মে মাস নাগাদ রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তমের কাছে উপনীত হন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে সমগ্র দক্ষিণী শক্তিবর্গ একত্রে মহীশূরের বিভিন্ন দুর্গ দখল করে রাজধানীর ওপর আঘাত হানলে টিপু অবশেষে হার মানেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই মার্চ শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি (১৭৯২) টিপুর পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক হয়। মহীশূর রাজ্যের অর্ধাংশ তাঁকে

ছেড়ে দিতে হয় যার মধ্যে বরামহল ও দিন্দিগুল জেলা দুটি—কান্নান্নোর ও কালিকট বন্দর যায় কোম্পানির ভাগে। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ সীমা অব্দি মারাঠা এলাকা বিস্তৃত হয়; নিজাম পান কুমবুম, কুডাপ্পা, গঞ্জিকোটা ও তুঙ্গাভদ্রার নিম্ন ভূ-ভাগ থেকে মারাঠা শক্তি ও নিজাম যে ভূমিগত এলাকা লাভ করেন—তাকে পুনরাধিকার বলা যায়, কারণ সেখানে এই দুই শক্তির দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা যা দখল করল, তা সম্পূর্ণভাবে তাদের নতুন এলাকা—যা স্রেফ বাহুবলে বিজিত।

রাজ্যাংশ হারানো ছাড়াও টিপু বিজয়ী মিত্রশক্তিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ তিন কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হন। এই বাধ্যবাধকতার শর্তগুলি আদায়ে টিপুর ওপর জোর খাটাতে তাঁর দুই নাবালক পুত্রকে পণবন্দি হিসাবে দিতে কর্নওয়ালিস বাধ্য করেন।

এই অপমান টিপুর ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবকে ক্রমে 'জেহাদে' রূপান্তরিত করে। শ্রীরঙ্গপত্তম চুক্তির দ্রুত রূপায়ণে এবং ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তি নির্মূল করতে যুগপৎ মনোযোগী হয়ে ওঠেন টিপু সুলতান। ভারতে অবস্থিত ফরাসি শক্তি, আফগানিস্তানের শাসক জামান শাহ ও অটোমান সুলতানের কাছে তিনি মিত্রতার বার্তা পাঠান। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি শক্তির কাছে টিপু ভারতে থেকে ব্রিটিশদের উচ্ছেদকল্পে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠান, যাতে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে তাদের যৌথ প্রয়াস গড়ে তোলা যায়। অটোমান সুলতানের কাছে প্রেরিত (১৭৯৯ সালে) একটি বার্তাতেও টিপু বিস্তারিতভাবে ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য, যেমন—বাংলা, অযোধ্যা, আর্কট আগ্রাসনে ব্রিটিশ শক্তির নীতি ও কৌশলের যেভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন, তাতে সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্যাসের পটভূমিকার ওপর তাঁর গভীর জ্ঞান লক্ষ্য করা যায়।

১৭৯৭ সালের শেষাশেষি ফরাসি শক্তির সঙ্গে টিপুর সম্ভাব্য রাজনৈতিক আঁতাত ব্রিটিশ শিবিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া তোলে। ওই বছরের অক্টোবর মাসে নিজাম কোম্পানির সঙ্গে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তিতে আবদ্ধ হন ও একটি পুতুল শক্তিতে পরিণত হন। ১৭৯৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ শক্তি মহীশূরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে। মে মাসেই এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষার্থে টিপু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। মহীশূর ব্রিটিশ দখলে আসে।

মহীশূরের রাজনৈতিক পতনের পিছনে কোম্পানির অর্থনৈতিক অভিসন্ধির চেহারাটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। বাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আগ্রাসনেই (সিন্ধু, পাঞ্জাব, মহীশূর) কোম্পানি দেশীয় পুঁজিপতি ও মহাজন শ্রেণী ও সামাজিক মধ্যবর্গীয় শ্রেণীর সহযোগিতা আদায় করে নিয়ে তবেই রাজনৈতিক আগ্রাসনে হাত বাড়িয়েছিল (৩.২.১ অধ্যায়ে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে)। দক্ষিণ-পূর্বে করমণ্ডল উপকূল এলাকা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মালাবার উপকূলে কোম্পানির একক আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহযোগী ছিল গুজরাটী মহাজন গোষ্ঠী ও হিন্দু রাজস্ব ব্যবসায়ী শ্রেণী (এ চিত্র নিজামের অন্তর্গত এলাকা কৃষ্ণা-গোদাবরীর মধ্যবর্তী উত্তর সরকারের ক্ষেত্রেও একই ছিল)। আরও দক্ষিণে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত পুঁজি-লেনদেনের ব্যবসায়ে হিন্দু রাজস্ব ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। আর্কটের নবাবকে এই দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতি শ্রেণী ঋণের জালে আবদ্ধ করেছিল। অতএব, কোম্পানি অতি সহজেই আর্কটের মতো একটি দেশীয় রাজ্যকে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তির জালে আবদ্ধ করে, যার শর্তানুসারে বাৎসরিক দেয় একটি নির্দিষ্ট করের বিনিময়ে নবাব ইংরেজদের কাছ থেকে সুরক্ষা 'ক্রয়' করতে বাধ্য হন।

মারাঠা ও মহীশূরের মতো শক্তিশালী দেশীয় রাজ্যগুলি অপরপক্ষে একদিকে 'উত্তর সরকার' কিংবা 'আর্কট' ত্রাসে উদ্যোগী হলে কোম্পানি কোনরকম 'অধীনতামূলক' চুক্তির আড়ালে না থেকে আঠারো শতকের শেষাশেষি, দাক্ষিণত্যের 'মিত্র' শক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষ শাসনের আওতায় নিয়ে আসে।

১৭৬০ -এর দশকে মহীশূর, মালাবার কিংবা করমণ্ডল উপকূলে কোম্পানির অনুপ্রবেশকে চ্যালেঞ্জ জানায়। মালাবার এলাকায় হিন্দু বণিকদের সঙ্গেস্বার্থঘটিত আঁতাত স্থাপন ও ঐ এলাকার বাণিজ্যিক পুঁজির কারবার থেকে মহীশূর রাজ্যকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই কোম্পানি আগ্রাসী ভূমিকা নেয়। টিপু সুলতানের আমলে উদ্বৃত্ত রাজস্বের বেশিরভাগটাই আসত পলিগার-শ্রেণীর ভূ-স্বামী ও মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের উপর চাপানো কর থেকে—গরিব রায়তদের শোষণ করে নয়। বাণিজ্যিক পুঁজির ওপর থেকে রাজস্ব আদায়ে যেমন টিপু মনোযোগী ছিলেন, তেমনি বহির্বাণিজ্যে প্রসার ঘটানোর জন্য আরব ও ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কও স্থাপন করেন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ইংরেজ যুদ্ধবন্দীর স্মৃতিকথায় মহীশূরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চেহারা ধরা পড়েছে এইভাবে—"...extensive paddy fields and country which was very rich, highly cultivated, full of cocoanut trees, groves, fields abounding with grain, and well-built and populous villages"। এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আরও ছবি পাওয়া যায় বুকাননের *JOURNEY FROM MADRAS*-এ।

অতএব, ১৭৯০-এর দশকের সমৃদ্ধ মহীশূর রাজ্য, যা টিপু সুলতান তাঁর পিতা হায়দার আলির কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করেছিলেন, এবং গোটা উপদ্বীপিয় ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা জুড়ে যা অবস্থান করছিল, সামরিক ক্ষমতায়ও যে রাজ্য সমসাময়িক সকল দেশীয় শক্তির মোকাবিলা করতে পারত—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রম-আগ্রাসী অর্থনৈতিক স্বার্থে তা বাধাস্বরূপ ছিল—এ কথা বলাই বাহুল্য।

২(ক).৫ উদ্দেশ্য

ধ্বংসোন্মুখ মুঘল শক্তির দুর্বলতার সুযোগে ভারতের স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মারাঠা শক্তিই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। মুঘল সাম্রাজ্যের হীনাবস্থায় ভারতের রাজনৈতিক শূন্যস্থান পূর্ণ করার মতো শক্তি একমাত্র মারাঠারাই অর্জন করতে পেরেছিল। এই নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারও অভাব এদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু মারাঠা সর্দারদের মধ্যে একতার অভাবই সর্বভারতীয় মারাঠা সার্বভৌমত্ব গড়ে তোলার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পাণিপথের পরাজয় মারাঠাদের জন্য আরও শোচনীয় পরিণাম বহন করে এনেছিল—যা রাজনৈতিকভাবে তাদের মর্যাদা খর্ব করে দিয়েছিল। মারাঠাদের এই পরাজয়ে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল ইংরেজরা, কারণ মারাঠাদের দুর্দশার সুযোগে তারা বাংলা ও দক্ষিণ ভারতে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির সুবিধা পেয়ে গিয়েছিল। বস্তুত পাণিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধের মীমাংসাটি হয়েছিল নঞর্থক—অর্থাৎ ভারত-শাসনের অধিকার কার থাকবে না, এই প্রশ্নের।

২(ক).৫.১ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধোত্তর মারাঠা শিবির (১৭৬১-৭৩)

১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে সপ্তদশবর্ষীয় পেশবা মাধবরাও—যিনি রণদক্ষ ও রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন

করেন—ক্ষমতায় আসেন। তিনি নিজামকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও মহীশূরের হায়দার আলিকে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করেন। রোহিলা-আফগান, রাজপুত রাজাদের ও জাঠ-সর্দারদের দমন করে তিনি উত্তর-ভারতে আর একবার মারাঠা জাতির প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা শক্তির সহায়তায় সম্রাট শাহ্ আলম দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মারাঠা-আশ্রিত একজন বৃত্তিভোগী সম্রাট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ক্ষয়রোগে মাধব রাও-এর মৃত্যু মারাঠা জাতির ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাতের আকারে নেমে এসেছি । অতঃপর মারাঠা সাম্রাজ্যে বেশ একটা বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। পেশবাতন্ত্রের সদর এলাকা পুণেতে ক্ষমতা দখল নিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সংঘর্ষ নিয়ে এই অশান্তির সৃষ্টি—একজন দাবিদার বালাজী বাজিরাও-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঘোবা বা রঘুনাথ রাও, ও অন্যজন ছিলেন মাধব রাও-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণ রাও একটি চক্রান্তে নিহত হলে একদিকে রঘুনাথ রাও ও অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী নানা ফড়নবীশ-এর দল গৃহবিবাদে জড়ায়। সদ্যোজাত সওয়াই মাধব-রাও, যিনি পিতা নারায়ণ রাও-এর মৃত্যুর সময়ে মাতৃগর্ভে ছিলেন, তাঁকে ভবিষ্যৎ পেশবা হিসাবে ঘোষণা করে নানা ফড়নবীশ ও 'বারাভাই' নামে মারাঠা সর্দারদের একটি সমিতি রঘুনাথ রাও-এর তীব্র বিরোধিতা করেন। পেশবা-র গদি না পেয়ে হতাশ রঘুনাথ রাও ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ক্ষমতাসীন হওয়ার চেষ্টা চালান।

পেশবা-র ক্ষমতাও এই সময়ে বেশ সংকুচিত হয়ে এসেছিল। নানা ফড়নবীশ-এর নেতৃত্বে সওয়াই মাধব রাও-এর সমর্থকদের সঙ্গে রঘুনাথ রাও-এর পক্ষাবলম্ভীদের বিরোধ ও ষড়যন্ত্রে রাজধানী পুণের পরিবেশ অত্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে উত্তর ভারতে বড় বড় মারাঠা সর্দাররা নিজেদের জন্য অর্ধ-স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মহাদ্জী সিন্ধিয়ার মতো প্রবল প্রতাপশালী মারাঠা সেনাপতি, কিংবা নাগপুরের ভোঁসলে, ইন্দোরের হোলকার ও বরোদার গায়কোয়াড় বংশ উল্লেখ্য। সিন্ধিয়া ও নানা—এই দুই প্রতিভাদর ক্ষমতার কেন্দ্র পরস্পরকে সমীহ করে চললেও একমতে কখনোই উপনীত হতে পারেননি। পেশবাতন্ত্রের প্রতি এঁদের আনুগত্য কমলেও পুণের ক্ষমতাচক্রে হস্তক্ষেপ করতে এঁরা প্রতেকেই উৎসাহী ছিলেন।

অন্যদিকে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্টের মাধ্যমে ভারতে অবস্থিত সমস্ত ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সিগুলিকে—অর্থাৎ মাদ্রাজ ও বোম্বাইকে কলকাতার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসকে গভর্নর জেনারেল পদে উন্নত করে তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে চার সদস্যের একটি কাউন্সিল গড়ে দেওয়া হয়। এই সময় ১৭৫৬ সালে ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শেষ হলেও পরবর্তী এক দশকেরও কিছু বেশি সময় ধরে ব্রিটেনের নৌ-ক্রিয়া ও আগ্রাসী কার্যকলাপে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। সেসময়—অর্থাৎ ফরাসি-বিপ্লব পুর্ববর্তীকালে, সামুদ্রিক আধিপত্যের লড়াইয়েও ফ্রান্স ইংরেজদের কিছুটা হঠিয়ে দেয়।

এই পরিস্থিতিতে ১৭৭২ সালে পেশবা মাধবরাও-এর মৃত্যু একদিকে মারাঠা যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এবং অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ভারসাম্য—উভয়কেই প্রভাবিত করে।

২(ক).৫.২ মারাঠা গণরাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সলবঙ্গ-এর চুক্তি (১৭৭৩-১৭৯৯)

এই পর্বে উত্তর ভারতে মহাদ্জী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে মারাঠারা প্রায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধীশ্বর হয়।

সিন্ধিয়ার হাতে ছিল সেই সময়ের সর্বোৎকৃষ্ট সামরিক বাহিনী। পুরানো গেরিলা রণনীতি ত্যাগ করে বিখ্যাত ফরাসি সেনাপতি De Boinge-এর তত্ত্বাবধানে তা ক্রমশই ইউরোপীয় মডেলে শিক্ষিত হচ্ছিল। ১৭৮৪ সালে সম্রাট শাহ্ আলমকে তিনি তাঁর সুরক্ষা কবচে বন্দী করে ফেলেন এবং পেশবা পদটি সম্রাটের সহকারী মর্যাদাভুক্ত হবে (নায়েব-ই-মুনাইব)—এই স্বীকৃতি সম্রাটের কাছ থেকে আদায় করেন। এর সঙ্গে শর্ত ছিল এই যে স্বয়ং মহাদ্জী সিন্ধিয়াই পেশবার প্রতিনিধিরূপে কাজ করে যাবেন। সেই সময়ের দক্ষ কূটনীতিজ্ঞ নানা ফড়নবিশের সঙ্গে এইভাবে রণনীতিজ্ঞ সিন্ধিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন, যার নেতিবাচক প্রভাব সলবঈ-এর চুক্তিতে পড়ে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৭৭৪ সালে পেশবা নারায়ণ রাও-এর হত্যার পর দীর্ঘদিনের আকাঙ্খার শেষে রঘুনাথ রাও প্রভূত অমর্যাদার সঙ্গে পেশবাপদ দখল করেন। তাঁর বিরুদ্ধে পুণায় নারায়ণ রাও -এর শিশুপত্রের পক্ষ নিয়ে গড়ে ওঠে পাল্টা কেন্দ্র—যার নেতৃত্বে ছিলেন বালাজী জনার্দন বা নানা ফড়নবীশ, সখারাম বাপু, মহাদ্জী সিন্ধিয়াকে নিয়ে তৈরি 'বারাভাই'-নামে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী। ১৭৯৪ সাল অব্দি এই গোষ্ঠী নানা-র নেতৃত্বে মারাঠা রাজনীতিকে পরিচালনা করে। হতাশ রঘুনাথ রাও ১৭৭৫ সালে বোম্বাই-এর কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে ১৭৭৭ সাল নাগাদ মারাঠারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রতিবেশি মহীশূরের সঙ্গে মারাঠারা সন্ধি স্থাপন করে এবং হায়দ্রাবাদ, মহীশূরের হায়দার আলি ও মধ্যভারতে নাগপুরের ভোঁসলে গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটি ব্রিটিশ-বিরোধী চুক্তিতে উপনীত হয়। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত এই চতুঃশক্তি-সমবায় স্থির করে যে একসঙ্গে তারা বাংলা, উত্তর সরকার পরগণা (নিজামের এলাকা) ও কর্ণাটক বিভিন্নমুখী আক্রমণ চালিয়ে কোম্পানির সৈন্যকে ব্যতিব্যাস্ত করবে।

কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের সুচতুর কূটনীতির খেলায় নিজামকে গুন্টুর ফেরত দিয়ে কোম্পানি এই শিবির ভেঙে দেয়। মাধোজী ভোঁসলেকে-ও প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করা হয়। ১৭৮০-তে কল্যাণ ও বেসিন দখল করে কোম্পানি নানা-র ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি মারাঠা শক্তিকে সন্ধি করতে বাধ্য করে।

সলবঈ-এর চুক্তি : প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায়, কিন্তু হেস্টিংসের কূটনীতির কাছে পরাজিত হয়ে মারাঠারা অচিরেই মহীশূরের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হয়। কর্ণাটকে মহীশূর-অধিকৃত সমস্ত এলাকা হায়দার আলিকে প্রত্যর্পণে বাধ্য করানোই ছিল মারাঠাদের দায়িত্ব। এ কাজে ভবিষ্যতে পেশবা কোম্পানির সঙ্গে সামরিক আঁতাতেও রাজি বলে মহাদ্জী জানান। এছাড়াও সন্ধির শর্তানুযায়ী, সলসেট কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া হয়, কোম্পানিকে বাণিজ্যগত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, পেশবাকে অন্য কোনো ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধ করা হয় ইত্যাদি।

অতএব যুদ্ধের প্রাক্কালে শান্তির জন্য উদ্গ্রীব ব্রিটিশ পক্ষ, যারা মহাদ্জীর প্রবল সামরিক পরাক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে কর্তৃপক্ষকে জানায়—"We are altogether unequal to the difficult and dangerous contention in which we are now engaged."—(কোম্পানির সেনাপতি স্যর আয়ারকূটের চিঠি থেকে উদ্ধৃত) এই পরিস্থিতি থেকে কোম্পানিকে বাঁচায় মহাদ্জী সিন্ধিয়া ও নানা ফড়নবীশ-এর পারস্পরিক মতানৈক্য। ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়াতে সিন্ধিয়া চাইছিলেন উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তির বিস্তার

ঘটাতে; অন্যদিকে নানা-র নীতি ছিল মহীশূরের পতন ঘটিয়ে দক্ষিণমুখী বিস্তার ঘটাতে। সলবঙ্গ-এর চুক্তি রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া মারাঠা রাজনীতিতেও প্রধান পুরুষ হতে চান। ঐতিহাসিক স্টুয়ার্টগর্ডনের ভাষায়—"the tail was wagging the dog". সলবঙ্গ-এর চুক্তিতে মহাদ্‌জীর ভূমিকা নিয়ে নানা-ও ক্ষুব্ধ হন। নানা-র দক্ষিণমুখী নীতি বাস্তবে অবশ্য কার্যকরী হয়নি, কারণ মহীশূরের নতুন শাসক টিপু সুলতান এই চুক্তিকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে কোম্পানির সঙ্গে একদিকে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন, ১৭৮৪ সালে নিজামকে যুদ্ধে হারিয়ে বহু এলাকা দখল করেন এবং ১৭৮৬—৮৭ সালে মারাঠারা টিপুকে হারালেও আর্থিক বা আঞ্চলিক, কোন দিক দিয়েই লাভবান হয়নি।

১৭৮৮-৮৯ সাল থেকে লর্ড কর্নওয়ালিসের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতীয় রাজনীতিতে ইংরেজরা পুনরায় চালকের আসনে বসে। ১৭৯০ সালে ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে মারাঠা শক্তি ও নিজাম—উভয়েই ইংরেজদের সহায়তা করে। ১৭৯২-এর শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি দ্বারা মারাঠা বা নিজাম যা অঞ্চল লাভ করে, তার থেকে অনেক বেশি লাভবান হয় কোম্পানি।

১৭৯২-পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিধান্বিত মারাঠা শিবির পুনরায় টিপুর দিকে ঝোঁকেন। এইসময় লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫) নতুন গভর্নর জেনারেল হিসাবে ভারতে আসেন ও কোম্পানির ইতিহাসে আগ্রাসনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী অর্ধদশক মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া উত্তর ভারতের মালব, দিল্লির পার্শ্ববর্তী এলাকা, আহির, কিচি, বুন্দেল প্রভৃতি উপজাতি গোষ্ঠী ও রাজপুতদের পরাজিত করেন ও তাঁর সামরিক খাতে ব্যয় উপর্যুপরি বেড়েই যায়। অন্যদিকে দুর্বল নিজামের বিরুদ্ধে বিদার, আদোনি ও বেরার প্রদেশের ওপর চৌথ আদায়ের দাবি নিয়ে মারাঠা সৈন্য যুদ্ধে নামে। ১৭৯৫ সালের শেষে সওয়াই মাধব রাও-এর মৃত্যু হলে পুনরায় গৃহবিবাদ তুঙ্গে ওঠে। ইতিমধ্যে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হলে দৌলত রাও সিন্ধিয়া নতুন পেশবা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা-র বিরোধী শিবির গড়ে তোলেন। বহু চক্রান্তের পরে রঘুনাথ রাও-এর পুত্র দ্বিতীয় বাজিরাও-কে নানা পেশবা করতে সক্ষম হন। কিন্তু ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নানা ফড়নবিশের মৃত্যু মারাঠা শক্তির পতনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

২(ক).৫.৩ বেসিনের চুক্তি ও পেশবাতন্ত্রের সমাপ্তি (১৮০১-১৮১৮)

লর্ড ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তি দক্ষিণের অবশিষ্ট স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলিও ফরাসি শক্তির মধ্যে সম্ভাব্য মিত্রতা রুখতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আগ্রাসন চালায়। মারাঠা আক্রমণ থেকে বাঁচতে হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানির সার্বিক বশ্যতা স্বীকার করেন। মারাঠা ও মহীশূর—এই উভয় শক্তিই কোম্পানির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান ছিল। টিপু মারাঠা প্রতিনিধি হরিপন্থ ফাড়কে-কে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট লেখেন যে মহীশূর রাজ্য নয়, মারাঠাদের প্রকৃত শত্রু হল কোম্পানি। অতএব, ১৭৯৯ সালে টিপুর রাজ্য আক্রমণে কোম্পানি কোনো ভণিতা করেনি।

কিন্তু ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নানা ফড়নবিশ-এর মৃত্যু নির্জীব মারাঠা শক্তিকে ব্রিটিশদের সামনে নতজানু করে। দ্বিতীয় বাজিরাও-এর মতো অযোগ্য পেশবা, উত্তর মালব ও বুরহানপুরে হোলকার ও সিন্ধিয়ার

মধ্যে যুদ্ধ মারাঠা জাতিকে শক্তিহীন করে তোলে। ১৮০২ সালের অক্টোবর মাসে পুণাতে হোলকারের সৈন্যবাহিনী সিন্ধিয়া ও পেশবার যুগ্ম বাহিনীকে পরাস্ত করে ও পুণে হোলকার সেনার দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বাজিরাও ব্রিটিশদের আশ্রয়ে পালিয়ে যান ও ১৮০৩ সালে ব্রিটিশদের সঙ্গে অধীনমূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সুরাট ব্রিটিশদের হস্তগত হয় ও পুণায় কোম্পানির প্রতিনিধিকে পেশবার কাজে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের অধিকার দেওয়া হয়।

একদিকে লর্ড ওয়েলেসলি ও লর্ড লেকের অধীনে বিশাল ও সুশিক্ষিত কোম্পানির সৈন্যবাহিনী পুণের সদর দফতর দখল করে ও গোটা ১৮০৩-০৪ সাল ধরে উত্তর মহারাষ্ট্রে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের বাহিনীকে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাস্ত করে। বুরহানপুর, আসির প্রভৃতি এলাকা কোম্পানির দখলে চলে যায়। কোম্পানির সেনাদলের অপর একটি শাখা দিল্লি, আগ্রা ও চম্বলের ডত্তরে সিন্ধিয়ার যাবতীয় ভূখণ্ড দখল করে নেয়; এমনকি মুঘল সম্রাটের ওপর প্রতীকী কর্তৃত্বের অধিকারও। পুণে দখলের পর মালবের উত্তরে বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠী, জাঠ, রোহিলা ও বুন্দেলা—সব গোষ্ঠীই কোম্পানির অধীনতা স্বীকার করে নেয়।

এই পর্যায়ে ব্রিটিশ শক্তির চূড়ান্ত আগ্রাসী নীতির ফলে কোম্পানি আর্থিকভাবে প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়লে, কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ—যাঁরা ভূখণ্ড আগ্রাসনের চেয়ে আর্থিক লাভের হিসাবে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন, —লর্ড কর্নওয়ালিসকে পুনরায় ভারতে পাঠান। দ্বিতীয়ত, মারাঠা-যুদ্ধের (১৮০৩-০৫) সন্তোষজনক মীমাংসার্থে কর্নওয়ালিসের নতুন ব্যবস্থায় হোলকার ও সিন্ধিয়া—উভয়েই তাঁদের হাত এলাকার অল্প অংশ ফেরৎ পেলেন (মালব সমভূমি অঞ্চল); উপরন্তু রাজপুতানার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলি কোম্পানি বাতিল করল। তৃতীয়ত, পেশবার কর্তৃত্বের ন্যূনতম চিহ্নটুকুও মুছে দিয়ে বিভিন্ন মারাঠা গোষ্ঠীগুলিকে কোম্পানির কাছে তাদের দাবিদাওয়া সরাসরি পেশ করতে বলা হল। কেবল পদমর্যাদাটুকু বজায় রেখে পেশবার যাবতীয় ক্ষমতা—এমনকি খাজনা আদায় করাও কোম্পানি হরণ করে নিল।

ক্ষমতাহীন পেশবাতন্ত্রের এই মর্যাদাহীন কাঠামো আরও দশবছর টিকে ছিল। ১৮১৭-র জুন মাসে পেশবা ও কোম্পানির ম্ধ্য একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার ঘোষণাপত্রে পেশবাতন্ত্রকে পুরোপুরি 'অকার্যকরী' বলে চিহ্নিত করা হয়। অন্যান্য মারাঠা রাজ্যগুলি অবশেষে স্ব-স্ব বলে কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে দেশীয় রাজ্য হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখল।

মারাঠা শক্তির পতন ও পর্যালোচনা : ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট গর্ডন, তাঁর 'The Marathas : 1600-1800' গ্রন্থে মারাঠা শক্তির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা নিয়ে আলোচনায় বলেছেন—(১) মারাঠা জাতিসংঘের মূল শক্তি কেন্দ্রমুখী না হয়ে ক্রমেই বিকেন্দ্রীভূত হয় (Shift in power from the centre to the peripheral Maratha States)। ১৭৩০ সালের পর থেকেই দেখা যাচ্ছিল যে, সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলে ও গায়কোয়াড় গোষ্ঠী নিজস্ব শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলছিল, এমনকি নিজস্ব কর সংগ্রহ ও বিচারব্যবস্থা পর্যন্ত। (২) পুণার কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশই উপরিল্লিখিত দুটি বা তিনটি গোষ্ঠীর সাহায্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল। ক্ষমতা ক্রমেই তার হাতেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল যে যত নিপুণ দক্ষতার রাজস্ব-সংগ্রাহক আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। ফলে পুণেতেও দেখা গেল ক্ষমতার বিভাজন। ক্রমে শিবাজীর বংশধরদের হাত থেকে পেশবা; পেশবা-র বংশধরদের হাত থেকে অধীনস্থ কর্মচারী নানা ফড়নবীশ-র হাতে ক্ষমতা চলে যায়। (৩) এছাড়াও

একা রঘুনাথ রাও-কে তুরুপের তাস করে ব্রিটিশরা মারাঠা যুক্তরাজ্যে কার্যকরী ফাটল ধরাতে পেরেছিল— যে অস্ত্র 'বাংলা' বা 'অযোধ্যাতেও' তারা খাটিয়েছিল, অর্থাৎ ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে চক্রান্তে প্রলোভিত করা।

পুনরায় মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া ও নানা ফড়নবীশ-এর অহংবোধ ও পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, ক্ষমতার অলিন্দে 'শিবিরীকরণ' ঘটায়। মুঘল সাম্রাজ্যে ভারতীয় জনগণের মধ্যে যে রাজানুগত্য দেখা যেত তার চেয়ে বেশি কিছু মারাঠা সাম্রাজ্যের ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে দেখা যায়নি। মুঘলদের মারাঠারাও করভার বৃদ্ধি করে প্রজাদের শোষণ করত। অতএব সাধারণ প্রজা ও শাসকদের মধ্যে কোনো জনসংযোগ বা আনুগত্য কখনই দেখা যায়নি। "The Maratha State, like the Holy Roman Empire, was a curious and baffling political puzzle. Its whole texture was neither solid, nor rational".

২(ক).৬ ঔপনিবেশিকতায় উত্তরণ : প্রতিরোধ ও সহযোগিতা

আঠারো শতকের শুরুতে ইউরোপে উৎপাদন ব্যবস্থার বিস্তার ও প্রাচুর্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতেও বিস্ফোরণ ঘটায় ও তার প্রভাব এসে পড়ে ভারতে ব্রিটিশ বণিকবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিবর্তনে। এইসময়ে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের সবচেয়ে লাভজনক পণ্য ছিল বস্ত্রসম্ভার। ইউরোপ থেকে রূপা আমদানির মধ্য দিয়ে এর মূল্য মেটানো হত। আঠারো শতকের শুরুর দিকে ইংল্যান্ড থেকে এই ব্যাপক রূপো চালানের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের জগতে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাস্তা খোঁজা হয় এইভাবে যে, ভারতীয় রাজস্ব উৎপাদনের মূল উৎসের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায় কিনা (তখনও পুরোপুরি দখল বা নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাবা হয়নি)।

অবশ্য ইউরোপ থেকে রূপোর নির্গমন ঠেকানোর জন্যই কেবল ভারতে উপনিবেশ বিস্তার হয়— তা নয়। প্রকৃতপক্ষে আঠারো শতকের শেষদিকে ভারতে রাষ্ট্রকাঠামো ও তার অর্থনৈতিক পরিকাঠোমোর অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য ও স্ববিরোধতা কোম্পানির হস্তক্ষেপের রাস্তা তৈরি করে দেয়। এক্ষেত্রে মুঘল যুগের উত্তরাধিকারী স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলিতে বণিক-পুঁজিপতি শ্রেণীর নেতিবাচক সক্রিয়তা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভারতের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে কোম্পানির কর্মচারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ।

আঠারো শতকের শেষাশেষি দেখা যায়, কিছু আঞ্চলিক রাজ্য এই দেশীয় পুঁজিপতি ও ব্যবসাদার শ্রেণীর ওপর তাদের আর্থিক নির্ভরতা কমিয়ে আনার চেষ্টা করে ও তাদের ওপর করের পরিমাণ বাড়ায়। তুলনামূলক শক্তিশালী রাজ্যগুলির তরফে এই আর্থিক জঙ্গিপনা (military fiscalism) বা বলপ্রয়োগের নীতি সেখানকার বণিক-পুঁজিপতি শ্রেণীকে বিমুখ করে ও কোম্পানির প্রতি চক্রান্তমূলক সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করে। ফলে সুযোগমতো বিদেশী মূলধনী শক্তির তরফে দেশীয় বণিক-পুঁজিপতি শ্রেণীকে তথাকথিত 'নব্য-সুলতানী' রাজ্যগুলির বিরোধিতায় উৎসাহিত করা হয়। এটাই ঔপনিবেশিকতার বিবর্তনে আর একটি ধাপ। সামুদ্রিক বাণিজ্যে ইউরোপীয় বণিকদের বিপুল অভিজ্ঞতা তথা আধিপত্য, সুদূর বিদেশ থেকে পুঁজির অনুপ্রবেশ, এদেশে দেশীয় সম্পদের অনাবৃত উৎসের প্রতি লালসা ও সর্বোপরি সামরিক প্রযুক্তির দিক দিয়ে ব্রিটিশদের উন্নত-রণকৌশল—আঠারো শতকের আঞ্চলিক রাজ্যগুলির পতনে এদের প্রত্যেকটিরই অবদান ছিল।

শেষে, স্বাধীন এই দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তারে ইংরেজরা খুব নিপুণ কৌশলে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিদের হটিয়ে দেয়। বিস্ময়ের কথা, দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অভ্যাসে ফরাসিরা ইংরেজ শক্তির চেয়ে দৌড়ে এগিয়ে থাকলেও, শেষ লড়াইয়ে ব্রিটিশরাই বিজয়ী হয়।

২(ক).৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পিছনে মূল প্রেরণার উপাদানগুলি কী কী?

২। মহীশূর রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধির কী চিত্র মেলে?

৩। মারাঠা যুক্তরাজ্য পতনের মূল কারণ কোথায় নিহিত ছিল?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

৪। টিপু সুলতানের চরিত্র ও কার্যাবলী বিচার করে তাঁর শাসনকাল বিশ্লেষণ কর।

৫। অযোধ্যা, মহীশূর—এই দেশীয় রাজ্যগুলির গ্রাসের পিছনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের কোনো মূল ধারা খুঁজে পাও কি?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

৬। রোহিলা যুদ্ধের সময় কে গভর্নর জেনারেল ছিলেন?

৭। কোন্ সন্ধির দ্বারা চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শেষ হয়?

৮। বেসিনের সন্ধি কে, কবে স্বাক্ষর করেন?

২(ক).৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। বিপান চন্দ্র, ভাষান্তর—গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত : আধুনিক ভারত।

২। A. C. Banerjee : The New History of Modern India, 1707-1947.

৩। Sugata Bose & Ayesha Jalal : Modern South Asia—History, Culture, Political Economy.

৪। Stuart Gordon : The Marathas : 1600—1800.

৫। Kate Bnrittlebank : Tipu Sultan's Search for Legitimacy.

৬। C. A. Bayly : Indian Society and the Making of the British Empire.

একক ২(খ) ❑ ভারতে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের বিস্তার : ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে ডালহৌসী

গঠন

২(খ).০ উদ্দেশ্য

২(খ).১ প্রস্তাবনা

২(খ).২ আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব—বণিকবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ (১৭৬৫-১৮৫০)

২(খ).৩ ওয়ারেন হেস্টিংস ও কোম্পানির আগ্রাসন (১৭৭২-১৭৮৫)

- ২(খ).৩.১ ওয়ারেন হেস্টিংস ও অযোধ্যা
- ২(খ).৩.২ ওয়ারেন হেস্টিংস ও মারাঠা শক্তি
- ২(খ).৩.৩ ওয়ারেন হেস্টিংস ও মহীশুর

২(খ).৪ লর্ড কর্নওয়ালিস ও দেশীয় রাজ্য (১৭৮৬-১৭৯৩)

২(খ).৫ লর্ড ওয়েলেসলির অধীনে সাম্রাজ্যবিস্তার (১৭৯৮-১৮০৫)

- ২(খ).৫.১ অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি
- ২(খ).৫.২ ওয়েলেসলি ও মারাঠা শক্তি

২(খ).৬ লর্ড হেস্টিংস ও সাম্রাজ্যবাদ (১৮১৩-১৮২৩)

২(খ).৭ লর্ড ডালহৌসী ও রাজ্যগ্রাস নীতি (১৮৪৮-১৮৫৬)

- ২(খ).৭.১ কোম্পানির সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি ও মূল্যায়ন

২(খ).৮ অনুশীলনী

২(খ).৯ গ্রন্থপঞ্জী

২(খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- বিভিন্ন গভর্নর-জেনারেলদের নেতৃত্বে কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনমূলক নীতিসমূহ;
- ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাঠামোগত পরিবর্তন ও শাসকসংগঠন হিসাবে উত্তরণ;
- কোম্পানি একশত বৎসরের ভারত-শাসনের চরিত্র ও ফলাফল (১৭৫৭-১৮৫৭)।

২(খ).১ প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য থেকে জানা গেল যে, এই এককে একটি বাণিজ্যিক সংগঠন থেকে কীভাবে সামরিক আগ্রাসনের সাহায্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হল, তাই বিধৃত হয়েছে। যে বিশেষ উদ্দেশ্য ও কৌশলগুলি কোম্পানি দেশীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল, তার চরিত্র, কার্যকারিতা ও ফলাফল, এবং সামগ্রিক বিচারে প্রথম একশ' বছরে কোম্পানির শাসনের পর্যালোচনা করাই এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্য/উপজীব্য বিষয়।

২(খ).২ আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশদের প্রভুত্ব—বণিকবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ (১৭৬৫-১৮৫০)

১৭৫৭ সালের পরবর্তী দশকগুলিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যা এশিয়া মহাদেশে মূলত বাণিজ্যের ছাড়পত্র নিয়ে এসেছিল, ভারতে তার বিজিত অঞ্চলগুলি শাসন করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে। বাণিজ্যে লভ্যাংশ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভূমিরাজস্ব আদায়েও কোম্পানি কর্মচারী নিয়োগ করে। ইতিহাস চর্চার একটি অন্যতম কৌতুহলোদ্দীপক ক্ষেত্র হিসাবে ঔপনিবেশিক যুগের শুরুতে কোম্পানি তার প্রশাসনিক সংগঠন কতটা পুরাতন দেশীয় কাঠামোকে আশ্রয় করেই গড়ে তুলেছিল, তা নিয়ে প্রভূত গবেষণা হয়েছে। কিন্তু সমাজ ও অর্থনীতিতে যে এই যুগ একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা ও কাঠামোর জন্ম দেয়, যা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনে, তা নিয়ে সংশয় নেই।

একটি সামরিক স্বৈরতন্ত্র (military despotism)-এক আশ্রয় করে আঠারো শতকের শেষভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অধিকার কায়েম করে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার প্রভুত্ব কব্জা করার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতাও কোম্পানি 'দেওয়ান' হিসাবে কুক্ষিগত করে। অন্যদিকে নিজামতের—অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও তারা নিয়েছিল। কোম্পানি আর্থিক আধিপত্য ভোগের সঙ্গে সঙ্গে সেই অর্থের জোরে সেনাবাহিনীও পুষত, যার বেশিরভাগ 'সিপাহী আসত বিহার ও উত্তরপ্রদেশের উচ্চবর্ণের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে। ১৭৬৮ সালে কোম্পানির অধীনে সিপাহীদের সংখ্যা ছিল ২৫,০০০; ১৮১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫,০০০-এ। ১৮১৪ সাল নাগাদ গোটা উত্তর ভারত জুড়েই এই 'সিপাহী'-দের নিয়ে গঠিত 'বেঙ্গল-আর্মি'-র দাপট দেখা যায়। এইভাবে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব খাটানো সত্ত্বেও শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে কোম্পানি সরাসরি কোন যোগাযোগ রাখত না। প্রশাসনের গলদের জন্যে নবাব ও তাঁর কর্মচারীদের দায়ী করা হত আর শাসকজনিত সুবিধাগুলি কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা ভোগ করত।

এইভাবে ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশ পুঁজি ও কোম্পানির তরফে প্রবল চাপ তৈরি করা হয়। একাজে তারা দেশীয় বণিক ও পুঁজিপতি শ্রেণীর কাছ থেকে গোপন ও কার্যকরী সহযোগিতা লাভ করে। এর ফলে কোম্পানি সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত উপায়ে দেশীয় রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক উৎপাদনের উৎসগুলিকে ধ্বংস করতে পারে ও অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করার পর দেশীয় মধ্যবর্তী-পুঁজিকেও অচিরেই অধস্তন-পর্যায়ে ঠেলে সরাতে পারে। অর্থাৎ এককথায়, আঠারো শতকে সাম্রাজ্যবাদের স্পন্দনশীল ও অনুকূল অর্থনৈতিক

অভিঘাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে যে আগ্রাসী ভূমিকা নেয়, তার ধাক্কায় উনিশ শতকে ভারতীয় অর্থনীতি একটা গতিহীন, অবরুদ্ধ চেহারা নেয়।

২(খ).৩ ওয়ারেন হেস্টিংস ও কোম্পানীর আগ্রাসন (১৭৭২-১৭৮৫)

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশরা একটি বিশেষ ক্ষমতাধর শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ইংল্যান্ডে এর পরিচালকরা ভারতের অবশিষ্ট অংশে নতুনভাবে প্রভুত্ব বিস্তারের প্রস্তুতি হিসাবে বাংলায় তাদের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করায় মনোনিবেশ করে। কোম্পানি ইতিপূর্বে ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছিল; নতুন নতুন রাজ্যজয় ও অর্থলালসাও তারা সংযত রাখতে পারেনি। কাজেই বাংলায় তাদের শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই তারা বিভিন্ন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর হয়ে আসেন ও ১৭৭৪ সালে গভর্ণর জেনারেল পদে উন্নীত হন। তাঁর আমলে অযোধ্যা রাজ্যটিকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে মারাঠাদের এক উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কোম্পানিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়। বস্তুতপক্ষে, হেস্টিংসের আমলেই কোম্পানির মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী উভয়েই যথাক্রমে মহীশূরে হায়দার আলি ও হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং মারাঠা নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘাতে জড়ায়। অর্থাৎ তৎকালীন দেশীয় শক্তির তরফে সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি পড়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে ফরাসিরাও সেইসময় এদেশে ব্রিটিশ কর্তৃত্বস্থাপনে অন্যতম বাধা ছিল।

২(খ).৩.১ ওয়ারেন হেস্টিংস ও অযোধ্যা

হেস্টিংসের বিদেশনীতির মূল স্তম্ভ ছিল অযোধ্যা—মূলত উত্তরভারতে অযোধ্যাকে শক্তিশালী একটি মিত্রশক্তিতে পরিণত করাই ছিল হেস্টিংসের উদ্দেশ্য। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে হেস্টিংস বেনারসের চুক্তি সম্পাদন করেন, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শর্তসাপেক্ষে সুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক দৃঢ় করা। এই সূত্রেই কেম্পানি ১৭৭৪ সালে অযোধ্যার হয়ে রোহিলখণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

১৭৭১ সালে পুনরুজ্জীবিত মারাঠা শক্তি উত্তরভারতে দিল্লী দখল করলে মুঘল সম্রাট শাহ্‌আলম তাদের হাতে বন্দী হন এবং অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ড উভয় শক্তির কাছেই মারাঠাদের উপস্থিতি ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব ১৭৭২ সালে সুজাউদ্দৌল্লা রোহিলা-আফগান নেতা হাফিজ আহ্‌মেদ খানের সঙ্গে একটি রক্ষণাত্মক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যার দ্বারা চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সুজাউদ্দৌল্লা রোহিলাদের হয়ে মারাঠা বিতাড়ন করবেন, স্থির হয়। কিন্তু মারাঠারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রোহিলাখণ্ড ত্যাগ করলেও সুজাউদ্দৌল্লা উপরোক্ত অর্থ দাবী করেন। এই অন্যায় দাবিপূরণে ওয়ারেন হেস্টিংসের পূর্ণসম্মতি না থাকা সত্ত্বেও কোম্পানি অযোধ্যাকে রোহিলাখণ্ড আগ্রাসনে সামরিক সাহায্য দেয়। এই যুদ্ধের (১৭৭৪) ফলে রোহিলাখণ্ড অযোধ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়।

হেস্টিংসের ভূমিকা প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে। ঐতিহাসিক রবার্টস 'কেম্ব্রিজ ইতিহাসে' [P. E. Roberts—Cambridge History of India—Vol. VI] এবং ডেভিস তাঁর 'ওয়ারেন হেস্টিংস অ্যান্ড আউধ' বইতে হেস্টিংসের কাজের সমর্থন করেন এই যুক্তিতে, যে, রোহিলাখণ্ড আগ্রাসনের পিছনে অযোধ্যার একটি স্বাভাবিক সুরক্ষিত সীমান্তের যুক্তিটি খুবই জোরালো ছিল। এছাড়াও অযোধ্যা এরপর থেকে কোম্পানির নিজস্ব সুরক্ষার প্রশ্নে 'প্রথম সীমান্তে'র কাজ করে ও কোম্পানি আর্থিকভাবেও নবাবের কাছ থেকে প্রভূত অর্থলাভ করে। কিন্তু অচিরেই তাঁর নিজের কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বারাই হেস্টিংস প্রভূতভাবে সমালোচিত হন মূলত এক্ষেত্রে তাঁর কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্য।

অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ড ছাড়াও হেস্টিংস পুনরায় প্রবল সমালোচিত হন বেনারসের রাজা চৈত সিং-এর ঘটনায় ও অযোধ্যার বেগমদের সম্পদ লুঠ করার ঘটনায়। মূলত মারাঠাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ও কর্ণাটকের যুদ্ধে কোম্পানির প্রচুর আর্থিক ব্যয় হয়ে যায় ও কোষাগার পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে হেস্টিংস, 'কোম্পানির স্বার্থেই' দেশীয় শক্তিগুলির সম্পদ লুঠ ['squeezing' wealthy natives to support India's 'pacification'] করতে প্রবৃত্ত হন। বস্তুত, উত্তরভারতে বেনারস বাণিজ্যিক লেনদেন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করেছিল। ১৭৭৯ সালের পর থেকে ক্রমাগত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে হেস্টিংস বেনারসের রাজাকে চাপ দিতে থাকেন, যাতে বার্ষিক দেয় ৪৫ লক্ষ টাকার ওপরেও বাড়তি অর্থ দেওয়া হয়। চৈত সিং তা দিতে অপারগ হলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এর বিরুদ্ধে সেনা-অভ্যুত্থান হলে হেস্টিংস তাঁর দাবিতে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। এই অভ্যুত্থান বস্তুতই হেস্টিংসের কূটনৈতিক ব্যর্থতা-জাত বলে সমালোচিত হয়েছে।

একইভাবে ১৭৮২ সালে মাদ্রাজ ও বোম্বাইস্থিত কোম্পানির আর্থিক দাবি মেটাতে হেস্টিংস অন্যায়ভাবে অযোধ্যার বেগমদের সম্পদ লুঠ করেন, এই অজুহাতে যে, তাঁরা চৈত সিং-কে সমর্থন করেছিলেন।

২(খ).৩.২ ওয়ারেন হেস্টিংস ও মারাঠাশক্তি

কোম্পানির পররাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে অযোধ্যা যদি হেস্টিংসের কাছে নির্ভরতার প্রথম স্তম্ভ ছিল, তাহলে দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিল মারাঠাশক্তির বিরোধিতা। ১৭৬১-তে পাণিপথে শোচনীয় পরাজয়ের পর মারাঠাশক্তি কার্যত ছিন্নশক্তিতে পরিণত হয়। দক্ষিণে নিজাম ছিল তাদের প্রধান শত্রু। এর ওপর, ১৭৭২ সালে পেশবা মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর কার্যত মারাঠারা উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। অযোগ্য রঘুনাথরাও-এর ক্ষমতালিপ্সা, মাধবরাও-এর পুত্র পেশবা নারায়ণ রাও -এর হত্যা (১৭৭৩), পেশবাতন্ত্রের রক্ষক ও রঘুনাথ রাও-বিরোধী শিবির হিসাবে পুণেতে নানা ফড়নবিশ-এর নেতৃত্বে মারাঠা গোষ্ঠীতন্ত্রের উত্থান—এ সবই দক্ষিণে কোম্পানির হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেয়। ইতিমধ্যে মৃত নারায়ণ রাও-এর পুত্রের জন্ম হলে হতাশ রঘুনাথ রাও পেশবা পদের দাবিদার হিসাবে কোম্পানির রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন সলসেট—যা বোম্বাই-কর্তৃপক্ষের কাছে আকাঙ্ক্ষিত ছিল, তার বিনিময়ে রঘুনাথ রাও-কে কোম্পানি সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। অতএব ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সলসেট দখল করে ও রঘুনাথ রাও-এর সঙ্গে 'সুরাটের চুক্তি' স্বাক্ষর করে। রঘুনাথ রাও কোম্পানিকে সলসেট ও বেসিন প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছাড়াও ব্রোচ ও সুরাটের রাজস্বের এক অংশ দিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। অতএব বোম্ভাই-কর্তৃপক্ষ ২৫০০ সৈন্য দিয়ে (যার ব্যয়ভার অবশ্যই রঘুনাথ রাও বহন করবেন) পুণে-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।

১৭৭৫-৮২ খ্রিস্টাব্দ জুড়ে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিমধ্যে কলকাতা-কর্তৃপক্ষ সুরাটের চুক্তি 'অবিবেচনাপ্রসূত ও বিপজ্জনক' বলে সাব্যস্ত করলে নতুন করে পুণে-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইংরেজদের আলোচনা শুরু হয়। ১৭৭৬ সালে পুরন্দরের চুক্তির মাধ্যমে মারাঠাদের সঙ্গে কোম্পানি নতুন লেনদেনের শর্তে আবদ্ধ হয় যার বলে রঘুনাথ রাও-কে নির্বাসনে পাঠানো হয়, সলসেট ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া ব্রোচের রাজস্বের এক অংশ ও যুদ্ধের ব্যয়ভার বাবদ বার লক্ষ টাকা কোম্পানি আদায় করে।

কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ ও বোম্বাই-কর্তৃপক্ষ ও রঘুনাথ রাও—কেউই পুরন্দরের চুক্তি সমর্থন না করলে পুনরায় মারাঠাশক্তি ও কোম্পানীর সৈন্য মুখোমুখি হয়। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির সেনাবাহিনী মারাঠা সৈন্যের মুখোমুখি হয় ও পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়াদগাঁও কনভেন্‌শনের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের সাময়িক বিরতি ঘটে। কিন্তু হেস্টিংস এই সমঝোতার বিরোধিতা করলে পুনরায় মারাঠা-ইংরেজ শক্তি পরীক্ষার সূচনা হয়।

এই পরিস্থিতিতে মারাঠা, হায়দার আলি ও নিজামকে নিয়ে একটি ত্রিশক্তি আঁতাত গড়ে উঠলে দাক্ষিণাত্যে কোম্পানির কূটনৈতিক ব্যর্থতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একদিকে মাদ্রাজ-কর্তৃপক্ষ নিজামের প্রতিদ্বন্দ্বী বসালাত জঙ্গাকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করলে নিজাম বৃটিশ বিরোধী হয়ে ওঠেন; অন্যদিক মহীশূরের হায়দার আলিও মালাবারে ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তার ও মাহে বন্দর দখলের প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করেন। অতএব দক্ষিণী রাজ্যগুলি ব্রিটিশ-বিরোধিতায় একত্রিত হয়ে ঠিক করে যে নিজাম 'উত্তর সরকার' দখলে অগ্রসর হবেন, হায়দার আলি কর্ণাটক দখলে অগ্রসর হবেন, বেরার-এর ভোঁসলে বাংলা আক্রমণ করবেন ও মারাঠারা বোম্বাই এলাকায় হানা দেবে।

কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস এইসময় অসম্ভব কূটনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ভোঁসলে ও নিজামকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে নিবৃত্ত করেন ও ব্রিটিশ সেনাপতি গডার্ড পরপর অভিযানে গুজরাটের আমেদাবাদ, বেসিন ও কোঙ্কন দখল করে নেন। অন্যদিকে পরাক্রমী মারাঠা সেনাপতি মহাদ্‌জী সিন্ধিয়াকেও হেস্টিংস দুর্বল করে দেওয়ার জন্য আক্রমণ চালান।

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার মাধ্যমেই পুণে-কর্তৃপক্ষের কাছে আলোচনার প্রস্তাব পাঠান। সিন্ধিয়া এই চুক্তির রূপায়ণে একদিকে পুণের রাজনৈতিক-কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ও অন্যদিকে কোম্পানির কাছে চুক্তি রূপায়ণের মুখ্য জামিনদার হিসাবে রইলেন।

সলবঈ চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ সলসেট অধিকার করে; রঘুনাথ রাওকে অবসরভাতা দেওয়া হয়; মহীশূরের বিরুদ্ধে পুণে কর্তৃপক্ষকে দিয়ে আগ্রাসী পদক্ষেপ নেওয়ানো হয়; এবং সর্বোপরি পরবর্তী কুড়ি বছরের জন্য ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্কে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়—যে সময়টির মধ্যে ইংরেজরা বাংলায় তাদের শাসন সংহত করে নেয়। অন্যদিকে মারাঠা সর্দারেরা নিজেদের শক্তি সংহত না করে পারস্পরিক তিক্ত বিবাদে এই সময়ের অপচয় করে।

২(খ).৩.৩ ওয়ারেন হেস্টিংস ও মহীশূর

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে হায়দার আলির সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে। ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে এর আগে হায়দার আলি একের পর এক যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত করেছিলেন, বহু ইংরেজ-সৈন্য আত্মসমর্পণ করতেও বাধ্য হয়েছিল। এই যুদ্ধেও হায়দারের সেই পুরানো রণকুশলতা অব্যাহত ছিল। এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র কর্ণাটক

অঞ্চল তাঁর করতলগত হয়েছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস নিজামকে ঘুষ দিয়ে তাঁকে ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। ১৭৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা ভীতি থেকেও কোম্পানি চুক্তির দ্বারা মুক্ত হলে পুরো সামরিক শক্তি নিয়ে ব্রিটিশরা এখন মহীশূরের বিরুদ্ধে নামে। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সেনাপতি আয়ারকূটের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী পোর্টোনোভো-র যুদ্ধে হায়দার আলি-কে পরাস্ত করে। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হায়দার আলির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত হয়ে ওঠায় অবশেষে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হয়। এর শর্ত অনুসারে পরস্পরকে বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে হয়েছিল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস যে দাবি করেন তা এইরকম : "মারাঠা যুদ্ধের মূল কারণ ও সূত্রপাত নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আমার মূল দায়িত্ব ছিল একটি প্রেসিডেন্সিকে (বোম্বাই) কুখ্যাতি ও দুটি প্রেসিডেন্সিকেই (বোম্বাই ও মাদ্রাজ) ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো।"

২(খ).৪ লর্ড কর্ণওয়ালিস ও দেশীয় রাজ্য (১৭৮৬-৯৩)

কেবল গভর্নর জেনারেল হিসাবেই নয়, কোম্পানির সেনাবাহিনীর সর্বেসর্বা হিসাবেও লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে আসেন। পিটের ভারত আইনে কোম্পানির গ্রাসী ভূমিকার ওপর প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা হলেও কর্নওয়ালিসের সময় মহীশূরের বিরুদ্ধে (১৭৮৯) কোম্পানি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মহীশূরের সম্পদ, যা অবশ্যই কোম্পানির কাছে বাংলা ও মাদ্রাজের আর্থিক লোকসানকে চাঙ্গা করার জন্য লোভনীয় ছিল, কর্নওয়ালিসকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে। ১৭৯২-এ টিপু সুলতানের পরাজয়ের ফলে মালাবার উপকূল কোম্পানি দখল করে। এই যুদ্ধে কোম্পানি পেশবা ও নিজামের সহযোগিতা লাভ করেছিল। মারাঠারা এই সময়ে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে উত্তরে প্রবল আগ্রাসন চালাচ্ছিল। টিপুর প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সমসাময়িক কোন দেশীয় শক্তিই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার দুরদর্শিতা দেখায়নি।

২(খ).৫ লর্ড ওয়েলেসলির অধীনে সাম্রাজ্য বিস্তার (১৭৯৮-১৮০৫)

ভারতে লর্ড ওয়েলেসলির (লর্ড মর্নিংটন হিসাবে আগমন ও টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর 'মার্কুইস অফ ওয়েলেসলি' উপাধি লাভ) আগমন ইউরোপ, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে অবনতির সমসাময়িক। নেপোলিয়ন সেই সময়ে (১৭৯৮-৯৯) ইংল্যান্ডের সমুদ্র আধিপত্যকে অগ্রাহ্য করে ইজিপ্ট আক্রমণ করেছেন। ১৮০৫ সাল অবধি ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়ে—'were nervous with apprehension and tense with resolution' ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে অত্যন্ত ভাবিত ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে ওয়েলেসলির সময় পর্যন্ত দেশীয় রাজদরবারগুলি ভাড়াটে ফরাসি সৈন্য বা সেনাপতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল—এক্ষেত্রে সিন্ধিয়া, কিংবা নিজাম বা, টিপু সুলতান, সকলেই ফরাসী-যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

ভারতে ফরাসী-ভীতিই বাস্তবিকভাবে ওয়েলেসলির প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করে দেয়। দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর থেকে যাবতীয় ফরাসী প্রভাব মুছে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওয়েলেসলি এতদিনের কোম্পানির রক্ষণশীল নীতিকে ত্যাগ করে আগ্রাসী মনোভাব গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ের বৈশিষ্ট্য ছিল ফরাসী বিতাড়নের মত নেতিবাচক কর্মসূচীর পাশাপাশি ভারতে সার্বভৌম শক্তি হিসাবে ব্রিটিশদের উত্থানের মত ইতিবাচক কর্মসূচী গ্রহণ—যা ছিল একই মুদ্রার দুই দিক। ব্রিটিশ প্রভুত্বের ও সার্বভৌম ক্ষমতার সুরক্ষার ক্ষেত্রে, ওয়েলেসলির মতে, এমন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল যা হবে চুক্তিনির্ভর ও গোটা ভারতব্যাপী। এই আক্রমণাত্মক সবগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গী ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিট্-এর ভারত আইন (Pitt's Indian Act—1784)-এর পরিপন্থী ছিল। কোম্পানি-কর্তৃপক্ষ ততদিনই ওয়েলেসলির এই নীতির বিরোধিতা করেননি, যতদিন তা কোম্পানির স্বার্থবিরোধী হয়নি।

১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভারতের মহীশূর ও মারাঠা এই দুই বৃহৎ শক্তির গৌরব অস্তমিত হয়েছিল। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পর মহীশূর বা কর্ণাটক রাজ্য তার অতীত-গৌরব ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মারাঠা সর্দাররা পরস্পরের মধ্যে বাদ-বিসম্ভবাদে লিপ্ত থেকে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই অনুকূল পরিস্থিতিতে উপলব্ধি করেছিল যে, ব্যবসায়িক স্বার্থের ক্ষতি না করে রাজ্যবিস্তার নীতি মুনাফালাভের সম্ভাবনাকেই বাড়িয়ে তুলবে।

২(খ).৫.১ অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি

রাজনৈতিক দিক থেকে লর্ড ওয়েলেসলির নীতি ছিল ত্রিমুখী। অধীনতামূলক মিত্রতা, প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ও কোন সময়ে বিজিত রাজ্যগুলি দখল—এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। দেশীয় রাজ্যে কিছু কোম্পানির সৈন্য মোতায়েন রেখে প্রতিবেশী আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দান ও সংশ্লিষ্ট সৈন্যদের ব্যয়ভার ওই রাজ্যের কাছ থেকে আদায় করা—এই প্রচলিত পুরাতন নীতি-র বদলে ওয়েলেসলি এমন কৌশলে চুক্তির শর্ত সাজালেন, যাতে এই আশ্রিত রাজ্যগুলি কোম্পানির সর্বময় প্রভুত্বের আওতায় এসে পড়ে। ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি কার্যক্ষেত্রে ছিল এই যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যে স্থায়ীভাবে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থার বিনিময়ে সৈন্যবাহিনীর খরচ ওই রাজ্যের কাছেই কোম্পানি আদায় করবে। শুধু তা-ই নয়, উপরন্তু এই নীতির বলে রাজ্যটির তরফে কোম্পানির প্রভুত্ব মেনে নিয়ে সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভারের নামে কোম্পানিকে রাজস্ব বা কর দান করতে হবে। অনেক সময় ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি কবলিত শাসক বা রাজ্যকে বাৎসরিক খাজনার বদলে তার রাজ্যাংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে হত। এই 'অধীনতামূলক মিত্রতা' ব্যবস্থায় প্রায়ই কিছু শর্তও জড়িত থাকত—যেমন, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের দরবারে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে রেসিডেন্টরূপে রাখতে হবে; ব্রিটিশের বিনা অনুমতিতে কোনো ইউরোপীয় (অ-ইংরেজ) কর্মচারী নিয়োগ করা চলবে না, এবং গভর্নর জেনারেলের বিনা অনুমতিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা শাসক প্রতিবেশী রাজ্যের কোনো বিষয়ে কোনো কথাবার্তা চালাতে পারবে না।

প্রকৃতপক্ষে ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' ব্যবস্থা ছিল একটা ফাঁদ। কোনো রাজা বা রাজ্যের পক্ষে নিজের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেওয়া ছিল এই চুক্তির অর্থ। শুধু পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাই নয়, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তাঁর স্বাধীনতা সংকুচিত হয়েছিল। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ক্রমশই দেশীয় রাজ্যের দৈনন্দিন প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করত। এছাড়াও ব্রিটিশ-সেনার ভরণপোষণের খরচ চালাতে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে

বাধ্য হত রাজা ও তার করভারপীড়িত প্রজাসাধারণ। এর ওপর 'আশ্রিত' রাজ্যগুলির নিজস্ব সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেওয়ায় পুরুষানুক্রমে সৈনিক বৃত্তিধারী লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও সেনানায়করা জীবিকাচ্যুত হয় ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যে দারিদ্র্য ও নৈতিক পতন দেখা দেয়। অন্যদিকে 'মিত্রতার' বন্ধনে আবদ্ধ দেশীয় রাজারা তাদের প্রজাদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেও ক্রমে চ্যুত হন, যখন প্রজাবিদ্রোহের কোনো আশঙ্কা আর থাকে না, কারণ সাহায্যের জন্য কোম্পানির ভাড়াটে সৈন্য রয়েছে।

অতএব ব্রিটিশ-শক্তির পক্ষে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তি অত্যন্ত সুবিধার হাতিয়ার হয়। ভারতীয় শাসকদের টাকায় তারা এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে পারত; যে-কোনো সময় আশ্রিত রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেই দেশীয় রাজ্য অধিকার করা যেত। অতএব, ওয়েলেসলির সময়ে যত এলাকা ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হয়েছিল 'অধীনতামূলক মিত্রতা'-র কৌশলে, আর কখনও তা হয়নি। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে টিপু সুলতান শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং মহীশূরের প্রায় অর্ধাংশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয় ও মাদ্রাজের সঙ্গে ভারতের পশ্চিম উপকূল যুক্ত হয়। মহীশূরের উত্তরাঞ্চলের কিছুটা জোটে নিজামের ভাগ্যে—কারণ ১৭৯৯-এর যুদ্ধে মহীশূরের বিরুদ্ধে তিনি কোম্পানিকে সাহায্য করেছিলেন। বাকি এলাকা মহীশূরের পুরোনো হিন্দু রাজবংশকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যার দ্বারা নিজামের সেনাবাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হয়। নিজস্ব বাহিনীর পরিবর্তে, বাৎসরিক ২৪১,৭১০ পাউন্ড ব্যয়ের বিনিময়ে, কোম্পানির ছয় ব্যাটালিয়ন ব্রিটিশ-সৈন্য তাঁর রাজ্যরক্ষা করত। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত আর একটি চুক্তির দ্বারা নিজামের রাজ্যে কোম্পানির সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, তাঁর রাজ্যের একাংশের বিনিময়ে (তুলা-উৎপাদনে সমৃদ্ধ বেরার প্রদেশ)।

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার নবাবকে বাধ্য করা হল এই চুক্তি সম্পাদনে, যার দ্বারা চুক্তিবদ্ধ নবাব তাঁর রাজ্যের সমৃদ্ধ পশ্চিম দোয়াব ও রোহিলাখণ্ড এলাকা কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। লক্ষ্ণৌ চতুর্দিক দিয়ে ব্রিটিশ-সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। অবশিষ্ট 'আউধ' রাজ্যেও নবাবের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়; স্বরাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও ও অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায়ও কোম্পানির প্রতিনিধি ও আরক্ষা বাহিনীর হাতেই রইল চূড়ান্ত ক্ষমতা। একদিকে পশ্চিম উপকূলের সমৃদ্ধ সুরাট বন্দর ও অন্যদিকে দক্ষিণের তাঞ্জোর কোম্পানির অধিকার আসে। অতঃপর ভারতের ব্রিটিশ শাসন বহির্ভূত শক্তিগুলির মধ্যে মারাঠারাই মুখ্য স্থানের অধিকারী হয়েছিল। এইবার ওয়েলেসলি মারাঠাদের প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

২(খ).৫.২ ওয়েলেসলি ও মারাঠা

মারাঠাজাতির দুর্ভাগ্যবশত, আঠারো শতকের শেষদিকে একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নায়কের অভাবে তারা যৌথ ও বিকেন্দ্রীভূত একটি সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকে, যার মুখ্য নেতৃবৃন্দ প্রত্যেকেই স্ব স্ব উদ্দেশ্য ওস্বার্থসাধনে মনোযোগী ছিলেন। যেমন পুণেতে পেশবা, গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া, ইন্দোরে হোলকার, নাগপুরে ভোঁসলে ও বরোদায় গায়কোয়াড় বংশ। মহাদ্‌জী সিন্ধিয়া, তুকোজী হোলকার, কি অহল্যাবাঈ, পেশবা দ্বিতীয় মাধব রাও-এর পরে শেষ উল্লেখযোগ্য মারাঠা কূটনীতিজ্ঞ নানা 'ফড়নবিশ সকলেই আঠারো শতকের শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, নতুন মারাঠা সর্দাররা কেউই

ব্রিটিশ আগ্রাসনকে যোগ্য গুরুত্ব না দিয়ে আত্ম-সিদ্ধিসাধনে তীব্র গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হন। একদিকে যশোবন্ত রাও হোলকার ও অন্যদিকে দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছিল।

১৮০২ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর হোলকার, পেশবা ও সিন্ধিয়ার মিলিত বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও ওয়েলেসলির মিত্রতা প্রস্তাবে রাজী হলেন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর অসহায় ও ভীত পেশবা ব্রিটিশ হুমকির সামনে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেন ও 'সাধারণ প্রতিরক্ষা আঁতাত' হিসাবে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি 'বেসিনের চুক্তি' হিসাবে খ্যাত হয়, যার বলে কোম্পানির সৈন্য পেশবার ভাতায় স্থায়ীভাবে পুণেতে বহাল হল এবং এর ব্যয়ভার হিসাবে পেশবার রাজ্যাংশ থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়কারী এলাকা কোম্পানির হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র বহিঃশত্রু নয় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রদানেও এই সেনাবাহিনী বহাল হয়। সুরাট নগরী ও নিজামের এলাকার ওপর থেকে 'চৌথ' আদায়ের দাবিও পেশবা কোম্পানিকে ছেড়ে দেয়। ইংরেজ ব্যতিরেকে অপর কোনো ইউরোপীয় শক্তির বা সেনা-প্রশিক্ষণে সাহায্য গ্রহণ পেশবার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল।

বেসিনের চুক্তি গোটা দাক্ষিণাত্যে কোম্পানির একচ্ছত্র আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করে, যা ইতিমধ্যেই নিজামের অধীনতামূলক চুক্তিতে বশ্যতা স্বীকার, বা টিপু সুলতানের পতন অথবা আর্কটের নবাবের রাজ্য কোম্পানির দ্বারা অধিগ্রহণের দ্বারা নিকটস্থ হয়েছিল। উত্তরভারতেই মূলত হোলকার, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। যদিও দীর্ঘদিন আগেই পেশবা তাঁর প্রকৃত ক্ষমতা থেকে অপসৃত হয়েছিলেন, তবু এই চুক্তি আনষ্ঠানিকভাবে মারাঠা আধিপত্য নষ্ট করে।

অন্যদিকে তৎকালীন বোর্ড অফ কন্ট্রোল এই চুক্তির বিরোধিতা করে যেহেতু তা সরাসরি পিট্-এর ভারত আইন (১৭৮৪) ও ১৭৯৩ সালের চার্টার আইনের উল্টো পথে চলেছিল। উপরোক্ত দুটি আইনেই কোম্পানি দ্বারা কোন দেশীয় রাজ্য বলপূর্বক অধিগ্রহণে কিছু প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়েছিল। রাজনৈতিকভাবেও, বোর্ড অফ কন্ট্রোল সভাপতি এই চুক্তির বিরোধিতা করেন কারণ, ভবিষ্যতে কোম্পানি মারাঠা রাজনীতির অশান্ত ঘূর্ণিতে আরও জড়িয়ে পড়বে—এই আশঙ্কায়। এই আশংকাকে সত্যি প্রমাণ করে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে ১৮০৩ সালে ও হোলকার ১৮০৪ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

কিন্তু এই বিপদের দিনেও মারাঠা নেতারা একত্রিত হয়ে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারেননি। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে যখন অস্ত্র ধরলেন, তখন হোলকার তা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, গায়কোয়াড় মিত্র হিসাবে ইংরেজদের সাহায্য করলেন, এবং যখন হোলকার বিপদগ্রস্ত হলেন, তখন ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া নির্বিকার রইলেন। ভারতে কোম্পানিই যে প্রধান শত্রু ও তার সামরিক ক্ষমতা কত—সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রস্তুতি না নিয়েই মারাঠা নেতারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

দাক্ষিণাত্যে আর্থার ওয়েলেসলির নেতৃত্বে ব্রিটিশবাহিনী ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আসাই-নামক স্থানে ও নভেম্বর মাসে আরগাঁও-তে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে। উত্তর ভারতে লর্ড লেকের নেতৃত্বে ইংরেজবাহিনী ১৯০৩ সালের নভেম্বরে সিন্ধিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে আলিগড়,

দিল্লি, আগ্রা সব দখল করে নেন। পুনরায় মুঘল সম্রাট শাহ্ আলম ব্রিটিশদের আশ্রিত হন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে উভয়কেই অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির আওতাভুক্ত হতে হয়েছিল। এঁরা দুজনেই নিজ নিজ রাজ্যাংশ ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্টের উপস্থিত মেনে নিয়েছিল। অতএব, উপকূলীয় উড়িষ্যা থেকে গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থ ভূভাগ—সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়।

এতদিন যশোবন্ত রাও হোলকার নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে ছিলেন এই বিশ্বাসে যে, দীর্ঘ, ক্লান্তিকর অভিযানে ব্রিটিশশক্তি হতোদ্যম হয়ে পড়লে তাদের আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করা সহজ হবে। হোলকারের সহযোগী ভরতপুরের রাজা ইংরেজ সেনাপতি লেকের আক্রমণই সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেছিলেন। এই অবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অংশীদারেরা সচেতন হয়ে ওঠেন যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ব্যাপক সামরিক অভিযানের পিছনে তুমুল ব্যয়স্বীকারে কোম্পানির লাভের অঙ্কে টান ধরছে। কোম্পানির ঋণের মাত্রা ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে ছিল £ ১৭ মিলিয়ন, ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে তা বর্ধিত হয়ে দাঁড়ায় £ ৩১ মিলিয়নে। অপরদিকে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের আতঙ্ক ও প্রস্তুতি স্বদেশে ইংল্যান্ডের আর্থিক অবস্থা বিপন্ন করে তুলেছিল। অতএব আর যুদ্ধ নয়—এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর প্রবল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ লর্ড ওয়েলেসলিকে ইংল্যান্ডে ফিরতে হয়েছিল। তাঁর রাজ্যের বেশিরভাগ অংশ তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল। লর্ড কর্নওয়ালিস দ্বিতীয় বারের ও অত্যন্ত অল্পকালের জন্য ভারতে পুনঃপ্রেরিত হন।

লর্ড ওয়েলেসলি, যাঁকে 'নব্য মুঘল' বলে অভিহিত করা হয়েছে (স্ট্যানলি উলপার্টের ভাষায়), প্রকৃতপক্ষে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে "ব্রিটিশের ভারতীয় সাম্রাজ্যে" রূপান্তরিত করেন [The British Empire in India became the British Empire of India.]। নিজাম, টিপু সুলতান, মারাঠা নেতৃবৃন্দ—প্রতিটি দেশীয় শক্তির ভরকেন্দ্রগুলিকে তিনি ধ্বংস করেন। মুঘল সম্রাট যিনি লর্ড ওয়েলেসলির মতো মদগর্বী ও জেদী ইংরেজ প্রশাসকের কাছ থেকেও সম্মান আদায় করে নেন—শাহ্ আলমকে ওয়েলেসলি কোম্পানির আশ্রিত করে তোলেন। দক্ষিণে মহীশূর, আর্ক, অযোধ্যা—এই ত্রিশক্তির রাজ্য গ্রাস করে মারাঠা শক্তিকেও পদানত করেন। তাঁর অসমাপ্ত আগ্রাসী নীতি, কয়েক বছর বিরতির পর, লর্ড হেস্টিংসের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

শুধু যুদ্ধই নয়, একজন সুদক্ষ সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসক হিসাবেও তিনি কোম্পানির সাম্রাজ্যের ভিতকে সুসংহত করেন। ইংল্যান্ড থেকে নবাগত ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশে সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রশাসন সম্পর্কে সুদক্ষ করে তুলতে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সরকারি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কোম্পানির আমলে ভারতে বিখ্যাত প্রশাসনিক কর্মচারীদের অধিকাংশই—যেমন মানরো, মেটকাফ, ম্যালকম বা, এলফিনস্টোন—লর্ড ওয়েলেসলির অধীনে জীবন শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অধীনে ভারতে কোম্পানির শ্যসনব্যবস্থার এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

২(খ).৬ লর্ড হেস্টিংস ও সাম্রাজ্যবাদ (১৮১৩—২৩)

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ মারাঠা প্রধানদের শক্তি ও প্রভাব চূর্ণ করে দিলেও ধ্বংস করে দিতে পারেনি। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা তাঁদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে শেষ চেষ্টা চালান। ইংরেজ রেসিডেন্টের কঠোর

নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেও মারাঠা প্রধানদের মিলিত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই শেষ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন পেশবা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আরও একবার মারাঠারা এক সম্মিলিত ও সুচিন্তিত কর্মধারা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পেশবা পুণের ইংরেজ রেসিডেন্টের কার্যালয় ও বাসভবনে হানা দেন। নাগপুরের আপ্পা সাহেব নাগপুর রেসিডেন্সি আক্রমণ করেন। এই রেসিডেন্সিগুলি ছিল ব্রিটিশ শক্তির প্রতীক। অন্যদিকে মাধব রাও হোলকারও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রস্তুতি নেন।

লর্ড হেস্টিংস সমুচিত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মারাঠা স্পর্ধার জবাব দেন। পেশবা বাজীরাও ১৮১৮ খিস্টাব্দের ১৮ই জুন আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। তাঁর পদ বিলুপ্ত করা হয় তাঁর এলাকা গ্রাস করে বর্ধিত আয়তনের বোম্বাই প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। তাঁকে একটা ভাতা মঞ্জুর করে কানপুরের কাছে বিঠুরে নির্বাসিত করা হয়। হোলকার ও ভোঁসলেকে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সব মারাঠা প্রধানরাই নিজ নিজ রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চল ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। এরপর থেকে ভারতের অন্যান্য স্থানের দেশীয় নৃপতিদের মতো মারাঠাশক্তির পতনের মূল কারণ— বেইলির মতে, সাধ্যাতিরিক্ত বিস্তার ও আগ্রাসন তাদের মূল ভিত্তিতে ফাটল ধরায় [rapid expansion of their politics created fractures]।

এইভাবে পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ব্যতীত সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ব্রিটিশের অধিকারে এসে গিয়েছিল। এই সাম্রাজ্যের একাংশ ছিল ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। বাকী অংশ বহুসংখ্যক দেশীয় রাজা ও নবাবদের দ্বারা শাসিত হলেও ব্রিটিশের সর্বময় প্রভুত্বের অধীনে পরিচালিত হত। এই দেশীয় রাজ্যগুলির নিজস্ব সৈন্যবাহিনী বলতে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। অযোধ্যার মতো দেশীয়, নিজস্ব সেনাবাহিনীকে কোনো কাজে না লাগিয়ে বাড়তি ভাতা দিয়ে কোম্পানির সৈন্যকে কাজে লাগানো হত। বহির্জগত কিংবা অন্য রাজ্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতাও দেশীয় শাসকবর্গের রইল না। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনেও রেসিডেন্টের তরফে হস্তক্ষেপের মাত্রা বাড়তে লাগল। এইভাবে ভারতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করে কোম্পানি একদিকে নজর দিল পাঞ্জাবের দিকে এবং অপরদিকে সামাজিক-ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাঁরা ধীরে ধীরে হস্তক্ষেপের দিকে ঝুঁকল।

২(খ).৭ লর্ড ডালহৌসী ও রাজ্যগ্রাস নীতি (১৮৪৮-১৮৫৬)

অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে মূল অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হলেও ডালহৌসীর আমলে তা ধার হারিয়ে ফেলে। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ছিল অযোধ্যা বা আউধ। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে অযোধ্যার নবাব বাৎসরিক বিপুল অঙ্কের করপ্রদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কোম্পানির কাছ থেকে সুরক্ষা ক্রয় করেন। করের দেয় টাকা যোগাড় করতে গিয়ে নবাব ক্রমশই রাজ্যের অধীনস্থ জমিদার, রায়ত সেনাবাহিনী ও অন্যান্য শ্রেণীকে বিরূপ ও বিরক্ত করে তুলছিলেন, কারণ রাজ্যের এই ক্রম দেউলিয়াকরণে তাদের ভাগের প্রাপ্য অর্থ ও বেতন তারা পাচ্ছিল না। এই চুক্তির অনিবার্য পরিণতি হিসাবে নবাব ক্রমশ ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছিলেন। উত্তর ভারতে এইভাবে অযোধ্যা ও দক্ষিণে

আর্কট উভয় রাজ্যের ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার বেইলি-র মতে—"the financial demands of the alliance merely served to erode the basis of the state, and ultimately to provide the conditions for British annexation," অর্থাৎ আর্থিক দাবিদাওয়া ক্রমশ রাজ্যের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দেয়, ফলে ব্রিটিশ আগ্রাসনের ক্ষেত্রেও সহজ হয়।

এই পরিস্থিতিতে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী গভর্নর-জেনারেল রূপে ভারতে আসেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী ডালহৌসী চেয়েছিলেন ভারতের যতটা অঞ্চলে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ অধিকার বা শাসন ব্যপ্ত করা সম্ভব তা তিনি করে যাবেন। তিনি আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, "ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতাহরণ সুনিশ্চিত, তবে সেটা কিছু সময়সাপেক্ষ ব্যাপার মাত্র।" ডালহৌসীর এই নীতির পিছনে ছিল তাঁর এই ধারণা যে, দেশীয় শাসকদের রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল প্রজাপীড়ন ও দুর্নীতিপুষ্ট। সেই তুলনায় ব্রিটিশ-ভারতের শাসনব্যবস্থা বহু পরিমাণে উন্নত। তবে এই রাজ্যবিস্তার নীতির মূল প্রেরণা ছিল ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি। অন্যান্য সাম্রাজ্যবিস্তারকামী ইংরেজদের মতোই ডালহৌসীর এই বিশ্বাস ছিল যে, দেশীয় রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ পণ্যের কম কাটতির কারণ ঐ রাজ্যসমূহে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার অভাব। তাছাড়া এই গোত্রীয় শাসকরা ভাবতেন যে, তাদের 'ভারতীয় মিত্ররা' ইতিমধ্যেই তাঁদের ভারত বিজয়ের পথ সুগম করে দিয়েছিল যে উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে মিত্রতা করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। দেশীয় রাজ্যের পক্ষে প্রশাসনিক অক্ষমতার কারণটি এই মিত্রতাকে জীর্ণ করে দিয়েছে।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে লর্ড ডালহৌসী 'স্বত্ববিলোপ নীতি'-কে কাজে লাগিয়েছিলেন। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপক আর্থিক ব্যয় খানিকটা লাঘব করার জন্যেও ডালহৌসী এই আশ্রিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই নীতি অনুসারে কোনো 'আশ্রিত' রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেওয়া হত। চিরাচরিত 'হিন্দুপ্রথা' অনুসারে অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি 'দত্তক' পুত্রের পাওয়ার কথা। ডালহৌসীর আইনে এটা মানা হয়নি। জীবিত অবস্থায় আশ্রিত 'অপুত্রক' রাজা যদি কোনো 'দত্তক' পুত্র নিয়ে থাকেন এবং এটি যদি ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ দ্বারা আগে থেকেই অনুমোদিত হয়ে থাকে শুধু সে ক্ষেত্রেই রাজ্যটি আশ্রিত রাজ্য হিসাবে টিকে থাকবে— স্বত্ববিলোপ নীতি এইভাবে প্রযোজ্য হয়েছিল। অতএব, ১৮৪৮ সালে সাতারা, ১৮৫৩ সালে ঝাঁসি এবং ১৮৫৪-তে নাগপুর সরাসরি ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে।

লর্ড ডালহৌসী বহু ভূতপূর্ব রাজা বা শাসকের সনদ ও উপাধি বাতিল করে দেন, প্রাপ্য বৃত্তিও (যেমন পেশবা) বন্ধ করে দেন। কর্ণাটক ও সুরাটের নবাব এবং তাঞ্জোরের রাজার উপাধি কেড়ে নেওয়া হয়।

অযোধ্যা রাজ্যটিকে গ্রাস করবার জন্য লর্ড ডালহৌসী ব্যগ্র ছিলেন। ১৮০১ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির পরবর্তীকালে 'আউধের' অবস্থা ক্রমশ হীন হয়। লর্ড বেন্টিঙ্ক, লর্ড অকল্যান্ড প্রমুখ গভর্ণর জেনারেলেরা প্রত্যেকেই 'আউধের' প্রশাসনিক সংকট নিয়ে নবাবকে সতর্ক করলেও তার কোন উন্নতি হয়নি। ডালহৌসী এর প্রতিকারকল্পে তিনটি উপায় দর্শান—অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষমতা স্থায়ীভাবে কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে বা অযোধ্যার নবাব কিছুদিনের জন্য রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব কোম্পানিকে সঁপে দিয়ে অথবা অযোধ্যাকে দখল করে নিয়ে—এই সমস্যার সমাধান ঘটানো সম্ভব। যেহেতু বক্সার-যুদ্ধের আমল থেকে

'আউধের' নবাব ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে এসেছেন, এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে এই রাজ্য গ্রাস করা যেত না। ফলে ডালহৌসী বা কোম্পানিকে প্রশাসনিক নিপীড়ন থেকে অযোধ্যার প্রজাদের উদ্ধার করার সাধু উদ্দেশ্য দর্শানো ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। অতএব, ডালহৌসীর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, যে, নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্ ঠিকমতো রাজ্যশাসনে মনোযোগী নন। অতঃপর ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি 'নবাবকে ' ভাতা দিয়ে অযোধ্যা গ্রাস করে।

এতে সন্দেহ নেই অযোধ্যার অভ্যন্তরীণ সংকটে অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের মতো নবাবরাও স্বার্থপরভাবে ভোগবিলাসে ব্যস্ত থেকে ইন্ধন জুগিয়েছিল। কিন্তু এই শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য কোম্পানির কূটনীতি ও ধুরন্ধর রাজনৈতিক চালও কম দায়ী ছিল না। ১৮০১ সাল থেকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও কোম্পানি পিছন থেকে নবাবের স্বাধীন ক্ষমতায় লাগাম টেনে ধরে ও অযোধ্যা-র রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যাপারে দাবিদাওয়া বাড়িয়েই চলে। ডালহৌসীর হৃদয় অযোধ্যার প্রজাদের দুঃখে কাতর হয়ে ওঠার একটা গূঢ় কারণ ছিল এই যে, তাঁর মনে হয়েছিল এই রাজ্যটি ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্পসম্ভারের খুব ভালো বাজার হতে পারে, এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য রাজ্যটির প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব দরকার হয়ে পড়েছিল। ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্পে কাঁচাতুলার অভাব দূর করার জন্য ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ডালহৌসী নিজামের হাত থেকে বেরার প্রদেশের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন। কারণ এই এলাকা তুলা উৎপাদনে সমৃদ্ধ ছিল। বিশেষত ১৭৮৪ সালের পর থেকে দেখা যায়, গুজরাট ও চীনদেশের মধ্যে তুলা রপ্তানির ব্যবসা এত লাভদায়ক হয়ে দাঁড়ায়, যে কোম্পানি ও তার বেসরকারি বণিকরা ক্রমশই পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার গুরুত্ব সম্পর্কে অধিক সক্রিয় হয়ে ওঠে।

অযোধ্যা ও উল্লিখিত অন্যান্য দেশীয় রাজ্য ছাড়াও ডালহৌসী দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের মাধ্যমে (১৮৪৮-৪৯) পাঞ্জাব দখল করেন। এক্ষেত্রেও মূলতানের একটি সামান্য বিদ্রোহ ও দুজন কোম্পানির কর্মচারীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বাধে। ডালহৌসী এই কারণে সমালোচিত হন, যে বিদ্রোহের সময় প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিল কোম্পানি ও মহারাজা দিলীপ সিং ছিলেন নাবালক শাসক ও কোম্পানিরই অভিভাবকত্বে। তাঁকে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার অজুহাতে সিংহাসনচ্যুত করা অন্যায় ছিল।

এই ব্যাপক আগ্রাসী অভিযানের ফলে লর্ড ডালহৌসীর সময়ে যত দেশীয় রাজ্য কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আসে, তা আয়তনে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস্-এর দ্বিগুণ ছিল এবং অন্য যে-কোনো গভর্নর-জেনারেলের অধীনে দখলিকৃত এলাকারও দ্বিগুণ।

২(খ).৭.১ কোম্পানির সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি ও মূল্যায়ন

ব্রিটিশ কর্তৃক কোনো দেশীয় রাজ্য অধিকারের আর বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছিল না, কারণ দেশীয় রাজ্যগুলিকে কোনোরকমেই ভারতীয় রাজ্য বলা চলত না। পুরোপুরি ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত হওয়ার আগে থেকেই এর সবকিছুই ব্রিটিশের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ব্রিটিশ-ভারতের জনসাধারণের অবস্থার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের অবস্থার কোনো তফাত ছিল না। দেশীয় রাজ্যগুলিকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশের দিক থেকে একটা শাসনতান্ত্রিক লাভ। ভারতীয় জনগণের অবস্থায় কোনো গুণগত পরিবর্তন

এই মালিকানা-বদল আনতে পারেনি।

অতএব, শেষ বিচারে যদি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রকৃত কারণ খোঁজা হয়, তাহলে বিচার্য বিষয়গুলি হবে অবশ্যই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রাথমিকভাবে ক্ষমতায় আসে, কারণ তা অধীনস্থ সামরিক বাহিনীকে খুব মূল্যবান আর্থিক নিরাপত্তার যোগান দিতে পারে। বাংলার রাজস্বের ওপর দখল ক্রমশই উপকূলীয় অর্থনৈতিক কাজকর্মের ওপর দখল নিতে সাহায্য করে। এই দৃঢ় আর্থিক বুনিয়াদ না থাকলে ভারতব্যাপী যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে সম্ভব হত না। বাণিজ্যিক লাভের অঙ্ক যে কী পরিমাণ ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের পিছনে কাজ করেছিল তা বোঝা যায় কোম্পানির পশ্চিম উপকূল দখলের দৃষ্টান্তে। চীনের বিকাশশীল বাজারে রপ্তানির জন্য তুলা উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা ১৭৮৪ সালের পর কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছিল। ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ সালের মধ্যে গুজরাট থেকে বোম্বাই হয়ে প্রেরিত তুলার পরিমাণ দাঁড়ায় বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা থেকে ৩৫ লক্ষ টাকায়। বোঝাই যাচ্ছে, বেইলির মতে—"The company was drawn into conquest in the Western Deccan and Central India Primarily because the demand of its fiscal and military machine."

এছাড়াও, শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ আগ্রাসনকেই অস্ত্র করে নয়, অধীনস্থ দেশীয় মিত্রশক্তিবর্গ ও নির্ভরশীল দেশীয় সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে গূঢ় কূটনৈতিক কৌশলে বা চালে নিজস্বার্থে ব্যবহার করেও কোম্পানি কার্যোদ্ধার করেছিল। অধীনস্থ রাজা বা নবাবদের সামরিকভাবে নির্বীর্য করে দিলেও, তাদের সম্পদ বা আর্থিক সংগতিকে সুকৌশলে কোম্পানি তার সাম্রাজ্যবিস্তারে বা বিদ্রোহ দমনে ব্যবহার করত। এক্ষেত্রে দেশীয় অধীনস্থ শক্তিবর্গকে স্বজাতিরই বিদ্রোহ দমনে খুব সুকৌশলে ব্যবহার করেছিল কোম্পানি (যেমন সিন্ধিয়া ভোঁসলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গায়কোয়াড়কে সহযোগী হিসাবে কোম্পানির ব্যবহার)।

২(খ).৮ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১। ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবিস্তারের পিছনে তৎকালীন পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর গুরুত্ব কী? সাম্রাজ্যবিস্তারে সাফল্যের জন্য কী কী কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল?

২। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্যগ্রাস নীতি ও রাজ্যজয় বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

৩। কী কারণে মারাঠাশক্তি ব্রিটিশদের কাছে পরাস্ত হয়?

৪। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে ব্রিটিশদের অযোধ্যা নীতি কী ছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

৫। 'স্বত্ববিলোপ নীতি'-র মূল সূত্র কী ছিল?

৬। বেসিনের সন্ধি ও সলবঙ্গ-এর চুক্তির সময় ও স্বাক্ষরকারীদের নাম লেখ।

২(খ).৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। S. M. Burke, Salim Al-Din Qureishi : *The British Raj in India : An Historical Review.*

২। A. C. Banerjee. : *The New History of Modern India.*

৩। বিপান চন্দ্র (অনুবাদ—গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত) : আধুনিক ভারত।

৪। C. A. Bayly : *The New Cambridge History of India : Indian Society and the Making of the British Empire.*

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ৩ ❑ ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের পরিবর্তনশীল ধারা—আর্থিক নিষ্ক্রমণ—ঊনিবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ : ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রভাব—অবশিল্পায়ন

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ প্রারম্ভিক কথা

৩.৩ কোম্পানির বাণিজ্য

৩.৪ কোম্পানির বাণিজ্য ও এজেন্সি হাউস

৩.৪.১ কোম্পানির বিনিয়োগ ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ভূমিকা

৩.৫ একচেটিয়া কারবারের প্রভাব : ভারতীয় বাজার ও উৎপাদক

৩.৬ পরিবর্তনশীল বাণিজ্যের ধারা

৩.৭ অবশিল্পায়ন

৩.৭.১ অবশিল্পায়ন ও সুতিবস্ত্র শিল্প

৩.৮ আর্থিক নিষ্ক্রমণ বা সম্পদ নির্গম

৩.৯ সারাংশ

৩.১০ অনুশীলনী

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করতে পারবেন—

- ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রভাব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করেছিল।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য নীতি ও বিনিয়োগ।
- ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য।
- কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য।

- পরিবর্তনশীল বাণিজ্যের ধারা।
- অবশিল্পায়ন।
- আর্থিক নিষ্ক্রমণ।

৩.১ প্রস্তাবনা

ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসেছিল বণিকরূপে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শাসক হিসেবে—রাজনৈতিক ইতিহাসে এই বহুপ্রচলিত কথাটি তথ্যভিত্তিকভাবে প্রমাণিত। ইংরেজ শাসনের অর্থনৈতিক প্রভাবের একটি দিক এই এককটিতে আলোচিত হয়েছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে পুরোপুরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আনার বহুপূর্বে ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। কীভাবে ইংল্যান্ডের প্রয়োজন অনুসারে ভারতীয় অর্থনীতি ও সম্পদের উৎসগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল এই এককটিতে তাই আলোচনা করা হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনিয়োগ নীতি, ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য, ১৮১৩-তে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান সমস্তই নির্ধারণ করা হয়েছিল ইংল্যান্ডের স্বার্থের কথা ভেবেই। ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় কুটিরশিল্পের ধ্বংস ও ভারতীয় সম্পদের উৎসের ক্রমিক নির্গমন এরই ফল। এই এককটি পাঠ করলে কীভাবে তা ঘটেছিল তা জানা যাবে।

৩.২ প্রারম্ভিক কথা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অপকেন্দ্র শক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী ও কেন্দ্রীভূত মোগল সাম্রাজ্যকে ভেঙে টুকরো করেছিল, ফলে কতকগুলি আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটেছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করার পর ভারতীয় ইতিহাসের অন্য এক অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছিল। আমাদের দেশে ব্রিটিশ শোষণের পরপর তিনটি পর্ব ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। এর প্রথম পর্বটি ছিল ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩-র বণিক পর্যায়। সরাসরি লুঠ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা ছিল এই পর্বের লক্ষণ। ইংল্যান্ডে ও ইউরোপে রপ্তানির জন্য ভারতে তৈরি মাল যথেষ্ট কম দামে কিনে ও তা থেকে উদ্বৃত্ত বিনিয়োগ করে এটি চলেছিল। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব নাটকীয়ভাবে পাল্টে দিয়েছিল ব্যবসার পুরো ধাঁচটাই। ১৮১৩ থেকে ১৮৫৮ অবধি সময়কে বলা যেতে পারে অবাধ ব্যবসার, শিল্পবাদী শোষণের ধ্রুপদী যুগ। ভারতের চিরায়ত হস্তশিল্পকে এসময়ে উপড়ে ফেলা হল এবং অচিরেই তাকে ম্যানচেস্টার থেকে আনা কাপড়ের বাজারে ও কাঁচামালের উৎসে পরিণত করা হয়। এই এককটি পড়লে জানা যাবে কিভাবে ব্রিটিশ শোষণের অর্থনৈতিক নাগপাশ ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল যার অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছিল ভারতীয় হস্তশিল্পের ধ্বংস ও পরবর্তী পর্যায়ের আর্থিক নিষ্ক্রমণ।

৩.৩ কোম্পানির বাণিজ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্যে প্রধানত তিন ধরনের বণিকরা লিপ্ত ছিল। বিভিন্ন ইওরোপীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থাৎ ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ইত্যাদি চার্টাড কোম্পানিগুলি, আর্মেনিয় বণিকদের মতো এশীয় বণিকেরা এবং ভারতীয় বণিকগণ। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট, ফারুকশিয়ারের ফরমান ইংরেজ কোম্পানিগুলিকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে তাদের অন্যান্য বণিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ফরমানে বলা হয়েছিল যে, ইংরেজ কোম্পানি মোগল সাম্রাজ্যে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার বিনিময়ে সম্রাটকে বছরে ৩,০০০ টাকা নজরানা দেবে। যদিও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেই মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে থাকে, বাণিজ্যে কিন্তু অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যায়নি। ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে কেবল ব্রিটেনই ৪,৯৩,২৫৭ পাউন্ড মূল্যের ভারতীয় পণ্য নিজ দেশে আমদানি করেছিল। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন আমদানি করেছিল ১,০৫৯,৭৫৯ পাউন্ড মূল্যের ভারতীয় পণ্য। বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে এই ব্রিটেনকৃত ভারতীয় পণ্যের আমদানি দাঁড়ায় ১,০৯৮,৭১২ পাউন্ড। অপরদিকে ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত ব্রিটেনের কাছ থেকে বুলিয়নের মাধ্যমে ১৭,০৪৭,১৭৩ পাউন্ড লাভ করেছিল।

কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দুর্বলতার ফলে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের ফর্মানকে আইন অনুযায়ী প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। কোম্পানির কর্মচারীরা প্রায়ই দস্তকের অপব্যবহার করে ফর্মানের শর্ত লঙ্ঘন করত। পলাশীর বিজয় বাংলায় ব্রিটিশ প্রভাবকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করল, ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও শুল্ক ছাড়ের সুযোগ নিতে লাগল অথচ ফারুখশিয়ারের ফর্মানে কোম্পানির নিজস্ব আমদানি-রপ্তানির ওপরই কেবল শুল্ক ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারীদের পুরো শুল্ক দিতে হবে। দস্তকের অপব্যবহারের ফলে ভারতীয় বণিকগণ গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল কারণ তাদের আগের মতোই চড়া হারে শুল্ক দিতে হচ্ছিল।

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে বাংলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানির বাংলা বিজয় এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ানি লাভ বাংলার বাজারের ওপর ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলে বাংলার উৎপাদকেরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার সুযোগ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য নির্দিষ্ট কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তাদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য থাকত এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যও ধার্য করে দিত কোম্পানির কর্মচারীরা। দেওয়ানি লাভের পর অর্থাৎ বাংলার রাজস্বের ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করার ফলে ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরও একটি সুদুরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দিল।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারতে বুলিয়ন আমদানি করে ইংরেজ কোম্পানি তার রপ্তানি বাণিজ্য চালাত। কিন্তু দেওয়ানি লাভের পরে রপ্তানিযোগ্য ভারতীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে আর বুলিয়ান আমদানি করতে হয়নি। কারণ কোম্পানি তখন থেকে বাংলার রাজস্ব দিয়েই তার বার্ষিক বিনিয়োগ করত। বাংলা কেবলমাত্র ইওরোপীয় বাজারে প্রধান পণ্য সরবরাহকারীই ছিল না, কোম্পানি চীন থেকে যে চা ও রেশম কিনত তার জন্য বুলিয়ন যোগান দিতেও বাংলা বাধ্য হয়েছিল। রৌপ্যমুদ্রা রপ্তানি হয়ে যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী কুফল হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে টাকার যোগান হ্রাস পেয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকেই ভারতের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় বাণিজ্য পুঁজির পরিমাণ কমতে থাকে। ইংরেজ কোম্পানি ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ বণিকদের এজেন্সি হাউসগুলির মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলেই ভারতীয় বণিকদের পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল।

১৭৭৯ থেকে ১৭৮৬-র মধ্যে শিল্পবিপ্লবজাত নানা নতুন প্রযুক্তির উদ্ভবের ফলে ১৭৮৭ নাগাদই ল্যাংকাশায়ার সূতীবস্ত্র শিল্প ভারতীয় শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারছিল। তবে সূক্ষ্মতম মসলিনবস্ত্রের ক্ষেত্রে ভারতীয় বস্ত্রের কোনো তুলনাই ছিল না। বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগকারী ইংল্যান্ডের শিল্পস্বার্থ চাইছিলো ভারতবর্ষ থেকে সূক্ষ্ম সূতো ও সূতীবস্ত্র রপ্তানির পরিবর্তে তুলো আমদানি করতে। ১৭৯২-৯৩-এ এই দাবী আরও জোরদার হয়েছিল এবং ম্যানচেস্টারের বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগকারীগণ চাইছিল ভারতীয় সূতিবস্ত্র আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক। কিন্তু এই দাবির সঙ্গে আরও অন্যান্য গোষ্ঠীর দাবী ও স্বার্থও প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছিল, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই সমস্ত স্বার্থও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকেরা কতগুলি সুবিধা আদায় করেছিল। এই সনদে বলা হল যে তারা ৩,০০০ টন ওজনের পণ্য পর্যন্ত কোম্পানির জাহাজে আমদানি-রপ্তানি করতে পারবে। কিন্তু এর জন্য যে ভাড়া তাদের দিতে হবে তার হার ছিল যথেস্ট বেশি। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে একটি আইনের মাধ্যমে গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলি বেসরকারি ইংরেজ বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি আইন করেন। এই আইন অনুসারে ব্যক্তিগত ইংরেজ বণিকরা ভারতীয় জাহাজে করে ব্রিটেনে পণ্য রপ্তানি করার অনুমতি পায়। এই পদক্ষেপ ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। বাংলা থেকে ইংরেজ বণিকরা অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্বে মূলত নীল, কাঁচা রেশম, সূতি ও রেশমী বস্ত্রের থান, কাঁচা তুলো, চিনি, শস্য ও সোরা ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করত। এই সময় সূতি ও রেশম বস্ত্রের রপ্তানি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নীল, কাঁচা তুলা এবং আফিমের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ড যে পরিমাণে পণ্য ভারতে রপ্তানি করত, তার ৩৩ শতাংশই আসত ভারতে। বুলিয়ন ছাড়া ইংরেজরা যে সব পণ্য ভারতে রপ্তানি করত সেগুলি হল মদ, স্পিরিট, কাচ, ছুরি, কাঁচি, লোহা, পশমের বস্ত্র, বই এবং টুপি। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির নীতি ছিল ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্য যত বেশি সম্ভভব ভারতে রপ্তানি করা, যাতে ভারতীয় ভোক্তারা ঐ সমস্ত পণ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয়কেই কোম্পানির "বিনিয়োগ" বলা হত। বাংলায় সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে এই বিনিয়োগের মাধ্যম মূলত ছিল দাদ্‌নি বণিকেরা। এই বণিকগণ কোম্পানির কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে তাঁতিদের দিত নিয়মিত দ্রব্য সরবরাহের জন্য। এছাড়াও নগদ দ্রব্য ক্রয়ের ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু দাদ্‌নি বণিকদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে এই বিনিয়োগ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নানা কারণে পরিত্যাগ করা হয়েছিল।

পরিবর্তে ভারতীয় গোমস্তা বা কোম্পানির দালাল নিয়োগ করা হয়েছিল যারা কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মচারীদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কোম্পানির জন্য দ্রব্য ক্রয় করত। পরবর্তী বিভাগে এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে আসবে।

৩.৪ কোম্পানির বাণিজ্য এবং এজেন্সি হাউস

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানি এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ বণিকরা। কোম্পানির দাদ্‌নি ব্যবস্থা অবলুপ্তির ফলে ব্যক্তিগত বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ কর্মচারীরা তাদের নিজস্ব বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তুলতে আরম্ভ করেছিল। এই সংস্থাগুলিকে বলা হত "এজেন্সি হাউস"। এই এজেন্সি হাউসগুলি ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ কর্মচারীদের টাকা স্বদেশে প্রেরণ করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চীনের সঙ্গে আফিন বাণিজ্য শুরু হওয়ার সময় বাংলায় কম করে ১৫টি এজেন্সি হাউসের অস্তিত্ব ছিল এবং ঐগুলি অধিকাংশই ছিল ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত। ভারতে ব্রিটিশ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই এজেন্সি হাউসগুলি। যদিও মূলত এই সংস্থাগুলি ছিল বাণিজ্য কুঠি কিন্তু একই সঙ্গে এগুলি ব্যাংকার, হুন্ডির দালাল, জাহাজের মালিক, বিমার দালাল ও পণ্য সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করত। নীল, আফিম এবং উপকূল বাণিজ্য ইংরেজ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের নতুন ক্ষেত্র খুলে দিয়েছিল।

এজেন্সি হাউসগুলি গড়ে ওঠার আগে দেশীয় বণিকরাই ইংরেজদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালের কাজ করত। এজেন্সি হাউসগুলি গড়ে ওঠার পর ভারতের বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে ভারতীয় বেনিয়ানদের বা দালালদের গুরুত্ব ক্রমশ কমতে থাকে। এর ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকেই ভারতীয় বাণিজ্যে ভারতীয় পুঁজির পরিমাণ কমতে থাকে ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ বণিকদের পুঁজির পরিমাণ বাড়তে থাকে। ভারতীয় বাণিজ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বেনিয়ানদের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসে।

১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল। এর আগে পর্যন্ত এজেন্সি হাউসগুলিই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ইংরেজ বণিক ও নীল আবাদকারীদের কাছে ব্যাঙ্কের কাজ করত। আলেকজান্ডার অ্যান্ড কোম্পানির মতো এজেন্সি হাউস নোট ছাপাবার অধিকারও লাভ করেছিল। ১৭৮০ ও ৯০-এর দশকে নীলচাষ আরও হয়েছিল, ইংরেজ বণিকদের চীনে আফিম বিক্রির লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল এবং জাহাজ ব্যবসারও বিকাশ ঘটেছিল, ফলে এজেন্সি হাউসগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকল। ১৮৩০-এর গোড়ার দিকে একটি এজেন্সি হাউসই হয় সম্পূর্ণ মালিক হিসেবে নয় অংশীদার হিসেবে অন্তত ৫৬টি নীল তৈরির কারখানার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই সময়ে বাংলার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর কয়েকটি এজেন্সি হাউসের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এজেন্সি হাউসগুলির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে কোম্পানির সরকার। বৃহত্তর এজেন্সি

হাউসগুলিকে কোম্পানির সরকার ঋণদান করে। কোম্পানি সরকারের বাজেট ঘাটতি হওয়া সত্ত্বেও এজেন্সি হাউসগুলির আর্থিক সঙ্কটের সময় সরকার সেগুলিকে উদার হাতে ঋণদান করতে থাকে। এই সরকারি সাহায্যদানের পিছনে কতকগুলি জোরালো কারণ ছিল। প্রথমত, এজেন্সি হাউসগুলির বণিকদের স্বার্থের সঙ্গে প্রশাসনিক ও সামরিক কাজে লিপ্ত কর্মচারীদের স্বার্থ সংযুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত সরকারি রাজস্ব অনেকটাই ইংরেজ বণিকদের সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করত।

১৮৩০ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একের পর এক এজেন্সি হাউসগুলি কিন্তু ভেঙে পড়তে থাকে। এজেন্সি হাউসগুলির ধ্বংসের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে ইংরেজ বণিকদের ফাটকা কারবার যা মূলত নীল তৈরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১৮০-এর দশকে ইংল্যান্ডের বাজারে যে আর্থিক মন্দা দেখা দেয় তার ফলে ইংল্যান্ডের নীলের ও অন্যান্য পণ্যের বাজারের প্রভূত ক্ষতি হয়। অবশ্যম্ভাবীভাবে এজেন্সি হাউসগুলি আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে। নীলের কারবারের ক্ষতি এজেন্সি হাউসগুলির ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল। এজেন্সি হাউসগুলির ভাঙনের প্রভাব মারাত্মকভাবে ব্যাঙ্কগুলির ওপর পড়লো। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে পামার কোম্পানি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গেই উক্ত কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক ভেঙে পড়ে। ম্যাকিনটস কোম্পানির পতন ও কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের পতন প্রায় একই সঙ্গে হয়েছিল। এমনিতেই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় দেশী বণিকদের ভূমিকা ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ক্রমক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ছিল। ব্যাঙ্কগুলি থেকে যারা ঋণ পায় তাদের মধ্যে ভারতীয় নাম বিরল হয়ে দাঁড়ায়। ত্রিশের দশকে এজেন্সি হাউসগুলির ব্যবসার মন্দাতে বাংলার বণিকরাও অনেক খেসারৎ দেয় এবং তারা ইংরেজ চালিত ব্যবসা থেকে সরে যেতে থাকে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বাইরে, টাকার বাজারেও দেশি পুঁজির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল। এর জন্য দায়ী ছিল ইংরেজ পুঁজির স্বার্থের খাতিরে কোম্পানি সরকারের হস্তক্ষেপ। বহুবার কোম্পানি রাজস্ব থেকে কম সুদে ইংরেজ বণিকদের ঋণ দেয় এমন এক সময়ে যখন পুঁজির বাজারে টানাটানির দরুন ভারতীয় বণিকরা উঁচু হারে সুদ আদায় করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু কোম্পানির হস্তক্ষেপের ফলে তা সম্ভব হয়নি। পূর্বভারতে এভাবে বিদেশী পুঁজির আধিপত্যের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল বলে অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন।

৩.৪.১ কোম্পানির বিনিয়োগ ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ভূমিকা

১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ এই সময়ের মধ্যে ব্রিটেন শোষণ চালিয়েছিল দুটি উপায়ে—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দ্বারা এবং এই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ইওরোপীয় বণিক দলের সক্রিয় সহায়তা দ্বারা কোম্পানির চীন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সহায়তা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত তাদের বেতন, যেহেতু তা যথেষ্ট কম ছিল, ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে পরিপূরণ করার প্রচেষ্টা করত। আগে বলা হয়েছে যে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে পাওয়া ফরমানের জোরে ইংরেজ কোম্পানি বাণিজ্যে পণ্যের ওপর শুল্ক ছাড় পেয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারীদের পুরো শুল্ক দিতে হবে একথাও বলা শর্ত লঙ্ঘন করে বিনাশুল্কে তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য চালাতে থাকে।

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে বাংলা সবচেয়ে গরুত্বপূর্ণ প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ানি লাভ ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাংলার বাজারের ওপর এই একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে কোম্পানি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণও কাজে লাগিয়েছিল ফলে বাংলার উৎপাদকগণ নিজেদের ইচ্ছানুসারে তাদের পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারতে বুলিয়ন আমদানি করে ইংরেজ কোম্পানি তার বাণিজ্য চালাত। বছরে এই বুলিয়ন আমদানির পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ পাউন্ড। দেওয়ানি লাভের পরে রপ্তানিযোগ্য ভারতীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে আর বুলিয়ন আমদানি করতে হয়নি। কোম্পানি বাংলার রাজস্ব দিয়েই তার বার্ষিক বিনিয়োগ করতে শুরু করেছিল।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কোম্পানির কর্মচারীরা এই আয় দেশে পাঠানো নিয়ে সমস্যায় পড়ে। প্রচলিত প্রথা ছিল এইরকম যে, ইংরেজ বণিকরা তাদের অর্জিত মুনাফা ভারতে ইংরেজ কোম্পানির তহবিলে জমা রাখবে; পরিবর্তে তারা পেত বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ। দেশে ফিরে তারা কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্-এর কাছ থেকে এই বিল মারফৎ সে টাকা ভাঙিয়ে নিতে পারত। কিন্তু এইভাবে পাঠানো টাকার বিনিময় হার কোম্পানির ইংরেজ বণিকদের কাছে আদৌ লাভজনক ছিল না। এইজন্য তারা ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় কোম্পানির মাধ্যমে এই টাকা পাঠাতে শুরু করে। ফল হল এই যে, এই কোম্পানিগুলিও ইংরেজ বণিকদের টাকার ওপর নির্ভর করতে শুরু করল এবং ইংরেজ বণিকদের গচ্ছিত টাকা বিদেশি কোম্পানিগুলি ভারতে তাদের পণ্য ক্রয় করার জন্য বাণিজ্যিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। আগেও বলা হয়েছে যে এর ফলে বিদেশি কোম্পানিগুলি ইউরোপ থেকে সোনা বা রূপা অর্থাৎ বুলিয়ন আমদানি বন্ধ করে দিতে লাগল।

আগের বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকরা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের অপর একটি আইনের দ্বারা বেসরকারি ইংরেজ বণিকদের ভারতীয় জাহাজে পণ্য রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়। এর ফলে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটে। বাংলাদেশ থেকে ইংরেজ বণিকগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে মূলত নীল, কাঁচা রেশম ও সূতি বস্ত্রর থান, কাঁচা তুলো, চিনি, শস্য ও সোরা ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করত। এইসময় সূতি ও রেশম বস্ত্রের রপ্তানি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১৮১২ নাগাদ নীল, কাঁচা তুলো এবং আফিমের রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে লাগল।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭০-এর দশকে চীনের ক্যান্টন বন্দর থেকে বছরে ৬ মিলিয়ন পাউন্ড চা কিনত। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৭৭০-এর দশক পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চীন থেকে চা কিনত মূলত ইংল্যান্ডের রূপো দিয়ে। কিন্তু ১৭৯০-এর দশকে ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক বাংলার বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেখা গেল যে ইংরেজ কোম্পানি চীনে সমগ্র রপ্তানির মাত্র ৮.৭ শতাংশ ছিল ইংল্যান্ডের

রূপো, ৩৭.২ শতাংশ ছিল ব্রিটিশ পণ্য এবং ৫৪.১ শতাংশ ছিল ভারতীয় পণ্য। ১৮৩০-এর গোড়ার দিকে ইংরেজ কোম্পানি চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত প্রায় ভারতীয় পণ্যের মাধ্যমেই। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার শেষ হয়ে গেলে বেসরকারি ব্যক্তিগত বণিকদের মুনাফার অংশ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। ব্রিটেনের বদলে চীনে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি করে তারা আরও লাভবান হচ্ছিল। ফলে কোম্পানি এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকরা উভয়েই চীনে প্রচুর আফিম রপ্তানি করে মুনাফা অর্জন করতে লাগল। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত থেকে চীনে প্রতি বছর গড়ে ১২,২৬১ চেস্ট আফিম রপ্তানি হত। ১৮৩১-১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারত থেকে চীনে আফিম রপ্তানির বার্ষিক গড় পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৪৩,৫৪৮ চেস্ট। চীনের সঙ্গে এই আফিমের ফলাও ব্যবসা দুদিক থেকে ইংরেজদের লাভের কারণ হচ্ছিল। একদিকে, আফিম বাণিজ্য থেকে কোম্পানি পেত প্রচুর রাজস্ব, অপরদিকে আফিম ব্যবসায় আহৃত বিপুল মুনাফার একটা অংশ ইংরেজ বণিকরা নিজের দেশে পাঠাত।

১৭৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বণিকদের ভারত থেকে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য ছিল ২০.৫ মিলিয়ন টাকা। ১৮১১-১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩৪ মিলিয়ন টাকা। এই সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড কাঁচা তুলো, নীল, চিনিশস্য প্রভৃতি ভারতীয় পণ্য রপ্তানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল। এক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, ইংরেজ কোম্পানির ভারতে বিনিয়োগ অষ্টাদশ শতকের শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে স্পষ্টতই ছিল ব্রিটিশ অর্থনীতির স্বার্থে ও প্রয়োজনে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হলেও ব্যক্তিগত বাণিজ্যে যুক্ত ইংরেজ বেসরকারি বণিকরাও ইংল্যান্ডের লাভের জন্যই ভারতে তাদের বাণিজ্য নীতি পরিচালনা করেছিল।

৩.৫ একচেটিয়া কারবারের প্রভাব : ভারতীয় বাজার ও উৎপাদক

কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকারের ফল ভারতীয় বণিক এবং উৎপাদনকারীদের ওপর হয়েছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর ও বিধ্বংসী। ভারতীয় বণিকদের কাছ থেকে ভারতীয় বণিকদের সরাসরি পণ্য ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। নানারকম অর্থনৈতিক এবং অর্থনীতি বহির্ভুত নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ইংরেজ বণিকরা সরাসরি উৎপাদকদের কাছ থেকে কম মূল্য দিয়ে পণ্য ক্রয় করার ব্যবস্থা করে। স্বাধীন ভারতীয় উৎপাদকদের উৎপাদনকেও নিরুদ্যম করা হয় কখনো সরাসরি নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে, আবার কখনো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে কাজে লাগিয়ে। কোম্পানির এই ভূমিকা কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট ছিল।

কোম্পানির বাণিজ্য নীতিতে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারতীয় রেশমশিল্প। ভারতের রেশম বণিকেরা ১৭৪৯-৫৩'র মধ্যে কাশিমবাজার থেকে ১৯,৫০৩ মণ কাঁচা রেশম ক্রয় করেছিল। ১৭৬৪-৬৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,৮৫৮ মণ। উল্লিখিত সময়ের মধ্যেই রেশম থান কেনার পরিমাণও ১,০৫,৬৫১ থেকে কমে ৭১,৪৯৫ মণ দাঁড়ায়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের পর মুর্শিদাবাদ থেকে সুরাটে রেশম যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। রেশম বাণিজ্যের সবচেয়ে খারাপ দিক ছিল কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোম্পানির হস্তক্ষেপ। এই

হস্তক্ষেপের ফলে দাদ্‌নি বণিকরা ও বেনিয়ানরা কোম্পানির কর্মচারীদের গোমস্তা বা এজেন্ট হিসেবে বাণিজ্যে অংশ নেবার সুযোগ হারিয়েছিল। ১৭৮৮-৮৯ সাল নাগাদ এজেন্সি ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে কোম্পানির বস্ত্র আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে দালালরাও গুরুত্ব হারাল। এজেন্সি হাউসগুলির প্রতিষ্ঠা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য থেকেও ভারতীয় বণিকদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে। কিছু ভারতীয় বণিক ইংরেজ বাণিজ্যকুঠিগুলিকে ঋণদান করতে থাকে কিন্তু ঋণদানের শর্ত সম্পূর্ণ ইওরোপীয় বণিকদের পক্ষে যাওয়ার ফলে তারা পুঁজি জমিদারি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ইত্যাদিতে খাটাতে শুরু করল। কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের দ্বারা ভারতীয় উৎপাদকরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

লবণ এবং আফিম তৈরির ক্ষেত্রেও একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোম্পানির প্রকৃত নজর ছিল রাজস্বের দিকে, বাণিজ্যের দিকে নয়। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে হাউস অফ্ কমন্স-এর তৈরি একটি কমিটির সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে হল্ট ম্যাকেঞ্জি একথা বলেন। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে কোম্পানি লবণ তৈরি করার দায়িত্ব নিজের হাতে নেয় এবং বাংলার বিভিন্ন লবণ উৎপাদনকারী অঞ্চলে যেমন মেদিনীপুরের হিজলীতে, নোয়াখালির ভুলুয়াতে, চট্টগ্রাম এবং যশোরে ইউরোপীয় এজেন্ট নিযুক্ত করে। লবণের দাম ধার্য করে দেয় কোম্পানির গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল। ১৭৮৬-৮৭ সালে কর্নওয়ালিস এই ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করে বছরের কতকগুলি সময়ে জনসাধারণের মধ্যে নীলামের মধ্যে লবণ সরবরাহের নিয়ম চালু করেন। এই ব্যবস্থায় প্রথমে লবণ প্রস্তুতকারী মোলুঙ্গীদের কাছ থেকে লবণ সংগ্রহ করা হত ও এই লবণ বিভিন্ন লবণ উৎপাদনকারী জেলাগুলির সরকারি গুদামে রাখা হত। এই সংগৃহীত লবণ এরপর সালকিয়ার বড় গুদামে রাখা হত এবং সেখান থেকে বছরে চারবার নীলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হত। এর আগে মোলুঙ্গীরা, যেহেতু তাদের খুব কম পারিশ্রমিকে কাজ করতে হত, তাদের উৎপাদনের একটা অংশ গোপনে দেশীয় বণিকদের বিক্রয় করত। কোম্পানি নানা আইনের মাধ্যমে তাদের এই গোপন ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। ফলে মোলুঙ্গীরা অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থায় পড়ে ও কোম্পানির ঋণের জালে সারাজীবনের মত বাঁধা পড়েছিল।

কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার আফিম চাষীদেরও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল। এজেন্সি ব্যবস্থায় আফিমের ক্ষেত্রে কোম্পানির এজেন্টরা দাদন হিসেবে রায়তদের অগ্রিম টাকা দিত এবং তাদের কাছ থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করত। এই কাঁচা আফিম কোম্পানির কারখানাগুলিতে তৈরি করা হত বিক্রয়যোগ্য পণ্যে। রায়তদের দাদন দেওয়া হত তাদের জমির পরিমাপ অনুযায়ী। রায়তরা কোম্পানির এজেন্টদের কাছ থেকে আফিমের মূল্য পেত খুবই কম হারে এবং অনেকসময়ই আফিমের গুণগত মান নিকৃষ্ট এই অছিলায় রায়তদের তাদের প্রাপ্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করা হত। শুধু তাই-ই নয়, আফিম কারখানার নিম্নতম কর্মচারীরা দরিদ্র রায়তদের ওপর উৎপীড়ন চালাত, বলপূর্বক সেলামী আদায় করত ও ওজনের সময় ঠকাত।

সুতি ও রেশম তাঁতিদের ক্ষেত্রেও কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য ক্ষতিকর হয়ে উঠছিল। এক্ষেত্রেও তাঁতিরা অগ্রিম নিয়ে কাজ করত ফলে তারা ক্রমশই কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল। তাদের

উৎপাদিত বস্ত্র সংগ্রহ করার আগেই পরিমাণ ও মূল্য ধার্য করে দেওয়া হত। অপরদিকে কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে তাঁতিরা কেবল কোম্পানির কাছেই তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য ছিল। কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার এভাবে দেশীয় বণিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করে ও মোলুঙ্গী, রায়ত এবং তাঁতিদের জীবনে বিধ্বংসী প্রভাব ফেলে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে উইলিয়াম বোল্টস্ লিখেছিলেন, দেশের গরিব উৎপাদক ও কারিগরদের ওপর অকল্পনীয় উৎপীড়ন ও কঠোরতা চালানো হচ্ছে এবং কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের ফলে তারা দাসের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ছে।

৩.৬ পরিবর্তনশীল বাণিজ্যের ধারা

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য আধিপত্যের অবসান ঘটল। একচেটিয়া কারবারের অবসানের ফলে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে রপ্তানিকৃত ব্রিটিশ পণ্যের মূল্য ছিল ১৮ লক্ষ পাউন্ড। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতে রপ্তানিকৃত ব্রিটিশ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৪৫ লক্ষ পাউন্ড। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলার আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই বৃদ্ধি পায়। ১৮১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১৭-১৮ পর্যন্ত বাংলা থেকে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি ৪০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ১৮২৮ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত ভারত থেকে ব্রিটেনে রপ্তানিকৃত ভারতীয় পণ্যের মূল্য ছিল ১১৮.২ মিলিয়ন টাকা; ব্রিটেন থেকে ভারতে এসেছিল ৪৮.৮ মিলিয়ন টাকা মূল্যের ব্রিটিশ পণ্য। আপাতদৃষ্টিতে তখনও বাণিজ্যিক ভারসাম্য ভারতের দিকেই ঝুঁকে ছিল একথা মনে হতে পারে। কিন্তু এই নতুন বাণিজ্যধারার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ভারত থেকে কাঁচামাল যেত ব্রিটেনে আর ব্রিটেন থেকে ভারতে আসত শিল্পজাত পণ্য। ১৮১৩ সালে কলকাতা থেকে ব্রিটেনে ২ মিলিয়ন স্টার্লিং মূল্যের সুতিবস্ত্র যায় কিন্তু ১৮৩০ সালে কলকাতা বন্দর ২ মিলিয়ন স্টার্লিং মূল্যের শিল্পজাত সুতিবস্ত্র আমদানি করেছিল। ১৭৯৯-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কলকাতা থেকে ব্রিটেনে ৩,০২৬,২৫৩টি সুতিবস্ত্রের থান রপ্তানি করা হয়েছিল। ১৮২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা কমে হয়েছিল ১,৯৫,৭২৫টি। ১৮১৪ সালে ভারত ৬,৮০,২৩৪ গজ সাদা ও ছাপার কালিকো কাপড় ব্রিটেন থেকে আমদানি করেছিল; ১৮২৮-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪,৮৪৩,১১০ গজ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্রিটিশ বাণিজ্য নীতির কুফল। ভারতে আমদানিকৃত ব্রিটিশ-শিল্পজাত পণ্যের ওপর সাধারণত কোনো শুল্ক ধার্য করা হত না, বা করা হলেও তার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম কিন্তু ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য ব্রিটেনে আমদানি করলে তার ওপর চড়া হারে আমদানি শুল্ক ধার্য করা হত। ফলে শুরু হয়েছিল এক অসম প্রতিযোগিতা। সরকারের এই নীতির মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়লো ভারতীয় শিল্পগুলির ওপর। ভারতে প্রথম পর্যায়ের অবশিল্পায়ন শুরু হয়েছিল।

৩.৭ অবশিল্পায়ন

সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপর্যয়কে ঐতিহাসিকরা অবশিল্পায়ন বলে অভিহিত করেছেন। অবশিল্পায়ন বলতে বোঝায় শিল্পায়নের বিপরীত, শিল্পের অধোগতি। শিল্পায়নের লক্ষণ হল কৃষিকার্য

থেকে উৎপন্ন জাতীয় আয়ের অংশের তুলনায় অনুপাতে শিল্পকর্ম থেকে উৎপন্ন অংশ বাড়ে, শিল্পকর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যা কৃষিকর্মে নিয়োজিত মানুষের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এর বিপরীত যখন ঘটে, অর্থাৎ যদি দেশের মানুষ শিল্পকর্ম ছেড়ে কৃষি দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে শুরু করেন, অর্থাৎ জাতীয় আয়ে কৃষিজ অংশ বাড়তে এবং শিল্পজ অংশ কমতে থাকে, তাকে অবশিল্পায়ন বলা যায়।

ঔপনিবেশিক ভারতে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ এই অবশিল্পায়নের ধারার ওপর জোর দিয়েছিলেন। রমেশ দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, সখারাম গণেশ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ অবশিল্পায়ন বলতে বুঝিয়েছেন দেশীয় শিল্পের অবক্ষয়—ভারতীয় শিল্পের অবক্ষয় ও কুটিরশিল্পের ধ্বংস। পরবর্তীকালে রজনীপাম দত্ত, গ্যাডগিল, সারদা, রাজু, নরেন্দ্রকৃষ্ম সিংহ ইত্যাদি ঐতিহাসিকগণ প্রায় একই কথা বলেছেন। অবশিল্পায়নের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন অমিয় বাগচী।

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদগণ তৎকালীন বিভিন্ন উপাদান থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আঠারো শতক অবধি ভারতীয় কুটিরশিল্পের অবস্থা যা ছিল তার ক্রমিক অবনতি দেখিয়েছেন উনিশ শতকের শুরু থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আমদানি-রপ্তানির হিসেবে দেখা যায় যে, কুটিরশিল্পজাত শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি একদিকে কমেছে, অপরদিকে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি বেড়েছে। বিশেষ করে সুতির কাপড়ের আমদানি বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। রমেশ দত্তের মতে, উনিশ শতকের গোড়ায় রপ্তানি কমার অর্থ দাঁড়াল এই যে দেশী শিল্প বিদেশী বাজার হারাল এবং আমদানি বাজার স্বদেশের বাজার থেকেও দেশী শিল্পপণ্য উৎখাত হল।

ঐতিহাসিকরা অবশিল্পায়নের ভিন্ন ভিন্ন কারণ উপস্থাপনা করেছেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তাকেও কারণ হিসেবে অনেক সময় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হরিরঞ্জন ঘোষাল এবং সারদা রাজু যথাক্রমে বাংলা এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সূতিবস্ত্র শিল্পের কেবল সাময়িক ক্ষতি করেছিল, স্থায়ী অবনতি ঘটায়নি। ডি. আর. গ্যাডগিলের মতে, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে বহু দেশীয় রাজা-মহারাজাগণ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। তাঁদের দরবারে যে সৌখিন বস্ত্রের চাহিদা ছিল এর ফলে তা হ্রাস পায়। অবশিল্পায়নেরও এও একটি কারণ। এছাড়াও ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রা উনিশ শতকে সাহেবদের অনুকরণে বিলিতি কাপড় ও আমদানিকৃত শহুরে বিলাসদ্রব্যের দিকে ঝোঁকেন। দেশের উঁচুদরের শহুরে শিল্পগুলি এর ফলস্বরূপ পূর্বতন বাজার হারায়। যদিও এগুলি ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের স্থায়ী অবনতির কারণ ছিল কিনা তা বিতর্কসাপেক্ষ কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, ভারত তার স্বকীয় শিল্পকর্ম হারিয়ে ইংল্যান্ডের শিল্পদ্রব্যের বাজারে পরিণত হল এবং কেবলমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে ইংল্যান্ডের কৃষিক্ষেত্র হয়ে টিকে রইল।

ভারতে এই অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সস্তায় শিল্পদ্রব্য ভারত থেকে কিনে ইউরোপে বিক্রি করার লোভে ক্রমাগত ভারতীয় কারিগরদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। মুক্ত বাণিজ্যের হোতা ইংল্যান্ডের প্রতিভূ হওয়া সত্ত্বেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে গায়ের জোরে একচেটিয়া ব্যবসার ফাঁদে বাংলার তাঁতিদের আটকেছিল। অত্যধিক শোষণের ফলে তাঁতি ও অন্যান্য উৎপাদকদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং একই সঙ্গে বাজার

থেকে দেশী পুঁজি পিছু হটে গেল। মাদ্রাজে, বাংলায়, বিহারে, অন্ধ্রপ্রদেশে, গুজরাটে সর্বত্রই শিল্পের দুরবস্থা দেখা দিল। এর ওপরে এসে পড়ল ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা। প্রকৃতপক্ষে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদের মাধ্যমে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লুপ্ত হবার পর এবং মুক্ত বাণিজ্যনীতি গৃহীত হওয়ার পরই ভারতে অবশিল্পায়ন ঘটতে শুরু করল। ভারতীয় কুটির শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানি হ্রাস করে কাঁচামাল ইংল্যান্ডে পাঠানো হতে লাগল এবং সস্তা ইংল্যান্ডের মিলের তৈরি কাপড় আমদানি বৃদ্ধি করে ভারতীয় বাজার ভরিয়ে ফেলা হল। বিলিতি কাপড়ের অনুপ্রবেশ সহজতর করার জন্য আমদানিকৃত মিলের কাপড়ের ওপর শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হল। ১৮১৫ সালে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত বস্ত্রের ওপর মাত্র ২১/২% আমদানি শুল্ক ধার্য করা হল অথচ ১৮১৩ সালে বাংলার মস্‌লিনের ওপর ৪৪% এবং ক্যালিকো ও ডিমিটি কাপড়ের ওপর ৮৫% আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল। ম্যানচেস্টারের মিলে তৈরি কাপড় যখন ভারতীয় বাজার ছেয়ে ফেলল তাঁতশিল্পে এক অভূতপূর্ব বিপর্যয় দেখা দিল। সস্তা মিলের কাপড় প্রভূত পরিমাণে আসার ফলে দেশী কাপড়ের চাহিদা কমল তো বটেই সেই সঙ্গে ইংল্যান্ডের কারখানাগুলির জন্য কাঁচামাল রপ্তানি করার ফলে ভারতীয় তাঁতি ও কারিগরেরা কাঁচামালের সমস্যায় পড়লো। উপরন্তু ইংল্যান্ড ভারতীয় শিল্পপণ্যের ওপর চড়া হারে আমদানি শুল্ক ধার্য করার ফলে ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য কেবল ইংল্যান্ডই নয় বিশ্বের অন্যান্য স্থানের বাজারও হারালো। ঊনবিংশ শতকে ভারতে কুটিরশিল্পের অবলুপ্তির বা অবশিল্পায়নের প্রধান কারণ ছিল ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের অবাধ বাণিজ্যনীতি ভারতীয় শিল্পের জন্য এক অমঙ্গলজনক ইঙ্গিত নিয়ে এসেছিল।

৩.৭.১ অবশিল্পায়ন ও সুতিবস্ত্র শিল্প

ঐতিহাসিক রমেশ দত্ত সুতিবস্ত্র শিল্পের অবলুপ্তিকে ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃখজনক অধ্যায় বলে বর্ণনা করেছেন। অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় বস্ত্রশিল্পের সঙ্কটকেই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যেতে পারে। অসংখ্য তাঁতি, সুতো-কাটুনি, রঞ্জক, ধোলাইকর, ধুনুরী, সূচিশিল্পী এবং সুতি ও রেশমশিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। কাজের অভাবে কোম্পানি নিজেই সূতিবস্ত্র ও রেশমবস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি তুলে দিতে থাকে। ১৮১৮ থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কুঠি ও শিল্পকেন্দ্রগুলি একের পর এক বন্ধ হয়ে যায়। ১৮১৮ সালে ঢাকার কুঠি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮১৯-এ উঠে যায় শান্তিপুর ও পাটনার কুঠি। উঠে যাওয়া কুঠিগুলিতে কর্মরত কারিগর এবং তাঁতিরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র বাংলাতেই ১০ লক্ষ লোক জীবিকা হারিয়েছিল বলে জানা যায়। সমসাময়িক সরকারি দলিলপত্র থেকে পশ্চিম ভারতের সুরাট, আমেদাবাদ, ব্রোচ, পুনা, শোলাপুর ইত্যাদি স্থানের এবং দক্ষিণ ভারতের কোয়েম্বাটুর, বেলারি, তিনেভেল্লি, মাদুরা ইত্যাদি কেন্দ্রের তাঁতশিল্পীদের চরম দুর্দশার কথা জানা যায়। এইসব পেশাচ্যুত শিল্পী ও কারিগরদের বিকল্প কর্মসংস্থানের তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছিল—অধিকাংশ কৃষিকাজে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করল। কৃষির ওপর চাপ বৃদ্ধি পেল। জনসংখ্যার প্রায় ৮০% থেকে ৮৬% হয়ে পড়ল কৃষির ওপর নির্ভরশীল, ফলে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হল। কারিগরদের মধ্যে অনেকেই ক্ষেতমজুর বা কুলির কাজ করতে বাধ্য হল। দক্ষিণ ভারতের বহু তাঁতি কর্মসংস্থানের খোঁজে স্বদেশ ত্যাগ করে সিংহল, বর্মা, মরিশাসে চলে গেল। এই কারিগর ও তাঁতিদের দুরবস্থা সামগ্রিকভাবে চিত্রিত করা সম্ভব

হয়নি। একদিকে তাদের পুরোনো পেশার দ্বারা জীবিকা অর্জনের সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল অথচ বিকল্প কর্মসংস্থানকারী কলকারখানাও গড়ে উঠল না, ফলে হস্তশিল্পের ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা এক চরম দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হল।

জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদদের ও পরবর্তী ঐতিহাসিকদের লেখায় অবশিল্পায়নের যে চিত্র পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধে ষাটের দশকে কিছু ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলতে থাকেন। বিতর্ক সৃষ্টি হয় যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাবে ভারতে অবশিল্পায়ন আদৌ ঘটেছিল কিনা। মার্কিন ঐতিহাসিক মরিস ডি. মরিস মনে করেছেন অবশিল্পায়ন আদৌ কখনো ঘটেনি, উনিশ শতকেও নয়। মরিসের মতে, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকগণ শিল্পদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি মানেই অবশিল্পায়ন একথা ভেবে ভুল করেছেন। যদি জনসংখ্যা এবং জাতীয় আয় বাড়ে তবে দেশী শিল্প অক্ষুণ্ণ থেকেও আমদানি বাড়তে পারে। দ্বিতীয়ত, শিল্পদ্রব্যের আমদানির ফলে একটি বিশেষ ধরনের দেশী শিল্পের ক্ষতি হলেও অন্য শিল্পের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। উনিশ শতকের গোড়ায় সুতো আমদানিতে সুতো-কাটুনিরা ঘা খেল কিন্তু তাঁতিরা সস্তায় সুতো পেয়ে সস্তা কাপড় বানাতে পারল, বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারল। তৃতীয়ত, মরিসের মতে, অনেকগুলি প্রাচীন কুটিরশিল্প ম্যানচেস্টার, শেফিল্ড, বার্মিংহামের উৎপাদন আমদানি করা সত্ত্বেও বেঁচে থাকলো। এর কারণ কুটিরশিল্পের একটি নিজস্ব বাজার ছিল যেখানে বিদেশী প্রতিযোগিতা ছিল না যেমন পট্টবস্ত্র বা মোটা কাপড়। এসব ক্ষেত্রে কুটিরশিল্প টিকে গিয়েছিল। মরিসের বক্তব্যের মধ্যে কিছু ফাঁক থাকায় এই যুক্তিকে গ্রহণীয় বলে অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন না। তাঁর যুক্তির গোড়ায় গলদ হল এই যে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে জনসংখ্যা ও মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় বাড়ার ফলে উনিশ শতকে বাজারের আয়তন বাড়ে এবং তার ফলে আমদানি ও দেশী দুই ধরনের শিল্পদ্রব্যেরই জায়গা ছিল। অতএব, দেশী শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। মরিসের বক্তব্য গ্রহণীয় নয় কারণ উৎপাদিত মোটা তাঁতবস্ত্র আঘাত পায় ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে, রেল লাইন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে। একই ধরনের বক্তব্য উপরস্থিত করেছেন মারিকা ভিজিয়ানি এবং পিটার হারনেটি। মূলত তাদের বক্তব্য হল আদমসুমারির হিসাব এবং বাণিজ্য-সংক্রান্ত সরকারি তথ্য সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রামীণ তাঁতশিল্প প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে পেরেছিল বলেও তারা মনে করেন। এই বক্তব্যের অনুরূপ মত পাওয়া যায় তীর্থঙ্কর রায় ইত্যাদি ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের মধ্যে।

জাপানী ঐতিহাসিক তরু মাৎসুই তাঁর আলোচনায় তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন যে ঊনবিংশ শতকে তাঁতিদের সংখ্যা কমে যায় এবং তাদের অবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতিও প্রমাণ করা যায় না। মাৎসুই এবং ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যে পরিমাণ সুতো আমদানি করা হয়েছিল তার থেকে অনেক পরিমাণ বেশি তৈরি কাপড় এদেশে এসেছিল। অমিয় বাগচী ও তাঁর পরিসংখ্যানগত তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন ১৮০৯-১৩ সাল থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে গাঙ্গেয় বিহারে কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল কারিগরদের সংখ্য ১৮% থেকে ৮% নেমে এসেছিল। অতএব, উনিশ শতকের ভারত ইতিহাসে অবশিল্পায়ন কোনো অতিকথা নয়—একটি বাস্তব সত্য। ঔপনিবেশিক শাসন এই অবশিল্পায়ন ঘটিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে পশ্চাদবর্তী করে তুলেছিল। পরবর্তী পর্যায়ের ব্রিটিশ-বিরোধী বহু আন্দোলনকে বুঝতে গেলে হস্তশিল্পীদের দুদর্শাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে রাখতে হবে।

৩.৮ আর্থিক নিষ্ক্রমণ বা সম্পদ নির্গম (Economic Drain)

ঔপনিবেশিক শাসন কীভাবে ভারতীয় শিল্পকে ধ্বংস করেছিল পূর্ববর্তী বিভাগে আমরা তা আলোচনা করেছি। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ফল ছিল ভারতীয় সম্পদের বহির্গমন। ১৮৭০-এর দশক থেকে জাতীয়তাদী অভিযোগের প্রধান স্থায়ী বিষয় হয়ে উঠেছিল—সম্পদ নির্গম। সার্বিকভাবে আর্থিক নিষ্ক্রমণ বা economic drain বলতে বোঝায় একটি উপনিবিশের সম্পদ যখন ঔপনিবেশিক শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজের দেশে নিয়ে যায়, তার পরিবর্তে উপনিবেশকে কিছুই দেয় না এবং উপনিবেশি থেকে অর্জিত পুঁজি উপনিবেশের অনুৎপাদক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যা কখনোই সার্বিক আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক হয় না। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরাও যেমন ফ্রান্সিস, ওয়ারেন হেস্টিংস, জন লোর বিভিন্ন সময়ে এই সম্পদের নির্গমন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। জন লোর লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ যুগের অবসান হয়েছে; ভারতবর্ষের যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ছিল তা চালান করা হয়েছে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সমৃদ্ধির জন্য তার শক্তিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে।

দেশে সমালোচনার মুখে পড়লেও ইউরোপীয় ব্যবসাদাররা ভারতে সোনা নিয়ে আসতে বাধ্য হয় বাণিজ্যের খাতিরে। এর অন্যতম কারণ পশ্চিম ভারতীয় সূতি ও রেশম কাপড়ের বিস্তৃত ইউরোপীয় বাজার। ভারতে কিন্তু পশ্চিমী উৎপাদনের বাজার ছিল তুচ্ছ। কিন্তু ঘটনাক্রম নাটকীয় মোড় নিল পলাশীর যুদ্ধের ফলে। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানি তথা বেসরকারি ইংরেজ বণিকরা বাংলাদেশ থেকে বিপুল সম্পদ লুঠ করতে থাকে। শাসক বদলের রাজনীতির দ্বারা নজরানা ও পারিতোষিক হিসেবে ইংরেজরা বিপুল পরিমাণ সম্পদ হস্তগত করে। শুল্কহীন অন্তর্দেশীয় ব্যবসার মুনাফা ও দেওয়ানি রাজস্বের উদ্বৃত্তও এর সঙ্গো যুক্ত হয়েছিল। পলাশীর পরবর্তী যুগকে ইংরেজ ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পীয়ারই খোলাখুলি ও নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ বলে অভিহিত করেছেন।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন বাংলা থেকে আর্থিক নির্গমন মূলত দুটি ধারায় হতে থাকে। প্রথমত, ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বেসরকারি বণিকদের বাণিজ্যের মাধ্যমে; দ্বিতীয়ত, কোম্পানি অনুসৃত সরকারি আর্থিক বাণিজ্যিক নীতির মাধ্যমে।

কোম্পানির কর্মচারী ও বেসরকারি বণিকদের লোভ বাংলার অর্থনীতির ওপর চরম আঘাত হেনেছিল। পলাশীর পরবর্তীকালে বাংলার রাজনীতিতে নবাব বদলের ব্যবসা করে ইংরেজ কর্মচারীরাও প্রচুর লাভ করে। অবৈধভাবে সম্পদ লাভ করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন লর্ড ক্লাইভ। ক্লাইভকে অনুসরণ করে ইংরেজ কর্মচারীরা ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছিল। এছাড়াও কত অর্থ লিখিত প্রমাণ ছাড়াও ইংরেজরা হস্তগত করে তার কোনো হিসেব পাওয়া যায় না।

দেওয়ানি লাভের পর রাজস্বের উদ্বৃত্তও ইংরেজ কোম্পানির হাতে আসে। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নর-জেনারেল ছিলেন তিনি অবৈধভাবে বিপুল উপার্জনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন এবং তার প্রিয়পাত্রদের সঙ্গো বে-আইনি চুক্তি করে তাদেরও এর ভাগ দিয়েছিলেন। কোম্পানির এজেন্টরা উৎপাদকদের কাছ থেকে

পণ্য ক্রয় করার জন্য দামের একাংশ সেলামী হিসেবে নিয়ে তাদের লাভ বৃদ্ধি করত। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ কিন্তু প্রকৃত ভারতীয় উন্নয়নকে কোনভাবেই সাহায্য করেনি। রমেশ দত্ত তাঁর গ্রন্থ 'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৭৯২-৯৩ থেকে ১৮৩৭-৩৮ পর্যন্ত কোম্পানির দ্বারা সংগৃহীত রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের একটি তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকা দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন কী পরিমাণ উদ্বৃত্ত আয় কোম্পানির শেয়ারের অধিকারীদের লভ্যাংশ হিসেবে দিতে ব্যয় হত। তা সত্ত্বেও ভারতীয় ঋণের অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছিল যার ফল ভুগতে হয়েছিল ভারতীয়দেরই। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে মন্টগোমারি মার্টিন লিখেছিলেন যে, অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ থেকে প্রতি বছর প্রায় দুই থেকে তিন মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যা দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক ব্যয়, ঋণের জন্য দেয় সুদ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় মেটানো হচ্ছে যে সম্পদ কোনোভাবেই ভারতবর্ষে ফেরৎ আসছে না।

কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা নানাভাবে বিপুল সম্পদ আহরণ করেছিল তার সবটাই তারা নিজেদের দেশে চালান দিত বিভিন্ন উপায়ে। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাদের রোজগারের একটা বড় অংশ দেশে পাঠাত মূল্যবান পাথরের মাধ্যমে। এইভাবে অসংখ্য মূল্যবান রত্নসামগ্রী ভারতের বাইরে চলে গেল। বেসরকারি ইংরেজ বণিকরা তাদের অর্জিত মুনাফা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তহবিলে জমা রাখত, তারপর তারা ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরসের কাছে বিল-অফ্-এক্স চেঞ্জের দ্বারা তা ভাঙিয়ে নিত। এই পদ্ধতিতে তারা সন্তুষ্ট ছিল না কারণ এর বিনিময় হার তাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল না। আগেই বলা হয়েছে যে, বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে তারা ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি অন্য ইউরোপীয় কোম্পানির মধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতে লাগল এবং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিও ভারতীয় পণ্য ক্রয় করার জন্য এই টাকাই পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। পরিস্থিতি দাঁড়াল এই যে, বাংলা থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ দ্বারাই বাংলা তথা ভারতের পণ্য ক্রয় করা হতে লাগল ফলে ভারতীয় অর্থনীতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। পরবর্তীকালে বেসরকারি বণিকরা যখন এজেন্সি হাউসগুলির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতে লাগল অবস্থার কোনো পরিবর্তনের কোনো সুযোগ রইল না। এইভাবে চলতে থাকল বাংলার আর্থিক নিষ্ক্রমণ।

ইংরেজ কোম্পানির সরকারি নীতিও এই নির্গমনকে বাড়িয়ে তুলছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দ্রুতহারে বাংলার সম্পদ বাইরে চলে যেতে থাকে। এটি ছিল সম্পদ নির্গমের এক নির্লজ্জ রকমের সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া। ভারতীয় পণ্য কেনার জন্য কোম্পানি যে ব্যয় করত তাকেই বলা হত বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের মাধ্যমেই সম্পদ নির্গমকে আরও সহজ করে তোলা হয়েছিল। ১৭৫৭ সালের আগে পর্যন্ত কোম্পানি ভারতীয় পণ্য ক্রয় করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে প্রচুর পরিমাণ সোনা, রূপা বা বুলিয়ন আমদানি করত। ১৭৫৭ থেকে কোম্পানির এই নীতি পরিবর্তিত হয় কারণ এই পলাশীর পরে যে সম্পদ ইংরেজরা হস্তগত করেছিল তা কাজে লাগানো হল বাংলা থেকে রপ্তানি মাল কেনার জন্য। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর থেকে পরিস্থিতি একেবারেই পাল্টে যায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলায় বুলিয়ন বা সোনা, রূপো আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। ১৭৬৫-৬৬ থেকে ছয় বছরে ইংরেজ কোম্পানি আদায়ীকৃত নিট রাজস্বের ৩০.৮ শতাংশ রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য বিনিয়োগ খাতে ব্যয় করেছিল।

ম্যানচেস্টারের প্রতিযোগিতার সামনে ভারতীয় সূতিবস্ত্র ও রেশমজাত দ্রব্যের রপ্তানি কমে যায় ফলে কোম্পানি তার কর্মচারী ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকদের সবার সামনেই টাকা পাঠানোর সমস্যা দেখা দিয়েছিল। নীলের চাষ ও চা কেনার জন্য চীনে আফিম রপ্তানি করে প্রথমে এই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হয়। চীনের চা ও রেশম দ্রব্য ইংরেজ কোম্পানি বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ সোনা ও রূপো চীনে পাঠাতে শুরু করল। এছাড়াও প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ, অষ্টাদশ শতকের শেষে ও ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যয় মেটানোর জন্যও বাংলা থেকে আহৃত আয় ব্যবহৃত হতে লাগল। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে জেম্‌স গ্রান্ট তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন যে, সামগ্রিকভাবে বাংলার আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাণ ছিল ১৮,০০০,০০০ টাকা। ঐতিহাসিক হোল্ডেন বারবার দেখিয়েছেন যে, ইংরেজ কোম্পানি তার বিনিয়োগ এবং চীনে সোনা, রূপো রপ্তানির মাধ্যমে ১৭৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা থেকে বছরে ১.৭৮ মিলিয়ন পাউন্ড সম্পদের নির্গমন হয়েছিল। ইরফান হবিব বলেছেন, ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ থেকে ৪.২ মিলিয়ন পাউন্ড আর্থিক নিষ্ক্রমণ হয়েছিল এবং তা ছিল ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের ২ শতাংশেরই বেশি ও তদানীন্তন ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের প্রায় ৩০ শতাংশ। ১৮৫০-এর দশকের পর শুরু হয়েছিল অন্য এক পর্যায় যখন ভারত থেকে নতুন ধরনের রপ্তানির—যেমন পশ্চিম ভারতের তুলো, পাঞ্জাবের গম, বাংলার পাট, আসামের চা, দক্ষিণ ভারতের তৈলবীজ ইত্যদির দ্রুত বিস্তার ঘটে এ কাজ আরও সফলভাবে করা হল। ভারত থেকে ব্রিটেনে তহবিল হস্তান্তরের সমস্যা থেকেই যায়, প্রয়োজনও থেকে যায় এবং তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়ে লভ্যাংশ মেটানোর দায়ের বদলে ১৮৫৮'র পর থেকে শুরু হয় ভারত সচিবের ভারত দফতরের খরচ। স্বরাষ্ট্র ব্যয় ও ব্যক্তিগত সূত্রে পাঠানো টাকা, দুই-ই চালান করা হতে থাকে ভারতীয় রপ্তানির মাধ্যমে। ভারতের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি উদ্বৃত্তের ভিতর দিয়ে তাই প্রতিফলিত হল সম্পদ নির্গমের প্রক্রিয়াটিই। অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে শোষণের পদ্ধতি ও ব্রিটিশ ভারতীয় লগ্নি পুঁজিবাদের গড়ন—এই দুইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যবসাগত নির্গম।

৩.৯ সারাংশ

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ওপর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। রাজনৈতিক ও অর্থনীতি বহির্ভুত নানা কৌশল অবলম্বন করে কোম্পানি ভারতীয় উৎপাদকদের থেকে সস্তায় শিল্পজাত দ্রব্যক্রয় করে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করার লক্ষ্যে তাদের বিনিয়োগ নীতি পরিচালিত করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এ সময়ে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ইওরোপের বাজারে যেত। এই দ্রব্য ক্রয় করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে আসত বুলিয়ন অর্থাৎ সোনা বা রূপো। কিন্তু কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যে অধিকার একদিকে উৎপাদকদের ওপর চাপ ও অত্যাচারের সৃষ্টি করতে লাগল, অপরদিকে ভারতীয় পুঁজিকে নিরুদ্যম করছিল ফলে ভারতীয় পুঁজি শিল্পক্ষেত্র থেকে ক্রমে সরে যেতে বাধ্য হল। বাণিজ্যের এই ধারা ক্রমশ পরিবর্তিতত হচ্ছিল ইংল্যান্ডের স্বার্থে। ১৭৫৭'র পলাশির যুদ্ধে জয় এবং ১৭৬৫-তে দেওয়ানি লাভ কোম্পানিকে আরও

সুবিধাজনক অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কোম্পানি উদ্বৃত্ত রাজস্ব দ্বারা ভারতীয় পণ্য ক্রয় করতে লাগল এবং কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্যের দ্বারা আহৃত অর্থ দেশে নানাভাবে পাঠিয়ে দিতে লাগল। ভারতীয় অর্থে ভারতীয় পণ্য ক্রয়ের ফলে সোনা এবং রূপোর আমদানি কমে আসতে লাগল। ভারতীয় আফিম উৎপাদন বাড়িয়ে, তা চীনে পাঠিয়ে এই প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করা হয়েছিল। শুরু হয়েছিল ভারত থেকে সম্পদ নির্গমের প্রথম পর্যায়।

ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য ক্রমে বিদেশের বাজার হারাতে লাগল ও ইংল্যান্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে প্রবেশ করে দেশী বাজার দখল করে নিতে লাগল; পরিবর্তে ভারতীয় রপ্তানি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল কাঁচামাল রপ্তানিতে—ইংল্যান্ডের কৃষিক্ষেত্র হিসাবে। ১৮১৩'র সনদে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লুপ্ত করে তুলল। ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস ও অবশিল্পায়নের প্রক্রিয়া দেশীয় অর্থনীতিকে পশ্চাদবর্তী করে তুলেছিল। একদিকে ভারতীয় সম্পদের বহির্গমন অপরদিকে দেশী শিল্পের ক্রমিক অবনতি ও ধ্বংস—এই দুই ধারায় ঔপনিবেশিক শোষণ ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে তুলেছিল।

৩.১০ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোম্পানির বাণিজ্য নীতি কী ছিল?

২। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার ভারতীয় বাজার ও উৎপাদকদের ওপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল?

৩। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের প্রত্যক্ষ ফল কী হয়েছিল?

৪। বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণ মূলত যে দুটি ধারায় হতে থাকে তার উল্লেখ করুন।

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

১। —— খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফরমান ইংরেজ কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দেয়।

২। এজেন্সি হাউসগুলি গড়ে ওঠার আগে —— ইংরেজদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালের কাজ করত।

৩। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের মাধ্যমে —— বাণিজ্যে লিপ্ত বণিকরা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল।

৪। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির —— বাণিজ্য আধিপত্যের অবসান ঘটল।

নিচের উক্তিগুলির কোন্‌টি ঠিক (✓) এবং কোন্‌টি ভুল (×) চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন :

১। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফরমান ইংরেজ কর্মচারীদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য অধিকার দিয়েছিল।

২। লবণ এবং আফিম তৈরির ক্ষেত্রেও একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোম্পানির প্রকৃত নজর ছিল বাণিজ্যের দিকে।

৩। সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপর্যয়কে ঐতিহাসিকরা অবশিল্পায়ন বলেছেন।

৪। ইংরেজ কোম্পানির সরকারি নীতি বাংলা থেকে আর্থিক নির্গমন বন্ধ করেছিল।

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। সরকার, সুমিত : আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭।

২। Sinha, N. K. : The Economic History of Bengal, vol-I and III.

৩। Ghosal, H. R. : Economic Transition in the Bengal Presidency.

৪। Dutt, Romesh : The Economic History of India vol-I.

৫। Chatterjee, Suranjan and Guha Roy Siddhartha : History of Modern India.

৬। ভট্টাচার্য, সব্যসাচী : ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, ১৮৫০-১৯৪৭।

৭। Tripathi, Amalesh : Trade and Finance in the Bengal Presidency, 1793-1833.

৮। Bagchi, A. K. : The Political Economy of Underdevelopment.

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ৪ ❑ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন; ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা, রাজস্ব নীতি, সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের কারণ; বাংলায় তিনটি রাজস্ব-সংক্রান্ত গৃহীত বন্দোবস্ত

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর

- ৪.২.১ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রামীণ সমাজ
- ৪.২.২ ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর
- ৪.২.৩ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সূচনা
- ৪.২.৪ কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যিকীকরণ
- ৪.২.৫ ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সমাজের ধ্বংসের সূচনা

৪.৩ বাংলার ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থা

- ৪.৩.১ প্রাচীন বাংলার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা
- ৪.৩.২ বাংলায় মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা
- ৪.৩.৩ মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা

৪.৪ বাংলায় ইংরেজদের রাজস্ব-সংক্রান্ত নীতি (১৭৫৭-১৭৭২)

৪.৫ ইংরেজদের সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের কারণ

৪.৬ বাংলায় ইংরেজদের রাজস্ব-সংক্রান্ত গৃহীত তিনটি পদক্ষেপ

- ৪.৬.১ নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা (১৭৭২-১৭৭৭)
- ৪.৬.২ একসালা বন্দোবস্ত বা জমিদারি ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন (১৭৭৭-১৭৮৬)

৪.৭ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

- ৪.৭.১ পটভূমি
- ৪.৭.২ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে গ্রান্ট, শোর ও কর্নওয়ালিসের মধ্যে বিতর্ক

৪.৮ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব

৪.৮.১ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব

৪.৮.২ জমিদার শ্রেণীর উপর প্রভাব

৪.৮.৩ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব

৪.৯ সারাংশ

৪.১০ অনুশীলনী

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনকালে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল তার পরিণতিতে এক নূতন ধরনের বিকাশ লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হলেও ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের আর্থিক প্রক্রিয়ায় নূতন স্রোত সঞ্চারিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে ইংরেজরা পুরাতন আর্থিক কাঠামোর বিলোপ ঘটিয়ে প্রচলন করে চলেছিল নূতন আর্থিক পদ্ধতির। পরিণতিতে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের (প্রায় হাজার বছরের পুরাতন) স্বয়ম্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়তে থাকে। গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণ যৌথ জীবনযাত্রার বিনাশ যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন ভারতবাসীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য ঐতিহাসিকভাবে তার প্রয়োজন ছিল (যদিও বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলেছে)। এই এককটি পাঠ করার পর আপনারা—

- ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতে গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর কেমন করে হল জানতে পারবেন।
- প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে বাংলায় ভূমি-ব্যবস্থার বিন্যাসের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- ইংরেজদের নূতন রাজস্বনীতি ও তার পিছনে সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- সর্বোপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিকীকরণ প্রক্রিয়ার উত্তরণ কালপর্ব (যা পাঁচ দশক পূর্বে শুরু হয়েছিল) কিভাবে সমাপ্ত হচ্ছে সেটি মূল্যায়ন করার পর—নানা তর্ক-বিতর্কের সমালোচনা করে নিজস্ব স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে সক্ষম হবেন।

৪.১ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্যের তাৎপর্য নিয়ে বিতর্ক আজও চলেছে। একটা আধুনিক জাতি ,যারা নিজের দেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল; একটি পুঁজিবাদী জাতি যারা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সামন্ততান্ত্রিক জনগোষ্ঠীর থেকে উন্নত হয়ে উঠেছিল; যে জাতির মধ্যে তখন জাতীয়তাবাদ প্রবল—সে জাতি ব্রিটিশ জাতি; যারা উপনিবেশ ভারতের

আর্থিক কাঠামোকে গড়তে চেয়েছিল নিজেদের প্রয়োজনভিত্তিক। ভারতে ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শাসনের প্রসারের ইতিহাসের পাল্টা চিত্র হল প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উত্তরণের ইতিহাস। ব্রিটিশ শাসকরা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়ে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদ সাধন করেছে, অন্যদিকে 'এশীয় উপাদানভিত্তিক' সমাজের অবসান ঘটিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুগত ভিত্তিকে স্থাপন করেছিল। এটি করার জন্য প্রয়োজন ছিল মুঘলদের থেকেও অনেক সংহত রাজনৈতিক ঐক্য। কৃষিব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা তাকেই ব্যবহার করে ইংরেজরা চেয়েছিল রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে। যেহেতু বাংলা-সুবায় রাজনৈতিক আধিপত্য রচনার মধ্য দিয়ে তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা, তাই এই এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ইদানিং উপনিবেশবাদ শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। ইতিহাস চর্চায় এই শব্দ এক ভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি করেছে। ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চায় আমরা কয়েকটি ঘরানা দেখতে পাই— (১) জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার জনক দাদাভাই নৌরজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা, ওগুলিকে আদি ঘরানাও বলা যায়। এঁদের লেখায় দেওয়ানী লাভের পর থেকে গ্রামবাংলার অর্থনীতিতে অবক্ষয় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের গৃহীত রাজস্ব নীতির ফলে গ্রামসমাজে উৎপাদন সম্পর্কের জটিলতা, কৃষককুলের দুর্দশা ইত্যাদির মূলে ঔপনিবেশিক শাসনকেই দায়ী করা হয়েছে। (২) থিওডর মরিসন, জর্জ চেসনি, রিচার্ড স্ট্রেচি প্রমুখের বক্তব্য হল—উপনিবেশগুলির অগ্রসর সম্ভবপর হয়েছে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসার ফলে, রেল, রাস্তা, বন্দর, বিদ্যুৎ ইত্যাদি নিচের পরিকাঠামো এবং উৎপাদন ব্যবস্থার (কৃষি ও শিল্পে) আধুনিকীকরণ না করলে এশিয়া ও আফ্রিকা অনগ্রসর থেকে যেত (৩) মানবেন্দ্র রায়, রজনীপাম দত্ত, ডি. ডি. কোশাম্বী প্রমুখের মার্ক্সীয় ভাবনায় প্রভাবিত অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চা নূতন মাত্রা এনেছে। (৪) গবেষকদের প্রধান বক্তব্য হল—ইংরেজদের গৃহীত উপনিবেশিক রাজস্বনীতি ও অর্থনীতির নূতনত্ব কিছু ছিল না। ঐতিহ্য-বিরোধী যা চালু করতে চেয়েছিল সেটি আসলে পুরানো ব্যবস্থারই অনুবৃত্তি মাত্র।

৪.২ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর

ভারতীয় উপমহাদেশে শক, হুণ, পাঠান, মুঘলরা ক্ষমতা দখলের লড়াই করতে এসে কখনোই গ্রামীণ সমাজের ভিতরে অধিকার প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত হয়নি। কৃষিপ্রধান গ্রামীণ ভারতবর্ষে দেশীয় রাজায় রাজায় যুদ্ধ ছিল গ্রামের উপর অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা, জমি দখলের লড়াই নয়। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাসে দেখা যায় ভূস্বামীরা উৎপাদনের অংশের উপর অধিকার লাভেরই লড়াই করেনি, বাধ্যতামূলক শ্রমের দ্বারা কৃষিতে নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে চেয়েছে। সুতরাং গ্রামসমাজে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবসথা বলতে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যে অর্থ দাঁড়ায় ভারতীয় গ্রামসমাজে তার চিহ্ন বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না. ইউরোপের মতো ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। রাজা বা মধ্যবর্তীরা গ্রামসমাজের হাত থেকে ভূমির নিয়ন্ত্রণের

অধিকার কেড়ে নেয়নি এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়নি। আসলে 'এশীয় উৎপাদনভিত্তিক সমাজের' একটি নির্দিষ্ট চরিত্র রয়েছে। একে কখনোই সম্পূর্ণ অর্থে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বলা যায় না। অবশ্য অনড় না হলেও ভারতীয় সমাজ ছিল 'বদ্ধ' সমাজ।

৪.২.১ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রামীণ সমাজ

প্রাপ্ত উপাদানসমূহ থেকে যেটুকু তথ্য আহরণ করা গেছে তার থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, ভারতীয় সামাজিক বিন্যাস প্রধানত ভূমি-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। ভূমি-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল গ্রামগুলির ছিল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রথমত, আত্মনির্ভরশীল বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের এক উল্লেখযোগ্য দিক। চাষবাসের পুরানো পদ্ধতি ও সহজ সরল যন্ত্রনির্ভর প্রয়োজনভিত্তিক হস্তশিল্পের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল আত্মনির্ভরশীল গ্রামগুলি। দ্বিতীয়ত, গ্রামে ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে বিশেষ সমর্থনযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায় না। গ্রামে অন্তর্গত জমির মালিকানা প্রকৃতপক্ষে ছিল গ্রামসভা বা পঞ্চায়েতের হাতে। সম্মিলিত পরিশ্রমদানের মধ্য দিয়ে চাষ-আবাদ সম্পন্ন হত। গোচারণ ভূমি, বনভূমির উপর অধিকার ছিল সবার; সেচ, জলসরবরাহ, কীটপতঙ্গ ও গবাদিপশুর হাত থেকে ফসল রক্ষা করা হত পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। গ্রামে বসবাসকারীরা যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিবিধ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিল। কোনো সম্রাট বা তাঁর প্রতিনিধিরা গ্রামসমাজের হাত থেকে ভূমি নিয়ন্ত্রণের অধিকার কেড়ে নেয়নি। এই গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন কাঠামো অক্ষুণ্ণ ছিল দীর্ঘকাল ধরে। (দেখুন, A. R. Desai—*Social Background of Indian Nationalism,* Bombay, 1876)।

তৃতীয়ত, গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল প্রয়োজনভিত্তিক। উৎপন্ন শস্যের অংশবিশেষ রাজস্ব হিসাবে প্রদানের পর বাকিটা অধিকাংশ স্থানীয় পর্যায়ে উপভোগ করত। হস্তশিল্প যা কিছু গড়ে উঠেছিল সেটিও ছিল প্রয়োজনকে ভিত্তি করে। গ্রামর ছুতোর, মুচি, কুমোর, ধোবা, তেলি প্রমুখেরা উৎপাদন করত গ্রামের প্রয়োজন মেটাতে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিনিময় ছাড়াও গ্রামভিত্তিক বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গ্রামের শ্রমবিভাজন ছিল অসম্পূর্ণ। কৃষকরা অবসর সময়ে যেমন সুতা কাটত, কারিগরেরাও প্রাপ্ত জমিতে চাষ করত। গ্রামের কারিগরি কলাকৌশল খুব একটা উন্নত মানের ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য গণ্ডগ্রামের হাটেই সীমাবদ্ধ ছিল। এককথায় আর্থিক প্রশ্নে গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। চতুর্থত, গ্রামগুলিতে এক ধরনের নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্বনির্ভর গ্রামে বসবাসকারী জনগণের মন ছিল সংকীর্ণতায় আবদ্ধ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে অসহায় অবস্থায় তাদের মন ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তার প্রতি আকৃষ্ট হত। সার্বজনীন, আর্থিক ও সামাজিক জীবন-চেতনা গড়ে ওঠেনি তখন। ঐক্যের ধারণা যেটুকু ছিল সেটি ছিল ধর্মীয় অর্থে। পঞ্চমত, গ্রামসমাজে জাত ব্যবস্থাভিত্তিক সংগঠন। গ্রামবাসীরা জাতপ্রথাকে দৈবাদিষ্ট বলে গণ্য করত। জাতব্যবস্থা সম্পর্কে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের মানসিকতা সে যুগের গ্রামবাসীর মনে প্রায় ছিলই না। এককথায় প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় গ্রামসমাজ আত্মনির্ভরশীল ও ব্যক্তিমালিকানাহীন হলেও উদার মানসিকতা, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সত্তার অভাব ছিল *(Social Background of Indian Nationalism,* p. 22)।

৪.২.২ ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় গ্রামসমাজের রূপান্তর ঘটার পিছনে রয়েছে মূলত অর্থনৈতিক কারণ। সে সময় সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে শাসকশ্রেণী নানা ধরনের ভূমি-ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে নায়েব-দেওয়ানকে সামনে রেখে রাজস্ব বৃদ্ধির যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিল ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে সে পর্বের অবসান ঘটে। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের অনুসারী স্বার্থের সঙ্গে ভারতের কৃষি উৎপাদনকে জুড়ে দেওয়া হয়। এককথায় ইংল্যান্ড তার উপনিবেশ ভারতকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির পৃথিবীব্যাপী যন্ত্রের একটি অংশে পরিণত করে। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ বহুবার বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠী দ্বারা বিজিত হয়েছে। কিন্তু সে রাজনৈতিক জয়ের ফলে রাজনীতিতে পরিবর্ত ঘটেছিল; গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর তার বিশেষ প্রভাব পড়েনি। গ্রামীণ সমাজের চরিত্র তাই অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু ব্রিটিশ আধিপত্যের তাৎপর্য ছিল ভিন্ন। ব্রিটিশ পুঁজিবাদের অগ্রগতি ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় এনেছিল ব্যাপক পরিবর্তন। পরবর্তী অধ্যায়ে সে পরিবর্তনগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২.৩ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সূচনা

ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভূমিব্যবস্থা ছিল তিন ধরনের—জমিদারী, রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী। (১) ব্যক্তিগত আনুকূল্যে চাষ-আবাদ হলে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাবে ও কৃষিবিপ্লব ঘটবে (যা ইতিপূর্বে ইংল্যান্ডে ঘটেছিল), (২) উদীয়মান জমিদাররা শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে ব্রিটিশ শাসকের হাতকে শক্ত করবে, (৩) দক্ষতার অভাব দেখা দিলে জমিদারী হাত বদল হবে (বিক্রি)—এই তিন চিন্তা মাথায় রেখে জমিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে নেওয়া হয় জমিদারী ব্যবস্থায় যা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সর্বপ্রথম গ্রামের অধিকারভিত্তিক প্রাচীন ভূমিব্যবস্থায় ভাঙন সৃষ্টি করে। নব প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব রক্ষার সামাজিক সমর্থন অর্জন করার প্রশ্নটি মাথায় রেখে জমিদারদের জমির কেনাবেচার অধিকার দান করে রাজনৈতিক স্বার্থও চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। অপর একটি ভূমিব্যবস্থা রায়তওয়ারী, যেটিতে কৃষক জমি কেনাবেচার অধিকার লাভ করে। ব্রিটিশ উপনিবেশের ৫১ শতাংশ জুড়ে ছিল এই ব্যবস্থা। রায়তওয়ারী ব্যবস্থা ও জমিদারী ব্যবস্থা উভয় রাজস্বনীতিই গ্রামভিত্তিক মালিকানার ভারতীয় প্রথাকে ভেঙে দেয়। এইভাবে জমি ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পত্তিতে পরিণত হয়, জমি হয়ে ওঠে কেনাবেচাযোগ্য পণ্য (সব্যসাচী ভট্টাচার্য—*ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি*, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৬-২০)।

৪.২.৪ কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যিকীকরণ

নূতন ভূমি-সম্পর্ক ও রাজস্ব প্রদানের প্রথা চালু হওয়ার সঙ্গে গ্রামীণ কৃষির আদিরূপ বদলে গেল। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে কৃষিদ্রব্য উৎপাদন কেবল প্রয়োজনভিত্তিক ছিল এবং গ্রামীণ বাণিজ্য কেবল হাটেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে অধ্যাপক এ আর. দেশাই যে মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক ইরফান হাবিব সে যুক্তিকে অবশ্য খণ্ডন করেছেন। গ্রামগুলি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিদ্রব্য যে শহরের বাজারে আসত—অধ্যাপক

হাবিবের গবেষণা সেটি প্রমাণ করেছে (Irfan Habib—*The Agrarian System of Mughal India.* Bombay. 1963) এই বিতর্ক থাকলেও 'আজকের দিনে যে গণেশ কৃষি-লক্ষ্মীকে চালনা করে'—তার সূচনা কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে। গ্রাম ছেড়ে ফসল শহরে বিক্রির সূচনা হল কয়েকটি কারণে—(ক) নগদে রাজস্ব প্রদানের তাড়নায় ফসল বিক্রি, (খ) ঔপনিবেশিক স্বার্থে রেল, বন্দর, রাস্তাঘাটের উন্নতির ফলে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শহরে মাল পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি, (গ) ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে নূতন নূতন ফসল উৎপন্ন করার চাহিদা, যা ড. বিনয়ভূষণ চৌধুরীর গবেষণায় ধরা পড়েছে। (B. B. Chowdhury—*Growth of Commercial Agriculture in Bengal, 1757-1900,* Calcutta, 1964) ক্রমশ কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন ও চাহিদা নির্ভরশীল হয়ে উঠতে থাকে আন্তর্জাতিক বাজারের উপর। তাই গ্রামের অর্থনীতি যুক্ত হল বিশ্ববাজারের সঙ্গে। আত্মনির্ভরশীল গ্রাম হয়ে উঠল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অনুসারী। কুটির-শিল্পের ধ্বংসের সূচনা হল, দেখা দিল 'অবশিল্পায়ন'। সমাজে সৃষ্টি হল নূতন শ্রেণী,—মহাজন, দালাল, ফড়ে, বেনিয়া পাইকার। জাতপাতভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। গ্রামসমাজে নূতন ধরনের শোষণের সূচনা হল।

৪.২.৫ ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সমাজের ধ্বংসের সূচনা

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পরিণতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্ল মার্ক্স লিখেছেন—'ভৌগোলিকভাবে দেখলে কয়েক শত বা হাজার একর আবাদী বা পতিত জমি নিয়ে একত্র কটি গ্রাম, রাজনৈতিকভাবে দেখলে পৌরগোষ্ঠীর মতো। রাজস্ব আদায় থেকে পুলিশের কাজ, শস্যপাহারায় সহযোগিতা থেকে ক্ষুদে বিচারপতি, শাসনকর্তা থেকে সীমানদার—এই সরল পৌর-শাসনের আওতায় দীর্ঘকাল ধরে ভারতবাসী বাস করে এসেছে।....এই ছোট ছোট সনাতন সামাজিক সংস্থাগুলো ঔপনিবেশিক শাসনের ধাক্কায় ভেঙে গেছে। তার কারণ রক্তচোষক করসংগ্রহকারী বা কোম্পানির বর্বর সৈন্যদের অত্যাচারে নয়, ইংরেজদের বাষ্প ও অবাধ বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়ার ফলেই (মার্ক্স ও এঙ্গেলস—প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা, সংগ্রাম, মস্কো, ১৯৭১, পৃ. ১৮-১৯) গ্রামসমাজ তার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য নিয়ে সবরকমের রাজনৈতিক ঝড়ের মুখে বেঁচে ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চাপে ও রাজনৈতিক শাসন ও বাণিজ্যিক প্রভাবে ভারতীয় গ্রামসমাজ পরাভূত হল। এই পরিবর্তনকে একদল স্বাগত জানিয়েছে, অপরদল বিরোধিতা জানিয়েছে। এ. আর. দেশাই প্রমুখ লেখকরা (এমনকি কার্ল মার্ক্সও) মনে করেন জাতীয়তাবাদের প্রসার, সংস্কৃতির গুণগত মান ও উন্নত সামাজিক জীবনকল্পে পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন। যারা এর বিরোধিতা করেছেন (গান্ধীজি থেকে রবীন্দ্রনাথ) তাদের মতে, গ্রামসমাজে পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির ভিত্তি ছিল হাতে-কাটা সুতা থেকে কাপড় বোনা ও নিজের হাতে চাষ; সমন্বয়ের কুটিরশিল্প যা আত্মনির্ভরশীলতার শক্তি—সেটি হারিয়ে গেল। মানবিক সম্পর্ক অবলুপ্ত হল। একটা আর্থিক নিরাপত্তা ছিল যা যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সময়ও সমাজকে রক্ষা করে চলেছিল—সেটিও হারিয়ে গেল।

ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক স্বার্থে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ক্রমে গ্রামসমাজের কাজকর্ম (বিশেষত প্রতিরক্ষা) নিজের হাতে তুলে নেওয়ায় স্বশাসিত গ্রামসমাজ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র শাসনের অঙ্গে পরিণত হতে থাকে, গ্রামের

অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। গ্রামের আর্থিক ও শাসনতান্ত্রিক সার্বভৌমত্ব লোপ পাওয়ায় যৌথ সহযোগিতার পরিবর্তে গ্রামজীবনে দেখা দিল প্রতিযোগিতা ও সংঘাতের সম্পর্ক (A. R. Desai—*Social Background of Indian Nationalism,* p. 40, Bombay, 1876)।

৪.৩ বাংলায় ভূমিবিন্যাস ব্যবস্থা

প্রাচীন বাংলার ভূমিব্যবস্থার যথার্থ পরিচয় দান আজও সম্ভব নয়, কারণ নির্ভরযোগ্য উপাদানের অভাব। তাম্রফলক ও লিপিমালা থেকে যেসব তথ্যাদি পাওয়া গেছে তার দ্বারা ভূমির স্বত্বাধিকারী নিয়ে বিতর্কের অবসানও হয়নি। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভূমি-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর বাংলার প্রাচীন ভূমিব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যাবে না, তবে পরবর্তী অধ্যায়ে কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। তথ্যাদি পর্যাপ্ত থাকায় অবশ্য মধ্যকালীন ভারতে রাজস্ব ও ভূমিবিন্যাস এবং ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত রাজস্বনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে।

৪.৩.১ প্রাচীন বাংলার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা

৮০০ খ্রিঃ পূর্ববর্তী লিপিগুলি থেকে বাংলায় প্রধানত তিন ধরনের ভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়—বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র; অর্থাৎ বাসযোগ্য ভূমি, কর্ষণযোগ্য ভূমি ও অনাবাদী ক্ষেত্র। পরবর্তী লিপিমালাতে তল, বাটক, আলি ইত্যাদি ভূমিরও উল্লেখ দেখা যায়। একাধিক লিপিমালায় বনভূমি, গোচারণ ভূমিদানের কথাও লিপিবদ্ধ রয়েছে। গুপ্তযুগে শস্য উৎপাদনের পরিমাপ দেখে ভূমির পরিমাণ নির্ধারিত হত। গ্রামগুলি ছিল আত্মনির্ভরশীল। ভূমির মূল্য কী হতে পারে সে সম্পর্কে কোনো উপাদান বিশেষ পাওয়া যায়নি। তবে রাজস্ব হিসাবে উৎপন্ন শস্যে $^{১}/_{৬}$ অংশ বিশেষ এলাকায় সংগ্রহ করা হত, তার প্রমাণ রয়েছে। হাট, খেয়া পারাপার ইত্যাদি থেকেও রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। ৮০০-১৩০০ মধ্যবর্তী লিপিগুলি ভূমিদানের সাক্ষ্য বহন করে, এর থেকে অনুমান করা যায় সে সময় জমি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন প্রায় ছিলই না। রাজা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার উপর যথেচ্ছাচার করতেন না (দেখুন, নীহাররঞ্জন রায়—*বাঙালীর ইতিহাস*)।

৪.৩.২ বাংলায় মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা

দিল্লিতে সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নির্দিষ্ট কোনো রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু খরচার জন্য কৃষি থেকে উৎপন্নের একাংশ আদায়ের প্রয়োজন ছিল, তার জন্য চাই একটি সরকারি যন্ত্র; গড়ে ওঠে 'ইক্তা' ব্যবস্থা। মোরল্যান্ড ভূমি থেকে রাজস্ব সংগ্রহকারী অধিকারকে বলেছেন 'ইক্তা' এবং 'ইক্তা'র অধিকারী 'মুক্তি'র ছিল কিছু সামরিক দায়িত্ব। আলাউদ্দিনের শাসনকালে 'ইক্তা'র গঠন ও চরিত্রে পরিবর্তন আসে। মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনকালে রাজস্বব্যবস্থা একটি উন্নত রূপ পায়, যার সূচনা হয়েছিল অবশ্য শেরশাহের আমলে। আকবহর টোডরমলের সাহায্য নিয়ে যে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন সেটি 'আসল জুমা তুমার' নামে পরিচিত। ১৫৮২ খ্রিঃ বাংলার ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হয় ১,০৬,৯৩,১৫২

টাকা (N. K. Sinha—*The Eco-History of Bengal,* vol.-II. Calcutta, 1968, p. 12)। কাগজে-কলমে সম্রাট খাজনা সংগ্রহের অধিকারী হলেও বাস্তবে সে অধিকার অর্পণ করা হয় তাঁর শাসকশ্রেণীর কিছু লোকের হাতে। সামরিক দায়িত্ব পালনের অধিকারী বিশেষ পদাধিকারী ব্যক্তিকে বলা হত 'মনসবদার', যারা একটা নির্দিষ্ট এলাকার 'জাগীর' পেতেন, যার খাজনা বেতনের সমান। দ্বিতীয় ধরনের রাজস্ব আদায়কারীরা ছিল জমিদার, এরা খাজনা আদায় করা ছাড়াও শান্তি-শৃঙ্খলা, বিচারসহ নানা দায়িত্ব পালন করেন। আদায়কারীরা ছিল জমিদার, এরা খাজনা আদায় করা ছাড়াও শান্তি-শৃঙ্খলা, বিচারসহ নানা দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণত জমিদারগণ মালগুজারী, পেশকাশি ও খিদমৎকারী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মুঘল যুগে খালসা ও জাগীর দুই ধরনের জমিতেই জমিদারী প্রথা প্রচলিত ছিল। বাংলার রাজমহল, রংপুর ও মেদিনীপুরের মতো সীমান্তবর্তী জেলাতেও জমিদারী ব্যবস্থার অস্তিত্ব চোখে পড়ে। মুঘল যুগে মূলত বাংলার ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হত জমিদারদের দ্বারা। জমিদারদের উপর সরকারি চাপ যে বিশেষ ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নিচের পরিসংখ্যান থেকে—

সাল	বাংলায় নির্ধারিত রাজস্ব (টাকা)
১৫৮২	১,০৬,৯৩,১৫২
১৭০০	১,১৭,২৮,৫৪১
১৭২১	১,৪১,০৯,১৯৪

(সূত্র—*The Economic History of Bengal,* vol-II, pp. 8-9)।

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় মুঘল শাসকরা জমিদারদের কখনোই জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইত না। রাজস্ব জমা অনিয়মিত হলে ব্যক্তিগতভাবে পীড়ন করা হত তেমনি প্রয়োজনে রাজস্ব মকুবের ব্যবস্থা ছিল। সে যুগে রাজস্ব সংগ্রহে কঠোরতা থাকলেও দুর্নীতির হাত ছিল কম। বাংলায় জমিদারী প্রথা মুসলিম শাসনের পূর্ব থেকেই ছিল, কিন্তু তারা পরবর্তীকালে খাজনা দেবার শর্তে জমির অধিকার ভোগকে অক্ষুণ্ণ রাখে। অনুর্বর জমিকে চাষযোগ্য করে ভোগদখলীদার জমিদারকে বলা হত 'জঙ্গালবার'। আসলে মুঘল জমিদারী ব্যবস্থায় প্রথাগত বংশাক্রমিক ভোগদখলী নিয়ম চালু ছিল। আকবর ও পরবর্তী শাসকগণ রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাংলাকে ১৬৬০টি পরগনায় বিভক্ত করেন যাদের অধীনে ছিল প্রায় এক লক্ষ গ্রাম; ১৬৬০টি পরগনাকে আবার ৩৪টি সরকারের অধীনে শাসন করা হত (*Eco-History of Bengal,* vol-II, p. 8-9)।

মুঘল সরকারের আদর্শ ছিল সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে খাজনা গ্রহণ, কিন্তু আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে ছিল বৈপরীত্য। আদায়ের সুবিধার্তে তাই গড়ে উঠেছিল মধ্যবর্তী শ্রেণী। বিভিন্ন মুঘল দলিলে মধ্যবর্তীকে খাজনার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া গেছে। রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার বা মধ্যবর্তী শ্রেণী লাভ করছে খাজনার একটা বড় অংশ। সে যুগে নানা কারণে খাজনার হার বৃদ্ধি পেয়েছিল, এই বোঝা চাষীদের সঙ্গে জমিদারদেরও বইতে হত। ফলে একদিকে যেমন শ্রেণীবৈষম্য বাড়ছে অন্যদিকে খাজনার বোঝা সকল শ্রেণীকে স্পর্শ করছে।

মুঘল আমলাতন্ত্র ও শাসকশ্রেণীর সদস্যদের সঙ্গে বাংলার কোনো ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত ছিল না। এই পদগুলি (সুবাদার ও দেওয়ান) ছিল অন্য যে-কোনো দায়িত্বের মতো, যার থেকে পদোন্নতি ও বদলির আশা করা

হত কেবল। এই ধরনের সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকার একটি নেতিবাচক দিক রয়েছে। ইরফান হাবিবের গবেষণা প্রমাণ করেছে : কৃষিবিকাশের ক্ষেত্রে জাগীর হস্তান্তর বিষয়টি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলায় মুঘল শাসকশ্রেণী জানতেন, যে তারা সাময়িক দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছেন। তাই তাদের কাজকর্মে ও চিন্তাভাবনায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের ছাপ পাওয়া যায় না। সুতরাং শাসকদের অত্যাচারের যে চিত্র তপন রায়চৌধুরী তাঁর গবেষণার মাধ্যমে *(Bengal Under Akbar and Jahangir)* এঁকেছেন তাকে অনেকাংশেই সমর্থন করা যায়। এই পরিস্থিতিতে সদা বিঘ্নমূলক ব্যয়সাধ্য শক্তি প্রয়োগ না করে মুঘল শাসকরা স্থানীয় পর্যায়ে আপস রফা করে টিকে থাকার চেষ্টা চালায়। একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে জমিদার আখ্যানপ্রাপ্ত স্থানীয় শক্তিধরদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়।

৪.৩.৩ মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব ব্যবস্থা

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, যদুনাথ সরকার, আব্দুল করীম ও সম্প্রতি অনিরুদ্ধ রায় মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব-ব্যবস্থা নিয়ে যেসব আলোচনা করেছেন তার উপর ভিত্তি করে বাংলায় মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব-ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। ১৭০০ খ্রিঃ মুর্শিদকুলি খান বাংলার দেওয়ান ও মখসুদাবাদের ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং ১৭১৭ খ্রিঃ থেকে আমৃত্যু ছিলেন বাংলার সুবাদার। নিযুক্তির পর থেকেই তিনি টাকা সংগ্রহের উপর জোর দেন। ১৭০২ এবং ১৭১১ খ্রিঃ বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধির হার ছিল বেশি। সম্ভবত দেওয়ানের পদ লাভের জন্য রাজস্বের হার বৃদ্ধি করে তিনি মুঘল সম্রাটের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছিলেন। ১৭২২ খ্রিঃ মুর্শিদকুলি 'কামিল জমা তুমারী' নামে নূতন রাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলেন। নূতন 'ডাকলা' একক শুরু করে বাংলা সুবাকে তেরোটি চাকলায় বিভক্ত করা হয়। তৈরি করা হয় নূতন আর্থিক একক। আসলে মুর্শিদকুলির লক্ষ্য ছিল কঠোরভাবে রাজস্ব সংগ্রহ, ফলে অত্যাচারের কাহিনী শুরু হতে বাধ্য। সে সময় বাংলায় নগদ টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মনসবদারদের অন্য প্রদেশে বদলী শুরু হওয়ায় নগদী সৈন্যের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বেতন না পেয়ে নগদী সেনারা মুর্শিদকুলিকে একসময় আক্রমণও করে। অন্যদিকে মনসবদার বদলী হওয়ায় জাগীর জমিগুলিকে 'খলিসা'য় রূপান্তরিত করা হয় এবং সেগুলি ইজারা দেওয়া হতে থাকে।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ অভিযোগ করেছেন, মুর্শিদকুলি ছোট ছোট জমিদারদের উচ্ছেদ করে বড় জমিদারি গঠন করে কর সংগ্রহের কাজটি সহজ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভূমিরাজস্বের অর্ধেক আসতো ৬টি বড় জমিদারের কাছ থেকে। যদুনাথ সরকারের অভিযোগ হল দুটি—(১) মুর্শিদকুলি বেশিমাত্রায় ইজারাদারী ব্যবস্থা চালু করায় পুরাতন হিন্দু জমিদারগুলি ধ্বংস হয়ে যায়, (২) মুর্শিদকুলির আচরণ ছিল হিন্দু জমিদারদের বিপক্ষে। আব্দুল করিমের অভিযোগই ভিন্ন। তাঁর মতে মুর্শিদকুলী জগৎ শেঠকে প্রশ্রয় দিয়ে শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ করেছেন। এই জগৎ শেঠই শেষ পর্যন্ত সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এই অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে উত্তর খুঁজে পাওয়া গেছে অনুরুদ্ধ রায়ের সদ্য প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ("মুর্শিদকুলি খানের বাংলায় রাজস্ব ব্যবস্থা : একটি আলোচনা", ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫, পৃ. ২৭৩-২৮১)। ড. রায় যুক্তি ও তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন— (ক) রাজশাহী ছাড়া অন্যান্য বড় জমিদারিগুলি আগে থেকেই বর্তমান ছিল। 'ইজারা' ব্যবস্থা মুর্শিদকুলির সৃষ্টি নয়, এটি একটি পুরাতন মুঘল প্রথা। বাংলায়

'ইজারা' ব্যবস্থা চালু হওয়ায় জমিদাররা প্রাপ্য 'হক' থেকে কিন্তু বঞ্চিত হয়নি। (খ) জমিদারদের আয় কমে গেলেও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি। জমিদারী ধ্বংসের পিছনে মূল কারণ ছিল আভ্যন্তরীণ কলহ। (গ) দীর্ঘদিন জমি জরিপ না হওয়ায় এবং মূল্য বৃদ্ধির ফলে জমিদাররা রাজস্ব বাড়িয়ে নেয়। মুর্শিদকুলি এই বেনিয়ম আয় বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু, সুতরাং রাজস্ব সংগ্রহের কঠোরতার বিরুদ্ধে এই হিন্দুবিরোধী প্রচার গড়ে ওঠা ছিল স্বাভাবিক। (ঘ) মুঘলদের একটি প্রথা ছিল বাণিজ্য ও ব্যবসার মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা। আওরঙ্গজেবও সে নীতি অনুসরণ করেছিলেন, মুর্শিদকুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রথাটি অমান্য করতে চাননি। জগৎ শেঠের স্বাধীনতা ও প্রভাব (বাণিজ্যক্ষেত্রে) সম্পর্কে সে কারণেই মুর্শিদকুলি নিশ্চুপ ছিলেন।

৪.৪ বাংলায় ইংরেজদের রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি (১৭৫৭-১৭৭২)

মীরজাফর বাংলার নবাবী পদে বসার উপঢৌকন স্বরূপ নানা অর্থসহ ২৪ পরগণার জমিদারী লাভ করে ইংরেজরা। এটি ছিল বাংলায় প্রাপ্ত প্রথম (আইনগতভাবে) ভূমি এলাকা। ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের নেতৃত্বে এই এলাকায় রাজস্ব সংগ্রহ শুরু হয়। তবে এই রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে তাদের কোনো নীতি গৃহীত হয়নি। জমিদারীটি পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে জমিদারী এলাকা ১৫ খণ্ডে বিভক্ত করে ইজারা দেওয়া হয়েছিল। জমি ইজারার সময় ফাটকাবাজরা দর তুলে দেওয়ায় তাদের ইজারাদারী পরীক্ষা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে সেনাদলের (ইংরেজ) ব্যয় নির্বাহের প্রতিশ্রুতিতে ব্যর্থ হলে মীরজাফর বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী কোম্পানিকে প্রদান করে। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানির উপর বর্তায়। এমনকি মীরকাশিমও পূর্বোক্ত এলাকার রাজস্ব কোম্পানিকে সংগ্রহ ও গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোম্পানির জ্ঞান ছিল সীমিত। তাই রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে কোম্পানির কাছে তখন দুটি পথ খোলা ছিল—(ক) মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা, যেটি চলে আসছে এবং মুর্শিদকুলি দ্বারা কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, সেটি বজায় রাখা নতুবা (খ) একটি নূতন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ইংরেজরা যে রাজস্ব ব্যবস্থা চালু ছিল তার প্রতি আস্থাশীল ছিল না, অন্যদিকে নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত ক্ষমতাও ছিল না। সুতরাং বাংলার ভূমিরাজস্ব নিয়ে কোম্পানির চলতে থাকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

প্রথম থেকেই কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার জমিদার সম্পর্কে অবিশ্বাসী মনোভাবাপন্ন ছিল। অনেক ক্ষেত্রে জমিদাররা রাজস্ব সঠিক সময়ে জমা দিত না; রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের ছিল অনীহা। কিন্তু খরচার একটা বড় অংশ রাজস্ব থেকে সংগ্রহে কোম্পানির আগ্রহ থাকায় তারা রাজস্ব সংগ্রহের বিকল্প পথ খোঁজে। মুঘল যুগে জমিদারি ব্যবস্থায় ইজারাদার ছিল, কিন্তু তারা ছিল এলাকারই অধিবাসী এবং বংশপরম্পরায় অধিকার ভোগ করত। মুঘল সরকার কখনোই প্রত্যক্ষ ইজারাদারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেনি। কিন্তু জমি থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের আশায় ইংরেজরা ফাটকা ইজারাদারদের রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার দেয়। বেনিয়াদের কাছে ইজারা লাভ ছিল মুনাফার এক স্বর্গরাজ্য। ফাটকা ইজারাদারদের সহযোগিতায় অতিরঞ্জন রাজস্ব নির্ধারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সর্বনাশের অধ্যায়। মীরকাশিমের সময় কঠোর রাজস্ব সংগ্রহ ও অতিরক্ত রাজস্ব নির্ধারণ

বাংলায় পুরাতন রাজস্ব কাঠামোয় বড় আঘাত হেনেছিল। উৎপন্ন ফসলের উপর নির্ভরশীল বার্ষিক খাজনা নির্ধারণের সঠিক নীতি সে সময় ভেঙে পড়ে। মীরজাফরের মৃত্যুর পর নবাব হলেন নাজম-উদ্-দৌল্লা; তার নবনিযুক্ত নায়েব নাজিম রেজা খাঁর উপর দায়িত্ব দেওয়া হল রাজস্ব বিষয়টি। সে সময় বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থাটি জরাজীর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৭৬৫ খ্রিঃ কোম্পানি স্বহস্তে দেওয়ানী গ্রহণ করেছে মূলত রাজনৈতিক কারণে।

১৭৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানী লাভ ছিল বাংলায় ইংরেজ অধিকারের আইনসঙ্গত স্বীকৃতি। এই রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে কোম্পানিকে প্রশাসনিক দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এই ধরনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মানসিক প্রস্তুতি ও সক্ষমতা কোনোটাই কোম্পানির সে সময় ছিল না। তাই ক্লাইভ গড়ে তোলেন দ্বৈত-শাসন নামে পরিচিত এক জোড়াতালি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় বাংলায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ববান ব্যক্তি ছিলেন রেজা খাঁ। যেহেতু কোম্পানির তখন একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা, তাই রেজা খাঁ উপলব্ধি করেন তার অস্তিত্ব নির্ভর করছে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণের উপর। ফলে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য তিনি নিযুক্ত করেন তাদের যারা বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম। এই কাজে রেজা খাঁ অনেকাংশে সাফল্যও পেয়েছিলেন। ১৭৬৪-৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানী লাভের পূর্বে বাংলার সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮১,৭৫,৫৩৩ টাকা; ১৭৬৪-৬৫ খ্রিঃ রেজা খাঁ সেখানে সংগ্রহ বাড়িয়ে করেছিলেন ১,৪৭,০৪,৮৭৫ টাকা (সূত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত—*ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস,* ১৭৫৭-১৮৩৭, পৃ. ৮৮)। রেজা খাঁ চড়া হারে রাজস্ব আদায়ের কুফল সম্পর্কে সাবধান করলেও কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। কোম্পানি দেওয়ানী এলাকাও 'Ceeded land'-এর সঠিক রাজস্ব কত হওয়া উচিত এই বিষয়টি নির্ধারণ করতে যেমন পারেনি তেমনি সময় দেয়নি রাজস্বনীতি নিয়ে চিন্তাভাবনার জন্য। সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব না দিতে পারায় অনেক আমিনের কর্মচ্যুতি ঘটল, জমিদারদের অবস্থা হল আরও সঙ্গীন। প্রশ্ন দেখা দিল ক্লাইভের দ্বৈত-শাসন নিয়ে।

পরবর্তী গভর্নর ভেরেলেস্ট রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। অত্যাচারী, প্রতারক ও শঠ আমিনদের ক্ষমতা হ্রাস এবং তাদের কাজকর্মের উপর নজর রাখার জন্য নিযুক্ত করলেন সুপারভাইজার। বস্তুত দেওয়ানী এলাকায় সুপারভাইজার নিয়োগ ছিল একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ১৭৭০ খ্রিঃ রেজা খাঁর প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমিনদের রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে সরে যেতে হয়। Court of Directors-এর নির্দেশে সুপারভাইজাররা ১৭৭২ খ্রিঃ রাজস্ব সংগ্রাহকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। রেজা খাঁর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭৭০ খ্রিঃ মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় গঠিত হয় "Comptrolling Councils of Revenue"। ইতিমধ্যে ১৭৬৮ খ্রিঃ বাংলায় উৎপাদন ব্যবস্থা আরও ভেঙ্গে পড়ে। ১৭৭০ খ্রিঃ সমগ্র বাংলায় দুর্ভিক্ষ চরম আকারে আত্মপ্রকাশ করে। দুর্ভিক্ষ চলাকালীন কোম্পানির সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ কিন্তু হ্রাস পায়নি। একদিকে খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া দাম, ত্রাণ সম্পর্কে শাসককুলের অনীহা, রাজস্ব সংগ্রহাকারীদের অত্যাচার, অন্যদিকে মৃত্যুর করাল গ্রাস বাংলার আর্থিক ও সামাজিক জীবনে নিয়ে আসে দুর্দশা। জনসংখ্যার $^{১}/_{৩}$ অংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়,

বিস্তীর্ণ এলাকা হয়ে পড়ে জঙ্গলাকীর্ণ। এই নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে 'Court of Directors' কোম্পানির কলিকাতা কর্তৃপক্ষকে দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটিয়ে নূতন রাজস্বনীতি গ্রহণের নির্দেশ পাঠায়। ওয়ারেন হেস্টিংস ক্ষমতায় এসে বাংলায় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে এক ভ্রান্ততম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান যেটি 'নূতন ইজারাদারী' ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

৪.৫ ইংরেজদের সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের কারণ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ভূমিরাজস্বের উপর গুরত্ব দিতে থাকে; দেওয়ানী লাভের পর চড়া হারে রাজস্ব আদায় শুরু করে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো ঘটনা ঘটলেও রাজস্ব বৃদ্ধির হার কিন্তু তারা কমায়নি। ১৭৯৩ খ্রিঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কালে বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৪,০০,০০০ পাউন্ড যেখানে ১৮৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানীর সময় রাজস্ব ছিল মাত্র ১৪,৭০,০০০ পাউন্ড। কোম্পানির এই ক্রমাগত রাজস্ব বৃদ্ধির পিছনে কয়েকটি উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়োজনীয়তা লুকিয়ে ছিল। প্রথমত, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত থেকে রেশম ও বস্ত্রসামগ্রী কিনে ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করার জন্য বিনিয়োগ করত সোনা ও রূপা (বুলিয়ন)। ভারতে বিক্রয় করার মতো দ্রব্যও তাদের বিশেষ ছিল না। ইংল্যান্ড থেকে সোনা ও রূপা বাইরে চলে যাওয়াটি কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভালো চোখে দেখছিল না। দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানির কাছে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভূমিরাজস্ব একটি আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। সংগৃহীত রাজস্বের অর্থ ব্যবসার দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হতে থাকে। ইংল্যান্ড থেকে সোনা, রূপা পাঠানোর দিন শেষ করতে চায় রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়ে। ইচ্ছেটা, 'মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজতে হবে।' এছাড়াও কোম্পানি তার কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদান করে অতিরিক্ত আয় বিনিয়োগ করতে চায় চীনের বাণিজ্যে। ফলে আয় বৃদ্ধির চাপটি গিয়ে পড়ে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার উপর। দ্বিতীয়ত, ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ এবং ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের মতো ব্যয়সাপেক্ষ ও দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ করতে হয়েছিল কোম্পানিকে ঔপনিবেশিক স্বার্থে। এই ব্যয়ের অর্থ এসেছিল ভারতীয় রাজস্ব থেকে। সে সময় রাজনৈতিক অস্থিরতায় ব্যবসা থেকে রাজস্ব সংগ্রহের হার কমে গিয়েছিল, তাই ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির প্রসঙ্গটি কোম্পানির কাছে প্রাধান্য পায়। তাছাড়া মাথাভারী প্রশাসনিক কাঠামোতে ইউরোপীয় কর্মচারীদের উচ্চহারে বেতনের জন্য ব্যয়, ১৭৯৩ খ্রিঃ চার্টার আইন অনুসারে ইংল্যান্ডের 'Board of Control'-এর সদস্যদের বেতন এবং ১৮১৩ খ্রিঃ চার্টার আইনের ধারা প্রয়োজনে কোম্পানি ডিভিডেন্ট (১০১/২%) ভারতে ভূমিরাজস্ব থেকে প্রদানের নির্দেশ—প্রমাণ করেছিল কোম্পানির ভূমিরাজস্বের উপর নির্ভরতা। সুতরাং বাজেট ঘাটতির উপর নির্ভর করত রাজস্ব বৃদ্ধির হার। তৃতীয়ত, অষ্টাদশ শতকের শেষে ঔপনিবেশিক শোষণের তিনটি ক্ষেত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—(ক) আমেরিকায় বাধ্যতামূলক শ্রমের মাধ্যমে রৌপ্যখনি থেকে সম্পদ আহরণ, (খ) আফ্রিকানদের দাস হিসাবে চালান এবং (গ) এশিয়ায় নৌচলাচল ও জমির উপর অতিরিক্ত করের বোঝা। (দেখুন, Capitalism in History—by Irfan Habib (Bengalee Muslim ইতিহাস অনুসন্ধান-১১)। হাবিবের মতে, জাভার কৃষকদের উপর নেদারল্যান্ডসের করভার দিয়ে যে শোষণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ভারতে

পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ দখলদারী ছিল চূড়ান্ত মুহূর্ত। কোম্পানি তার দখলীস্বত্ব ভূমি এলাকা থেকে গৃহীত রাজস্ব মূলত নিয়ে যেত ভারতীয় বস্ত্রের আকারে। তাছাড়াও নানা আকারে প্রতিবছর বিপুল রাজস্ব ইংল্যান্ডে চলে যেত, যার পরিমাণ অষ্টাদশ শতকের শেষে দাঁড়ায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড। বাংলা থেকে বিপুল অর্থ ইংল্যান্ডে এই পাচারকে অর্থনীতিবিদগণের ভাষায় বলা হয় 'Economic Drain', অম্লান দত্ত বাংলায় তাকে বলেছেন 'অপহার'। অধ্যাপক ইরফান হাবিব মনে করেন, ঔপনিবেশ থেকে অর্জিত সম্পদ শিল্পবিপ্লবে উর্বরতা দিয়েছিল। এই নিষ্ঠুর উপনিবেশবাদ ছিল ধনতন্ত্র উদ্ভবের মৌলিক শর্ত। আভ্যন্তরীণ পুঁজি গড়তে পররাজ্যের অর্থনীতিতে দখল করা ছিল জরুরি (দেখুন, ইতিহাস অনুসন্ধান-১১, পৃ. ৮-৯)। এককথায় শিল্পবিপ্লবের স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন পুঁজি সরবরাহে ইংল্যান্ড অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল বাংলার ভূমিরাজস্বের উপর, তাই সকলেই চেয়েছিল রাজস্ব বাড়িয়ে পুঁজির যোগানকে অব্যাহত রাখতে।

৪.৬ বাংলায় ইংরেজদের রাজস্ব সংক্রান্ত গৃহীত তিনটি পদক্ষেপ

১৭৭০ খ্রিঃ এর পর বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠিত Comptrolling Councils of Revenue-এর সভাপতি নির্বাচন করা হল দরবারের ইংরেজ রেসিডেন্টকে। ১৭৭১ খ্রিঃ আগস্ট মাসে 'বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্' দেওয়ানী নিজের হাতে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং কোম্পানির কর্মচারীদের ভূমিরাজস্বের দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেয়। এই গুরুদায়িত্ব নিয়ে হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিঃ বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হন। কিন্তু হেস্টিংসের কাছে রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী যেমন ছিল না, তেমনি জমির কত রাজস্ব হতে পারে তার কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যাদিও ছিল না। অন্যদিকে কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি, সীমিত ক্ষমতা ও কাউন্সিলের সদস্যদের সদা বিরোধিতা সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলে। এই অবস্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি রাজস্ব বিষয়ক সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে স্বচেষ্ট হন।

৪.৬.১ নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা (১৭৭২-১৭৭৭)

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে হেস্টিংস দুটি বিষয়ে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—(১) যেহেতু জেলা, পরগনা বা গ্রামের জমির রাজস্ব সঠিক কত হতে পারে সেটি যখন জানা নেই তখন নিলামের বন্দোবস্ত করে সর্বোচ্চ রাজস্ব কত, সেটি জেনে নেওয়া যেতে পারে। (২) পাঁচ বছরের জন্য নিলামের ব্যবস্থা করে রাজস্ব ব্যবস্থায় স্থিতিলতা নিয়ে আসা। অতপর তাঁর এই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য গড়ে তুললেন নূতন প্রশাসনিক কাঠামো ১৭৭২ খ্রিঃ কাউন্সিলের সদস্য নিয়ে গঠিত হল 'বোর্ড অব্ রেভেন্যু' বা রাজস্ব পরিষদ যার হাতে রইল রাজস্ব পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব এই পরিষদের কয়েকজন সদস্য নিয়ে গড়ে তোলা হল 'কমিটি অব্ সার্কিট' যাদের কাজ হল প্রতিটি জেলায় ঘুরে কালেক্টরদের সহযোগিতায় সর্বোচ্চ নিলামের মাধ্যমে পাঁচ বছরের জন্য রাজস্ব আদায়ের জন্য জমি ইজারা দেওয়া। এই ব্যবস্থাটি নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা নামে পরিচিত। প্রতিটি জেলায় রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত হলেন একজন করে ইউরোপীয় কালেক্টর, যাকে সাহায্য করবে একজন দেশীয় দেওয়ান। অবলুপ্তি ঘটানো হল 'সুপারভাইজার' পদটির।

১৭৭২ খ্রিঃ জুন মাসে হেস্টিংস 'কমিটি অব্ সার্কিট'-এর সভাপতি হিসাবে নদীয়া জেলায় উপস্থিত হলেন। নদীয়াকে ধরা হল সমগ্র প্রদেশের আদর্শ জেলা হিসাবে, সেখানে যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন হবে সেই ব্যবস্থা চালু হবে অন্যত্র। নদীয়ার জমিদারকে বাদ দিয়ে সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদানে আগ্রহী ব্যক্তির সঙ্গে ইজারার ব্যবস্থা হল। পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিতে জমিদারদের ইজারাদারে পরিণত করার প্রক্রিয়া চলতে থাকল নানা জেলায়। জমিদার, তালুকদার, ছোট জমিদার সকলেই এখন ইজারাদার—জমিদার বলে কিছু রইল না। কিছুদিনের মধ্যে হেস্টিংসের নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা সবার কাছে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। নিলামে জমি বন্দোবস্তের ফলে অনেকে মর্যাদা রক্ষার্থে ও জেদের বসে চড়া হারে নিলাম ডাকলেও রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়। ফলে ইজারাদাররা রাজস্ব বাকী রাখে, কোম্পানির রাজস্ব ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ভাবনাটি অবাস্তবে পরিণত হয়। তাছাড়াও কোম্পানির কিছু কর্মচারীও বেনামীতে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে রাজস্ব বাকি রাখতে থাকে। অন্যদিকে ইজারাদারীতে অংশ নিয়েছিল অধিকাংশ বেনিয়ান ও মহাজন শ্রেণীর লোক; যাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইজারাভুক্ত জমি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা আদায়। তাদের অধীনস্থ দর-ইজারাদারগণ রায়তদের উপর অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য চালাতে থাকে অবাধ লুণ্ঠন। অনেক পুরাতন জমিদার যারা বংশমর্যাদা রক্ষার্থে চড়া হারে রাজস্ব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারাও বিপাকে পড়লেন। উদাহরণস্বরূপ রানি ভবানীর কথা বলা যেতে পারে, রাজস্ব বাকি থাকায় তাঁর জমিদারী কেড়ে নেওয়া হল। সুতরাং সব মিলিয়ে ইজারাদারী ব্যবস্থা চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। হেস্টিংস তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে দেখে নূতন তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করলেন 'আমিনী কমিশন' (১৭৭৬)। এদিকে পাঁচ বছরের ইজারাদারী ব্যবস্থার মেয়াদ শেষ হলে, তাকে বাতিল করে চালু করা হল অপর এক নূতন ব্যবস্থা।

৪.৬.২ একসালা বন্দোবস্ত বা জমিদারী ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন (১৭৭৭-১৭৮৬)

হেস্টিংসের পঞ্চবার্ষিক নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থার আশ্চর্যতম দিক হল দুর্ভিক্ষের পূর্বের তুলনায় কম সংখ্যক রায়তদের কাছে ইজারাদারদের অনেক বেশি খাজনার দাবী। ফলে এই ইজারাদারী ব্যবস্থার ধাক্কায় 'রায়তরা তলিয়ে গেল দুর্দশার অন্ধকারে, পুরাতন জমিদার হারাল তার প্রাক্তন সম্মান, দুর্ভিক্ষ যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়েছিল সেটি নিল আরো ভয়ঙ্কর রূপ' (নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ—*বাংলার অর্থনৈতিক জীবন*, পৃ. ৫৩)। ১৭৫৭ খ্রিঃ পর থেকে কোম্পানির রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সামনে মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা যেমন অকেজো হয়ে পড়েছিল, অন্যদিকে পাঁচসালা নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থাও যে ব্যর্থ হয়েছে সেটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় 'Court of Directors' রাজস্ব ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন, কমিটি গঠনের মাধ্যমে অনুসন্ধান ও ভবিষ্যতে রাজস্বনীতি সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে এক চিঠিতে জানিয়ে দেয়, আপাতত কোনো চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ না করে জমিদারদের সঙ্গে স্বল্পমেয়াদী বন্দোবস্ত করা উচিত। ফলে ১৭৭৭ খ্রিঃ পাঁচসালা বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষে একসালা বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে জমিদারী ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করা হল। এই বন্দোবস্ত অনুসারে—(১) ইজারাদারদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে

জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হল জমিদারদের। জমিদারের থেকে কেউ বেশি রাজস্ব প্রদানে আগ্রহী থাকলেও সেখানে অগ্রাধিকার পাবে জমিদার (২) রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিগত তিন বছরের গড় রাজস্বকে ধরা হল। (৩) রাজস্ব বাকি পড়লে কেবল উৎপন্ন শস্য থেকে বকেয়া মিটিয়ে ফেলার সুযোগ দেওয়া হল। আসলে এই একসালা বন্দোবস্ত ছিল একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা, হেস্টিংস একটি স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জমিদারগণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও ইতিমধ্যে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। ইজারাদারী ব্যবস্থার ফলে জমিদার হাতছাড়া হওয়ায় কানুনগো কার্যালয় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; তাই জমি-সংক্রান্ত দুর্নীতি রোধ করা আর সম্ভভব হল না। রাজস্ব যা নির্ধারিত হয়েছিল সেটিও ছিল মাত্রাতিরিক্ত। এই অবস্থায় ১৭৮৬ খ্রিঃ কর্নওয়ালিস ভারতে এলেন, তার কিছুদিন আগেই পিটের ভারত আইনে (১৭৮৪) কোম্পানিকে রাজস্ব চিরস্থায়ী করার নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ পালনের দায়িত্বটি পড়ল কর্নওয়ালিসের উপর।

৪.৭ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আমরা দুটি সমান্তরাল ধারা লক্ষ্য করে থাকি— (১) এই ব্যবস্থাটি ছিল রাজস্ব বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের চূড়ান্ত পরিণতি। (২) অন্যদিকটি হল তত্ত্বগত ভাবনাচিন্তা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত সাধারণের মনে এই ধারণা ছিল যে কর্নওয়ালিস হলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রণেতা। এই ধারণাটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন জেমস্ মিল তাঁর 'The History of British India' (London, 1848) গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে। বিংশ শতকের প্রথম দশকে বিদ্যোৎ সমাজে মিলের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসে, অনেকের মনে ধারণা জন্মাতে থাকে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য একা কর্নওয়ালিসকে দায়ী করা যায় না। রণজিৎ গুহের A Rule of Property of Bengal'. 'An Essays on the Idea of Permanent Settlement', Cambridge Eco-History of India (Vol.-2), বিনয়ভূষণ চৌধুরীর প্রবন্ধ, নরেন্দ্রকৃষ্ম সিংহের 'The Eco-History of Bengal,' (Vol.-II), ইত্যাদি গবেষণা-গ্রন্থ যেমন বিষটির উপর নূতনভাবে আলোকপাত করেছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে বিতর্ক। ড. গুহ ইউরোপীয়দের মানসিকতা বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে মত গড়ে ওঠার পিছনে ছিল ফরাসী ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদ্‌দের প্রভাব। ড. বিনয়ভূষণ চৌধুরীর প্রবন্ধের বক্তব্য হল, কোম্পানির বাণিজ্যিক উন্নতি বিধানের জন্য ও বুলিয়ন ইংল্যান্ড থেকে আসা বন্ধ করতে নিয়মিত ভূমি-রাজস্ব আদায়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মাল খরিদের (Investment) ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। এইসব নূতন নূতন তর্ক-বিতর্কের প্রেক্ষাপটেই আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে।

৪.৭.১ পটভূমি

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যখন বাংলার সমগ্র অর্থনীতিকে গ্রাস করেছে ঠিক তখনই স্কটিশ চিন্তাবিদ আলেকজান্ডার দাও প্রথম দাবি করলেন, বাংলাকে রক্ষা করতে হলে দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত (দেখুন, Alexander Daw—*The History of Hindoostan,* London,

1968)। আলোকজান্ডারের প্রস্তাবের ঠিক দু'বছর পরই এক ফিজিওক্র্যাট হেনরী পেট্রলো তাঁর 'Essays upon the Cultivation of the Lands and Improvements of the Revenues of Bengal' (London, 1772) গ্রন্থে প্রাক্-বিপ্লব যুগের ফ্রান্সের সঙ্গো বাংলার করুন অবস্থার তুলনা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। এই দুই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তার অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। ইতিমধ্যে কোম্পানি স্বহস্তে দেওয়ানীর কার্যকরী দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং চালু হয় নূতন ইজারাদারী (পাঁচ বছরের জন্য) ব্যবস্থা। এই রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে সে সময়ই বিতর্ক শুরু হয়েছিল। কাউন্সিল সদস্য ফিলিপ ডেকারস, ঢাকা থেকে রিচার্ড বারওয়েল এবং মুর্শিদাবাদ থেকে মিডলটন জমিদারদের সঙ্গো দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির কথা বলেন। নীতিগতভাবে এইসব রাজস্ব কর্মচারীরা একমত হলেও নানা বিষয়ে তাদের মধ্যে ছিল মতানৈক্য। তবে এই বিষয়ে সবথেকে জেরালো বক্তব্য রেখেছিলেন ফিজিওক্র্যাট চিন্তাধারায় প্রভাবিত, মন্টেস্কু ও এ্যাডাম স্মিথের লেখায় মুগ্ধ ফিলিপ ফ্রান্সিস। হেস্টিংসের প্রচলিত নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থার সমালোচনা করে ১৭৭৬ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে একটি পাল্টা রাজস্ব ব্যবস্থার পরিকল্পনা কোম্পানির কাছে পেশ করেন। এই পরিকল্পনা রচনায় তাঁকে সাহায্য করেছিল তৎকালীন বাংলার রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মচারীগণ যারা ছিল চিরস্থায়ী ব্যবস্থার সমর্থক। ফ্রান্সিস বিশ্বাস করতেন, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে এই ধরনের ভূমিব্যবস্থা যদি কৃষিবিপ্লবের সহায়ক হয় তাহলে বাংলাদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা কৃষিবিপ্লবের জন্য গ্রহণ করা উচিত। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, মুঘল যুগেও ভারতে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল; তাই কোম্পানির এখন উচিত ব্যক্তিগত মালিকানা মেনে নিয়ে জমিদারদের সঙ্গো চুক্তি করা। ফ্রান্সিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল বিষয়গুলি ছিল—(ক) জমিদারদের জমির একমাত্র মালিক বলে ঘোষণা করে চিরকালের জন্য তাদের উপর সরকারি খাজনা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া। (খ) রায়তদের বলে ঘোষণা করে চিরকালের জন্য তাদের উপর সরকারি খাজনা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া। (গ) রায়তদের অধিকার ও স্বার্থ জমিদারদের উপর ছেড়ে দেওয়া। (ঘ) বাংলার জমিদার শ্রেণী ইংল্যান্ডের ভূস্বামীদের ন্যায় উন্নতিকামী হয়ে উঠবে সে ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা রাখা (মুনতাসীর মামুন—*চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ,* ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৪০-৪১)। 'Court of Directors' অবশ্য ফ্রান্সিসের পরিকল্পনা এবং হেস্টিংসের ইজারাদারী ব্যবস্থা উভয়ই বাতিল করে দিয়ে জমিদারদের সঙ্গো এক বছরের জন্য বন্দোবস্ত নীতি গ্রহণ করে। ১৭৮৪ খ্রিঃ পিটের ভারত আইনে অবশ্য রাজস্ব বিষয়ে চিরস্থায়ী আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়। ১৭৮৬ খ্রিঃ Court of Directors-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে কর্নওয়ালিস ভারতে পৌঁছালে শোর ও কর্নওয়ালিসের মধ্যে দেখা দেয় বিতর্ক। সে সময় শোর ছিলেন বাংলার রাজস্ব বিষয়ে বিশারদ ব্যক্তি। কর্নওয়ালিস তাঁকে রাজস্ব উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন। নীতি প্রণয়নে যে শোরের উপর কর্নওয়ালিস ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এখন সে ব্যক্তিটি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করে জেমস গ্রান্ট; বাংলার রাজস্ব বিষয়ে তাঁরও ছিল যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। এই বিতর্ক চলেছিল তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে—(১) জমির প্রকৃত মালিক কে? কার সঙ্গো বন্দোবস্ত করা হবে? (২) রাজস্বের পরিমাণ কত হবে? (৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি যুক্তিযুক্ত হবে? এই বিতর্ক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে—

৪.৭.২ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে গ্রান্ট, শোর ও কর্নওয়ালিসের মধ্যে বিতর্ক

গ্রান্ট	শোর	কর্নওয়ালিস
(ক) মুঘল আমলে রাষ্ট্রই ছিল জমির মালিক। জমিদার কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করত। তার বিনিময়ে জমিদার পেত পারিশ্রমিক। সরকার ইচ্ছা করলে জমিদার ও প্রজা ইচ্ছামতো ব্যক্তির সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত করতে পারে।	(ক) জমিদারই ছিল জমির প্রকৃত মালিক, কিন্তু সরকারকে রাজস্ব প্রদানে তারা বাধ্য। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা যেহেতু জমিদারদের রয়েছে, সুতরাং রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্ত তাদের সঙ্গেই করা উচিত।	(ক) বাংলার কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ। কৃষির উন্নয়নের জন্য দেশীয় জমিদারদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে জমিদাররাই জমি ভোগ করায় মালিকে পরিণত হয়েছে। সরকারের নির্ভরযোগ্য সমর্থক পরিণত করতে হলে রাজস্ব বন্দোবস্ত জমিদারদের সঙ্গেই করতে হবে।
(খ) মুঘল আমলে মীরকাশিমের সময় রাজস্ব সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৬৫ খ্রিঃ কোম্পানি দেওয়ানী গ্রহণের সময় যে রাজস্ব ছিল সেটিকে ধরেই রাজস্বের হার চিরস্থায়ী করা যেতে পারে।	(খ) মুঘল আমলে ঘোষিত রাজস্ব অপেক্ষা প্রকৃত আদায়ের হার ছিল বেশি। সুতরাং রাজস্ব আদায়ের জন্য তথ্য ও তদন্তের আরো প্রয়োজন। আপাতত ১৭৮৭ খ্রিঃ আদায়ীকৃত রাজস্বকে হার হিসাবে ধরা যেতে পারে। তথ্য জোগাড়ের পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রকৃত রাজস্ব কত হবে।	(খ) বিগত ২৫ বছর ধরে রাজস্ব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ যখন সম্পূর্ণ হয়নি, তখন আর অপেক্ষা করা যায় না। ১৭৮৯ খ্রিঃ আদায়ী রাজস্বকে ভিত্তি বর্ষ হিসাবে ধরে সেটিকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।
(গ) রাজস্বের হার চিরস্থায়ী হলেও জমিদারদের সঙ্গে এই মুহূর্তে চিরস্থায়ী করা ঠিক হবে কিনা ভাবতে হবে।	(গ) জমিদারদের সঙ্গে একটা দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত করলে ভবিষ্যতে রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে না। আপাতত দশ বছরের জন্য চুক্তি করে জমি জরিপ ও তথ্যাদি সংগ্রহ চলতে পারে। পরে চিরস্থায়ীর কথা ভাবা যাবে।	(গ) কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় তিনি দায়বদ্ধ, তাই সত্বর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকরী করতে তিনি আগ্রহী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করায় দেশের অগ্রগতি পিছিয়ে যাচ্ছে। জমিদার চিরস্থায়ী স্বল্প মনোযোগী হবে। অন্যদিকে কোম্পানির রাজস্ব আদায়ে আসবে স্থিতিশীলতা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নে শোর, গ্রান্ট ও কর্নওয়ালিসের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য ছিল না। বিতর্ক দেখা দেয় চুক্তি কাদের সঙ্গে হবে এবং কখন করা উচিত এটি নিয়ে। এই অবস্থায় কর্নওয়ালিস ১৭৮৯ খ্রিঃ বাংলা ও বিহারে চালু করেন দশসালা বন্দোবস্ত, ১৭৯০ খ্রিঃ উড়িষ্যাতেও সেটি কার্যকরী হয়। কর্নওয়ালিস, শোর গ্রান্টকে জানান যে, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ অনুমতি না পাওয়া অবধি দশসালা বন্দোবস্তই চালু থাকবে। ইতিমধ্যে গ্রান্ট, শোর প্রমুখের সুপারিশ ও কর্নওয়ালিসের বক্তব্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় 'Court of Directors'-এর কাছে। কোর্ট বিষয়টি নানা দিক থেকে পর্যালোচনা করার পর কর্নওয়ালিসের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে চিঠিতে লেখে, 'আমরা মনে করি নানা সমস্যার অবতারণা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে পিছিয়ে

দেওয়ার অর্থ হচ্ছে দেশের সুখ-সমৃদ্ধিকে পিছিয়ে দেওয়া। সুতরাং আমরা আদেশ করছি, ইতিমধ্যে যদি নূতন কোন বাধার সৃষ্টি না হয় তবে অনতিবিলম্বে জমিদারদের সঙ্গে দশবর্ষীয় যে বন্দোবস্ত হয়েছে সেটি চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হউক' *(General Letters to the Court of Direcors,* Revenue Dept. Vol.-VI. Letter dt. 15.12.1787)। এই চিঠি প্রাপ্তির দু'মাসের মধ্যে কর্নওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করেন।

৪.৮ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব

আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মূলত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনকারী একটি ঘটনা। এরিক স্টোক্স (Eric Stokes) লিখেছেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুধুমাত্র বাংলাদেশের ভূমিক্ষেত্রে একটি রাজস্ব সংগ্রহমুখী ব্যবস্থাই ছিল না, সর্বাধিক রাজস্ব সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবের সুস্পষ্ট চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় এই ব্যবস্থার মধ্যে।' (Eric Stokes—*The Peasant and the Raj : Studies in Agrarian, Society and the Pleasant Rebellion in Colonial India.* Cambridge, 1978)। ব্রিটিশ সরকারের উচ্চহারে রাজস্ব সংগ্রহের তাগিদে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টার প্রভাব নানাভাবে পরিস্ফুট হয়।

৪.৮.১ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব

ভারতে ইংরেজ শাসনের আবির্ভাব এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করে। কার্ল মার্ক্সের মতে, ইংল্যান্ড ভারতীয় সমাজের অপরিবর্তিত কাঠামোকে ভেঙে দিয়েছিল নির্মমভাবে। সেটি সম্ভব হয়েছি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যারা প্রথমে জমিদারে রূপান্তরিত হয় তাদের সামাজিক অবস্থান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ক্রমে এই পুরাতন জমিদারগণ রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে তাদের জমিদারী নিলামে ওঠে। সেগুলি কিনে নেয় মহাজন, ব্যবসায়ী ও বেনিয়ার দল। এতদিন সমাজের চোখে যারা ছিল ফাটকাবাজ ও দালাল, তারাই জমিদারী নিলামে কিনে নিয়ে সামাজিক মর্যাদালাভের সুযোগ গ্রহণ করে। মোটকথা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের সঙ্গে বাংলার পল্লী এলাকায় জমিদারী ও রায়ত এই দুই শ্রেণীর বিকাশ ঘটে, ক্রমে অবশ্য এদের মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উত্থান ঘটেছিল যাদের ছিল আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে গ্রামে বা শহরে বসবাস। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর একটি কুফল ছিল মহাজন শ্রেণীর উদ্ভব। অশিক্ষিত দরিদ্র রায়ত ও অলস অভিজাতদের উপগর সুযোগ বুঝে যারা শিকারী নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত। অভাবগ্রস্ত দরিদ্র কৃষক যখন খাদ্য, ফসলের বীজ ও গবাদি পশু কেনার জন্য অর্থের সন্ধানে মহাজনদের বাড়িতে উপস্থিত হত, ঠিক তখনই অভিজাতরা (তথাকথিত) হাজির হত সামাজিক মর্যাদার প্রদর্শনের জন্য অযাচিত খরচে অর্থ ধার করতে। এই সুযোগে মহাজনরা ঐতিহ্যবাহী সাইলকের মতো উভয়কে শোষণ করত। সুতরাং নূতন রাজস্ব কাঠামোর সঙ্গে পরিবর্তন ঘটেছিল সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের।

নূতন ভূমিব্যবস্থার ফলে নগদে রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয় যা কৃষি উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। পূর্বে কৃষিজাত দ্রব্য সাধারণত গ্রামের প্রয়োজনেই উৎপন্ন হত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষিদ্রব্য বাজারের পণ্যে পরিণত হয়। শিল্পবিপ্লবজনিত কারণে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদাকে লক্ষ্য রেখে যেমন নূতন ধরনের কৃষি উৎপাদন শুরু হয়, দেখা দেয় কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ। কৃষিদ্রব্য কেনার

জন্য গ্রামে 'কড়িয়া' নামে এক শ্রেণী কাজ করতে শুরু করে। এইভাবে ভারতে কৃষিক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ধীরে ধীরে, প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক স্মারকগুলোও তার সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল।

৪.৮.২ জমিদার শ্রেণীর উপর প্রভাব

ইংল্যান্ডে জমিদারী ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করার ফলে জমিদাররা জমিকে উৎপাদনশীল পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে দেখতে শুরু করে। শিল্পবিপ্লবের ফলে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য জমিতে পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এটি দেখে ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকরা প্রচার শুরু করে যে বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনলে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব আসবে। এই বিষয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন ফ্রান্সিস, শোর ও কর্নওয়ালিস। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রিঃ পর কার্যত দেখা গেল জমিদাররা জমিকে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করেনি। এর জন্য প্রয়োজন ছিল দেশে এমন এক আর্থিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে মনে হয় কৃষিতে বিনিয়োগ করলে মুনাফার হার বেশি হচ্ছে। ইংরেজ শাসকরা সেটি তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে জমি থেকে আয়ের বড় অংশ জমিদাররা বিনিয়োগ করেছিল অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে (বিলাসিতায়)। কৃষি উন্নয়নে জমিদারদের অনীহা শাসককুলকে নিরাশ করে। এই শিক্ষা নিয়ে ভারতের অন্যান্য স্থানে চালু করা হয় মহলওয়ারী ও রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত।

৪.৮.৩ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব

অর্থনীতির সাথে সমাজের রাজনৈতিক অবস্থার যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে সেটি সর্বজনবিদিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটি অর্থনৈতিক পদক্ষেপ হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের ৫০ বছর ছিল সংঘ ও সমিতি গঠনের যুগ। ভারতের সে সময়ের রাজনীতি ছিল এই সংঘগুলির প্রাধান্য। যেমন 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন' যার অধিকাংশ সদস্য জমিদার শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় জনসাধারণের প্রয়োজনে এদের বিশেষ ভূমিকা ছিল না। এই সংঘ তার কার্যকলাপকে কলিকাতার বাইরে প্রসার ঘটাতে যেমন সক্ষম হয়নি তেমনি রক্ষা করে চলেছিল কেবল জমিদারদের স্বার্থ। জমিরদাররা বিভিন্ন সংঘ বা সমিতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্ম গোষ্ঠীস্বার্থ বর্ণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বিভেদের সৃষ্টি করে (Anil Seal—*The Emergence of Indian Nationalism,* London, 1968, p. 200-229) ১৮৮৫ খ্রিঃ জাতীয় কংগ্রেস গড়া হয়, যেটি সঠিক অর্থে ছিল রাজনৈতিক সংগঠন ; কিন্তু সেখানে জমিদারদের প্রাধান্য থাকায় শ্রেণী ধর্ম ও বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে যে জমিদার শ্রেণী গড়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের শক্তি ও প্রতিপত্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। ঊনবিংশ শতকে রাজনীতিতে যেহেতু জমিদার গোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল সেহেতু বাংলার রাজনীতি তখন ছিল আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি। ব্রিটিশদের তুষ্ট করে যতটা নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় করা যায়। নরহরি কবিরাজের ভাষায় 'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ, ব্রিটিশের বিচারবুদ্ধির উপর অদ্ভুত ভরসা ও উপর্যুপরি পরাজয়ের পর অবসাদ—এই ছিল সেসময়ের (ঊনবিংশ শতক) রাজনীতির আসল কথা (প্রবন্ধ : নরহরি কবিরাজ— *বাঙালী রাজনীতির গোড়ার কথা,* পরিচয়, ১৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা পৃ. ৩৪৫-৪৬)। নূতন জমিদার শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে নূতন মধ্যবিত্তদের স্বার্থ এক না থাকায় ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে এদের হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াইয়ে নেমেছিল মধ্যবিত্তরা।

৪.৯ সারাংশ

বিখ্যাত ইংরেজ অধ্যাপক সীলি (Seeley) কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতামালায় বক্তব্য ছিল ইংরেজরা আকস্মিকভাবে ও বিনা অভিপ্রায়ে ভারতে রাজস্ব স্থাপন করেছিল। কিন্তু নানা তথ্যাদি সে কথা প্রমাণ করছে না। ১৬৮৭ খ্রিঃ মাদ্রাজ ও ১৬৮৯ খ্রিঃ বোম্ভাই কর্তৃপক্ষকে বিলাত থেকে (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিসাররা) যে নির্দেশ পাঠিয়েছিল তাতে 'চিরকালের জন্য ভারতবর্ষে এক বিপুল, সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুঘল ও ব্রিটিশ যুগ), কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ২৭০-২৭১)। একথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে ইংরেজরা তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থে বাংলায় প্রভুত্ব বিস্তারে অগ্রসর হয়। ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করে। এযুগ বিশ্বাসঘাতকতার জয় নয়, এটি ছিল আসলে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধ পুঁজিবাদীদের জয়। ১৭৬৪ খ্রিঃ মীরকাশিমের পরাজয় এবং ১৭৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানী লাভের মধ্য দিয়ে কোম্পানি বাকি দুটি ধাপ অতিক্রম করে আর্থিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ চরিতার্থ করার যন্ত্রগুলিকে করায়ত্ত করে। কোম্পানির বাংলার অর্থনীতিকে সাজিয়ে নেয় নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে, ঔপনিবেশিক স্বার্থে, রাজনৈতিক স্বার্থে। ফলে বাংলার তথা ভারতের চিরাচরিত গ্রামীণ সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে, অর্থনীতিতে ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের সূচনা হয়। দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে সাজাতে থাকে ঔপনিবেশিক স্বার্থের অনুসারী হিসাবে। এই প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ পায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের নিরবচ্ছিন্ন পুঁজি যোগানের প্রয়োজন যেমন তেমনি প্রয়োজন ছিল বাজারের। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে এইদুটি ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছিল। আধুনিক কিছু গবেষক মনে করেন, ভারতের সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোকে ইংরেজরা সাজিয়ে নিতে চেষ্টা করে ঔপনিবেশিক স্বার্থের অনুকূলে। ব্রিটিশ সরকার চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জন্ম দেয় উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর। এই নব্য জমিদার 'বাবুশ্রেণী' নিজেদের নিয়োজিত করেছিল শ্রেণীস্বার্থে ব্রিটিশের চাটুকারে। ইংরেজরা নিজেদেরদ স্বার্থে টিকিয়ে রাখল ক্ষয়িষ্ণু আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে। এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-পুঁজিবাদী শ্রেণী ধ্যানধারণায় পুষ্ট একটি সামন্ত-বুর্জোয়া সংস্কৃতির জন্ম হল বাংলা প্রদেশে যেদি 'বাবু কালচার' নামে পরিচিত।

৪.১০ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় গ্রামসমাজের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছিল?

২। দেওয়ানী লাভের পূর্বে বাংলা মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার কাঠামোটি কেমন ছিল?

৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে জমির মালিক কে ছিল? ঔপনিবেশিক যুগে জমির মালিকানায় কী পরিবর্তন ঘটে?

২। মুর্শিদকুলি খানে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার উপর আলোকপাত কর।

৩। ইংরেজরা কেন সর্বোচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের নীতি গ্রহণ করে?

৪। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। ভূমিরাজস্ব বিষয়ে কী কী প্রশ্নকে কেন্দ্র করে শোর ও কর্নওয়ালিসের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়?

২। কৃষিদ্রব্যের বাণিজ্যিকীকরণ বলতে কী বোঝ?

৩। নূতন ইজারাদারী ব্যবস্থা কী?

৪। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা কেমন ছিল?

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Desai, A. R.—Social Background of Indian Nationalism, Bombay, 1976 (Reprint).

২। Haque, M. Ajijul—The Man Behind the Plough, Dacca, 1980.

৩। Habib, Irfan—The Agrarian System of Maghal India, Bombay, 1963.

৪। Sinha, N. K.—The Economic History of Bengal (From Plasey to Permanent Settlement) Vol.-II Calcutta, 1968.

৫। Stein, Burton (Ed.)—The Making of Agrarian Policy of British India, 1770-1900, New York. 1992.

৬। Kumar, Dharma (Ed.)—The Cambridge Economic History of India, Vol.-II (1757-1970. Delhi, 1984

৭। Singh, Yogendra—Modernization of Indian Tradition, Jaipur, 1986.

৮। চট্টোপাধ্যায়, গৌতম : ইতিহাস অনুসন্ধান, ১১ ও ১৩।

৯। দত্ত, রমেশচন্দ্র : ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস ১৭৫৭-১৮৩৭, কলিকাতা, ১৩৭৯।

১০। রায়, অনিরুদ্ধ : মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৯৬।

১১। ভট্টাচার্য, সব্যসাচী : ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, কলিকাতা, ১৩৯৬।

১২। মামুন, মুনতাজীর (সম্পাঃ) : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী সমাজ, ঢাকা, ১৯৭৫।

পর্যায় — ২

একক ১ ❑ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ : প্রেক্ষাপট এবং ইতিহাসচর্চার ধারা

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ প্রস্তাবনা
১.২ সিপাহী বিদ্রোহ
১.৩ সিপাহী বিদ্রোহের তাৎপর্য
১.৪ মূল্যায়ন
১.৫ অনুশীলনী
১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- সিপাহী বিদ্রোহের কারণ
- সিপাহী বিদ্রোহের তাৎপর্য
- সিপাহী বিদ্রোহ কি নিছকই বিদ্রোহ নাকি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল।

১.১ প্রস্তাবনা

ভারতীয় মননে ১৮৫৭র বিদ্রোহ ‘মহাবিদ্রোহ’ নামে স্থান পেয়েছে। জীবনকে তুচ্ছ করে অগণিত পরিচয়হীন মানুষের শক্তিশালী ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে সামিল হওয়ার স্মৃতি আজও ভারতবাসীকে নাড়া দেয়। আত্মত্যাগ, বীরত্ব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চিরকালই সম্ভ্রম আদায় করেছে। তাই ১৮৫৭র বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে দেশবাসীর এই শ্রদ্ধাভাব অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া, উপমহাদেশব্যাপী অভূতপূর্ব এই উথালপাথালের দ্বিতীয় কোনও নজিরও ভারতের পরবর্তীকালের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ঐ বছরের ঘটনাবলী ঐতিহাসিকদেরও অনেক ভাবিয়েছে ও এখনও ভাবায়। এটা জানা কথা যে, অতীত আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা আবেগ বর্জন করাটাই পছন্দ করেন। তাই তাদের মতামত সর্বসাধারণের স্মৃতির সাথে সবসময় খাপ খায় না—১৮৫৭র বিদ্রোহের ঐতিহাসিক আলোচনাও এটা দেখিয়ে দেয়। আবার এটাও ঠিক যে, পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে অতীতের যথাযথ পুনর্গঠন সবসময় সম্ভব হয় না। তবে এই বিদ্রোহের

সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব সম্ভবত নেই—উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন সময় Narrative of Events (সংক্ষেপে) নামাঙ্কিত বিদ্রোহের জেলাওয়ারি সরকারি বিবরণ বেরিয়েছিল। তবে, যদিও বা তথ্যনির্ভর বাস্তবসম্মত ইতিহাস লেখা গেল, একই ঘটনার একাধিক ব্যাখ্যা অনেক সময় তৈরি হয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে, অথচ ঠিক এই কারণেই এর আলোচনা প্রাণবন্ত ও কৌতুহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছে।

১.২ সিপাহী বিদ্রোহ

১১ই মে ১৮৫৭র প্রত্যুষে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ একদল ভারতীয় সৈন্য (sepoy বা সিপাহী/সিপাই নামে যারা আমাদের কাছে পরিচিত) মীরাট থেকে যমুনা পেরিয়ে দিল্লি শহরে হাজির হয়ে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহর কাছে আর্জি জানায় কোম্পানির বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে। কোম্পানির পেনশনভোগী এই বৃদ্ধ নিমরাজী হতেই সেপাইরা তাঁকে শাহেনশাহ-এ-হিন্দুস্থান ঘোষণা করল। এইভাবে মহাবিদ্রোহের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল।

ইংরেজ প্রভুর বিরুদ্ধে এদেশীয় সৈন্যদের এটাই প্রথম বিদ্রোহ (mutiny) নয়। ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে, নানা কারণে সিপাইদের মধ্যে অনেক আগে থাকতেই অসন্তোষ বাড়ছিল। এটা ঠিক যে, কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলে ভারতীয় সৈন্যদের জীবনে আর্থিক সুরাহা হয় এবং সমাজে সম্মানও বাড়ে কিন্তু এই অভিজ্ঞতা। সততই সুখকর ছিল না। একজন পদাতিক সৈন্য পেত মাত্র সাত টাকা মাসিক বেতন ও একজন সওয়ার বা অশ্বারোহী সৈন্য পেত মাসিক সাতাশ টাকা যা থেকে পোশাক-আশাক, নিজের খাবার, ঘোড়ার দানাপানির জন্য খরচ করার পর তার হাতে থাকত মাত্র কয়েক টাকা। পঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ অধিকারের পর আবার অতিরিক্ত ভাতা গেল কমে। তাছাড়া, ইংরেজ সৈন্যদের তুলনায় পদোন্নতির সুযোগ-সুবিধা ছিল নিতান্তই কম। সবচেয়ে বড় কথা, উর্ধ্বতন ইংরেজদের জাতিবিদ্বেষী মনোভাব ও আচরণ সিপাইকে মনে করিয়ে দিত প্রতি পদক্ষেপে যে, সে হীন। এটা সমসাময়িক ইংরেজ লেখকেরাও মেনেছেন, যেমন T. R. Holmes বলেছেন : “Though he might give the signs of a military genius of Hyder, he knew he could never attain the pay of an English subaltern and that the rank which he might attain after 30 years of faithful service, would not protect him from the insolent dictation of an ensign fresh from England.” অন্যদিকে, ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সৈন্যবাহিনীর সম্প্রসারণের সাথে সাথে ‘কালাপানি’ পেরোনোর বাধ্যবাধকতা, বিদেশবিভুঁইয়ে অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ, ক্যান্টনমেন্টে নানা জাত ও অঞ্চলের মানুষের সাথে মেলামেশার অসুবিধা ইত্যাদি কারণে এই বাহিনীর মেরুদণ্ডস্বরূপ রাজপুত ও ভূমিহার ব্রাহ্মণ সিপাইদের মধ্যে জাত খোয়ানোর আশঙ্কা বাড়ছিল। ক্যান্টনমেন্টগুলোতে ইউরোপীয় মিশনারীদের অবাধ যাতায়াত আবার ইতিমধ্যে এই গুজবও ছড়িয়েছিল যে, ইংরেজরা ভারতীয়দের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চায়। কোম্পানির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ করে মাদ্রাজি সৈন্যরা ১৮০৬এ; তারপর কোম্পানির প্রধান সৈন্যদল বেঙ্গাল আর্মি (Bengal Army) একাধিকবার—১৮১৪তে জাভায়, ১৮৩৪এ গোয়ালিয়রে, ১৮৩৯ থেকে ১৮৪২র মধ্যে আফগানিস্তানে এবং বর্মায় ১৮২৮ ও ১৮৫২তে বিদ্রোহ করে।

এই যখন পরিস্থিতি, তখন কোম্পানির দ্বারা প্রবর্তিত নতুন এনফিল্ড রাইফেলের (Enfield Rifle) কার্তুজ ভারতীয়দের দিশেহারা করে দিয়ে মহাবিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ যোগালো। অধ্যাপক সুগত বোস ও অধ্যাপক আয়েষা জালালের ভাষায় : "The sepoys in the company's army were already suffering from a deep sense of social and economic unease when certain greased cartridges for the new Lee Enfield rifle supplied the immediate fuel to spark off reslt." সিপাইদের মধ্যে এই ধারণা তৈরি হল যে, নতুন কার্তুজের গায়ে লাগানো চর্বি আসলে গোরু ও শুয়োরের এবং তা ব্যবহার করতে বাধ্য করে ইংরেজরা তাদের ধর্মনাশের চেষ্টায় আছে। মীরাটিদের আগেই ১৮৫৭'র মার্চ মাসে বহরমপুরের ১৯তম দেশীয় পদাতিক বাহিনীর (19th Native Infantry) সৈন্যরা এই কার্তুজ ব্যবহার করতে গররাজী হলে তাদের নিরস্ত্র করে শাস্তি দেওয়া হয়। এরই ফলে ৩৪তম নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির মঙ্গল পান্ডে ঊর্ধ্বতন এক ইংরেজ অফিসারের ওপর গুলি চালালে তার ফাঁসি হয় ও তার সঙ্গীদের নিরস্ত্র করা হয়। ওউধ রেজিমেন্টের একই হাল হল। সাথীদের এই অসম্মানই ১০ই মে রাত্রিতে মীরাটের ১১তম নেটিভ ক্যাভলরির সিপাইদের বিদ্রোহ করার মতো চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে।

১৮৫৭'র মে মাসের এই বিদ্রোহ তাহলে বহুদিনের অবমাননা ভোগ ও পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তবে, আগের ঘটনাগুলির সাথে এর পার্থক্য হল এই যে, এর ছোঁয়াচে দ্রুত গোটা উপমহাদেশ জুড়ে দেখা দিল ব্যাপক হাঙ্গামা যাতে সামিল হল কোম্পানির প্রায় আড়াই লক্ষ ভারতীয় সৈন্যের অর্ধেক। বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রায় প্রতিটা ক্যান্টনমেন্ট ও বোম্বাই'র বেশ কয়েকটা এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। কেবলমাত্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিকে শান্ত থাকতে দেখা যায়।

সিপাইদের সাথে সমাজের অন্যান্যরাও যোগ দিলে সিপাই বিদ্রোহ (sepoy mutiny) পরিণত হল এক ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে (civil rebellion)। বিদ্রোহ সবচেয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করে ইংরেজ দ্বারা সর্বশেষ অধিকৃত প্রদেশ অযোধ্যায়। এখানে নবাবের নামে তালুকদারদের (যাদের মধ্যে প্রায় একুশ হাজার জমিদারী হারিয়েছিল নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায়) সাথে যোগ দেয় চাষী ও কারিগর। উন্মত্ত জনতা আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে ইংরেজ হত্যা করে ও লুঠতরাজ-ভাঙচুর চালায়। লক্ষ্ণৌতে বেগম হজরত মহল বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন। তাঁর পুত্র বিরজিস কাদিরকে নবাব ঘোষণা করে বিদ্রোহীরা নতুন শাসনব্যবস্থা চালু করল। বেরিলীতে মানুষ বরখাস্ত হওয়া রোহিলা শাসকদের এক উত্তরসূরী খান বাহাদুরকে নেতা মানে। ইংরেজদের পেনশনভোগী খান বাহাদুর প্রথমদিকে উৎসাহী না হলেও—এমনকি স্থানীয় ইংরেজ প্রশাসকের কাছে আসন্ন বিদ্রোহের খবর পৌঁছে দিলেও—তা অগ্রাহ্য হওয়ায় পরে মহা উৎসাহে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেন। বিহারে জগদীশপুরের সত্তর বছর বয়সি জমিদার কুঁয়র সিং সিপাইদের সাথে যোগ দেন। কোম্পানির জমি অধিগ্রহণ নীতির কারণে নিঃস্ব হওয়া এই জমিদারদেরও প্রথমে বিদ্রোহ করার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। কানপুরে বিদ্রোহীদের নেতা হলেন সর্বশেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাওয়ের দত্তকপুত্র নানা সাহেব। বড়লাট ডালহৌসীর একই স্বত্ববিলোপ নীতির আরে শিকার ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাঈ মহাবিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেত্রী। সপুত্রক এই রানিকে ইংরেজরা দত্তক নিতে বাধা দিলে ১৮৫৩'য় রাজ্য হারিয়ে তিনি তাদের প্রধান শত্রুতে পরিণত হলেন।

প্রতিটা অঞ্চলেই জনসাধারণকে দেখা যায় সিপাই ও বিদ্রোহী নেতাদের সাথে সামিল হতে। সাধারণ মানুষ রাজন্যবর্গ ও অভিজাতদের তুলনায় ইংরেজ শাসনের বেশি বই কম শিকার হয়নি। নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার দরুন করভার বৃদ্ধি, করসংগ্রহের কড়াকড়ি, নিষ্কর জমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি চাষীকে দারুণ অসুবিধায় ফেলে। ক্রমশ মহাজন ও জমিদারের ঋণের জালে জড়িয়ে যাওয়া, নিজজমি থেকে উৎখাত হওয়া, ভাগচাষী বা মজুরে পরিণত হওয়া—উত্তরোত্তর এই হয়ে দাঁড়ায় চাষীর হাল। এটাই কারণ কেন ১৮৫৭'র বিদ্রোহী সিপাইরা ঐতিহাসিকদের কাছে 'উর্দ্দীধারী চাষী' ('peasant in uniform') আখ্যা পেয়েছে। আসলে কর্মক্ষেত্রে নানা অসুবিধার সাথে সাথে পরিবারের অর্থনৈতিক দুর্দশাও সিপাইকে বিপর্যস্ত করে। কারিগরদেরও অবস্থার অবনতি হয় ইংরেজ আমলে। দেশীয় শাসকেরা গদিচ্যুত হলে তারা একের পর এক পৃষ্ঠপোষক হারাতে থাকে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোম্পানি তাদের কাছ থেকে কম দামে জিনিস কিনে আর বিলিতি পণ্যের আমদানি বাড়িয়ে কারিগরদের দারুণ অসুবিধায় ফেলে। কষ্ট সহ্য করেও ভারতীয় কারিগরেরা আপনাপন পেশায় কোনওমতে টিকে থাকার চেষ্টা করে কিংবা অহেতুক ভিড় বাড়ায় কৃষিক্ষেত্রে।

তীব্র উত্তেজনাপরিপূর্ণ, জনসমর্থনপুষ্ট ও ব্যাপকাকার এই মহাবিদ্রোহ—যা একসময় ইংরেজদের মনে ভয় ধরায় যে, পলাশীর যুদ্ধজয়ের ঠিক একশ বছর পরে তাদের রাজত্বের অবসান আসন্ন—তাও একদিন শেষ হল। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ইংরেজ সামরিকবাহিনীর সাথে সিপাইদের শেষ অবধি পেরে ওঠা স্বভাবতই সম্ভভব হয়নি। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, যোগাযোগের অভাব, কার্যকরী নেতৃত্বের অনুপস্থিতি এবং ভারতীয় সমাজেরই কয়েকটি শ্রেণীর কাছ থেকে সমর্থন না আসায় সিপাইরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। উত্তর ও মধ্য ভারত এবং পশ্চিমভারতের একটি অংশ ছাড়া উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলই বিদ্রোহে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকে। কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর অর্ধেক সিপাই বিদ্রোহে সামিল হয়নি মনে রাখতে হবে। অভিজাত নেতারা কয়েকবার পরিস্থিতি ও সুযোগ অনুযায়ী দল বদলায়। বাংলার ও বোম্বাই'র আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা এই বিদ্রোহকে মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়া মনে করে শঙ্কিত বোধ করে। তাছাড়া বাংলায় ইংরেজ সৈন্যদের উপস্থিতিও একটা কারণ কেন এখানে বিদ্রোহ অভ্যুত্থানে পরিণত হতে পারেনি। মারাঠাদের বিদ্রোহে হায়দ্রাবাদের নিজাম সামিল না হওয়াটাই শ্রেয় মনে করেন। শিখ জমিদারদের বিরোধিতার কারণে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ব্যাপক হতে পারেনি। ইংরেজ আমলে সুবিধাপ্রাপ্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও দূরে সরে থাকে। তা সত্ত্বেও ১৮৫৭'র গণ-অভ্যুত্থান প্রায় এক বছর অবধি চলে; এমনকি ১৮৫৭'র জুলাই মাসে বড়লাট ক্যানিং'র বিদ্রোহ শেষের ঘোষণার পরেও কিছুদিন অবধি সিপাই ও সাধারণ মানুষ হাল ছাড়ে না। উল্লেখযোগ্য যে, এই বিদ্রোহ দমন করতে কোম্পানিকে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছিল।

১.৩ সিপাহী বিদ্রোহের তাৎপর্য

১৯৫৭'র অভ্যুত্থানের ঘটনাবলী ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে জানা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু ততোধিক কঠিন এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। এই কাজই ঐতিহাসিকদের ব্যস্ত রেখেছে আর প্রায় দেড়শো বছর পরেও এ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মতৈক্য হয়নি। এই বিদ্রোহ কি নিছকই এক সিপাহী বিদ্রোহ নাকি প্রকৃতই এক গণবিদ্রোহ? এই গণবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া চলে কি?

এটা ঘৃণ্য ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় জেহাদ নাকি এক ধর্মনিরপেক্ষ সংগ্রাম? ইংরেজ উপনিবেশ রাজবিরোধী এক অভ্যুত্থান নাকি স্রেফ এদেশীয়দের মধ্যে বোঝাপড়ার এক অধ্যায়? ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জমিদারদের সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া নাকি সমাজের নিচের তলার মানুষের আপন সংগ্রাম? এমন একাধিক প্রশ্ন ঐতিহাসিকদের ভাবিয়েছে এবং আপনাপন বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তাঁরা চেষ্টা করেছেন তথ্য বিশ্লেষণ করে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে।

১৮৫৭'র পরে পরে এমনকি আরও বেশ কিছুকাল পরে অবধি সরকারি প্রতিবেদন ও সমসাময়িকদের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থকে নির্ভর করে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা যে ইতিহাস লেখেন তাতে 'সিপাই বিদ্রোহের' ধারণাটাই গুরুত্ব পায়। তাছাড়া, শাসকের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এই জাতীয় বই'এ—যেমন চার্লস বলের 'দি হিস্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি', জন কে'র 'হিস্ট্রি অফ দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি অফ এইটিন ফিফটি সেভেন-ফিফটি এইট' ও কর্নেল ম্যালেসনের 'দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি অফ এইটিন ফিফটি সেভেন' (Charles Ball, *The History of the Indian Mutiny,* 1858-59; John Kaye, *History of the Indian Mutiny of 1857-58,* 1857-98; Col. Malleson, *The Indian Mutiny of 1857,* 1912)—ভারতীয় সৈন্যদের আচরণকে আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা ও ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসের এক শিক্ষামূলক অধ্যায় হিসাবেই দেখা হয়। এই মতানুযায়ী কোম্পানির কয়েকটি ভুলের মাসুলস্বরূপ এই বিদ্রোহ ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিকে সাময়িকভাবে ব্যাহত করে মাত্র। এই সময়ই জন্মায় 'ষড়যন্ত্রতত্ত্ব' ('conspiracy theory'), যে তত্ত্ব অনুযায়ী এই বিদ্রোহের সংগঠক ক্ষমতাচ্যুত ভারতীয় অভিজাতরা।

বিশ শতকের প্রথম দিকে এক সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্রোহের ব্যাখ্যা করলেন ভি. ডি. সভরকর (V. D. Savarkar, *The Volcano on the First War of Indian Independence,* 1909)। এই লেখকের মতে, ধর্মরক্ষা ও স্বরাজ হাসিল করার উদ্দেশ্যেই ভারতীয়রা নানা সাহেব ও মৌলবী অজিমুল্লাহর মতো মানুষের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এই বই'এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল ভারতবাসীর মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা। অতএব 'চক্রান্তকারীরাও' পরিণত হল দেশবাসীর 'নায়কে' ('heroes')।

১৯৫৭'য় প্রকাশিত হল অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'এইটিন ফিফটি সেভেন' (*Eighteen Fifty Seven*) ও অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'দি সিপয় মিউটিনি অ্যান্ড দি রিভোল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন' (*The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857*), এবং ১৯৬১তে তারাচাঁদের 'হিস্ট্রি অফ দি ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' (*The History of the Freedom Movement in India*)। ঈষৎ পার্থক্য সত্ত্বেও এই তিন লেখকের মূল বক্তব্য এক। সংক্ষেপে এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতার যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া যায় না; সিপাইদের সাথে যোগ দেওয়া গুণ্ডা-বদমাশ সহ সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সুযোগ নিয়ে আপনাপন স্বার্থ হাসিল করা; বিদ্রোহীদের জয় হলে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হত। অধ্যাপক সেনের মতে, বিদ্রোহীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার

(যা একটি আধুনিক আদর্শ) কোনও ধারণাই ছিল না : “The patriots of Oudh fought for their king and country but thy were not champions of freedom, for they had no conception of individual liberty. On the contrary, they would, if they could, revive the old order and perpetuate everything it stood for..........” অধ্যাপক মজুমদার মন্তব্য করেন যে, ১৮৫৭'র বিদ্রোহের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়নি বরং তা মৃতপ্রায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মরণকামড় মাত্র : “The miseries and bloodshed of 1857-58 were not the birth-pangs of a freedom movement in India, but the dying growns of an absolute aristocracy and centrifugal feudalism of the mediaeval age.” বলাবাহুল্য, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, গণতন্ত্র, সাংবিধানিক আন্দোলন পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে পশ্চিমী আদলে গড়ে ওঠা আধুনিক ভারতীয় ধারণাগুলির সাথে ১৮৫৭'র বিদ্রোহীদের ধ্যানধারণা ও কার্যকলাপ খাপ খায় না বলেই এই ধরনের ইতিহাস রচনায় তারা হয়ে পড়ে মধ্যযুগীয় ও পশ্চাতমুখী। সম্প্রতি এক ঐতিহাসিক এমনই মন্তব্য করেছেন : “The Indian writings on 1857 were produced within the wider framework of nationalist discourse which, while granting the people their ability to fight for freedom, was equally eager to dismiss all actions that did not fit into the linear progression of nationalist politics.”

অথচ একই বছরে প্রকাশিত অধ্যাপক শশীভূষণ চৌধুরীর ‘সিভিল রেবেলিয়ন ইন দি ইন্ডিয়ান মিউটিনিজ’র (*Civil Rebellion in the Indian Mutinies, 1857-58*) বক্তব্য অন্য ধরনের। যেখানে তাঁর সমসাময়িকেরা জোর দেন শহরাঞ্চলে সিপাইদের ওপর, সেখানে তিনি সবিস্তারে আলোচনা করলেন বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের। তা করতে গিয়ে অধ্যাপক চৌধুরী পৌঁছলেন বিপরীত এক সিদ্ধান্তে; তাঁর মতে, ইংরেজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিপাইদের অসন্তোষের সঙ্গে অভিজাতদের অভিযোগ ও জনসাধারণের দুরবস্থাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ এইসব মিলেমিশে গিয়েই ঘটিয়েছিল ১৮৫৭'র অভূতপূর্ব উপমহাদেশব্যাপী গণ-অভ্যুত্থান। আর তা যদি হয়, তাহলে এই বিদ্রোহকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একজাতীয় সংগ্রাম হিসাবে ভাবতে বাধা কোথায়? অধ্যাপক চৌধুরীর ভাষায় : “The grievances under which the population laboured, the hatred of the British amongst the higher classes, the restiveness of the agrarian classes as manifested in the disturbances of the earlier period, and not any single cause, singly considered—must be regarded as the true source of revolt.” সমসাময়িক এক মার্কিন ঐতিহাসিকেরও একই মত।

১৮৫৭'র বিদ্রোহের ইতিহাস রচনায় নতুন দিকনির্দেশ করলেন ইংরেজ ঐতিহাসিক এরিক স্টোকাস ‘দি পেজেন্ট অ্যান্ড দি রাজ’ (*The peasant and the Raj, Studies in Agrarian Society and peasant Revolt in colonial India*) গ্রন্থে। এই বিদ্রোহকে তিনি ইংরেজ দ্বারা ভারতজয় পরবর্তীকালের অনিবার্য লক্ষণ (‘Post-pacification revolt’) বলে দাবি করলেন। তাঁর মতে, বিদেশী শাসনের প্রতিষ্ঠা পর্বে প্রাচীন সমাজের প্রতিরোধ (‘primary resistance’) ও পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাংবিধানিক আন্দোলনের (‘secondary resistance’) এটা মধ্যবর্তী এক পর্ব। অধ্যাপক স্টোকসের মতে, প্রাচীন ব্যবস্থার

অবসান ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্থাপনার সংযোগকালে যখন নতুন ব্যবস্থার প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে তখন তার বিরুদ্ধে এই ধরনের ব্যাপক প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে, এই মতানুযায়ী শাসকবিরোধী এই বিদ্রোহে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সামিল হয় বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাগতিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই; কেবল বিদেশী শাসকের প্রতি সর্বজনীন বিদ্বেষ ধর্মীয় অনুশাসনের রূপে তাদের এককাট্টা করে। তাঁর ভাষায় : "[The] formal power superstructure having been wholly or partially dismantled at pacification, colonial rule engages society more directly and evokes in consequence a more widespread reaction should a revolutionary conjuncture occur. But the reaction will be a really of heterogeneous elements, reflecting compartmentalism and uneven development, and held together loosely by anti-foreign sentiment expressed in the form of religious ideology." অধ্যাপক স্টোকস বলেন যে, নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারেরাই এক সময় বিদ্রোহী নায়কে পরিণত হয়েছিল—অর্থাৎ, ক্ষুদ্র জাগতিক স্বার্থ রক্ষা করতেই তারা এই সময় তৎপর হয়েছিল। তাই যে জমিদারদের স্বার্থে ঘা লাগেনি এবং যারা লাভবান হয়েছিল তারা বিদ্রোহ তো করেইনি বরং সমর্থন যোগায় বিদেশী শাসককে। অধ্যাপক স্টোকস তাহলে অধ্যাপক চৌধুরীর মতো গণ-অভ্যুত্থানকে (civil rebellion) গুরুত্ব দিলেও বিদ্রোহীদের মধ্যে মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পান না। বরং তাঁর মতে, বিভিন্ন এলাকার মানুষ অন্ধের মতো তাদের প্রভুদের রণক্ষেত্রে অনুসরণ করে। ("played little part in the fight or atmost followed the behests of its caste superiors")।

একই বিশ্লেষণী ধারায় লেখা—অর্থাৎ ইংরেজ আমলের নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিদ্রোহের কারণ খোঁজা ও এইভাবে বিদ্রোহের প্রকৃতি বোঝা—'অবধ ইন রিভোল্ট'র লেখক অধ্যাপক রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত কিন্তু অন্য ধরনের। তাঁর মতে, বিভিন্নভাবে হলেও অযোধ্যার তালুকদারেরা ও তাদের চাষী-প্রজারা উভয়ই ইংরেজ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার শিকার হয়। আর যেহেতু প্রাচীন ব্যবস্থার ভাঙন উভয়ের জন্য সর্বনাশ ডেকেছিল সেহেতু তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শ্রেণীবিরোধ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজ শত্রুর ('common enemy') মোকাবিলা করা। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় : "In fact the imposition of British rule and the subsequent policies caused an upheaval in the rural world. The Raj assaulted the traditional view of social norms and obligations, the realm of mutual interdependence between the raja and the peasant that constituted the moral economy. In the revolt of 1857, in the uprising of the entire agrarian population, this moral eco, the world of paternalism and beneficience, reasserted itself. Together the talukdar and peasant resisted intervention in their cherished world."

১৮৫৭'র বিদ্রোহের ইতিহাস লেখার ইতিহাস (historiography) আরেকবার মোড় ঘুরলো অধ্যাপক গৌতম ভদ্র'র প্রবন্ধ 'ফোর রেবেলস অফ এইটিন ফিফটি সেভেন'এ ('Four Rebels of Eighteen fifty seven')। 'নিম্নবর্গীয়' (subaltern) দৃষ্টিভঙ্গীর এই ঐতিহাসিক দাবি করলেন যে, এযাবৎকাল এই বিদ্রোহের যাবতীয় রচনা এলিটিয় (elitist) দৃষ্টিভঙ্গীপুষ্ট। তাঁর মতে, যেভাবেই এই ঘটনার চরিত্রায়ণ (characterisation)

হোক না কেন তা একপেশে হতে বাধ্য কারণ তা থেকে বাদ পড়েছে সাধারণ মানুষের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন। তাঁর ভাষায় : "There is a curious complicity between all the principal modes of historiography which have engaged so in the study of the rebellion of 1857.......In all these representations what has been missed out is the ordinary rebel, *his* role and *his* perception of alien rule and contemporary crises." তিনি ১৮৫৭'র বিদ্রোহের চারটি অনামী-নামী চরিত্র—জাঠ চাষী শাহ মল, ক্ষুদ্র জমিদার দেবী সিং, আদিবাসী কোল যুবক গোনু ও মৌলবী আহমদুল্লাহ খান—উপস্থিত করে দেখান যে, বিদ্রোহের মুহূর্তে স্বকীয় চেতনাসম্পন্ন সাধারণ মানুষও নিজ নিজ জগতে কতদূর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সমাজের ওপরতলার মানুষের প্রভাব ও নির্দেশনা ছাড়াই : ".............such leaders far from being incidental, [were] indeed an integral part of popular insurgency. They asserted themselves through the act of insurgency and took the initiative hitherto denied to them by the dominant classes; and in doing so they put their stamp on the course of the rebellion............" এই মতানুযায়ী তাহলে সাধারণ মানুষের নিজ ভূমিকাকে বাদ দিয়ে ১৮৫৭'র বিদ্রোহের কোনও বর্ণনাই সম্পূর্ণ হয় না; আর জনসাধারণ কেবল নেতাদের অনুসরণ করেনি, অগণিত ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই হয়ে উঠেছিল নেতা।

একইভাবে অধ্যাপক তাপ্তী রায় দেখিয়েছেন, বুন্দেলখণ্ডে স্থানীয় সিপাইরা, রাজারা, ঠাকুরেরা ও জনসাধারণ ১৮৫৭'য় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও ধ্যানধারণা অনুযায়ী এবং আপনাপন পদ্ধতিতে সচেতনভাবে ঔপনিবেশিক ইমারৎ ভেঙে বিকল্প ব্যবস্থা স্থাপনে সচেষ্ট হয়। যেহেতু জোর পড়েছে বিভিন্ন স্তরের বিদ্রোহীদের বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপের ওপর সেহেতু বর্ণনা হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য। সম্প্রতি একাধিক প্রবন্ধে (যেমন, 'The Sepoy Mutinies Revisited') অধ্যাপক রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায় একইভাবে সিপাইদের কার্যকলাপের 'ইতিবাচক' বৈশিষ্ট্যের ওপর দৃষ্টিপাত করেছেন। ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ'র 'পেজেন্ট ইনসারজেন্সী ইন কলোনিয়ন ইন্ডিয়া' (*Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,* New Delhi, 1983) ও সাধারণভাবে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচিন্তা ও শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত এই ঐতিহাসিক সিপাইদের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন সাংগঠিক শক্তি, সচেতনতা যা তাদের সাহায্য করে শত্রুমিত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে ও সহজাত দৃঢ়তা যার বলে ঘৃণ্য ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রতি তারা কঠিন আঘাত হেনেছে। ইংরেজ আমলে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অবক্ষয় ও সঙ্কট চাষীদের মতো সৈন্যদেরও যোগায় সাহস।

১.৪ মূল্যায়ন

১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহ তাহলে ভারতীয় ইতিহাসের এক জটিল অধ্যায়, যার ওপর কোনও একটি 'লেবেল' (label) আরোপ করার অর্থ সরলীকরণ। 'জাতীয়' অভ্যুত্থান বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা হয়তো এই বিদ্রোহ ছিল না কারণ উপমহাদেশে তখনও এই অর্থে ভারতীয় জাতিগঠন হয়নি। তবে এটাও ঠিক যে, বিদ্রোহীদের মধ্যে স্বদেশ-চেতনা ও স্বদেশভক্তির অভাব ছিল না কারণ তা না থাকলে ইংরেজ রাজত্বের অবসান

ঘটানোর জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ এই অভ্যুত্থানে সামিল হত না। অধ্যাপক সুগত বোস ও অধ্যাপক আয়েষা জালালের মন্তব্য : "The 1857 revolt was infused with an incohate sense of patriotism, if not nationalism, to the extent that it had a shared objective of putting an end of colonial rule." বস্তুত, যে কারণেই বিভিন্ন শ্রেণী এই বিদ্রোহে যোগ দিক না কেন, সকলেরই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফিরিঙ্গীদের দেশছাড়া করানো। দ্বিতীয়ত, এই বিদ্রোহ কি ভারতীয় সমাজের একাংশের ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক ধর্মীয় জেহাদ? প্রশ্নটা তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এই লেবেল আরোপ করে অনেক সময় এর গুরুত্ব হ্রাসের চেষ্টা হয়েছে। এই মতের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা সমসাময়িক ইংরেজ কর্মচারীরা। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ১৮৫৭'র অভ্যুত্থান আসলে বিক্ষুব্ধ মুসলমান অভিজাতদের ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। লক্ষ্যণীয় যে, উনিশ শতকের শেষদিকে সৈয়দ আহমেদ খাঁ'র মতো আধুনিক মুসলমানেরা এই মতের বিরোধিতা করে ইংরেজ প্রশাসনের কাছে আনুগত্য প্রমাণের চেষ্টা করলেও ১৯৪৭'র পরে আই. এইচ. ক্যুরেশী ও সৈয়দ মৈনুল হকের মতো একাধিক মুসলমান বুদ্ধিজীবী এই বিদ্রোহকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা প্রমাণ করতে গিয়ে আরেকবার মুসলমান বিদ্রোহীদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে বসেন। কোনও সন্দেহ নেই ১৮৫৭'র বিদ্রোহে ধর্মের এক বিশেষ স্থান ছিল, ধর্ম পেয়েছিল একটা বিশেষ মাত্রা। এটা ঠিক যে, অসংখ্য মুসলমান অভিজাত, গাজি, জমিদার প্রভৃতি বিদ্রোহ করতে গিয়ে ধর্মের দোহাই পাড়ে। আবার এটাও ঠিক যে, নিজেদের সমাজের মধ্যে থেকেই এর বিরোধিতা আসে : আযোধ্যায় শিয়া শাসকের প্রত্যাবর্তন সুন্নিদের পছন্দসই হয়নি, আবার, সাফল্য অনিশ্চিত জেনেও অনেকে জেহাদ ঘোষণা করতেই চায়নি। মোটের ওপর আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ১৮৫৭'র বিদ্রোহীদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সংহতি মেনে নিয়েছেন; একাধিক ঘোষণাপত্রে (proclamation) হিন্দু ও মুসলমান, দুই গোষ্ঠীর মানুষকেই ধর্মের নামে বিদ্রোহে ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল হতে আহ্বান করা হয়। সম্প্রতি অধ্যাপক রজতকান্ত রায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, ঘোষণাপত্রে 'হিন্দুস্তানের হিন্দু ও মুসলমান' শব্দাবলীর মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহীরা নিজেদের সংহতি শুধু নয় অভূতপূর্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ স্থাপন করতে চায়। তাঁর ভাষায় : "..........the term 'the Hindus and Musalmans of Hindustan'............was not used in the loose sence of common parlance, indicating the two major communities of the subcontinent, but was on the contrary a sort of constructed political term...........". তৃতীয়ত, সাম্প্রতিক সব ঐতিহাসিকই মেনে নিয়েছেন যে, কৃষি অসন্তোষ ও কৃষক বিদ্রোহ ১৮৫৭'র অন্যতম প্রধান দিক। এই দিকটা উপেক্ষা করে সমসাময়িক ইংরেজ কর্মচারী ও লেখকেরা নিজেদের মনোবল বাড়াবার অহেতুক চেষ্টা করে মাত্র। অধ্যাপক সেন ও অধ্যাপক মজুমদার এই সিদ্ধান্তে আসতে গিয়ে কৃষক বিদ্রোহ-সংক্রান্ত তথ্যগুলোই এড়িয়ে গেছেন মনে রাখতে হবে। তবে কৃষি-অভ্যুত্থানে একাধিক স্তর ছিল এটাও অস্বীকার করা যায় না। তালুকদার, জমিদার, স্বত্বাধিকারী চাষী, ভাগচাষী, আদিবাসী সকলেই এই বিদ্রোহে সামিল হয়, তবে বিভিন্ন কারণে। অধ্যাপক স্টোকসের সিদ্ধান্ত-জনসাধারণ সমাজের শিরোমণিদের অনুসরণ করে মাত্র-কিছুদূর যেমন ঠিক, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের অযোধ্যার কৃষি-সমাজের সংহতির বিবরণ, আবার তেমনই ঠিক অধ্যাপক ভদ্র ও অধ্যাপক রায়ের দাবি যে, সমাজের নিচের তলার মানুষ প্রায়শই বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে চায়।

বিদ্রোহের অভুতপূর্ব ব্যাপ্তি ও তীব্রতা, অসংখ্যা জটিলতা, অসাধারণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগ, প্রচণ্ড হিংসা ও উত্তেজনা, সবশেষে ব্যর্থতা ও হতাশা—সব মিলিয়ে ১৮৫৭'র ঘটনাবলী আজও আমাদের নজর কাড়ে। তাই অধ্যাপক স্টোকসকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে, এই বিদ্রোহ আজও এদেশের মানুষের মনে দৃঢ়মূল হয়ে থেকে গেছে : "To India 1857 bequeathed a more living and enduring presence."

১.৫ অনুশীলনী

বিশদ উত্তরের প্রশ্ন :

১। ১৮৫৭'র বিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' গণ্য করা যায় কী?

২। ১৮৫৭'র বিদ্রোহ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতামত আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের কারণগুলি কী?

২। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে লিখুন।

৩। ১৮৫৭'র সিপাই বিদ্রোহ কবে আরম্ভ হয়?

৪। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের কয়েকজন নেতার নাম করুন।

৫। স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবর্তক কে?

৬। ১৮৫৭'র বিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ' কে প্রথম বলেন?

৭। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের 'নিম্নবর্গীয়' দৃষ্টিভঙ্গীর ঐতিহাসিকদের নাম করুন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

1. Sugata Bose and Ayesha Jalal, *Modern South Asia History, Culture, Political Economy,* Delhi, 1999.
2. Gautam Bhadra 'Four Rebels of Eighteen-Fifty-Seven' in Ranajit Guha and Gayatri Chakraborty Spivok (eds.), *Selected Subaltern Studies.* New York and Oxford, 1988.
3. Rudrangshu Mukherjee, *Awadh in Revolt. A Study of Popular Resistance.* Delhi, 1984.
4. Eric Stokes, *The Peasant and the Raj : Studies in Agrarian Society and Peasant Rebellion in Colonial India.* London, 1978.

একক ২(ক) ❑ সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী পর্বে ১৮৫৮ সালের মহারানীর শাসনের ঘোষণা এবং ১৮৬১ সালের আইন

গঠন

২(ক).০ উদ্দেশ্য

২(ক).১ প্রস্তাবনা

২(ক).২ ইংল্যান্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণের পটভূমিকা

২(ক).৩ ১৮৫৮ সালের মহারানীর ঘোষণার (Queens' Proclamation of 1858) তাৎপর্য

২(ক).৪ ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্ট ও তার গুরুত্ব

২(ক).৫ সারাংশ

২(ক).৬ অনুশীলনী

২(ক).৭ গ্রন্থপঞ্জী

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

২(ক).০ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন
- কোন পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে মহারানীর শাসন প্রচলিত হয়?
- জনজীবনে এর গুরুত্ব কি ছিল?
- ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট কেন চালু হয়?
- প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব কি ছিল?

২(ক).১ প্রস্তাবনা

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী ভারতের ইতিহাস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে দেশীয় রাজন্যবর্গের পরাজয়ের ইতিহাস। এই পর্ব প্রমাণ করে যে ভারতের রাজনৈতিক সংহতি নষ্ট প্রায়। এই সুযোগে কোম্পানি

তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ঠিক একশত বৎসর পরে ১৮৫৭ সালে কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে না হলেও ব্যাপকভাবে ভারতে এক মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়। টলায়মান ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যদিও এই বিদ্রোহ দমন করে, তাহলেও মহাবিদ্রোহ তাদের সশঙ্কিত করে তোলে। মূল্যায়ন করা হয় একশত বৎসরের কোম্পানির শাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে। এই প্রেক্ষিতে অবসান হয় কোম্পানির শাসনপর্বের। ভারতের শাসনভার সরাসরি ন্যস্ত হয় ইংল্যন্ডেশ্বরীর উপরে।

২(ক).২ ইংল্যান্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণের পটভূমিকা

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অভ্যুত্থান ও ব্যাপ্তি ইংল্যান্ডের জনসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইংল্যান্ডে এই ধরণের সমালোচনাও করা হতে থাকে যে কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক ও তদ্‌জনিত লাভ—কাজেই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কোম্পানির পক্ষে অনুচিত কাজ হয়েছে। লর্ড পামারস্টোন তাঁর বিখ্যাত ভাষণে কোম্পানির শাসনকার্য পরিচালনাকে অত্যন্ত দায়িত্বহীন বলে অভিযোগ করেন। লর্ড পামারস্টোন উন্নততর শাসনব্যবস্থা ভারতে প্রচলন করার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে বিল উপস্থাপন করেন। স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানি তাদের একশত বৎসরের একচেটিয়া অধিকার ছেড়ে দিতে রাজী হয়নি। কোম্পানির বক্তব্য ছিল যে সিপাহী বিদ্রোহের উত্থানের জন্য কোম্পানি একা দায়ী নয়। কারণ যে কোনও সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত নিতেন ব্রিটেনের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সদস্যবৃন্দ। কাজেই মহাবিদ্রোহ যদি হয়েই থাকে তার দায়ভাগ ব্রিটেনের উপরও বর্তায়।

একথা অনস্বীকার্য যে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট জারী করার পর থেকেই কোম্পানির ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছিল। এরকম প্রশ্নও উঠেছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো বাণিজ্যিক সংস্থার উপরে ভারতের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া যথাযথ হবে কি না। ইংল্যান্ডে টোরি এবং হুইগ উভয় দলই কোম্পানির আধিপত্য খর্ব করার পক্ষে ছিল। অর্থাৎ কোম্পানির বিদায় মুহূর্ত ঘনিয়েই এসেছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ কোম্পানির অন্তিম মুহূর্তটিকে ত্বরান্বিত করে মাত্র।

২(ক).৩ ১৮৫৮ সালের মহারানীর ঘোষণার তাৎপর্য

১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানির শাসনের অবসান হয়। প্রশাসনিক ব্যাপারে মহারানীর তরফ থেকে সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হয় ভারত সচিবকে। কোম্পানির সামরিক ও নৌশক্তির নিয়ন্ত্রণ সরাসরি মহারানীর দপ্তরের উপর ন্যাস্ত হয়। বোর্ড অফ কন্ট্রোল এবং কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্‌দের আর কোনও অস্তিত্ব রইল না। ভারতের যাবতীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য একটি কাউন্সিল বা উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হয়। ভারত সচিব এই কাউন্সিলের সাহায্যে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি মূলত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তাঁর কাজের জবাবদিহি একমাত্র পার্লামেন্টের কাছেই করতে হত।

ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫। এদের মধ্যে সাতজনকে নির্বাচিত করতেন কোর্ট অফ ডিরেক্টরসরা। বাকী আটজনকে মনোনীত করতেন ব্রিটিশ সরকার। কাউন্সিলের অর্ধেকের বেশি সদস্য হতেন তাঁরাই যাঁদের ভারতে অবস্থানকালের ব্যাপ্তি ছিল দশ বছরেরও বেশি। ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীরা প্রত্যেকেই তাঁদের বেতন পেতেন ভারতীয় রাজস্ব থেকে।

এইচ. এস. ক্যানিংহাম মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় প্রশাসন ব্রিটিশরাজের হাতে চলে আসাটা'rather a formal than a substantial change' আসলে বড় কোনও মৌলিক পরিবর্তন এই ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে হয়নি। ভারত সচিব যেন বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতির নতুন সংস্করণ এবং ডিরেক্টর সভাই যেন পরবর্তীকালে কাউন্সিলে রূপান্তরিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ভারত সচিবের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিল। তাছাড়া ১৮৫৭ থেকে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলগুলি তাদের বহুবিধ সমস্যা নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে ভারতবর্ষের সমস্যাগুলি সম্পর্কে মাথা ঘামানোর অবকাশ তাদের ছিল না। কাজেই বলা যেতে পারে যে মহারানীর রাজত্বে ভারতীয়দের অবস্থানগত কোনও পার্থক ঘটল না।

তবে মহারানীর ঘোষণায় দেশীয় রাজাদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ভবিষ্যতে তাদের রাজ্য অধিগ্রহণ করা হবে না এবং হিন্দু রাজাদের উত্তরাধিকারত্ব সংক্রান্ত আইনে দত্তক পুত্রের বৈধ অধিকার মেনে নেওয়া হবে। এছাড়া মহারানীর ঘোষণায় ভারতবর্ষের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রশাসনিক ব্যাপারে ভারতীয় রীতিনীতি সংস্কারের কথা মনে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিসেবে ভারতীয়রা ইংরেজদের মতোই সমান সুযোগ সুবিধা পাবে ঘোষণা করা হয়।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে যে আইন গৃহীত হয় তাতে সামরিক পুনর্গঠনের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দেশীয় সিপাহীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যে সম্ভবপর নয় এই তথ্য ইংরেজদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ফলে তারা সামরিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে কিছু বিশেষ নীতি গ্রহণ করে। দেশীয় সিপাহীদের সংখ্যা হ্রাস করে ইউরোপীয় সিপাহীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে কোনও চিড় ধরেনি। এই ঐক্য যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থায়িত্বের পক্ষে অনুকূল নয় একথা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ সরকার ভারতে বিভাজন নীতি অনুসরণ করে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হয়। সামরিক দিক দিয়ে এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিতে দেশীয় সিপাহীদের সরিয়ে ইউরোপীয় সিপাহীদের মোতায়েন করা হয়। বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ সর্বত্র সেনাবাহিনীতে পূর্বের মতই উচ্চপদগুলি ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণে রইল। অর্থাৎ মহারানীর ঘোষণা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর মূল চরিত্রে কোনও পরিবর্তন আনেনি।

মহারানীর ঘোষণার প্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনীর পুনর্বিন্যাস বিশ্লেষণ করাকালীন মনে রাখতে হবে যে ভারতের যে অঞ্চলগুলিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল সেই অঞ্চলের লোকজনদের সামরিক বাহিনীতে স্থান না দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। শিখ, গোর্খা, পাঠান যারা ইংরেজ সরকারকে মহাবিদ্রোহের সময়ে সাহায্য করেছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে তাদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে, ভারত সচিব চার্লস উড তৎকালীন বড়লাট ক্যানিংকে বলেছিলেন যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে জাতি ও সম্প্রদায়গত বিভেদ মাথায় রেখে এমনভাবে গড়ে

তুলতে হবে যাতে তাদের মধ্যে কোনওরকম ঐক্যবোধ গড়ে উঠতে না পারে। এছাড়া গোলন্দাজ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে রইল ইংরেজদের হাতে।

মহারানী তাঁর ঘোষণায় ব্যক্ত করেছিলেন যে দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে আগ্রাসন নীতি অনুসৃত হবে না। তবে এই প্রসঙ্গে কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন যে দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে মহারানীর এই ঘোষণা নিতান্তই অর্থহীন। কারণ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পূর্বেই ইংরেজরা অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি থেকে শুরু করে স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমে ভারতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে ফেলেছিল। কাজেই নতুন করে আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া ইংরেজরা একথাও বুঝেছিল যে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও জমিদার সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন কার একান্ত আবশ্যক। কারণ নিজ নিজ অঞ্চলের জনসাধারণের উপরে এদের প্রভাব অপরিসীম। মহাবিদ্রোহ থেকে ইংরেজরা এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। কাজেই দত্তক প্রথাকে পুনরায় স্বীকৃতি দানের কথা মহারানীর ঘোষণায় বলা হয়। তবে এইসব দত্তক পুত্রদের সিংহাসনে বসার পূর্বে ইংরেজ সরকারের অনুমোদন নিতে হত।

দেশীয় রাজ্যগুলি মহারানীর ঘোষণায় আশ্বস্ত হলেও এই ঘোষণার মূল অর্থ ছিল দেশীয় রাজ্যগুলির উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুস প্রভুত্ব বিস্তার। দেশীয় রাজ্যগুলির প্রশাসনিক কাজের তদারকের জন্য ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হতেন। দেশীয় রাজাদের ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামোভুক্ত করার জন্য সর্বত্র একই ধরণের ডাক ও তার ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবহার করা হত। রেলপথে প্রতিটি রাজ্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। পররাষ্ট্র নীতি বা নিরাপত্তা বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারটি পরিচালনার ব্যাপারে দেশীয় রাজাদের স্বাধীনতা ছিল না বললেই চলে। আবার ইংরেজ সরকার ইচ্ছে করলেই যে কোনও দেশীয় রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ঐ বংশের অন্য কাউকে সিংহাসনে বসাতে পারত। এই রকম উদাহরণ যথেষ্ট দেওয়া হয়।

মহাবিদ্রোহ কোম্পানির অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। সরকারি আয়ের হৃদপিন্ড ছিল ভূমিরাজস্ব। মহাবিদ্রোহের সময়ে রাজস্ব আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহের পরে প্রশাসনিক দায়িত্ব যখন ব্রিটিশ রাজের হাতে চলে আসে, তখন অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য বাৎসরিক বাজেট, নিয়মিত হিসাব পরীক্ষা ব্যবস্থা, সরকার অর্থ দপ্তরের পুনর্গঠন এবং সরকারি অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপরে আয়কর ধার্য হয়। ভারতের বাণিজ্য নীতির উপরে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতকে শোষণ করে ইংরেজ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়।

মহারানীর ঘোষণায় যদিও বলা হয়েছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই—তা সত্ত্বেও এই ঘোষণা ব্যাপকভাবে কার্যকরী হতে পারেনি। কারণ শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক এতই তিক্ত ও ঘৃণার ছিল যে এই বিদ্বেষ মহারানীর উদার ঘোষণা মুছে দিতে পারেনি। ইংরেজদের কৌশলী চরিত্রটি ভারতীয়দের পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব ছিল। যেভাবে পলাশীর যুদ্ধ থেকে সিপাহী

বিদ্রোহের পূর্ব পর্য্যন্ত কোম্পানি ভারতীয়দের বঞ্চনা করে এসেছিল তা বিস্মৃত হওয়া সহজ ছিল না। তারা মহারানীর মেনে নিয়েছিল খানিকটা নিরুপায় হয়ে। মহাবিদ্রোহ তাদের এই শিক্ষা দিয়েছিল যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নামার যোগ্যতা তাদের নেই। কাজেই ইংরেজদের সাথে তাদের মানিয়ে চলতে হবে। কিন্তু তখন থেকেই অবচেতন মনে ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশ-বিরোধী চিন্তাধারা কাজ করেছিল। যদিও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল অনেক পরে।

মহারানীর ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে ভারতীয়দের ধর্ম ও সমাজ জীবনে ইংরেজদের কোনও ভূমিকা থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ একথা প্রমাণ করেছিল যে ভারতীয়দের ধর্ম ও সমাজজীবনে হস্তক্ষেপ করার ফল ভালো হয়নি। কাজেই প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে যদি নিস্তরঙ্গ রাখা যায় তাহলে ব্রিটিশ শাসনকে ভারতে কায়েমী করে ফেলতে সুবিধা হবে।

২(ক).৪ ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল্ এ্যাক্ট ও তার গুরুত্ব

ভারতীয় সংবিধানের ইতিহাস ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বস্তুতঃপক্ষে ১৮৫৩ সালের চার্টার আইনের মধ্যে যে গলদগুলি ছিল তা দূর করার জন্যই ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৩ সালের চার্টার আইনের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি ছিল এই যে আইন পরিষদ বা Legislative Council-এ ভারতীয়দের কোন স্থানই ছিল না। কাজেই ভারতীয়রা ইংরেজদের প্রবর্তিত আইনবিধি সম্পর্কে কি ধরণের চিন্তাভাবনা করছে তা জানার কোনও উপায় ছিল না। স্যর সৈয়দ আহমেদ এই আইন সম্পর্কে মনে করেছিলেন যে যদি কোনও অপ্রিয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হত তাহলেও ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে প্রতিবাদ জানানো সম্ভব ছিল না। কারণ আইন পরিষদে ভারতীয়দের তরফে কোনও প্রতিনিধি ছিল না। স্যর চার্লস উড আইন সভা বা Legislative Council-এর স্বাধীন মনোভাব পছন্দ করেননি। তিনি বলেছিলেন যে আইন পরিষদ কাজেকর্মে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের যেন একটি ক্ষুদ্রতম সংস্করণে পরিণত হয়েছে। ফলে ইংরেজ প্রশাসনের তরফেও এই আইন সম্পর্কে কিছু বিরূপতা ছিল। এই কারণে ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্টের প্রয়োজনীয়তা হয়।

প্রশাসনিক ব্যাপারেও ইংরেজ রাজ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির আইন প্রণয়ন ক্ষমতা রদ করে দিয়ে যাবতীয় ক্ষমতা কলকাতায় রেখে দেওয়া হলে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রশাসন অসন্তুষ্ট হয়। এই অবস্থা আরও তিক্ত হয়ে ওঠে আয়কর সংক্রান্ত বিলকে কেন্দ্র করে। মাদ্রাজে এই সমস্যাটি হয়েছিল এবং ইংরেজ সরকার এই প্রসঙ্গে বুঝতে পেরেছিল প্রশাসনিক দুর্বলতাগুলির দূর করে ব্রিটিশ রাজত্ব সুসংহত করতে গেলে আর একটি আইন পাস করা দরকার।

১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্টের শর্ত অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন করা হয়। অর্থ দপ্তর ও আইন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য দুজনকে ব্রিটিশ সরকার

নিযুক্ত করতেন। ভারত সচিব বাকী তিনজন সদস্যকে মনোনীত করতেন। এদের ভারতে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কম করে দশ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ছিল। Extra ordinary সদস্য হিসাবে এই কাউন্সিলে, Commander-in-chief ছিলেন বা সেনাপতি। এদের প্রত্যেকেরই দায়িত্বকালের মেয়াদ ছিল পাঁচ বছরের।

এই প্রথম আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যে কাউন্সিল গঠিত হয় যেখানে ভারতীয়দের স্থান ছিল। ছয় থেকে বারজনের মধ্যে সদস্যবৃন্দ নিয়ে যে Executive council গড়ে ওঠে সেখানে ছয় জন বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে ভারতীয়দেরও আসন ছিল। তবে ভারতীয় সদস্যদের নির্বাচিত করতেন গভর্নর জেনারেল। বেসরকারি সদস্যরা আইন পরিষদে দুই বছরের জন্য থাকতেন। কিছু নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে গেলে গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন একান্ত আবশ্যক ছিল। আবার ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছে করলে আইৰ পরিষদের প্রণীত যে কোনও আইন নাকচ করে দিতে পারতেন।

বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের হাতে পুনরায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রেও গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন ছিল আবশ্যক। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ বা পাঞ্জাবেও আইন পরিষদ গঠন করার কথা ভাবা হয়। গভর্ণর জেনারেল প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ইচ্ছে করলেই নতুন প্রদেশ গঠন করতে পারতেন। লেফটেনান্ট গভর্ণর নিয়োগের ক্ষমতা তাঁর উপরে ছিল।

নিঃসন্দেহে ১৮৬১ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই এ্যাক্ট সর্বপ্রথম ভারতীয়দের শাসন ব্যবস্থায় অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। তবে ভারতীয় সদস্যরা ছিলেন সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়। দেশীয় রাজারা, দেওয়ান বা জমিদাররা আইন পরিষদের বেসরকারি সদস্যরূপে গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হতেন। কাজেই জনপ্রতিনিধি বলতে যা বোঝায় এঁরা তা ছিলেন না। ভারতবাসীর অসন্তোষ বা চাহিদা প্রকৃতপক্ষে কি তা জানা সম্ভব ছিল না এই সদস্যদের মাধ্যমে। কারণ সাধারণ মানুষের চাহিদা জানার মতো মানসিক সেতু সমাজের উপরতলার ব্যক্তিদের সাথে গড়ে ওঠে নি। উপরন্তু কাউন্সিলের মিটিং-এ আসার আগ্রহও অধিকাংশ ভারতীয় সদস্যদের ছিল না। হতে পারে তাঁদের হাতে বিশেষ কোনও ক্ষমতা ছিল না বলেই উৎসাহের অভাব ছিল।

তবে একথা বলা যায় আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় সদস্যদের আইন পরিষদে যোগদান প্রহসনে পরিণত হলেও পরবর্তীকালে প্রশাসন যন্ত্রে অংশ গ্রহণের আকাঙ্খার বীজ হয়েছিল এখান থেকেই। কাজেই এই আইনের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট গভর্ণর জেনারেলকে সর্বময় কর্তৃত্বে পরিণত করে। আইন পরিষদ গঠিত হলেও প্রকৃত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন গভর্ণর জেনারেল। তবে ভবিষ্যতের ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামো আইন পরিষদকে কেন্দ্র করে কিভাবে গড়ে উঠতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট।

২(ক).৫ সারাংশ

এই একটিতে ১৮৫৮ সালের মহারানী ঘোষণার তাৎপর্য এবং ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্টের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। যদিও সিপাহী বিদ্রোহ বা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরে মহারানীর শাসনের আওতায় ভারতকে এনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল তাহলেও এই সময়ে যে আইনগুলি প্রণীত হয়েছিল তার কিছু সাংবিধানিক গুরুত্ব ছিল। ভারতীয়রা এই আইনের ফলেই অবচেতন মনে প্রশাসনে অংশ নেওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল—যার পরিণতি পরবর্তী পর্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময়ে লক্ষিত হয়।

২(ক).৬ অনুশীলনী

ক। নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

১। কোন পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৮ সালে মহারানীর ঘোষণা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল আলোচনা করুন।

২। ১৮৫৮ সালের মহারানীর ঘোষণা ভারত ইতিহাসে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেখান।

৩। ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট ভারতবর্ষের সাংবিধানিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ—বিশ্লেষণ করুন।

খ। অগ্রগতি যাচাই করুন (সঠিক উত্তরটিকে (✓) চিহ্ন দিন)

১। ১৮৫৮ সালের মহারানীর ঘোষণার ফলে কোম্পানির রাজত্ব আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

২। ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারিবৃন্দ যারা ভারতে নিযুক্ত ছিলেন তাদের বেতন দেওয়া হত ইংল্যান্ড থেকে।

৩। মহারানীর ঘোষণায় দত্তক পুত্রদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বৈধ বলে অনুমোদন করা হয়।

৪। মহাবিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনে বিভাজন নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

৫। ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট (১৮৬১) আইন পরিষদে সাধারণ ভারতীয় জনপ্রতিনিধি রাখার কথা বলেন।

২(ক).৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Majumdar— R.C. Roy Chowdhury, H.C. Dutta, K.K.—An Advanced History of India.
2. Spear, P.— Modern India.
3. T. B. Metclaf—Aftermath of the Revolt. E. Thomson.
4. Garatt. G.T.—British rule in India.
5. A.B. Keith—Constitutional Development of India.
6. R.C. Majumdar ed : History and culture of the Indian people, Vol. IX. British Paramountey and Indian Renaissance in India.
7. A.C. Banerjee : Constitutional History of India.

একক ২(খ) ❑ ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন ও উপজাতি বিদ্রোহ

গঠন

২(খ).০ উদ্দেশ্য
২(খ).১ প্রস্তাবনা
২(খ).২ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ
২(খ).৩ কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকা ও প্রকৃতি
২(খ).৪ ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্ট ও তার গুরুত্ব
২(খ).৪.১ নীল বিদ্রোহের প্রকৃতি ও নেতৃত্ব
২(খ).৪.২ নীল বিদ্রোহের ফলাফল
২(খ).৫ পাবনার কৃষক অভ্যুত্থান
২(খ).৬ মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহ
২(খ).৭ উপজাতি বিদ্রোহের পটভূমিকা
২(খ).৭.১ খারওয়ার আন্দোলন
২(খ).৭.২ মুণ্ডা বিদ্রোহ
২(খ).৭.৩ ওঁরাও বিক্ষোভ
২(খ).৮ মোপলা বিদ্রোহ
২(খ).৯ অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের বিদ্রোহ
২(খ).১০ সারাংশ
২(খ).১১ অনুশীলনী
২(খ).১২ গ্রন্থপঞ্জী

২(খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের কথা জানতে পারবেন।
- এইসব বিক্ষোভের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- এই বিক্ষোভগুলির ব্যাপ্তি ও ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

২(খ).১ প্রস্তাবনা

ব্রিটিশ শাসন যে ভারতীয়রা নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারেনি তার প্রমাণ ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্বের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান, নীল বিদ্রোহের মত প্রতিবাদী বিক্ষোভ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের আদিবাসী ও উপজাতি মানুষের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। যদিও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মত ব্যাপ্তি এই আন্দোলনগুলির ছিল না, তাহলেও জনগণ যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ক্রমশই হতাশ ও তিক্ত হয়ে উঠেছে তার সাক্ষ্য মেলে এই ধরনের অভ্যুত্থানগুলিতে।

২(খ).২ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ

ইংরেজ শাসনে সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কৃষক সম্প্রদায়। শোষণ যন্ত্রে নিপীড়িত হয়েছিল আদিবাসী মানুষজন। রজনীপাম দত্ত এবং মানবেন্দ্রনাথ রায় উল্লেখ করেছেন কৃষকদের উপর অপরিসীম করের ভার চাপানোর কথা। এদের অত্যন্ত চড়া হারে খাজনা দিতে হ'ত। জমিদাররাও অনেকেই প্রাপ্য কর ছাড়াও জোর করে বিভিন্ন ধরনের কর আদায় করতেন। টাকার অভাবে খাজনা মেটানোর জন্য কৃষকদের শরণাপন্ন হতে হত মহাজনদের কাছে। ফলে অবস্থা হয়ে পড়ে শোচনীয়। মহাজনের কাছে জমি বন্ধক রেখে জমিদার ও সরকারের খাজনা মেটানোর চেষ্টা করলেও মহাজনের দেনা মেটানো কৃষকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে বন্ধকী জমি মহাজনের হাতে চলে যায় এবং কৃষক হয়ে পড়ে ভূমিহীন। তাদের এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকার বা জমিদার কেউই এগিয়ে আসেনি। উপরন্তু জোর করে নীলের চাষ করতে কৃষকদের বাধ্য করে ইংরেজ সরকার—যদিও এই চাষ বাংলার কৃষকদের কাছে লাভজনক ছিল না। জমিদার, সরকার ও মহাজন এই ত্রিমুখী অত্যাচারের চাপে কৃষকদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল মর্মান্তিক।

আদিবাসী ও উপজাতি বিক্ষোভের প্রেক্ষাপট ছিল অন্য ধরনের। আদিবাসী সমাজে খাজনার দায়িত্ব ছিল যৌথভাবে—এখানে ব্যক্তিগত মালিকানার কোনও ব্যাপার ছিল না। গ্রামের প্রধান বা মোড়ল গ্রামবাসীদের সকলের হয়ে খাজনা দিত। এই ধরনের সামাজিক পরিকাঠামোতে জমিদার, মহাজন ইত্যাদি শব্দগুলি ছিল অপরিচিত। এই সহজ সরল ভূমি ব্যবস্থায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভূমি রাজস্ব নীতি আদিবাসী সমাজে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। জমিদার বা মহাজন সম্প্রদায় এই সুযোগে তাদের সমাজে প্রবেশ করে। আদিবাসীদের দৃষ্টিতে এরা ছিল বহিরাগত। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব মেটাতে গিয়ে আদিবাসীরা এদের কাছেই জমি বন্ধক রেখে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ফলে তারাও ক্রমশ ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে ওঠে।

২(খ).৩ উদ্দেশ্য

ভারতে ব্রিটিশ শাসন পর্বে কৃষক বিদ্রোহ অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে শোষিত হচ্ছিল। অবশেষে তাদের অভাব অভিযোগ যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে—তখনই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। রণজিত গুহ তাঁর Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে কৃষকরা বিদ্রোহকে বেছে নিয়েছিল শেষ অস্ত্র হিসাবে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অভ্যুত্থান ঘটায়নি। তারা জানতো তারা কি চায়। হয়তো বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বিদ্রোহের মধ্যে নানা ধরনের পার্থক্য ছিল—তাহলেও তাদের মানসিকতা ছিল এক—এই বিদ্রোহ ছিল শোষণ ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে।

কৃষক বিদ্রোহগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন ক্যাথলিন গাফ। তিনি বলেছেন—(১) কৃষক বিদ্রোহ এক ধরনের পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো এবং প্রকৃত শাসককে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা। (২) কৃষক বিদ্রোহ এক ধরনের ধর্মাশ্রয়ী অভ্যুত্থান। (৩) কৃষকবিদ্রোহ এক ধরণের গণবিদ্রোহ—যেখানে অভাব অভিযোগের বিরুদ্ধে সকল সোচ্চার হয়ে উঠেছিল (৪) লুঠপাঠ দস্যুতা কৃষক বিদ্রোহের অঙ্গ হয়ে পড়েছিল—Eric Hobsbawm একে বলেছেন Social bandity. (৫) কৃষকবিদ্রোহ ছিল এক ধরনের প্রতিবাদী আন্দোলন এবং এর চরিত্র ছিল হিংসাত্মক ও সশস্ত্র।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন কৃষক সমাজকে ভূমিহীন ও বিপন্ন করে তুলেছিল। ফলে তারা দলবদ্ধ হয়ে শুধুমাত্র যে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে তা নয়—ঔপনিবেশিকতাবাদকেও তারা বিলোপ করতে বদ্ধ পরিকর হয়। এই প্রেক্ষাপটে এক ধরনের ধর্মীয় আবরণও লক্ষিত হয়। এমন কিছু নেতার আবির্ভাব হয় যাদের ভাবমূর্তি ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য এবং বিদ্রোহীরা মনে করত এরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এরা বলতেন যে অতীতে সমাজে কোনও শোষণ ছিল না। এই ধরনের নিপীড়নহীন সমাজ ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিতেন এইসব নেতারা। এই হিসাবে বলা যায় যে কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে এক ধরনের অতীতমুখিতা ছিল। উপরন্তু বিদ্রোহের নেতারা বলতেন যে ঈশ্বর যেহেতু তাদের পক্ষে কাজেই জয় অনিবার্য।

এই ধরনের বিদ্রোহকে ইউরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু স্থানে Millennial ও Messianic বলা হয়। Millennial শব্দটির অর্থ হাজার বছর। এই শব্দটির মধ্যে একটি তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে যাকে বলা হয় Judaco-christain তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল কথা হল সোনালী ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। Messiah হচ্ছেন নিপীড়ন উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তিদাতা পুরুষের প্রতীক স্বরূপ। অনুমান করা হয় ভারতে আদিবাসী সমাজে এবং উপজাতি কৃষকদের মধ্যেও এই ধরনের মনোভাব দেখা গিয়েছিল। বীরসা মুন্ডার বিদ্রোহ এমনই একটি উদাহরণ।

কিছু কিছু বিদ্রোহ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সংস্কার আনতে চেয়েছিল। এদের মধ্যে বাংলার ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা মেদিনীপুরের লোধাদের আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোনওরকম

প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ কৃষকরা জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, মহাজন এদের হত্যা করেছিল—যাকে সামাজিক দস্যুতা বা Social banditry আখ্যা দেওয়া হয়। যেসব বিদ্রোহে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল সেখানে ধর্মীয় উন্মাদনা দেখা যায়নি। সাধারণতঃ এই ধরনের গণ-অভ্যুত্থানগুলি শান্তিপূর্ণবাবে শুরু হত। তবে শাসক সম্প্রদায় হিংসার আশ্রয় নিলে এই ধরনের গণ-অভ্যুত্থানগুলির হিংসাত্মক হয়ে উঠতে বেশি দেরী হত না।

২(খ).৪ নীল বিদ্রোহের সূত্রপাত

ভারতে ব্রিটিশ নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব কৃষক অভ্যুত্থান হয়েছিল তাদের মধ্যে নীল বিদ্রোহ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নীল বিদ্রোহের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। নীল বিদ্রোহীরা আন্দোলন করেছিল নীলকুঠীর সাহেবদের বিরুদ্ধে যারা কৃষকদের নিজেদের লাভের জন্য বাধ্য করেছিল নীল চাষ করতে। কাজেই নীল বিদ্রোহকারীদের প্রতিপক্ষ ছিল নীলকর সাহেবরা—জমিদার বা মহাজন সম্প্রদায় নয়। এইখানেই অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহের সাথে নীল বিদ্রোহের পার্থক্য।

নীল বিদ্রোহের কারণ ছিল কৃষকদের ক্ষোভ। নীল চাষ কৃষকদের পক্ষে লাভজনক ছিল না। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পে যুগান্তরকারী উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে যেহেতু কৃত্রিম নাল আবিষ্কৃত হয়নি, কাজেই কাপড় রঙ করার জন্যে ভারতীয় নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। বেন্টিংকের সময়ে ব্যাপকভাবে বাংলা ও বিহারে নীল চাষ শুরু হয়।

নীলকর সাহেবরা কৃষকদের অগ্রিম দিয়ে বা দাদন দিয়ে নীল চাষ করাতো। কৃষকরা জমিদারের খাজনা মেটানোর জন্য দাদন নিত। কিন্তু নীলকররা জোর করে উৎকৃষ্ট জমিতে নীলবীজ বপন করতে চাষীদের বাধ্য করত। ফলে যে জমিতে চাষ করে কৃষকদের সারা বছরের অন্নের সংস্থান হতে পারত, সেই জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য হওয়ায় তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। নীলকর সাহেবরা যে নীলচাষীদের উপর জোরজবরদস্তি করত তা নয়, তাদের আচরণও ছিল অশালীন। ইন্ডিগো কমিশনের রিপোর্টে এবং সমকালীন মিশনারীদের সাক্ষ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

দীর্ঘদিন ধরেই কৃষক সমাজ নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। তবে ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর কতকগুলি কারণও ছিল।

১৮৪৭ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে নীলকরদের পুঁজিতে টান ধরে। কারণ এই ব্যাঙ্ক ছিল তাদের টাকার যোগানদার। ফলে নীলকররা জমিদার হিসেবে অধিক অর্থ লাভের জন্য বেশি করে চাপ দিতে থাকে নীল চাষীদের উপর। নীলের দাম দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৪২ সালের পর থেকে নীলের বাজার পড়ে এসেছিল। কারণ নীল চাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্রাতিরিক্ত হারে। ফলে যারা কম দামে নীল চাষ করাতে পেরেছিল তারাই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে পারছিল। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই নীলচাষীদের উপর অত্যাচার বেড়ে যায়। তারা টাকা পেত কম অথচ ১৮৫৭-১৮৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের পর থেকে জিনিসের দাম বেড়েই চলছিল। এই প্রেক্ষিতে কৃষকরা নীল চাষ করতে অস্বীকৃত হয়। তারা ধান, চাল, ডাল, তৈলবীজ, আখ, তামাক বা অন্য কোনও লাভজনক জিনিস উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে পড়ে।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। শিশিরকুমার ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, হরিনাথ মজুমদার, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিরা নীলকরদের অত্যাচারের সবিশেষ বিবরণ হিন্দু পেট্রিয়টে পাঠাতেন। বাংলার গ্রামে গ্রামে নীলবিরোধী আবহাওয়া গড়ে ওঠে। দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ নাটকে নীলকরদের শোষণের এক প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরেন। জেমস্ লঙ-এর নামে এর ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডে পৌঁছলে সেখানে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়।

দীর্ঘদিন ধরেই নীলকরদের অত্যাচার সরকারের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। চারদিকে দেশীয় পত্র-পত্রিকায় নীলচাষের কুফল নিয়ে লেখালেখি হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও সরকার কোনও উদ্যোগ নেয়নি কারণ তখনও পর্যন্ত ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে নীলের বাজার দর ছিল যথেষ্ট বেশি। কিন্তু নীলচাষের যখন গুরুত্ব কমে যায় তখন সরকারও নীলচাষীদের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করে দেয়। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট ইডেন বলেন যে কৃষকরা তাদের জমিতে কি চাষ করবে সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই ঘোষণা কৃষকদের বিদ্রোহের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

২(খ).৪.১ নীল বিদ্রোহের প্রকৃতি

নীল বিদ্রোহ খুব দ্রুত একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৬০ সালের মধ্যে এই বিদ্রোহ যশোহর, পাবনা, রাজশাহী, ফরিদপুর, নদীয়া, বারাসাত, মুর্শিদাবাদ, মালদা প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহে নীলচাষীরা যে অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিয়েছিল নীলচাষের বিরুদ্ধে তা অভাবনীয়। তারা কোনও অবস্থাতেই নীল চাষ করবে না ঠিক করেছিল।

অনেকে মনে করেন যে বাজারে কৃত্রিমভাবে নীল তৈরি করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই নীলচাষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বিনয়ভূষণ চৌধুরী বলেন যে অন্তত ১৮৮০ সালের পূর্ব পর্যন্ত কৃত্রিম নীলের কোন প্রভাব বুঝতে পারা যায়নি। বাংলায় নীলচাষীরা এতোই অনমনীয় ছিল যে নীলকর সাহেবরা বাধ্য হয়েছিল নীলের চাষ বিহারে সরিয়ে নিয়ে যেতে। অনেকে আবার চা বাগানে মূলধন বিনিয়োগ করে।

নীল চাষীরা যে শুধু জোর করে নীল চাষ বন্ধ করতে চেয়েছিল তা নয়। তারা সামগ্রিকভাবে নীল চাষ তুলে দিতে চেয়েছিল। নিঃসন্দেহে এই ধরনের বৈপ্লবিক মনোভাব ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। উপরন্তু এই বিদ্রোহ বাংলায় প্রথম ধর্মঘটের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলে এক হয়ে নীলচাষের বিরুদ্ধে

সোচ্চার প্রতিবাদ করা ধর্মঘটের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। এই বিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত। এই বিদ্রোহ ছিল আসলে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার লড়াই। ধর্মের কোনও স্থান এই আন্দোলনে ছিল না।

খ্রিস্টান মিশনারীদের নীলচাষীদের পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। নদীয়ার নীলচাষীদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মিশনারীরা প্রতিবাদ করেছেন। তবে অভিজিৎ দত্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে খ্রীষ্টান মিশনারীরা বুঝতে পেরেছিলেন নীলকরদের অত্যাচার ভারতে ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করছে। সেই সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে সচেতন করার জন্যই তাঁদের এই নীলকর বিরোধিতা। এমনকি জেমস লঙ দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পনের ইংরেজি অনুবাদ করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর পত্রিকায় নীলচাষীদের নিপীড়ন নিয়ে লিখেছিলেন। তবে এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক প্রশংসনীয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার অবদান। বস্তুত তাঁর পত্রিকার মাধ্যমেই সাহেবদের অত্যাচারের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

নীল বিদ্রোহের নেতৃত্বে কারা ছিলেন এটা একটা বিতর্কিত বিষয়। একটা কথা পরিষ্কার যে নীলচাষ যাদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল তারাই নীল বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। নীলকরদের পছন্দ করত না বা নীলবিদ্রোহের প্রতি নৈতিক সমর্থন ছিল এরকম অংশও নিতান্ত কম ছিল না। যেমন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদক বা মিশনারীরা নীলবিদ্রোহ বা নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে চিত্তব্রত পালিত নেতৃত্ব প্রসঙ্গে মনে করেছেন যে এই বিদ্রোহে জমিদারদের আগ্রহ বেশি ছিল এবং এঁরাই নেতৃত্বের পুরোভাগে এগিয়ে আসেন। তবে এক্ষেত্রে সম্ভবত একটা স্বার্থের ব্যাপার লুকিয়ে ছিল। নীলকর সাহেবদের সম্পর্কে জমিদাররা তখনই অসন্তুষ্ট হয় যখন নীলকর সাহেবরা জমিদারের এলাকায় প্রজার উপর জমিদারের আধিপত্যে হস্তক্ষেপ করেছিল। অর্থাৎ কৃষক যে উদ্দেশ্য বিদ্রোহ করেছিল, জমিদারের নীলকর বিরোধিতার উদ্দেশ্য তা ছিল না। এঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য নীলবিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে এঁদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাহলেও নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়, রাণাঘাটের পালচৌধুরী পরিবারের গোপাল ও শ্যামচন্দ্র পালচৌধুরী, হরনাথ রায়, নবকৃষ্ণ পাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব জমিদারদের নেতৃত্বের প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহ মন্তব্য করেছেন যে জমিদাররা কখনই সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে নীল বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। বিনয়ভূষণ চৌধুরী বলেছেন যে যদিও জমিদাররা নীলচাষ পছন্দ করতেন না এবং নীলকরদের সাথে তাদের সম্পর্কও বিশেষ ভালো ছিল না, বিদ্রোহের সংগঠনে তাঁদের হাত ছিল।

ইন্ডিগো কমিশনও এই রায় দিয়েছিল যে নীল বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে নীলচাষীদের সংগঠনেই গড়ে উঠেছিল। কারণ, তারাই ছিল সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত। কাজেই নিজেদের দূরবস্থা দূর করার জন্য এরা সংগঠিত হয়েছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, মিশনারীরা বা সরকারি কর্মচারীদের কেউ কেউ এই বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও মূল নেতৃত্ব এসেছিল ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। গ্রামের কিছু ধনী কৃষক ও মোড়ল যাঁরা এককালে নীলকর সাহেবদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিল তাদের অনেকেও বিদ্রোহের নেতৃত্বে এগিয়ে আসে। এদের উদ্দেশ্য ছিল নীলকর সাহেবদের সরিয়ে দিয়ে মহাজনী কারবার নিজেরাই যাতে আত্মসাৎ করে নিতে পারে।

প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। এই বিদ্রোহ শান্তিপূর্ণ ছিল না। কৃষকরা অস্ত্র শিক্ষা করেছিল। নদীয় জেলায় বিদ্রোহে মহিলাদের অংশ নেওয়ার কথা জানতে পারা যায়। এই বিদ্রোহ বাংলা থেকে নীলকর সাহেবদের বাধ্য করেছিল নীলচাষ বন্ধ করে দিতে।

২(খ).৪.২ নীল বিদ্রোহের ফলাফল

নীলচাষীরা শান্তিপূর্ণভাবে বিদ্রোহ শুরু করলেও অবশেষে তা সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। কারণ নীলকর সাহেবরা বলপ্রয়োগ করে এই বিদ্রোহ ভেঙে দিতে বদ্ধপরিকর ছিল। চাষীরাও তখন হিংসার পথে এগিয়ে যায়। এই বিদ্রোহ এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে বাংলার সরকার ১৮৬০ সালের মার্চ মাসে একটি আইন জারী করতে বাধ্য হন। এই আইনে বলা হয় যে চুক্তি অনুযায়ী যদি নীল চাষ না করা হয় তাহলে চুক্তিভঙ্গকারী শাস্তি পাবে। নীলকর সাহেবরা এই আইনের সুযোগ নিয়ে নীলচাষে অসহযোগী চাষীদের বিরুদ্ধে মামলা করে। বলাই বাহুল্য বিচারকরাও নীলকরদের স্বপক্ষে রায় দিতেন।

কিন্তু কৃষক সম্প্রদায় এই সময়ে এতো অনমনীয় হয়ে উঠেছিল যে আইনকে উপেক্ষা করে তারা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে ১৮৬০ সালের আইন কার্যত বাতিল হয়ে যায়। নীল চাষ বাংলাদেশ থেকে উঠে যায়।

যদিও নীলবিদ্রোহে কৃষককুল সাফল্য লাভ করেছিল, তাহলেও অনেকে বলেন যে সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের এই বিদ্রোহে বিশেষ লাভ হয়নি। গ্রামের মহাজন ও জোতদাররা নীলকর সাহেবদের পরিবর্তে কৃষককূলকে শোষণ করতে শুরু করে। তবে বিনয় চৌধুরী মনে করেন যে বাংলাদেশের কৃষকরা নীলকর সাহেবদের এদেশে আসার থেকেই মহাজন ও জোতদারদের হাতে শোষিত হত। শোষণের এই ঘটনা নতুন কিছু নয়।

তবে নীল বিদ্রোহ বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে তারা সচেতন হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা জেগে ওঠে। বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বটি এখানেই তৈরি হয়েছিল বলা যেতে পারে।

২(খ).৫ পাবনার কৃষক অভ্যুত্থান

কৃষক অভ্যুত্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নজীর ১৮৭৩ সালের পাবনার কৃষক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহকে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলেও একটি ব্যাপারে সবাই একমত যে এই অভ্যুত্থান জমিদার বিরোধী এবং বর্ধিষ্ণু কৃষক বা জোতদার শ্রেণী এই বিদ্রোহে জমিদারদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে।

পাবনার কৃষক অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট করলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে জমিদার সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত শোষণ ও অত্যাচার এবং ক্রমাগত কর বৃদ্ধি কৃষককুলকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল।

অধ্যাপক সুনীল সেন ''ভারতের কৃষক আন্দোলন''-এ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে ১৭৯৩ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে করের পরিমাণ প্রায় সাতগুণ বেড়ে যায়। তবে কোন অঞ্চলে কি পরিমাণে কর আদায় করা হত তার কোনও প্রামাণ্য তথ্য নেই। ১৮৫৯ সালে যে আইন পাস হয় তাতে কর বৃদ্ধির সুযোগ কিছুটা কমে যায়। তখন জমিদাররা সরাসরি করের হার না বাড়িয়ে বিভিন্নভাবে বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করতেন। কৃষকরা তো বটেই, সরকারও এইভাবে অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায়ের বিরোধী ছিলেন।

১৮৭২ সালে সরকার এই অবৈধ কর বা আবওয়াব বন্ধ করে দিলে জমিদাররা অন্য পথ অবলম্বন করে। তারা প্রজাদের মূল খাজনার সাথে এই বাড়তি টাকা জুড়ে আদায় করতে তৎপর হয়। এছাড়া জমিদাররা কৃষকদের জমি নতুন করে জরিপ করা শুরু করে। এই জরিপ এমনভাবে হয় যে কৃষকদের জমির পরিমাণ আয়তনে হ্রাস পায়। সেই বাড়তি জমি দেওয়া হয় অন্য কৃষকদের এবং তা থেকে খাজনা আদায় করা শুরু হয়। ফলে জমিদার ও কৃষকদের সম্পর্ক হয়ে ওঠে তিক্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জমিদারির খাজনা পঞ্চাশভাগ বাড়িয়েছিলেন বলে জানা যায়।

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার শাসক, পাবনার জেলা শাসকের জবানবন্দী এব তৎকালীন সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে কৃষক সম্প্রদায়ের ক্ষোভ এবং জমিদারদের অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের মনোবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, সোমপ্রকাশ, সুলভ সমাচার প্রভৃতি পত্রিকাগুলি জমিদারদের উৎপীড়নের তীব্র সমালোচনা করে। চিত্রব্রত পালিত তাঁর "Pabna Uprising a Fresh Probe" প্রবন্ধে (Perspectives on Agrarian Bengal)-এ বলেছেন যদিও পাবনা বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল অধিক পরিমাণে খাজনা আদায় তাহলেও জমিদারদের একটা বিরাট অংশের খাজনা বাড়ানো ছাড়া কিছু করার ছিল না। ঢাকা, ফরিদপুর, রাজসাহী, সিরাজগঞ্জ এই সমস্ত জেলার জমিদাররা অধিকাংশই বিভিন্ন কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অপরদিকে সম্পন্ন কৃষককুল বাণিজ্যিক ফসল পাট উৎপাদন করে আর্থিক স্বচ্ছলতা, আরও বাড়িয়ে চলেছিল। অথচ খাজনার হার ছিল নিচু। ফলে অর্থ আদায়ের জন্য জমিদাররা বর্ধিত হারে খাজনার দায় তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। কিন্তু কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত তাঁর "Pabna Disturbance and the Politics of Rent" লেখনীতে পাবনা বিদ্রোহের মূল কারণকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে ১৮৫৯ সালে সরকার প্রণীত দশম আইন কৃষকদের বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল। প্রজাস্বত্ব দিয়েছিল, কাজেই কৃষকরা মনে করেছিল যে জমিদাররা আর খাজনা বাড়াবে না। কিন্তু জমিদাররা তাদের খাজনা দশম আইনকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে বাড়িয়ে চলেছিল। বাড়তি খাজনা না দিলে প্রজাস্বত্ব নাশেরও প্রয়াস ছিল। কৃষকরা তাদের প্রাপ্য অধিকারের উপর জমিদারের এই উপেক্ষা মানতে রাজী ছিল না। ফলে তারা অভ্যুত্থানের পথ বেছে নেয়। অর্থাৎ কল্যাণ কুমার সেনগুপ্তের মতে পাবনার কৃষক অভ্যুত্থান হয়েছিল কৃষকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বোধকে কেন্দ্র করে।

পাবনার কৃষকরা স্থির করে যে তারা কর দেবে না। তারা কৃষক সমিতি গড়ে তোলে। ১৮৭৩ সালে পাবনা জেলায় প্রায় সর্বত্র এই সমিতি গড়ে ওঠে। বিক্ষুব্ধ প্রজারা এই সমিতিতে চাঁদা দিয়ে একটি অর্থভান্ডার গড়ে তুলেছিল। আদালতের মাধ্যমে তাদের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মামলা মোকদ্দমায় যে খরচ হত তা মেটানো

হত এই অর্থভাণ্ডার থেকে। অনিচ্ছুক বিদ্রোহ বিরোধী প্রজাকে বিদ্রোহের সামিল হওয়ার জন্য বাধ্য করা হত। জমিদারদের বিরুদ্ধে পাবনার বিদ্রোহী ধনী কৃষকরা অত্যন্ত সুসংহতভাবে সংগঠন করে তুলেছিল। সম্পন্ন কৃষকরা এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছিল। এইসব নেতাদের মধ্যে দৌলতপুরের ঈষাণচন্দ্র রায়, মেঘুল্লা গ্রামের প্রধান শম্ভুনাথ পাল ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিদ্রোহের প্রকৃতি কি ধরনের ছিল তা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। বিনয় চৌধুরী এবং সুপ্রকাশ রায়ের মতে এই অভ্যুত্থান ছিল হিংসাত্মক। আবার কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন যে এর অনেকটাই ছিল আইনের লড়াই। সরকার প্রথমদিকে জমিদার বিরোধী ও বিদ্রোহীদের পক্ষে থাকলেও পরবর্তীকালে তারা জমিদারদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ফলে বিদ্রোহী নেতারা ধৃত হয় এবং নেতৃত্বের অভাবে অভ্যুত্থান ক্রমশঃ থিতিয়ে আসতে পারে।

কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, পাবনার কৃষক অভ্যুত্থান কিন্তু জমিদার ও কৃষকদের সম্পর্ককে আইনের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে এসেছিল। এই অভ্যুত্থানই ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের পথ প্রস্তুত করেছিল যার ফলে কৃষকরা অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল। সরকার বুঝতে পেরেছিলেন যে এই অভ্যুত্থান জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে। এই অভ্যুত্থান ব্রিটিশ-বিরোধী নয়। কাজেই তারা কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। অনেকে পাবনার কৃষক বিদ্রোহকে একটি সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ বলতে চেয়েছেন—যেহেতু জমিদাররা ছিলেন হিন্দু এবং অধিকাংশ কৃষকরা ছিল মুসলমান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি ভিন্ন। কারণ হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়গত বিরোধ হলে হিন্দু নেতা ঈষাণ চন্দ্র রায় বা শম্ভুনাথ পাল বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিকে এগিয়ে আসতেন না। এই বিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মীয় গোঁড়ামি বা ধর্মীয় অত্যাচারের কথা কোথাও উল্লিখিত হয়নি। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক।

২(খ).৬ মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহ

সরকারি নথিপত্রে মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহকে Deccan Riot আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১৮৭৫ সালে পাবনার কৃষক বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে মহারাষ্ট্রে কৃষক অভ্যুত্থানের কথা জানতে পারা যায়। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের সংগ্রাম ছিল মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে ছিল রায়তওয়ারী ব্যবস্থার বৈষম্য—যার ফলে কৃষকদের উপরে অত্যাধিক করের বোঝা চাপানো হয়েছিল। কৃষকদের খাজনা দেওয়ার ক্ষমতার যথার্থ্য বিচার না করেই তাদের উপরে করের বোঝা চাপানো হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের সম্যক ধারণা ছিল না। অনুর্বর ও রুক্ষ জমিতে পর্যাপ্ত শস্য যে উৎপাদন করা যায় না একথা সরকার ভেবে দেখেনি। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্যও উৎপাদন ব্যাহত হত। অথচ তার জন্য খাজনায় কোন ছাড় দেওয়া হত না। অগত্যা খাজনা মেটানোর জন্য কৃষকদের শরণাপন্ন হতে হত মহাজন সম্প্রদায়ের কাছে। এইভাবে মহারাষ্ট্রের কৃষক জীবনে মহাজনদের প্রবেশ ঘটেছিল।

রায়তওয়ারী ব্যবস্থার আগে মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ জীবনে মহাজনরা ব্যবসা করত। তাদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না। কৃষকরা ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা লাভ করেছিল। ইচ্ছামত জমি বন্ধক দিতে বা বিকর করতে তাদের কোনও অসুবিধা ছিল না। রাজস্ব দিতে না পারলেই তারা মহাজনের কাছে জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার করত। অনেকে বলেছেন যে কৃষকরা তাদের সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সাধ্যাতীত খরচ করত। তার জন্যেও তারা মহাজরে কাছে ঋণ করত। একবার তারা এই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়লে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া ছিল অসম্ভব। তখন তাদের জমি চলে যেত মহাজনের হাতে— কারণ ঋণ শোধ করার ক্ষমতা অধিকাংশ কৃষকদের ছিল না। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে সেখানকার তুলো রপ্তানি বন্ধ হলে ইংলন্ডে ভারতীয় তুলোর চাহিদা দেখা দেয়। চাষীরা মহাজনদের কাছে ধার করেও এই তুলোর চাষ করতে থাকে।

রবীন্দ্রকুমার তাঁর The Deccan Riot of 1875-এ দেখিয়েছেন যে, মহারাষ্ট্রের কৃষক অভ্যুত্থানের জন্য কেবলমাত্র মহাজন ও কৃষকদের তিক্ত সম্পর্কেই দায়ী ছিল না। একাধিক কারণ এই বিক্ষোভের জন্য দায়ী। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ চলাকালীন ভারত থেকে তুলো যেত ইংল্যান্ডে বস্ত্র শিল্প বয়নের জন্য। কিন্তু গৃহযুদ্ধের পর আমেরিকা থেকে তুলো আবার পাওয়ার ফলে ভারতে তুলোর দাম পড়ে যায়। মহারাষ্ট্র থেকে তুলো যেত। কাজেই মহারাষ্ট্রের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল। এই অবস্থায় সরকার খাজনার হার বৃদ্ধি করলে কুনবি অর্থাৎ কৃষক ও বনি অর্থাৎ গ্রামীণ মহাজনদের সম্পর্কের মধ্যে আর একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়। মহাজনরা ইতিমধ্যে অধিকাংশ কৃষককে তাদের ঋণজালে আবদ্ধ করে ফেলেছিল। এমতাবস্থায় তারা শঙ্কিত হয়ে পড়ে এই কথা ভেবে যে কৃষকরা সম্ভবতঃ খাজনা দিতে না পারলে তাদের জমিগুলি সরকার অধিগ্রহণ করবে। কাজেই নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য তারা কৃষককুলকে প্ররোচিত করতে থাকে নানাভাবে। এমনকি তারা কৃষকদের ঋণ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এইভাবে এক উত্তেজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার মূল কারণ ছিল নিপীড়ন।

অনেকের মতে আবার মহারাষ্ট্রে কৃষক অভ্যুত্থানে স্থানীয় মহাজনরা উপলক্ষ্য ছিল না। এই অভ্যুত্থান হয়েছিল বহিরাগত মাড়োয়ারী ও গুজরাটি মহাজন (সাহুকরদের) বিরুদ্ধে। স্থানীয় মহাজনেরা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের কারবার চালিয়েছে মহারাষ্ট্রে। জমি দখল করতেও তাদের আগ্রহ নিতান্ত কম ছিল না। বরং মারোয়ারী ও গুজরাটি মহাজনরা কৃষকদের জমি দখলের ভয় দেখাত যাতে তারা ঋণ শোধ করে। কাজেই মহারাষ্ট্রের কৃষকরা যে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য করেছিল বহিরাগতদের এটা নিতান্তই জাতিগত পার্থক্যের জন্য। কৃষকরা এদের ঋণপত্রগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিল। তবে সব গুজরাটি বা মাড়োয়ারি বহিরাগত ছিল তা নয়। এদের মধ্যে অনেকে দু-তিন পুরুষ ধরে মহারাষ্ট্রে বাস করছিল। স্থানীয় মহাজনরাও যে আক্রান্ত হয়েছিল সে প্রমাণও পাওয়া যায়। সরকার এই বিদ্রোহ কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করায় সমগ্র মহারাষ্ট্র এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন কেঙ্গলিয়া নামে এক নেতা। সামরিক বাহিনী নিয়োগ করে এই বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছিল। কেঙ্গলিয়া অবশেষে ধরা পড়েন।

ডেভিড হার্ডিম্যান বলেছেন যে মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৭৫ সালের মে মাসে। এইসময়ে কৃষকদের সবচেয়ে বেশি টাকার দরকার পড়ে। কারণ গ্রীষ্মকাল তাদের টাকার দরকার লাগে বেশি। কিন্তু ১৮৭৫ সালের মে মাসে মহাজনরা কৃষকদের ঋণ দিতে অস্বীকৃত হলে বিদ্রোহের স্ফুরণ ঘটেছিল।

মহারাষ্ট্রের কৃষকরা মনে করেছিল ঋণপত্র পুড়িয়ে ফেললেই মহাজনদের নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু কৃষক বিদ্রোহ সরকার কঠোর হাতে দমন করেন এবং কৃষকদের অবস্থার কোনও উন্নতি হল না। এর সঙ্গে শুরু হয় দুর্ভিক্ষ। এই পরিস্থিতিতে স্বচ্ছল চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, ইংরেজি শিক্ষিত বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে খান্দেশ ও নাসিক জেলার রামোশী, ভিল, কোলি ও ধাঙরদের এক করে ব্রিটিশ উৎখাত করে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে একটি দল গঠন করেন। দরিদ্র নীচু জাতি অধ্যুষিত এই দলে কিছু ব্রাহ্মণও ছিল। এরা লুটপাঠ করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে যাকে Eric Hobsbawn বলেছেন Social banditry। তিনি ধরা পড়লে দৌলতা রামোশী ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত জমিদার ও সাহুকরদের বিরুদ্ধে তার অন্দোলন চালিয়ে যান। অবশেষে সরকার ১৮৭৯ সালে Deccan Agriculturists Relief Act পাস করেন। ফলে মহাজনদের সুদের কারবার যেমন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়, তেমনই কৃষকদের স্বার্থও কিছু পরিমাণে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

২(খ).৭ উপজাতি বিদ্রোহের পটভূমিকা

কৃষক বিদ্রোহের পাশাপাশি ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায় বা উপজাতিগুলির বিদ্রোহ ঊনবিংশ-শতকের ব্রিটিশ ও মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া। ব্রিটিশরা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে আদিবাসীরা মূল জনস্রোত থেকে দূরে সরে গিয়ে তাদের ধর্মীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক রীতি নীতি বজায় রাখত। গোষ্ঠীবদ্ধ আদিবাসী জীবনে মহাজনের কোনও ভূমিকা ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পর থেকে তাদের নিজস্ব সমাজ ও অর্থনীতি বিপন্ন হয়ে পড়তে থাকে। আদিবাসীরা নিজেদের সংস্কৃতি ও অসিত্বের সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমঝোতা মেনে নিতে পারেনি, বলেই ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ চেয়েছিল। এই সংগ্রাম শুধুমাত্র শোষণ বা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, এই সংগ্রাম নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য। এইখানেই উপজাতি বা আদিবাসী বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য।

উপজাতি সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা বড়ো ক্ষোভ ছিল যে তাদের অরণ্য সম্পদের উপর ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ। আদিবাসী কৃষকগোষ্ঠী অনেকক্ষেত্রেই মাটি কর্ষণ করত না—তারা ঝুম প্রথায় চাষ করত। অর্থাৎ জঙ্গলের কিছু অংশে আগুন লাগিয়ে ছাই করে উর্বর জমি তৈরী হত। সেখানে চাষ করা হত। সমগ্র অরণ্য অঞ্চল জুড়ে তারা কখনই চাষ করত না। অরণ্য সম্পদ রক্ষার প্রতি তাদের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার অরণ্য সংরক্ষণের নামে ঝুম চাষ বন্ধ করে দেয়। এতে উপজাতি গোষ্ঠীগুলির অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

আদিবাসী আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তারা তাদের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অতীতের সুখকর দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে। এই আন্দোলন সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় revitalization movement বা পুনরুভ্যুত্থানবাদী আন্দোলন। এই সময়ে এমন কিছু নেতার আবির্ভাব হয় যাকে সাধারণ লোক মনে করত যে তাঁরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তাদের উপর আনুগত্য প্রদর্শন করে আদিবাসী সম্প্রদায় বিদেশী শাসন ও মহাজনী শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল এবং একই সঙ্গে ফিরে পেতে চেয়েছিল অতীতের সোনালি দিনগুলি। এইভাবে সমাজ ও অর্থনৈতিক অসন্তুষ্টির সাথে সাথে আদিবাসী আন্দোলনে একটা ধর্মাশ্রয়ী রূপরেখাও দেখা দিয়েছিল।

২(খ).৭.১ খারওয়ার বিদ্রোহ

আদিবাসী সমাজ মূলত সংগ্রাম করেছিল শোষণ ও অস্তিত্ব রক্ষার কারণে। ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল সিধু কান্‌হু। কিন্তু এই আন্দোলন যা সমগ্র সাঁওতাল পরগণায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল—অবশেষে, ব্রিটিশ দমননীতির কাছে পরাস্ত হয়। সরকার চেষ্টা করেছিল তাদের সমস্যার সমাধান করতে। এমনকি মহাজনদের কয়েক বছরের জন্য সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপ সাঁওতালদের খুশি করতে পারেনি। তারা বহিরাগতদের, যাদের তারা দিকু বলত এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি।

১৮৭০ সালে এই ধরনের হতাশার মধ্য থেকে সূত্রপাত হয় খারওয়ার আন্দোলনের। পূর্বে সাঁওতালরা কিন্তু খারওয়ার নামেই পরিচিত ছিল। খারওয়ার শব্দটি ব্যবহার করে বোঝান হয়েছিল যে এমন একটা দিন ছিল যখন তারা ছিল স্বাধীন এবং দিকুরা তাদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করেনি। এই আন্দোলনের এই অতীতমুখীতা এটাকে পুনরুভ্যুত্থানবাদী মনোভাব নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে। এছাড়া কোনও রাজনৈতিক নেতা কিন্তু খারওয়ার আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেনি। ধর্মীয় মোড়কে এই আন্দোলনকে গড়ে তোলা হয়েছিল। উপজাতি আন্দোলনের এটা একটা বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। এইসব ধর্মীয় নেতারা সহজ সরল সাঁওতালদের কাছে একথাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে দিকুদের সংস্পর্শে তাদের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কাজেই তা সংশোধন করে অতীতের স্বাধীন মুক্ত দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে হবে।

এইসব ধর্মীয় নেতাদের খারওয়ার আন্দোলনের বলা হত বাবাজী। ১৮৭০ সালে ভগীরথ মাঝি নামে একজন বাবাজী বিশাল এক জনসভায় সাঁওতালদের কর দিতে বারণ করেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই পদক্ষেপের সাথে সাথে ধর্মীয় কিছু আচরণবিধি পালনের কথাও বলা হয় এই জনসভায়। ভগীরথ মাঝি বিশুদ্ধিকরণের কথা বলেন। কাজেই সাঁওতালদের শূকর ও মুরগী খেতে বারণ করা হয়। দুটোই বিধর্মীদের খাদ্য। কাজেই এইসব খাদ্যাভ্যাস সাঁওতালদের ক্ষতি করেছে। ভগীরথ মাঝি আরও বলেন যে তার কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে। ব্রিটিশ সরকার তাকে বন্দী করতে পারবে না। সুদিন ফিরে পাওয়ার আকাঙ্খায় সাঁওতালরা উত্তাল হয়ে ওঠে। এইভাবে খারওয়ার আন্দোলন শুরু হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ব্যাপ্তি ব্রিটিশ সরকারকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। ভগীরথকে তারা বন্দী করেন। কিন্তু জ্ঞান পরগণাইত নামে আর একজন নেতা খারওয়ার আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন। সরকার এই আন্দোলনকেও প্রতিহত করেন। ১৮৮০ সালে দুবিয়া গোঁসাই খারওয়ার আন্দোলন আবার শুরু করেন। তিনিও বন্দী হন। ১৮৯৬-৯৭ সালে ফতে সাঁওতাল খারওয়ার আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন। তিনিও কারারুদ্ধ হন।

বারবার ব্যর্থ হওয়ার ফলে বাবাজীরা তাদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন তার সম্পর্কে সাঁওতালদের মনে অবিশ্বাস জন্মায়। উপরন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও মহাজনী শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যে জীবনের স্বপ্ন খারওয়ার বিদ্রোহের নেতারা দেখিয়েছিলেন তাও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে বিদ্রোহীদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তাদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হয়। সাফাই, সমরা ও বাবাজী এই তিনটি সম্প্রদায়ে তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

খারওয়ার আন্দোলন সাঁওতালদের মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। তাহলেও ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে তারা যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাদের কর বয়কট না করার সিদ্ধান্তও ছিল অভিনব। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে জাতীয়তাবাদী নেতারাও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

২(খ).৭.১ মুণ্ডা বিদ্রোহ

আদিবাসী বিদ্রোহের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল ছোটনাগপুরের মুন্ডা বিদ্রোহ। এদের প্রাচীন জীবনযাত্রা ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ। তারাও আরণ্যক ছিল সাঁওতালদের মতো। জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ করত। জমির মালিকানা ছিল যৌথ। এই ভূমি ব্যবস্থাকে বলা হত খুণ্ড কটিদার। এদের সমাজে সবাই যেহেতু জমির মালিক— কাজেই কেউ কেউকে খাজনা দিত না। এরা নিজেদের মধ্যে থেকেই একজন গ্রাম প্রধান নির্বাচন করত— তাকে বলা হত মুন্ডা। গ্রাম্য পুরোহিতদের খুণ্ড কটিদাররা বলত পাহান।

ব্রিটিশ শাসন ও তার আনুষঙ্গিক উপসর্গ মহাজনী শোষণ ও দিকুদের আগমন মুন্ডাদের খুন্ডকটিদার ভূমি ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলেছিল। তাদের রাজস্ব দিতে বলা হয়। অরণ্য সংরক্ষণের নামে বন কেটে বসত তৈরী নিষিদ্ধ হয়। ফলে খাজনা মেটানোর জন্য মুন্ডাদের মহাজন সম্প্রদায়ের দ্বারস্থ হতে হয়। এইভাবে মুন্ডাদের আরণ্যক জীবনযাত্রায় বহিরাগত বা দিকুদের প্রবেশ ঘটে ও শোষণ শুরু হয়। ঋণের দায়ে তাদের জমিগুলি ক্রমশই দিকুদের হাতে চলে যায়। প্রশাসন ছিল শোষণকারীদের পক্ষে।

১৮৪৫ সাল থেকে ছোটনাগপুর অঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারীদের ঢুকতে থাকে। এইসব মিশনারীরা মুন্ডাদের মহাজনী শোষণের হাত থেকে অব্যহতি পাওয়ার জন্য ও জমি উদ্ধারের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে বলে। এতে কোনও ফল হয়নি।

ক্রমশ মুন্ডাদের মধ্যে এক জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠে। মুন্ডাদের অনেকেই খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভেবেছিল মহাজনী শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাদের দুর্দশা দূর করতে

মিশনারীদের ব্যর্থতা মুন্ডাদের হতাশ করে তোলে। কিন্তু মিশনারীদের সংস্পর্শ তাদের মধ্যে এক স্বাধীনতাকামী সত্তা গড়ে তুলেছিল যার ফলে মিশনারীদের স্কুলে লেখাপড়া করা বীরসা মুন্ডা শোষণের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন।

বীরসা মুণ্ডার আদর্শের মধ্যে বৈষ্ণবীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তার আখড়া ছিল চালকা। সরকারের বনবিভাগ ১৮৯৩-৯৪ সালে মুন্ডাদের কিছু পতিত জমি নেওয়ার চেষ্টা করলে বীরসা প্রতিবাদ করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি নাকি ঈশ্বরের নির্দেশ পান বলা হয়। ব্রিটিশ সরকার বীরসার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে তাকে বন্দী করেন। ফলে মুন্ডা সমাজে তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। দুবছর পরে মুক্তি পেয়ে বীরসা সরাসরি দিকুদের বিরুদ্ধে আন্দোলন নেমে পড়েন। ১৮৯৯—১৯০০ সালে রাঁচী ও সিংভূম জেলা জুড়ে বীরসার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বীরসাকে কোন অলৌকিক শক্তি ব্রিটিশদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তিনি ধরা পড়েন এবং ব্রিটিশ কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়।

তবে বীরসার আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। ১৯০৮ সালে Chota Nagpur Tenancy Act পাস হয়। বলা হয় যে মুন্ডাদের জমি অন্য কেউ নিতে পারবে না। বেট বেগার বা বিনা মজুরীতে মুন্ডাদের কাজ করানো যাবে না। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে মুন্ডাদের সম্পর্কে সরকারের প্রজা আইন প্রণয়নের পূর্বেই তাদের নব্বই শতাংশ জমি দিকুদের হাতে চলে গিয়েছিল। সেগুলো উদ্ধারের কোনও নির্দেশ কিন্তু সরকার দেননি।

২(খ).৭.১ ওঁরাও বিক্ষোভ

ছোটনাগপুরের ওঁরাওরা ছিল মুন্ডাদের মতো আদিবাসী সম্প্রদায়। এদের সমাজেও খ্রিস্টান ও হিন্দুধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মুন্ডাদের মতো ওঁরাওরা মহাজনী শোষণের শিকার হয়েছিল। তবে তাদের ভূমি ব্যবস্থা যৌথ মালিকানা ব্যাপারটা প্রচলিত ছিল না। ওঁরাও আন্দোলনের নেতৃত্বেও দেখা যায় পুনরুভ্যত্থানবাদী মনোভাবের প্রতিফলন এবং বিশুদ্ধীকরণের মাধ্যমে অতীতের শোষণমুক্ত দিনগুলি ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন।

১৯১৪ সালে ওঁরাওদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন গুমলা মহকুমার অন্তর্গত, বিষুণপুর থানার অধীন ২৫ বছরের যুবক মাত্রা ওঁরাও। তিনি বলেন যে ওঁরাওদের দেবতা ধর্মেশ তাকে দেখা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ওঁরাওদের কিছু রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। ভূত প্রেতের পূজা, ঝাড়ফুঁক করা, মদ্যপান, মাংস খাওয়া, পশুবলি ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। নাচগান করা চলবে না। চাষবাসও তারা করবে না—কারণ এতে তাদের দুঃখ ঘোচে না। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য তারা অপরের দ্বারস্থ হয়ে কুলির কাজও করতে পারবে না। অচিরেই তাদের দুঃখ দূর হবে এবং ওঁরাওদের স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে।

ওঁরাওদের ধর্ম সম্পর্কে দুর্বলতা বা বলা যেতে পারে আদিবাসীদের ধর্ম সম্পর্কে দুর্বলতা খুব সহজেই এই নির্দেশগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলে। উপরন্তু এর মধ্যে ইঙ্গিত দেওয়া ছিল ভগবানের নির্দেশ মানলে স্বাধীন ওঁরাও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। ফলে ওঁরাওরা সরকার ও মহাজন বিরোধী বিদ্রোহে যোগ দেয়। সরকার যাত্রা ওঁরাও ও তার অনুগামীদের বন্দী করলেও ওঁরাওদের আন্দোলন কিন্তু ভেঙে যায়নি। পালামৌ, হাজারীবাগেও

এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি আসামের চা বাগানের ওঁরাওরা এই আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে চা বাগানের কুলীর কাজ ছেড়ে দেয়।

ওঁরাওদের এই নতুন ধর্মাদর্শের নাম ছিল কুড়ুখ ধরম। কারণ ওঁরাওদের অপর নাম ছিল কুড়ুখ।

১৯১৭ সালের শেষাশেষি ওঁরাওদের আন্দোলন ভেঙে পড়তে থাকে। ব্রিটিশরা পুনরায় ওঁরাও সমাজে তাদের প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সমর্থ হয়।

২(খ).৮ উদ্দেশ্য

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে যখন আদিবাসী ও কৃষক বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকার বিব্রত সেই সময়ে মালাবার অঞ্চলের মুসলমান কৃষক মোপলাদের অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভের ইতিহাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। মোপলারা ১৮৩৬ থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বারবার বিদ্রোহ করেছিল। এদের মনোভাব ছিল অনমনীয় এবং প্রয়োজনে এরা হিংসার পথ অবলম্বন করতে দ্বিধা করত না। উপরন্তু এদের বিদ্রোহের মধ্যে আদিবাসী বিদ্রোহীদের মতো ধর্মীয় বাতাবরণ উপস্থিত ছিল।

জমিদারী শোষণ ও অত্যাচার মোপলাদের বিদ্রোহ করতে বাধ্য করে। মোপলাদের দুর্দশার জন্য ব্রিটিশ সরকারের ভূমি সংক্রান্ত নীতিকে দায়ী করা যায়। ইংরেজরা ১৭৯২ সালে মালাবার অঞ্চল দখল করে হিন্দুদের প্রচুর জমি ও ক্ষমতা দেয়। ফলে মুসলমান কৃষকরা জমির উপর তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ তখন থেকেই তাদের মধ্যে বঞ্চনার ইতিহাস শুরু হয়। জমিদাররা জমি থেকে তাদের উৎখাত করার জন্য নির্মম অত্যাচার করত। এদের মধ্যে অনেকে আবার মহাজনী কারবারও করত। অর্থাৎ ভূমিহীন মোপলারা বেঁচে থাকার জন্য তাদের কাছ থেকেই ঋণ নিত।

কনরাড উড তাঁর লেখা “Peasant Revolt : An Interpretation of Moplah Violence in the 19th and 20th Centuries”-এ বলেছেন যে, মোপলারা যখন আর্থিক দিক দিয়ে বিধ্বস্ত, সেই সময়ে তাদের ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ধর্ম তাদের ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করেছিল। অস্পৃশ্য চেরুমারদের অনেকেই হিন্দু সমাজের জাতপাতের কড়াকড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমান হয়েছিল। ফলে মোপলাদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। বিদ্রোহীরা মিলিত হত মসজিদে। মোপলারা জমিদারদের (জম্মি) সম্পত্তি ধ্বংস করে, মন্দির ভাঙচুর করে ও জদিদারদের হত্যা করে তাদের প্রতিবাদ জানাত। কনরাড উডের মতে এই বিদ্রোহ মূলত হিন্দু জমিদার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের বিদ্রোহ। এরা সংঘবদ্ধভাবে কোনও সমবায় প্রতিষ্ঠা করে আইনের মাধ্যমে তাদের আন্দোলন পরিচালিত করার কথা চিন্তা করেনি।

ডি.এইচ. ধানাগাড়ে— Agrarian Conflict, Religion and Politics—The Moplah Rebellions in 19th and 20th Centuries-এ মন্তব্য করেছেন যে হিন্দু কৃষকরা কিন্তু জমিদারদের বিরুদ্ধে কোনও সংঘবদ্ধ নেতৃত্ব দেয়নি। তারা শুধু মাঝে মাঝে দস্যুবৃত্তি করেছে।

তবে ডেভিড আরনল্ড—Islam, the Mapillas and the Peasant Revolt in Malabar-এ বলেছেন যে মোপলাদের আন্দোলনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল সুন্দর ভবিষ্যতের এক স্বপ্ন। তারা শোষণহীন মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্যই জমিদার বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল যে বাইরে থেকে তাদের সাহায্যের জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আসছে।

দক্ষিণ মালাবারের এই কৃষক বিদ্রোহকে ব্রিটিশ সরকার স্থানীয় সমস্যা হিসাবেই গণ্য করেছিল। এছাড়া মুসলমান কৃষকরা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করায় আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় চরিত্রই প্রকট হয়ে উঠেছিল। ১৯২১ সালে যখন এই বিদ্রোহ অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে তখন ব্রিটিশ সরকার মোপলাদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে সচেতন হয়ে কিছু আইন প্রণয়ন করেছিল। ১৯২৯ সালে জমির উপর মোপলাদের বৈধ অধিকার স্বীকৃত হয়। এরপর আর কোনও মোপলা বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যায়নি।

২(খ).৯ অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের বিদ্রোহ

দক্ষিণ রাজস্থান ও উত্তর-পশ্চিম গুজরাটের অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতি আন্দোলন স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে গড়ে উঠেছিল। ১৮৬৮ সালে গুজরাটের পাঁচমহল অঞ্চলের নায়েকদা উপজাতির লোকেরা রূপসিং গোবরের নেতৃত্বে থানা আক্রমণ করেছিল। এদের আরেকজন নেতা ছিলেন জোরিয়া। গোবিন্দ গুরু ১৯১৩ সালে এক ধরনের শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন। তাকে প্রভাবিত করেছিল সম্ভবত হিন্দু ধর্ম। রাজস্থানের বাঁসওয়ারা, সুনু এবং দলুগড়পুর অঞ্চলে এবং গুজরাটের পাঁচমহলে ভীলরা স্বাধীন রাজ্যের স্বপ্ন নিয়ে বিদ্রোহ শুরু করেছিল। কিন্তু এই অভ্যুত্থান সফল হতে পারেনি।

গোদাবরী অঞ্চলে বাস করত কোয়া, কোণ্ড, ভোরা ও কোন্ধ উপজাতি সম্প্রদায়। এদের পরিধি ছিল বাস্তার, মালকানগিরি ও কোরাপুটের মধ্যে। বিদ্রোহীদের মূল কেন্দ্র ছিল চোডাভরম্ বা রাম্পা রাজ্য ও গুডেম অঞ্চল।

এই অঞ্চলের আদিবাসীরা ঝুম প্রথায় চাষ করত। স্থানীয় ভাষায় এই ধরনের চাষকে বলা হত পোড়ু। রাম্পা অঞ্চলের প্রশাসন তাদের অরণ্যের উপর অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে থাকে। জঙ্গলে কাঠ কাটা বা পশু চরানোর জন্য তাদের কর দিতে বলা হয়। উপজাতিরা তাদের সর্দার বা মুট্টাদারদের নেতৃত্বে বার বার বিদ্রোহ করে।

১৮৭৯-৮০ সালে মুট্টাদারদের বিক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠেছিল। রাম্পা অঞ্চল মাদ্রাজের আবগারি আইনের আওতায় পড়ার ফলে তাড়ির উপর কর ধার্য হয়। এছাড়া বহিরাগত ব্যবসাদার ও মহাজন যাদের এরা কোম্তি বলত তাদের অত্যাচারও ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছিল। পুলিশের অত্যাচার এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুট্টাদারদের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। তারা ধরে নিয়েছিল জমিদার ও মহাজনী শোষণ সরকারের মদত পুষ্ট।

মুট্টাদাররা গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকারকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। স্থানীয় মানুষরা মুট্টাদারদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ব্রিটিশ সরকার সেনাবাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করলেও মুট্টাদারদের জন্য আবগারী আইন শিথিল করতে বাধ্য হয়। মুট্টাদারদের রাম্পার শাসককে রাজস্ব না দিয়ে সরাসরি সরকারকে রাজস্ব দেবে স্থির হয়। রাম্পার তেলেগু গ্রামপ্রধান বা গ্রামের সর্বোচ্চ শাসক যাদের মনসবদার বলা হত তাদের প্রশাসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ প্রশাসন ভেবেছিল এই পরিবর্তনগুলি মুট্টাদারদের সন্তুষ্ট করতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংঘাত তীব্রতর হয়ে উঠল। মুট্টাদার ও ব্রিটিশ সরকারের মাঝে কোনও পক্ষ না থাকায় মুট্টাদাররা সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধিতা শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে মুট্টাদারদের বশ করার জন্যে ১৮৯২ সালে তাদের ভাতার বন্দোবস্ত হয়। এর ফলে উপজাতিরা মুট্টাদারদের সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে আন্দোলন হয়ে ওঠে ধর্মাশ্রয়ী। ১৮৮৬ সালে সুরলা রমল্লা ও রজলা অনন্তাইয়া নিজেদের রাম ও হনুমানের অবতার রূপে চিহ্নিত করেন। এদের অনুগত বাহিনীর নাম হয় রামদন্দু বা রামের বাহিনী। এরা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন। কোরামাল্লাইয়া বলে একজন নিজেকে পঞ্চ পান্ডবদের একজন অবতার বলে ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন তার শিশুসন্তান স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান। তিনিও বিট্রিশদের উচ্ছেদ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরা নানারকম অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে নিজেদের ঘোষণা করতেন। কার্যত কোনটাই অবশ্য প্রমাণিত হয়নি।

১৯২২ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯২৪ সালের মে মাস পর্যন্ত রাম্পা অঞ্চলে আবার ব্রিটিশ-বিরোধী আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। জঙ্গল ও পাহাড়ে রাস্তা তৈরির কাজে সরকার উপজাতিদের জোর করে কাজ করতে বাধ্য করেছিল। আল্লার শ্রীরাম রাজু নামে জনৈক ব্যক্তি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। যদিও তিনি উপজাতি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। যদিও তিনি উপজাতি আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছিলেন, তাহলেও তিনি কিন্তু উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তিনি শুধুমাত্র সাদা চামড়ার লোকদের ঘৃণা করতেন। ভারতীয়রা সেনাবাহিনীতে থাকলেও তিনি তাদের আক্রমণ করতেন না। জনসাধারণ এই আন্দোলনকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানানোয় ব্রিটিশ প্রশাসনকে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল।

দক্ষিণ অন্ধের কুড্ডাপ্পা ও নেলোর জেলার অন্তর্গত নামালাই পর্বতের চিঞ্চু উপজাতির মানুষরা ১৮৯৮ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকারকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। কারণ ব্রিটিশ সরকার তাদের ঝুম চাষ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং অরণ্যের উপর তাদের অধিকারকে খর্ব করেছিলেন। রাস্তার অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরোধিতা করে নেতৃত্ব দিয়েচিলেন একজন প্রাক্তন দেওয়ান। যদিও উপজাতিদের সম্পর্কে মমত্ব বোধ অপেক্ষা বাস্তারের রাজ সিংহাসনের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি।

১৯১৪ সালে উড়িষ্যার দাসপালিয়া অঞ্চলে খোন্দ উপজাতিরাও ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের সামিল হয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকার উপজাতি আন্দোলনগুলি সামরিক শক্তির সাহায্যে দমন করলেও একটা তথ্য প্রমাণিত হয় যে ব্রিটিশ প্রশাসন উপজাতিদের কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি।

২(খ).১০ সারাংশ

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষক সম্প্রদায় আদিবাসী গোষ্ঠী, অরণ্য পর্বতের উপজাতিরা শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তাদের ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রেক্ষাপট ছিল আর্থ সামাজিক। শোষণ ও নিপীড়ন ছিল ক্ষোভের মূল উৎস। মানুষকে তার স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করাই ছিল ক্ষোবের মূল কারণ। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল এক বিচিত্র ধর্মীয় আবরণ যা তাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সুখময় অতীত ফিরিয়ে আনার। আন্দোলনগুলি ব্রিটিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণে আনলেও একটা কথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল শোষণ ও নিপীড়নকে জনসাধারণ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে না।

২(খ).১১ অনুশীলনী

ক। বড় প্রশ্ন ঃ

১। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের প্রকৃতি আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

২। নীল বিদ্রোহ কেন হয়েছিল? এই বিদ্রোহ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছিল।

৩। পাবনার কৃষক বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

৪। মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহের বৈশিষ্টতা কোথায়?

৫। উপজাতি আন্দোলনগুলির বিশিষ্টতা কোথায়?

৬। খারওয়ার অভ্যুত্থান সম্পর্কে লিখুন।

৭। টীকা লিখুন ঃ

মুন্ডা বিদ্রোহ, ওঁরাওঁ বিদ্রোহ, উপজাতি আন্দোলনে মুট্টাদারদের ভূমিকা।

৮। মোপলা বিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণ করুন।

খ। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। দিকু কাদের বলা হত?

২। Social bandiry বা সামাজিক দস্যুতা বলতে কি বোঝায়?

৩। কুনবি ও বনি শব্দ দুটির অর্থ কি?

৪। খুণ্ডকটিদার বলতে কি বোঝায়?

৫। ‘কুড়ুখ ধরম’ কি?

৬। মোপলা বলতে কাদের বোঝায়?

৭। 'পোড়ু' শব্দটির অর্থ কি?

৮। কোম্‌তি কাদের বলা হত?

২(খ).১২ গ্রন্থপঞ্জী

1. Bipan Chandra—Modern India.
2. Anil Seal—Emergency of Indian Nationalism, Dharma Kumar (ed) Cambridge Economic History of India.
3. R.C. Majumdar (ed). British Paramountey and Indian Renaissance, Part-II.
4. B.B. Chaudhury—Peasant Movements in Bengal 1850-1900 in 19th Century Studies No. 3 Indian Peasant edited by Dr. Alok Ray.
5. Abhijit Dutta—Christian Missionaries on the Indigo question in Bengal.
6. Ranajit Guha—Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India.
7. Chittabrata Palit—Tensions in Bengal Rural Society. Perspectives of Agrarian Bengal.
8. K.K. Sengupta—Pabna Disturbance and the Polities of Rent.
9. Sumit Sarkar—Modern India.
10. R. Kumar—The Decan Riot of 1875 in Hardiman D.—(ed) Peasant Resistance in India 1858-1914.
11. Conrad Wood—Peasant Revolt ; "An Interpretation of Moplah Violence in the 19th and 20th Centuries "in Hardiman. D. (ed). Peasant Resistance in India.
12. D.H. Dhanagare—Agrarian Conflict, Religion and Politics : The Moplah Rehellions in 19th and 20th Centuries—Past and Present, 1977.
13. David Arnold—Islam, the Mopilas and the Peasant Revolt in Malabar.
14. সুনীল সেন—ভারতের কৃষক বিদ্রোহ।
15. সুপ্রকাশ রায়—ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।

একক ৩ ❑ সমাজ সংস্কার আন্দোলন

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য

৩.২.১ নবজাগরণের গতিধারা

৩.২.২ ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

৩.২.৩ বাঙ্গলায় শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস

৩.২.৪ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের কারণ

৩.২.৫ ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার

৩.২.৬ মিশনারীদের অবদান

৩.২.৭ মিশনারীদের উদ্দেশ্য

৩.২.৮ মুদ্রণযন্ত্র ও সংবাদপত্রের ভূমিকা

৩.৩ ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন

৩.৩.১ রামমোহনের প্রথম জীবন ও শিক্ষা এবং আদর্শ

৩.৩.২ রামমোহনের ধর্মচিন্তা

৩.৩.৩ আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা

৩.৩.৪ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা

৩.৩.৫ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য

৩.৩.৬ বিধবা বিবাহ ও সতীদাহ নিবারণ

৩.৩.৭ প্রথম আধুনিক মানুষ ঃ রামমোহন

৩.৩.৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্ম সমাজ

৩.৩.৯ কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম সমাজ

৩.৩.১০ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রসার

৩.৩.১১ ব্রাহ্ম সমাজের ভাঙ্গন

৩.৩.১২ ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের প্রভাব

৩.৪ পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৩.৪.১ প্রথম জীবন

৩.৪.২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কার্যাবলী

৩.৪.৩ বিদ্যাসাগর ও সমাজ সংস্কার
৩.৪.৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান
৩.৫ নব্যবঙ্গ আন্দোলন ও ডিরোজিও
৩.৫.১ ডিরোজিও ও তার আদর্শ
৩.৫.২ ডিরোজিওর পরবর্তী কালে নব্যবঙ্গ আন্দোলন
৩.৫.৩ নব্যবঙ্গ আন্দোলনের অবদান
৩.৫.৪ নব্যবঙ্গ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ
৩.৬ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশন
৩.৬.১ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার মত
৩.৬.২ স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্য
৩.৬.৩ বিবেকানন্দ ও ধর্ম সমন্বয়
৩.৬.৪ হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা
৩.৬.৫ রামকৃষ্ণ মিশন ও ধর্মান্দোলন
৩.৬.৬ নারী শিক্ষার প্রসার ও নিবেদিতার ভূমিকা
৩.৬.৭ থিওসফিক্যাল সোসাইটি
৩.৭ পশ্চিম ভারতে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন
৩.৭.১ মহারাষ্ট্রে পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার
৩.৭.২ মহারাষ্ট্রে কারিগরী ও নারী শিক্ষার প্রসার
৩.৭.৩ মহারাষ্ট্রে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন
৩.৭.৪ প্রার্থনা সমাজ আন্দোলন
৩.৭.৫ প্রার্থনা সমাজের উদ্দেশ্য
৩.৭.৬ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে পার্থক্য
৩.৭.৭ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ও তাঁর কার্যাবলী
৩.৭.৮ রাণাডের অবদান
৩.৭.৯ বাল গঙ্গাধর তিলকের অবদান
৩.৭.১০ মহারাষ্ট্রের অন্যান্য সমাজ সংস্কার
৩.৮ আর্য সমাজ আন্দোলন
৩.৮.১ দয়ানন্দ স্বরস্বতী ও তাঁর সংস্কার প্রয়াস
৩.৯ সারাংশ
৩.১০ অনুশীলনী
৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

বর্তমানে এককটি অধ্যায়ন করে আপনারা সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন গতিধারা ও বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য ও গতিধারা গুলি ঃ

- পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও সংস্কার চেতনার উন্মেষ
- প্রাচ্যপন্থী, ঐতিহ্যবাদী ও সমন্বয়ধর্মী ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন।
- সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র রূপে বাঙ্গলা দেশের ভূমিকা।
- পশ্চিমভারত তথা গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে সমাজসংস্কার আন্দোলন।
- জাতীয় ঐক্যবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ।
- শিক্ষার প্রসার, কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার, সামাজিক কু-প্রথার অবসান।

৩.১ প্রস্তাবনা

ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষের ব্যাপক ও সামগ্রিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। এই পরিবর্তনের প্রভাব এসে পড়েছিল সমাজব্যবস্থার মধ্যে। প্রভাবিত হয়েছিল ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি। কারণ ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কালীন কোম্পানি শাসন ও শোষণ ভারতীয় আর্থ সামাজিক কাঠামোকে বিপর্যস্ত করে ফেলছিল, তীব্র হয়েছিল সামাজিক জড়তা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি, আচার-সর্বস্ব ধর্মব্যবস্থা, নিষ্ঠুর অমানবিক কুসংস্কারের বেড়াজালে ভারতে দেখা গিয়েছিল এক অন্ধকারময় যুগ। এই সময়কালে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন চিরাচরিত ঐতিহ্য, প্রথা, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার যেন এক দৃঢ় ভিত্তিতে মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছিল। জনমানসে যুক্তিবাদের কোন স্থান ছিল না। ব্রিটিশ শোষণ, অজ্ঞতা প্রভৃতির কারণে মানুষ এক হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছিল। এই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে ভারতবাসীর মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয়দের এই সময়ে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছিল। অন্যদিকে তারা এক প্রগতিমূলক সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মধ্যে আসে যুক্তিবাদী চেতনা, অনসন্ধিৎসার মনোভাব। তাঁরা যুক্তির আলোয় যাবতীয় রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের বিচার করতে সচেষ্ট হন। ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে যেমন ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নবমূল্যায়ন ঘটে। নবমূল্যায়নের এই প্রবণতাই 'নবজাগরণ' নামে পরিচিত।

নবজাগরণ প্রকাশিত করতে থাকে সমাজ-সংস্কৃতির অবক্ষয়ের দিকগুলি। চিন্তাশীল মনীষীরা এই অবক্ষয়ের চিত্রকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা দূর করতে প্রয়াসী হন। তাঁদের এই প্রচেষ্টাই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করে। সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম আন্দোলনের ফলে সমাজ থেকে সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়, কুসংস্কারমুক্ত এক নতুন ভারতের উন্মেষ হয়।

৩.২ নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে নবজাগরণের সূচনা হল তার দুটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করতে পারি। প্রথমত, ভারতের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবক্ষয় স্থবিরতার সঙ্গে নব প্রগতিমূলক সংস্কৃতির সংঘাত এবং দ্বিতীয়ত, পশ্চিমী যুক্তিবাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে চিরাচরিত ঐতিহ্যের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। নবজাগরণের এই সমন্বয় ও সংঘাতের যুগ্ম প্রতিক্রিয়া ভারতে জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বস্তুতপক্ষে নবজাগরণের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। নবজাগরণ শুধু ধর্ম, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নয় রাজনীতি, সাহিত্য, সংবাদপত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক পরিমণ্ডলের সূচনা করে। বাঙলাদেশেই প্রথমে নবজাগরণ উন্মেষ হয় ক্রমে তা ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়।

৩.২.১ নবজাগরণের গতিধারা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা ছিল নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র। মননজগতে আলোড়ন হল নবজাগরণ যার প্রকৃতি হল আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা। জড় নিশ্চল সমাজব্যবস্থায় গতির সঞ্চার করেছিল নবজাগরণ। আধুনিকীকরণের এই গতি দুটি ধারায় সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রথমত, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সমাজে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মানুষের যুক্তিবাদী মন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থ বজায় ও সম্মান রক্ষার্থে প্রয়াসী হল।

উপরিউক্ত দুটি গতিধারায় কার্যকলাপকে বাস্তবায়িত করতে সৃষ্টি হল সংস্কারবাদী দল ও রাজনৈতিক দলের।

৩.২.২ ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলি প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিল ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে। এইসব আন্দোলনের প্রবক্তা যাঁরা ছিলেন তাঁরা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন বহু অভিনব বৈশিষ্ট্য যা পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পুরোধায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা পাশচাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও দর্শনের আলোকে হয়ে উঠেছিলেন মুক্ত মনের অধিকারী। উদার মন নিয়ে তাঁরা সনাতন হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে পাশচাত্য শিক্ষা ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক, সামাজিক ধর্মীয় ও ব্যক্তিজীবনের উপর প্রভাব ফেলেছিল।

৩.২.৩ বাঙ্গলায় শিক্ষা প্রসারের প্রয়াস

১৮১৩ সালের সনদ আইনে নির্ধারিত হয়েছিল যে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বছরে একলক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে অথচ ১৮২৩ সাল পর্যন্ত এই মঞ্জুরীকৃত অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। ইতিমধ্যে বাঙ্গালীরাই ব্যক্তিগতভাবে সর্বপ্রথম ইংরেজি শিক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এক্ষেত্রে তাঁরা খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক মানবতাবাদী ও সংস্কারকদের সহায়তা লাভ করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে, ১৮৩৫ সালের পূর্ব

পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বা শিক্ষা পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। শিক্ষা প্রসারের সরকারি উদ্যোগ অনেক পরে গৃহীত হয়েছিল।

৩.২.৪ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের কারণ

পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করার মূলে দুটি কারণ দেখা যায়। বাঙ্গলায় ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর এখানে সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। এই মধ্যবিত্ত সমাজে হিন্দুরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা পাশ্চাত্যের জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্য নিয়ে এই ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী হয়েছিলেন। কারণ তাঁদের মধ্যে ছিল পশ্চিমের রাজনৈতিক, ঐতিহ্য, চিন্তাধারা, পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার এক তীব্র আকাঙ্খা।

দ্বিতীয়ত, ১৭৭৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচার, আইন সম্পর্কিত কাজের জন্য বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে রুজি-রোজগারের তাগিদ সাধারণ মানুষকে ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী করে তুলেছিল।

৩.২.৫ ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য বিস্তার ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে ইংরেজি ভাষা জানা কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। যদিও এই সময় উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ হত না কিন্তু নীচু পদে অর্থাৎ দো-ভাষী, করণিক, নকলনবীশ পদের জন্য ভারতীয়দের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। তবে ব্রিটিশ কোম্পানির পক্ষ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য উদ্যোগ গৃহীত হবার আগেই বেসরকারি পক্ষ থেকে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। কিছু ইউরোপীয়ান, ইউরেশিয়ানরা এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শেরবোর্ণ নামে এক ইউরেশিয়ান জোড়াসাঁকোয় ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়েই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। আমড়াতলায় মার্কিন বোল্‌স (Bowles) -এর বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন মতিলাল শীল। হেনরী ড্রামন্ড ধর্মতলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরই ছাত্র ছিলেন ডিরোজিও।

৩.২.৬ মিশনারীদের অবদান

ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে মিশনারীদের অবদানও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এইসব মিশনারীরা ধর্মপ্রচার করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বাঙ্গলা ভাষা শিখেছিলেন এবং বাঙ্গালীদের ইংরেজি ভাষা শেখাবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। যেসব খ্রিস্টান মিশনারী বাঙ্গলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষার প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে উইলিয়াম কেরীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখনীয়। ১৭৯৩ সালে তিনি বাঙ্গলায় এসেছিলেন এবং শ্রীরামপুরে ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করেন। তিনি মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের সহযোগিতায় শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠা করেন একটি বিদ্যালয়ও একটি ছাপাখানা। এখান থেকে বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতে থাকে, কেরী সাহেব নিজে বাইবেলের বাঙ্গলা অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর ছাপাখানায় 'সমাচার দর্পণ' নামে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। বাঙ্গলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে ডেভিড

হেয়ারের নাম উল্লেখনীয়। তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় যা হেয়ার স্কুল নামে পরিচিত ছিল এবং স্থাপন করেছিলেন স্কুল বুক সোসাইটি।

চুঁচুড়ায় রবার্ট মে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি আরো ৩৬টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া রেভারেন্ড ডাফ নামে একজন স্কটিশ মিশনারী কলকাতায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যা স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে পরিচিত। রেভারেন্ড ডাফ ও রাজা রামমোহন রায় উভয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হলে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার দ্রুতগতি লাভ করে। এই কলেজটির উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের ইংরেজি, বাঙ্গলা ভাষা, ইউরোপ ও এশিয়ার সাহিত্য বিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা। এই কলেজের ছাত্র ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ন বসু, ভুদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। হিন্দু কলেজের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে কলকাতার বহু উচ্চ ইংরেজি কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই কলেজ পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে পরিচিত হয়েছিল।

৩.২.৭ মিশনারীদের উদ্দেশ্য

মিশনারীদের উদ্দেশ্য ছিল এইসব শিক্ষায়তনের মধ্যে দিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম ও সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করে তোলা। তাঁরা আশা করেছিলেন ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ভারতবাসী পশ্চিমের প্রগতিমূলক আধুনিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হবে। বস্তুতপক্ষে মিশনারীদের কর্মপ্রয়াস ভারতে পশ্চিমী ভাবধারা ও আদর্শের সূত্রপাত করেছিল। হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্বতা, সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা করতেন মিশনারীরা। তাঁদের সমালোচনা শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে উনবিংশ শতকে নানাবিধ প্রগতিমূলক সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করা হয়েছিল।

৩.২.৮ মুদ্রণযন্ত্র ও সংবাদপত্রের ভূমিকা

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ভারতে মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার হতে থাকে। ১৭৮০ সালে অগাস্টস হিকি (Hicky) সর্বপ্রথম 'বেঙ্গল গেজেট' নামে ইংরেজি সংবাদ সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ১৭৮০ সাল থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে কলকাতায় ছয়টি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্যালকাটা গেজেট, হরকরা, ইন্ডিয়া গেজেট প্রভৃতি। প্রতিটি পত্রিকায় ইংরেজিতে ইংরেজদের জন্য লিখিত হত। বেঙ্গল হরকরা পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৭৯৮ সালে। এই পত্রিকার সম্পাদক চার্লস মাকলিন ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি সূচক লেখনীর জন্য নির্বাসিত হন। মাদ্রাজেও প্রকাশিত হয় মাদ্রাজ কুরিয়ার (১৭৮৫), এছাড়া ইন্ডিয়া হেরাল্ড (১৭৯৫) প্রভৃতি পত্রিকা। এইসব পত্রিকা সরকারের সমালোচনা প্রকাশিত করলেও কোন রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করত না।

১৮১৮ সালের আগে বাঙ্গলা ভাষায় কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। শ্রীরামপুরের মিশনারী মার্শম্যান সম্পাদিত 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্শন' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮২১ সালে রাজা

রামমোহন রায়ের সম্পাদনায় 'সংবাদ-কৌমুদী' নামে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইসব পত্রিকাগুলিতে স্বদেশচিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। প্রাচীনপন্থীদের মুখপাত্র রূপে সমাচার পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পাদিত ইন্ডিয়ান রিফরমার প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩১ সালে। এটি ছিল প্রগতিপন্থীদের মুখপাত্র রূপে সমাচার পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পাদিত ইন্ডিয়ান রিফরমার প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩১ সালে। এটি ছিল প্রগতিপন্থীদের মুখপাত্র। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 'পার্থেনন' 'হিন্দু পাইওনীয়ার' ইত্যাদি পত্রিকার মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও সামাজিক বিষয়ে প্রগতিমূলক মতামত প্রচার করতেন। ১৮৫৭ সালের পর প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি সরকারি শোষণ, বৈষম্য, জনগণের দুঃখ তুলে ধরেছিল। ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা জনমানসের রাজনৈতিক চেতনার প্রসারে বহুল পরিমাণ সহায়তা করেছিল। ১৮৬১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় ইন্ডিয়ার মিরর, গিরীশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় বেঙ্গলী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ১৮৬৮ সালে শিশির কুমার ঘোষ 'অমৃত বাজার পত্রিকা' নামে বাঙ্গলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সরকারি সমালোচনা খুব তীব্রভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর ব্রতই ছিল এই পত্রিকাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারক ও বাহকে পরিণত করা। এছাড়া ছিল সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, সুলভ সমাচার, সাধারণী প্রভৃতি পত্রিকা। বাংলার এইসব সমাচার পত্র ও সাময়িক পত্রিকাগুলি রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায় ও সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি নির্দেশ করেছিল।

৩.৩ ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত। তিনি ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ বলে অভিহিত হয়েছেন। পশ্চিমী ভাবধারায় প্রভাবিত রামমোহন রায় ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মপ্রয়াস বা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং ভারতবাসীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য আজীবন অক্লান্ত সাধনা করেছিলেন। সামাজিক জড়ত্ব, ধর্মীয় দুর্নীতি, অশিক্ষা, কুসংস্কার তাঁকে ব্যাথিত করেছিল।

৩.৩.১ রামমোহনের প্রথম জীবন ও শিক্ষা এবং আদর্শ

১৭৭৪ সালে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তার পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত জমিদার। তিনি বাল্যকালে ফার্সী ও আরবী শিক্ষা করেন। সুফীবাদ সম্পর্কে পড়াশোনা করেন, তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। বারাণসীতে সংস্কৃত ভাষা পাঠ এবং হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন করেন, পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষা, পাশ্চাত্য দশন, সাহিত্য, ইতিহাস অধ্যয়ন করেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের ফলে তাঁর চরিত্রে বহুত্বের সমন্বয় ঘটেছিল। স্বদেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল সুগভীর। প্রাচ ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি

ভারতের সামাজিক জড়তা কাটাতে পাশ্চাত্যের আধুনিক সংস্কৃতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন জড়তা, সংস্কার কাটিয়ে ভারতবাসী যুক্তিবাদী মনোভাব গ্রহণ করুক মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা করুক। তিনি ছিলেন এক মানবতাবাদী সমাজ-সংস্কারক।

৩.৩.২ রামমোহনের ধর্মচিন্তা

রামমোহন রায় পাঠ করেছিলেন ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ, 'জৈন কাব্যসূত্র' এছাড়া ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ বেদান্ত উপনিষদ। এইসব ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে তিনি তাঁর মনে এই ধারণা হয় যে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগ্রন্থে তাঁর ভিন্ন রূপ কল্পনা করা হয়েছে বলেই ধর্ম ও ঈশ্বরের রূপ নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এই একেশ্বরবাদকে তিনি সারাজীবন সারসত্যরূপে পালন করেছিলেন। ১৮০৩ সালে তিনি 'তুহফাতুল-ময়াহিদিন' নামে ফার্সী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে একেশ্বরবাদের আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর গ্রন্থগুলিতে ধর্মীয় কুসংস্কার, দেবদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি, অলৌকিকত্ব প্রভৃতির সমালোচনার সঙ্গে অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদের অবতারণা ইত্যাদিও আলোচিত হত।

৩.৩.৩ আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা

১৮১৫ সাল থেকে রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। খুব শীঘ্রই তিনি কিছু সংস্কারমুক্ত মনস্ক ব্যক্তিদের নিয়ে 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করেন। তিনি হিন্দুধর্মের ও সমাজব্যবস্থার অর্থহীন ক্রিয়াকলাপের তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিবাদী আলোচনা তাঁকে যথেষ্ট সামাজিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তিনি প্রচার করেছিলেন ঈশ্বর নিরাকার এবং নিরাকার ব্রহ্ম একমাত্র সত্য এবং বৈদিক হিন্দু ধর্মে পৌত্তলিকতার কোন স্থান ছিল না তা একেশ্বরবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে ধর্মীয় আচারসর্বস্বতা বর্জন করে মানুষ প্রকৃত ধর্ম পালন করুক এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন চিরাচরিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার পৌত্তলিকতার ফলে মানুষের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। ১৮২১-২৩ সালের মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন (Brahmanical Magazine) প্রকাশ ভারতবাসীর অজ্ঞতার, দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে মিশনারীদের কার্যকলাপকে। মিশনারীদের গোঁড়ামির সমালোচনা করে ছিলেন তবে খ্রিস্টধর্ম বিরোধী তিনি ছিলেন না।

৩.৩.৪ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা

নানাপ্রকার ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে রাজা রামমোহন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর একেশ্বরবাদী মত প্রচার করার জন্য ১৮২৮ সালে স্থাপিত হল ব্রাহ্ম সভা। ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠা হল ব্রাহ্মসমাজ ভবন। এই ব্রাহ্ম সমাজ সকল একেশ্বরবাদে বিশ্বাসীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সকলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিতে পারতেন। তাঁর নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন

সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হয়। সামাজিক অত্যাচারের শিকার ছিলেন নারীসমাজ। রাজা রামমোহন নারী-সমাজের মুক্তির জন্য, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়াসী হন। এছাড়া জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, সতীদাহ, বর্ণভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সতীদাহের বিরুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক ও দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁক সহযোগিতা করেছিলেন। আবার একথা অনস্বীকার্য যে রামমোহনের সমর্থন ও সহযোগিতার কারণেই লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সামাজিক সংস্কারগুলি প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন।

৩.৩.৫ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ধর্মসংস্কার নয়, এর কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হল সামাজিক সংস্কার। সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, কুশিক্ষা দূরীভূত করার জন্য সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, একই সঙ্গে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে নিজস্ব মতপ্রকাশ করেছিলেন। রাজা রামমোহন তাঁর সংস্কার আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত সংগঠনের জন্য বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করে তাঁর নিজস্ব ভাবধারা জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন, তিনি 'সংবাদ কৌমুদী' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন।

৩.৩.৬ বিধবা বিবাহ ও সতীদাহ নিবারণ

তাঁর সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রধান বিচার্য ছিল নারী সমাজের মুক্তি ও কল্যাণসাধন। তাই তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য দুটি সামাজিক সংস্কার হল বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও সতীদাহ প্রথার নিবারণ। তাঁর নেতৃত্বে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত ও আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।

১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক আইনের সাহায্যে এই অমানুষিক প্রথার অবসান ঘটান। তবে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে এই প্রথার বিরুদ্ধে যে শক্তিশালী প্রগতিশীল এক জনমত গড়ে উঠেছিল তার ফলেই বেন্টিঙ্ক এই প্রথা রদ করতে পেরেছিলেন। তাই এই প্রথা রহিত করার পশ্চাতে প্রগতিশীল জনমতের ব্যাপক সমর্থন না থাকলে এই নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথাটি সহজে রদ হতে পারত না।

৩.৩.৭ প্রথম আধুনিক মানুষ ঃ রামমোহন

তাই একথা অনস্বীকার্য যে রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ-সংস্কার প্রয়াস জনমানসকে প্রভাবিত করেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির সমন্বয়ে আধুনিক ভারতবর্ষ গঠনের পথ তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ কোন বিকল্প হিন্দুবিরোধী ধর্ম ছিল না, তা ছিল উপনিষদের একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। রাজা রামমোহনের ছিল এক গভীর হিতবাদী চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আশ্চর্য সম্মেলন ঘটেছিল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ছিল সম্যক জ্ঞান। শুধু ভারতবর্ষ নয় ফ্রান্স, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে তিনি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। শুধু ভারতীয় নয় বিশ্বের প্রতিটি অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তি কামনা করতেন। এ ছিল তাঁর আধুনিক মনস্কতার চরম নিদর্শন।

৩.৩.৮ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্ম সমাজ

১৮৩৩ সালে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম সমাজের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে কমে যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে নবপ্রাণের সঞ্চার করেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজকে ব্রাহ্মধর্মে রূপান্তরিত করেন। ১৮৩৮ সালে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন ও ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন তত্ববোধিনী সভা। এই সভায় সংস্কারমুক্ত ধর্ম আলোচনা হত। রাজা রামমোহনের ভাবধারা ও আদর্শকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা তৎকালীন সামাজিক কুসংস্কার ও বিবিধ একটি ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে মতামত প্রচার করত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্ম ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। তিনি ব্রাহ্মধর্মের 'অনুষ্ঠান পদ্ধতি' নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার মাধ্যমে ব্রহ্ম উপাসনার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

৩.৩.৯ কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম সমাজ

১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ১৮৬২ সালে। তাঁর ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা, আবেগের ফলে যুক্তিবাদী ব্রাহ্মধর্ম ক্রমে ভক্তিবাদী ভাববাদী প্রকৃতি গ্রহণ করেছিল। তিনি ও তাঁর অনুগামীরা বাল্য বিবাহ জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে এবং বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতির স্বপক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সংস্কার আন্দোলনের ফলে ১৮৭২ সালে ভারতে সরকারি তিন আইন (Act III, 1872) দ্বারা বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এবং অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ স্বীকৃত হয়। তিনি ব্রাহ্মধর্মে বৈষ্ণব সংকীর্তন রীতিটি নিয়ে আসেন এবং যীশু ও চৈতন্যদেবের ভক্তিভাবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের ব্যাপকতা প্রদান করেন অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বে ব্রাহ্ম আন্দোলন সমাজ সংস্কারের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করেছিল। ১৮৮০ সালে তিনি ব্রাহ্মধর্মকে সর্বধর্ম সমন্বয়কারী নববিধান বলে ঘোষণা করেন যার আদর্শ হবে সাম্প্রদায়িকতাকে পাপ রূপে বর্জন করা; সকল ধর্ম, সম্প্রদায় ও শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্যকে সম্মান প্রদর্শন করা ও সেই সত্যকে গ্রহণ করা; ভগবৎ প্রেম; ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা। প্রথম দিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেনের কর্মসূচীর সমর্থক ছিলেন এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁক ব্রহ্মানন্দ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। খুব শীঘ্রই তাঁর ব্যাপক সংস্কার প্রচেষ্টার কিছু কিছু বিষয় (উপবীত বর্জন, অসবর্ণ বিবাহ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রাচীনপন্থীদের মনে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর ব্রাহ্ম সমাজ দুটি পৃথক সংস্থায় বিভক্ত হয়ে যায়। তরুণ ব্রাহ্মবাদীরা কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে "ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ" প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে প্রাচীনপন্থীরা "আদি ব্রাহ্মসমাজ" নামে কর্মপ্রয়াস পরিচালনা করতে থাকে।

৩.৩.১০ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্মের প্রসার

কেশবচন্দ্র সেন সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক নানা সংস্কারকার্যে প্রয়াসী হলেন। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ করেন ব্রাহ্ম ধর্মমত প্রচার করেন। ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে ধর্মসমাজ গঠিত হতে থাকে সর্বসমেত

৫৪টি ব্রাহ্ম সমাজের শাখা স্থাপিত হয়। বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্রার্থনা সমাজ'। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণের মাধ্যমে ঐক্য সাধনের যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছিলেন তা সত্যিই সেই যুগে ছিল অভিনব দৃষ্টান্ত।

৩.৩.১১ ব্রাহ্ম সমাজের ভাঙ্গন

খুব শীঘ্র সভ্যগণ ভক্তিবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন এবং কেশবচন্দ্র সেন তাঁদের কাছে অবতারে পরিণত হন তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার রীতিও প্রচলিত হয়। এই অবতারবাদের বিরুদ্ধে তরুণ ব্রাহ্মবাদীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। তরুণ সদস্যদের প্রগতিমূলক দাবী যেমন স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি কেশবচন্দ্র সেনের মনঃপুত ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৮ সালে তাঁর চতুর্দশবর্ষীরা কন্যার বিবাহ কোচবিহারের রাজপরিবারে হলে তিনি 'ব্রাহ্ম সমাজে' বিধি লঙ্ঘন করেচেন এই বিষয়টি কেন্দ্র করে 'ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ' থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রগতিবাদীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও ''সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'' নামে নতুন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজ নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ নামে পরিচিত হয়। সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজ এইভাবে তিনটি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে যায়—আদি ব্রাহ্ম সমাজ, নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ।

৩.৩.১২ ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের অবদান

ভারতের সামাজিক জীবনে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের জড় নিশ্চল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থায় এক মারাত্মক আঘাত হেনেছিল ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন। সংস্কারকদের যুক্তিবাদী প্রচার ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্মের আচার-সর্বস্বতা ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে চেতনার সৃষ্টি করে এবং তাঁরা ধর্ম ও সমাজের আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপলব্ধি করেন। ফলে কুপ্রথা ও কুসংস্কাগুলি ধীরে ধীরে সমাজ ও ধর্ম ব্যবস্থা থেকে নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের নেতৃবর্গ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন অর্থাৎ উভয়ের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির মধ্যে সমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা তাঁরা করেছিলেন পরবর্তীকালে তা আরো প্রসারিত হয়। সংস্কারের এই প্রয়াস সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়ে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার জাগরণ ঘটে মানুষের মধ্যে, পরাধীন ভারতবর্ষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে কেশবচন্দ্র সেনের সর্বভারতীয় ভ্রমণ ও প্রচার যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল এবং ভারতীয় জনগণ এক নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের উত্থান হয়। এই জাতীয়তাবাদ প্রথম প্রকাশ লাভ করেছিল সমাজ ও ধর্ম আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, পরে তা রাজনৈতিক প্রকৃতি গ্রহণ করেছিল। ফরাসি ও রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে যেমন দার্শনিক লেখক ও চিন্তাবিদরা সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তেমনই ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারকগণ জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ, বৃদ্ধি ও প্রসারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

৩.৪ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রাজা রামমোহনের পর বাঙলার নবজাগরণের অন্যতম সংস্কারক ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত হলেও পাশ্চাত্যের উন্নয়নমূলক চিন্তাধারা আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। রাজা রামমোহনের মতো তিনিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর মধ্যে আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। সমাজের নিম্নস্তরের অবহেলিত মানুষের উন্নতির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

৩.৪.১ প্রথম জীবন

তাঁর জন্ম হয় ১৮২০ সালের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও মাত ভগবতী দেবী। তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন ১৮২৯ সালে এবং ১৮৪১ সালে এই কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি নিয়ে পাশ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। কাব্য, অলংকার, বেদান্ত শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাঙলার হেড পণ্ডিত ও পরে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

৩.৪.২ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কার্যাবলী

সংস্কৃত কলেজে সমাজের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের শিক্ষার অধিকার ছিল। তিনি অত্যন্ত মুক্ত ও বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়ে যে কোন ছাত্রের জন্য এই কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করেন, এছাড়া এই কলেজে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করেন ও ইংরেজি অবশ্য পাঠ্য করা হয়। একই সঙ্গে সংস্কৃত ও ইংরেজি অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে ছাত্ররা প্রভাবিত হয়। জনশিক্ষা বিস্তারে তিনি প্রয়াসী হন। বর্ণমালা, কথামালা, বোধোদয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কারণ তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। সমাজের প্রকৃত প্রগতির জন্য স্ত্রীশিক্ষার অপরিহার্যতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। সমজের প্রকৃত প্রগতির জন্য স্ত্রীশিক্ষার অপরিহার্যতা তিনি উপলব্ধি করেন। তাঁর উৎসাহে বাঙলার গ্রামাঞ্চলে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি জানতেন গ্রামেই কুসংস্কারের শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত তাই গ্রামকেই তাঁর কাজের প্রধান ক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বেথুন সাহেবের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষাবিভাগের সরকারি পরিদর্শকের পদ লাভ করেছিলেন এবং এরপর জনসাধারণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার সুফলের কথাও প্রচার করেছিলেন।

৩.৪.৩ বিদ্যাসাগর ও সমাজ সংস্কার

শিক্ষা প্রসারে তাঁর স্বাধীন কর্মকাণ্ড সরকারি পক্ষে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তিনি সরকারি পদ পরিত্যাগ করে আরো প্রসারিত ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হলেন। তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বপূর্ণ সংস্কার হল বিধবাবিবাহের আইনসংগত স্বীকৃতি প্রদান করা। সমাজসংস্কারকগণ সতীদাহ প্রথার অবলুপ্তির মধ্যে দিয়ে যে

প্রগতিশীলতার সূচনা করেছিলেন তা পরিপূর্ণতা পেয়েছিল বিধবাবিবাহের আইনগত স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে। তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ, পত্রিকায় এই ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করেছিলেন। প্রবল বাধা, প্রতিবাদ ও সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে ১৮৫৫ সালে এক হাজার স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র সরকারের কাছে পেশ করেন। তাঁর একান্ত চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৮৫৬ সালে প্রথম বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রথম বিধবা বিবাহ করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ১৮৭০ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিবাহ করেছিলেন এক বাল্য বিধবাকে। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে একটি পত্রে লিখেছিলেন তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম সৎকার্য হল বিধবাবিবাহ প্রবর্তন। তিনি মনে করতেন এই কাজের চেয়ে সৎকর্ম তিনি এই জন্মে করতে পারবেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র বিধবা বিবাহ নয় বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেছিলেন। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় বহু বিবাহের সমালোচনা করা হয়েছিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকে বহুবিবাহের কুফল উদঘাটন করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বর্ধমানের মহারাজার সহায়তায় ৫০ হাজার স্বাক্ষর সহ বহু বিবাহের বিপক্ষে আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে আবেদন পাঠিয়েছিলেন ১৮৫৮ সালে। কিন্তু এই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকার হিন্দুদের সামাজিক প্রথায় হস্তক্ষেপ করা বন্ধ করে দেন। এসত্ত্বেও বলা বিদ্যাসাগরের মতো এত প্রসারিত ও গভীরভাবে নারী শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের চেষ্টা কেউ করেননি। তাঁর প্রচেষ্টা জনগণের মধ্যে সুচেতনা নিয়ে আসে এবং সামাজিক কুপ্রথাগুলি ধীরে ধীরে লোপ পায়।

৩.৪.৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান

শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা, নারী মুক্তি প্রভৃতি কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাতঃস্মরণীয় এক ব্যক্তিত্ব। প্রাচীন ভারতের সুমহান ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা একই সঙ্গে তিনি পশ্চিমের যুক্তিবাদী মানসিকতাকে অস্বীকার করেননি তাঁর মধ্যে উভয়ের সমন্বয় দেখা গিয়েছিল। সংস্কৃতে পন্ডিত হলেও আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন আর এটাও বুঝেছিলেন ইংরেজি ভাষা জনশিক্ষার মাধ্যম হতে পারে না। এজন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের উপর জোর দেন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা না করতে মাতৃভাষা বাংলা ম্রিয়মান হতশ্রী হয়ে পড়বে। তাই যাতে সহজে সংস্কৃত শিক্ষা করা যায় এজন্য 'উপক্রমণিকা' ব্যাকরণ কৌমুদী গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সীতার বনবাস, শকুন্তলা ছিল তাঁর অসাধারণ সাহিত্যিক কর্ম। এছাড়া তাঁর প্রাথমিক বাঙ্গলা পুস্তক বর্ণপরিচয় দ্বারা বাঙালী শিশুমাত্রেই অক্ষর জ্ঞান লাভের সুযোগ পায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তার সংস্কার প্রয়াস বাঙ্গলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ও সৃজনশীল ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এই সংস্কারের কর্মসূচী ভারতের সমাজব্যবস্থার মৌলিক ও কাঠামোগত কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পরিমণ্ডলে এই সংস্কার অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে সমাজের সাধারণ মানুষ নিস্পৃহ ছিল তাই তাঁর আন্দোলন এক প্রবল ঢেউ তুলে বিলীন হয়ে যায়।

৩.৫ নব্যবঙ্গ আন্দোলন ও ডিরোজিও

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মিশনারীদের কার্যকলাপে ভারতীয় সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অবাঞ্ছিত কুসংস্কার, অযৌক্তিক ধর্ম আচরণের বিরুদ্ধে যে সংস্কারপন্থীরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমূল সামাজিক পরিবর্তনে প্রয়াসী হন সেই শিক্ষিত যুবকগোষ্ঠী ইয়ং বেঙ্গল বা নব্যবঙ্গ নামে পরিচিত ছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের দুই দশক (বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক) পর্যন্ত নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন চলেছিল। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন হেনরী লুই ডিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি ছিলেন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান কবি, অধ্যাপক ও প্রখর যুক্তিবাদী। 'ধর্মতলা একাডেমী'তে হেনরী ড্রামন্ডের ছাত্র ছিলেন ডিরোজিও। ড্রামন্ডের প্রভাবে ডিরোজিও যুক্তিবাদ, মানবিকতাবাদে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজে সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয়তা ছিল। ছাত্রেরা তাঁর পান্ডিত্য, যুক্তিবাদে মুগ্ধ ছিলেন তাই নয় ডিরোজিওর উদারবাদ, স্বদেশপ্রেম তাদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ডিরোজিও রচিত Fakir of Jhungeera (ফকির অফ জাঙিঘরা) নামে কাব্যখানি খুব প্রশংসা লাভ করেছিল। এই কাব্য ভারতের প্রথম দেশাত্মবোধক কাব্য বলে অভিহিত হয়েছিল। এই কাব্যে তিনি ভারতবর্ষকে স্বদেশরূপে বন্দনা করেছেন এবং একই সঙ্গে তদানীন্তন সামাজিক হীন দরিদ্র অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

৩.৫.১ ডিরোজিও ও তাঁর আদর্শ

১৮২৮ সালে তিনি কলেজের ছাত্রদের নিয়ে একাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। এই সমিতিতে সমাজের নানাবিধ কুপ্রথা, কুসংস্কার, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, পৌত্তলিকতা বিষয়ে আলোচনা করতেন ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যরা। তাঁদের আচরণে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ডিরোজিও'র দার্শনিক প্রেরণার উৎস ছিল টমাস পেইন (Thomas Paine)-এর Age of Reason তিনি তাঁর ছাত্রদের যুক্তি দ্বারা সব বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে শিখিয়েছিলেন। অর্থাৎ সবকিছুকে প্রথা বলে মেনে না নিয়ে যুক্তির আলোয় তা পরীক্ষা করার কথা বলেছিলেন। তাঁর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনচিন্তা, অনুসন্ধিৎসা প্রখর হয়ে ওঠে। তাঁরা কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠেন, মূর্তিপূজা বর্ণভেদের সমালোচনা করতে থাকেন। ফলে রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে ভীষণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেয়। কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওকে সব বিপত্তির মূল কারণ বলে অভিযুক্ত করা হয় এবং রক্ষণশীল সমাজের চাপে কলেজ থেকে তিনি পদচ্যুত হন। ১৯৩১ সালে তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

৩.৫.২ ডিরোজিওর পরবর্তীকালে নব্যবঙ্গ আন্দোলন

তাঁর অকালমৃত্যুর পরও নব্যবঙ্গ চলতে থাকে তাঁর ছাত্রদের দ্বারা। তাঁর প্রিয় ছাত্র যেমন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাতনু লাহিড়ী প্রমুখ সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা বিষয়ে

উন্নয়নমূলক আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। পশ্চিমী চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটান। 'পার্থেনন' ও বেঙ্গল স্পেকটটর' নামে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যাতে ডিরোজিও শিষ্যরা ইরেজ সরকারের দুর্নীতি, কুশাসন, ধর্ম ও সমাজের পচনশীল দিকগুলি তুলে ধরতে থাকেন। জনগণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'সাধারণ জ্ঞান অর্জন সমিতি (১৮৩৯)'। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এনকুয়েরার (The Enquerer), পার্সিকিউটেড (The Persecuted) পত্রিকায় হিন্দুসমাজকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। তাঁরা দাসপ্রথা, নারী নির্যাতন, সামাজিক উৎপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সমাজের সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিকতার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন।

৩.৫.৩ নব্যবঙ্গ আন্দোলনের অবদান

নব্যবঙ্গ আন্দোলনের তীব্রতা ১৮৪০এর দশকে ধীরে ধীরে স্তীমিত হয়ে পড়ে। তাঁরা ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতান্ত্রিকতার সমর্থক ছিলেন। ভারতবাসীকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং জনগণ ক্রমশ স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। তাঁরা হিন্দুধর্মকে যুক্তির আলোকে বিচার করেছিলেন।

৩.৫.৪ নব্যবঙ্গ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

ডিরোজিও পরিচালিত আন্দোলন বস্তুতপক্ষে প্রগতিশীল চরিত্রের হলেও তা প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন গড়ে তোলেননি। তাঁদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনার ও আদর্শবাদের অভাব ছিল না ঠিকই কিন্তু তাঁরা আবেগ আর বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেননি। তাঁদের চিন্তা-ভাবনার উগ্রতা, জীবনযাত্রা সাধারণ মানুষদের থেকে পৃথক করে তুলেছিল। তাঁরা হিন্দুধর্মের মূলনীতিগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ না করে ধর্মের সমালোচনা করতেন। ধর্মের নামে যে কুসংস্কার ও অমানবিক প্রথা প্রচলিত ছিল তা সত্যিই নিন্দনীয় হলেও মূল হিন্দুধর্ম নিন্দনীয় ছিল না, অথচ ধর্মের মূল মর্ম সম্পর্কে ধারণা না থাকার ফলে তাঁরা প্রচার করতে থাকেন হিন্দুধর্মের সবকিছুই খারাপ, মন্দ। অন্যদিকে তাঁরা খ্রিস্টধর্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কার সম্পর্কে নীরব ছিলেন। তারা হিন্দুসমাজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে তার সংস্কারে প্রয়াসী হননি; সমাজকে তাঁরা ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছিলেন তাই জনসমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন। দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক সমাজের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি কিভাবে সমাজে আর্থিক দুর্দশার প্রভাব ফেলছে তার সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতা ছিল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে তাঁরা আচ্ছন্ন ছিলেন অথচ পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গঠনমূলক দিকটিকে ভারতীয় সমাজসংস্কারের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেননি।

তবুও বলা যায় ভারতের ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার ত্রুটিগুলির তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ভারতে প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রসারে তাঁরা ছিলেন অগ্রদূত এবং ভারতে নবজাগরণের উন্মেষে তাঁরা সহায়তা করেছিলেন।

৩.৬ রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) তাঁর সমগ্র জীবন ও সাধনার মধ্যে দিয়ে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়বাদী রূপটি পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য, মানবিক মূল্যবোধ এবং পশ্চিমের আধুনিক চিন্তাধারার মধ্যে অভিনব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর সবধর্ম সমন্বয়ের

আদর্শ, ধর্মের বিরোধ, সংঘাতের অবসান ঘটিয়েছিল। সাধারণ মানুষ তাঁর বাণী ‘‘যত মত তত পথ’’ দ্বারা নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজের যুক্তিবাদী মতবাদ, মিশনারীদের হিন্দুধর্ম-সমাজের আলোচনা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহজ, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও সাধারণের বোধগম্য ধর্মীয় ব্যাখ্যা মানুষকে মানবতা, সহিষ্ণুতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন।

৩.৬.১ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর মত

তিনি কোন প্রচলিত শিক্ষালাভ করেননি। রানী রাসমনি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে পূজারীরূপে নিযুক্ত হবার পর তার মধ্যে ঐশ্বরিকভাবের বিকাশ দেখা যায়, যদিও বাল্যকাল থেকে এই দিব্যভাব প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি নানা মতে সাধনা করেছিলেন এবং শেষ পর্যত এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন ঈশ্বর এক ও অভিন্ন; বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাঁকে ভিন্ন নামে প্রার্থনা করে; একটি ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের মধ্যে কোন বিভেদ বা সংঘাত নেই। তাঁর এই সমন্বয়ের বাণী তিনি শাস্ত্রের উদাহরণের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল। বেদান্তের জটিল তত্ত্বকে এত সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছিলেন যাতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিরা আশ্চর্য হয়েছিলেন। তাঁর বেদান্তের মানবিক ব্যাখ্যা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। রামকৃষ্ণদেব বৈরাগ্যলাভের কথা, মানবসেবার আদর্শের কথা বলেছিলেন। তাঁর ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজে প্রাণ সঞ্চার করে।

৩.৬.২ স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্য

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় ও মানবতার বাণীকে সমগ্র ভারতেই নয় বিশ্বে প্রসারিত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিটি ছিল স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ঐতিহ্য, সাংস্কৃতি আদর্শের উপর নির্ভরশীল এবং আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ ঘটানো; বাহ্যিক আড়ম্বর নয় আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মানুষের প্রতি সহানুভূতির এবং আধ্যাত্মিকতার উপর জোর দেওয়া।

৩.৬.৩ বিবেকানন্দ ও ধর্ম সমন্বয়

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেব রামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী বিশ্বে প্রচার করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য বাগ্মিতা, ব্যক্তিত্ব তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির মহানতা তিনি ভারতের বাইরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করতে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মানবসেবা ছিল তাঁর কাছে পরমধর্ম। দরিদ্র, আর্ত পীড়িত মানুষের জন্য সেবার মন্ত্রে তিনি মানবসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আর্ত মানুষের সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায় এবং ধর্ম পালন করা যায় এই ছিল তাঁর মত।

৩.৬.৪ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা

তাঁর অন্যতম অবদান হল ১৮৬৩ সালে শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে বিশ্বের দরবারে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও ঔদার্য প্রচার করা। তাঁর এই কার্যকলাপ সমগ্র ভারতবাসীর মনে প্রচণ্ড উদ্দীপনার সঞ্চার করে, বৃদ্ধি পায় ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস ও সম্মান। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে তিনি আন্তর্জাতিক চরিত্র প্রদান করেন। বিবেকানন্দের কর্মপ্রয়াসে সমন্বিত হয়েছিল স্বদেশপ্রেম, মানবতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ। শিকাগো ধর্মসভায় তিনি বেদান্তের বিশ্লেষণ ও হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। হিন্দুধর্ম মত ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা বিদেশী শ্রোতাদের মনে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধা বহুগুণ বৃদ্ধি করে। এ যাবৎ পশ্চিমের জনগণ ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হেয় জ্ঞান করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের ভিন্ন রূপটি উদ্ভাসিত হয় বিদেশীদের কাছে। ভারতবাসীর কাছেও তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির মহানতা উদ্‌ঘাটিত হয় ও তাঁরা নিজ সভ্যতার প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন।

ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান রচনা যেমন প্রাচ্য পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, পরিব্রাজক, রাজযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে দেশপ্রেম, স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগিয়ে ভারতের অন্তঃস্থলকে আলোড়িত করেন।

৩.৬.৫ রামকৃষ্ণ মিশন ও ধর্মান্দোলন

বিবেকানন্দ সেবাকে পরমধর্মরূপে জ্ঞান করতেন এবং মানবজাতি ছিল তাঁর কাছে সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তিনি একাধারে জাতীয়তাবাদী ও অন্যদিকে সমাজবাদী সন্ন্যাসী। ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মিশন এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অগ্রগতি লাভ করে। শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত না করে বিবেকানন্দ এখান থেকে শিক্ষার প্রসার, দাতব্য চিকিৎসা, ত্রাণকার্য, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার প্রসার প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করতে থাকেন। তিনি দরিদ্র দূরীকরণে ও আত্মশক্তি জাগরণের উপর জোর দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ঠিকই কিন্তু জাতিভেদ প্রথার, কুসংস্কারের ঘোর সমালোচক ছিলেন।

৩.৬.৬ নারী শিক্ষার প্রসার ও নিবেদিতার ভূমিকা

বিবেকানন্দ নারী জাতির শিক্ষার ও প্রগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর আদর্শ ও কার্যকলাপে প্রভাবিত হয়ে আইরিশ মহিলা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল ভারতবর্ষে আসেন ও মানবসেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। দীক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতা হয়ে নারী শিক্ষার প্রসারের মহান কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন।

৩.৬.৭ থিওসফিক্যাল সোসাইটি

হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে থিওসফিক্যাল সোসাইটির অবদান খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সোসাইটি শিক্ষা বিস্তার, ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিল। ১৮৮৫ সালে মাদ্রাজে

আডিয়ার শহরে মাদান ব্লাভটস্কি ও কর্নেল এইচ. এস. ওলকট এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৯ সালে শ্রীমতি এ্যানি বেসান্ত এই সংস্থায় যোগ দিলে সংস্থার নতুন প্রাণ সঞ্চার হয় এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তাঁর বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষের পরাচীন ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে ভারতের পুনরুজ্জবনের বিষয়টি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে থিওসফিক্যাল সোসাইটি সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার প্রবর্তন করে। এই সোসাইটির বহু শাখা ভারতে স্থাপিত হয়। বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় যা পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।

৩.৭ পশ্চিমভারতে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন

ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন বাঙলায় শুরু হয়েছিল সত্য কিন্তু বাঙলাদেশের অনেকে আগে মহারাষ্ট্রে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের একটা প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে মারাঠী পেশবারা প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য অনুসরণ করে সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই সংস্কারকার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মাদকদ্রব্য বর্জন, জাতিভেদ না মেনে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা, অন্যায়ভাবে সমাজচ্যুত ব্যক্তিদের সমাজে স্থান দেওয়া, নারীবিক্রয় বন্ধ করা। এইসব সৎকার্যে মারাঠী পেশবারা অগ্রণী ছিলেন (Prof. Natarajan : A Century of Social Reform in India, Bombay 1954)।

৩.৭.১ মহারাষ্ট্রে পশ্চিমী শিক্ষার অবদান

পশ্চিম ভারতে বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র ছিল সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। মহারাষ্ট্রে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে এই অঞ্চলের পাশ্চাত্য শিক্ষার যোগ ছিল। এখানে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে এম. এস. এলফিনস্টোন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। উইলিয়াম কেরীর মতো তিনিও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে স্থানীয় ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বোম্বাই ম্যাট্রিক এডুকেশন সোসাইটি। এই প্রতিষ্ঠান স্থানীয় ভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করত। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বোম্বাই, থানে, ব্রোচ শহরে বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। ১৮৪০ সালে এই সোসাইটি "Board of Education" নামে পরিচিত হয়। ইতিমধ্যে পুনায় ১৮১১ সালে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় যা পরে Deccan College নামে ভারতীয় বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৩.৭.২ মহারাষ্ট্রে কারিগরী ও নারী শিক্ষার প্রসার

১৮৫৭ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রে কারিগরী শিক্ষা ছিল বেশ উন্নত। এলফিনস্টোন কলেজে ১৮৪৪ সালে কারিগরী (engineering) শিক্ষার প্রবর্তন, ১৮৫৫ সালে আইন শিক্ষার

সূত্রপাত হয়। বোম্বাই বোর্ড অফ এডুকেশন ২১৬টি স্থানীয় ভাষার বিদ্যালয় স্থাপন করে। এইভাবে বোম্বাই মহারাষ্ট্রে শিক্ষার আলোক প্রসারিত হয়। মহারাষ্ট্রে স্ত্রীশিক্ষাও প্রসারিত হয়েছিল। আমেরিকান মিশনারী, চার্চ মিশনারী সোসাইটির প্রচেষ্টার অনেকগুলি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় তৈরি হয়। থানে, নাসিক, বেসিন শহরেও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয়েছিল।

৩.৭.৩ মহারাষ্ট্রে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন

মহারাষ্ট্রে সমাজসংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মারাঠী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ১৮৩০ সালে গঙ্গাধন শাস্ত্রী জাম্বেকর ও জগন্নাথ শঙ্কর ঘোষ খ্রিস্ট ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। গজানন রাও বৈদ্যের সভাপতিত্বে তৈরি হয় হিন্দু মিশনারী সোসাইটি। ১৮৪০ সালের পর মহারাষ্ট্রে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকারীগণ জাতবিচার মানতেন না ও প্রকাশ্যে সেই প্রকার আচরণ করতেন।

৩.৭.৪ প্রার্থনা সমাজ আন্দোলন

মহারাষ্ট্রে সংস্কার আন্দোলন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠার পর। বাংলার ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তাঁর ভারত পরিক্রমার অভিনব দৃষ্টান্ত ছিল ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে ‘ধর্ম সমাজ’-এর প্রতিষ্ঠা। বোম্বাই-এর ধর্ম সমাজ ‘প্রার্থনা সমাজ’ নামে পরিচিত হয়। প্রার্থনা সমাজের মূল প্রেরণা এসেছিল বাংলার ব্রাহ্ম সমাজ থেকে। বস্তুতপক্ষে, ১৮৫০ সালে কেশবচন্দ্র সেন এখানকার কিছু বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে যাবার পর প্রতিষ্ঠা হয় ধর্ম সমাজের। ১৮৬৭ সালে আত্মারাম পাণ্ডুরং গড়ে তোলেন প্রার্থনা সমাজ। ১৮৬৮ সালে পুনরায় কেশবচন্দ্র সেন এখানে এসে প্রার্থনা সমাজকে আরো সংগঠিত বিন্যস্ত করে দিয়ে যান। ১৮৭০ সালে প্রার্থনা সমাজে যোগদান করেছিলেন আর. জি. ভাণ্ডারকর, রামকৃষ্ণ গোখলে এবং মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। এইসব ব্যক্তিত্ব প্রার্থনা সমাজকে নুতনভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল।

৩.৭.৫ প্রার্থনা সমাজের উদ্দেশ্য

প্রার্থনা সমাজের দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য হল অদ্বৈতবাদের প্রচার ও সমাজ-সংস্কার। ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই সমাজ-সংস্কারকরা একেশ্বরবাদের বিশ্বাসী ছিলেন এবং নামদেব, রামদাস, তুকারাম প্রমুখ মারাঠী ধর্মগুরুদের নীতি অনুসরণ করতেন। তাঁর মূর্তিপূজার বিরোধিতা, সামাজিক উন্নয়ন, নারী কল্যাণ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শগুলির প্রসারে সচেষ্ট ছিলেন। এছাড়া প্রার্থনা সমাজ-সংস্কারকরা অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ, দরিদ্রদের সেবা, অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি কর্মসূচী নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বহু চিকিৎসালয়, অনাথ আশ্রম, শিশু সদন। পশ্চিম ভারতে এক ব্যাপক সমাজসংস্কার ও শিল্প বিস্তারের এবং রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলেন প্রার্থনা সমাজের সংস্কারকরা।

৩.৭.৬ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে পার্থক্য

প্রার্থনা সমাজ কোন নতুন ধর্মপ্রচার করেনি। এছাড়া ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া সত্ত্বেও এই প্রার্থনা সমাজ ব্রাহ্ম সমাজের ছায়া হয়ে থাকেনি। প্রার্থনা সমাজে হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে হিন্দুধর্মেরই অন্তর্ভক্ত এক সংস্কার সম্প্রদায় বলে মনে করত। প্রার্থনা সমাজের সভ্যরা ব্রাহ্মদের মতো নিজেদের নতুন ধর্মপ্রচারক বলে ভাবতেন না। প্রার্থনা সমাজ তাই নিজ কর্মপ্রচেষ্টার জন্য মৌলিক সংগঠনরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এটি ছিল একটি হিন্দু সংগঠন।

৩.৭.৭ মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ও তাঁর কার্যাবলী

প্রার্থনা সমাজ সংগঠনের কাজ সবচেয়ে বেশি জোরদার হয়েছে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের প্রচেষ্টায়। তিনি বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে জাতিবেধ বিরোধী জনমত গড়ে তুলেছিলেন। বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতার প্রসার এবং বাল্য ও বহু বিবাহ অবসানের জন্য প্রয়াসী হলেন। রাণাডে বিশ্বাস করতেন ভারতীয় ঐতিহ্য, সভ্যতার মধ্যে বহু সদগুণ রয়েছে কিন্তু মানুষের অজ্ঞতা কুশিক্ষার ঘাসে তার উপর আস্তরণ পড়ে বহু উচ্চ আদর্শ বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাই সংস্কারকদের প্রথম কর্তব্যই হল এই আস্তরণ দূরীভূত করা। হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যের উপর কুশিক্ষা, কুসংস্কারের ফলে যেসব বিধি-নিষেধের আবরণকে শান্তিপূর্ণভাবে মোচন করতে হবে। এই সময় বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে হিন্দুধর্ম পুনরুভ্যুত্থানের প্রয়াস দেখা যাচ্ছিল। কিছু বুদ্ধিজীবী বলেছিলেন হিন্দুধর্মের পুনঃ অভ্যুত্থান হলেই ভারত বিদেশী থেকে শাসনমুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। তাঁদের বক্তব্যকে খণ্ডন করে রাণাডে বলেছিলেন প্রথা প্রাচীন হলেই তাকে ধরে রাখতে হবে এমন ধারণা অযৌক্তিক, তাই হিন্দুধর্মের পুনঃঅভ্যুত্থান হলেই তার কুপ্রথা, কদাচারগুলিকেও নির্বিশেষে গ্রহণ করতে হবে। তাই পুনঃঅভ্যুত্থান নয় প্রয়োজনীয় হল হিন্দুধর্মের সংস্কার।

৩.৭.৮ রাণাডের অবদান

রাণাডে তার সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রার্থনা সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিলেন অথচ ব্রাহ্ম সমাজে এসেছিল ভাঙ্গন। তাঁর চেষ্টায় হিন্দু সমাজ নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মের সেইসব ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করা যা সমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবে এবং যে শিক্ষা, সংস্কার, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান হিন্দুদের মানসিক সামাজিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করছে তাকে বর্জন করতে হবে, তা সেই প্রথা বা প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীনই হোক না কেন। তিনি প্রচার করেছিলেন রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে সামাজিক উন্নতি সম্ভব এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসতে গেলে সমাজব্যবস্থা শক্তিশালী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর প্রভাব ছিল। তিনি কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের সঙ্গে একটি সামাজিক সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন।

৩.৭.৯ বাল গঙ্গাধর তিলকের অবদান

রাণাডের পর মারাঠী সংস্কারকদের মধ্যে বাল গঙ্গাধর তিলকের নাম স্মরণ করা যেতে পারে। তিনিও হিন্দু ধর্মের সমাজের সংস্কারের কথা ভাবতেন কিন্তু রাণাডের মতো সংস্কারের মাধ্যমে নয় তিনি চেয়েছিলেন

হিন্দু ধর্মের পুনঃঅভ্যুত্থান। তিনি সামাজিক চেতনার সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের উপরও জোর দিতেন কারণ রাজনীতি ও সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। সমাজ ও রাজনীতির যুগ্ম বিকাশের মাধ্যমে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অপশাসন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

৩.৭.১০ মহারাষ্ট্রের অন্যান্য সমাজ সংস্কার

রাণাডে, তিলক ছাড়াও জ্যোতিবা ফুলে নামে একজন মারাঠী সংস্কারক স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রসার এবং অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ প্রথা অবসান প্রভৃতির জন্য আন্দোলন করেছিলেন। তিনি ও তার স্ত্রী পুণা শহরে একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এছাড়াও অস্পশ্য বালক-বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব কাজের জন্য তাঁকে সমাজ ও গৃহচ্যুত করা হলে তিনি না দমে ‘সত্যসাধক সমাজ’ গড়ে তুলেছিলেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মারাঠী ব্রাহ্মণ ও সমাজপতিদের অবিচারের বিরুদ্ধে সাহস যুগিয়ে ছিলেন।

৩.৮ আর্য সমাজ আন্দোলন

ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, নব্যবঙ্গ আন্দোলন প্রভৃতি ছিল পশ্চিমী ভাবধারা ও আদর্শে প্রভাবিত। কিন্তু আর্য সমাজ আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এই আর্য সমাজ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ ও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে তিনি আসেননি। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল বেদ। বৈদিক আদর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী তিনি সমাজ গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাব জনগণের মধ্যে প্রসারিত করে আর্য সমাজের আন্দোলনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছিলেন। বিশুদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর সমাজব্যবস্থাকে সংগঠিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য এবং একমাত্র ইচ্ছা।

৩.৮.১ দয়ানন্দ স্বরস্বতী ও তাঁর সংস্কার প্রয়াস

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন গুজরাটের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। সংসার জীবনে তাঁর নাম ছিল মূলশংকর। রাজা রামমোহনের মতো তিনিও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ও পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন এই প্রথা বৈদিক ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবসম্মত নয় এবং তা বর্জনীয়। স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, প্রয়োজনে সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি বৈদিক ধর্মের অনুমোদিত নয় বলে যে ধারণা ছিল তার খণ্ডন করেছিলেন। ভারতের সর্বত্র বৈদিক ধর্মাচরণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। যে পশ্চিমী শাসন আর্য সমাজ ও ধর্মকে বিকৃত অপমানিত করেছে তার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে জাগ্রত করে তোলেন। পাঞ্জাব ও উত্তরভারতে তাঁর আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য তাঁর আবেদন হয়ে উঠেছিল সার্বজনীন। অহিন্দুরা যাতে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে পারে সেজন্য তিনি শুদ্ধি

আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ‘‘ভারতবর্ষকে এক জাতি এক ধর্ম এবং এক সমাজে ঐক্যবদ্ধ করা।’’ তাঁর মতে বেদ হল সত্যের আধার। নিজ মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ নামে কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে ছিল আর্যধর্মের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। এই গ্রন্থখানি শুধু শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই নয়, জনগণের মধ্যেও প্রচার করেন। তাই তাঁর মতবাদ খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্ম শক্তিশালী হয়ে ওঠেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আর্য সমাজ-সংস্কারকরা এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁরা পশ্চিমী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু পরে লাহোরে স্থাপিত হয় এ্যাংলো-ভেদিক কলেজ এবং আর্য সমাজীরা পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন।

৩.৯ সারাংশ

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে যে সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার তাৎপর্য হল যে জনমানসে এর ফলে জাতীয় চেতনার জাগরণ হয়, উদ্ভাসিত হয় ধর্ম ও সংস্কৃতির গঠনমূলক দিকটি। ভারতের সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের তিনটি স্রোতধারা পরিলক্ষিত হয়। একটি স্রোতধারায় চরম প্রাচ্যপন্থী বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হল আর্যসমাজ, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় স্রোতধারাটি চরম পাশ্চাত্যপন্থী বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরিচলিত হল নব্যবঙ্গ আন্দোলন এবং তৃতীয় ধারায় প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের রূপটি পরিস্ফুট হল ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা সমাজ আন্দোলনের মধে দিয়ে। স্রোতধারা বা বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হলেও লক্ষ্য ছিল একটি পরাধীন ভারতের শৃংখলামোচনের জন্য কুসংস্কার মুক্ত করে জাতীয়তাবোধের জাগরণ।

৩.১০ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

২। ধর্মতলা একাডেমীর প্রতিষ্টাতা কে? তাঁর ছাত্রের নাম লিখুন।

৩। বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম কি?

৪। ব্রাহ্ম সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন? শিবনাথ শাস্ত্রী পরিচালিত ব্রাহ্ম সমাজের নাম কি?

৫। দয়ানন্দ স্বামীর প্রকৃত নাম কি?

৬। প্রথম বিধবা বিবাহ কে করেছিলেন?

৭। শিকাগো ধর্ম সম্মেলন কবে হয়েছিল?

৮। প্রার্থনা সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

৯। সত্যসাধক সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

১০। সত্যার্থ প্রকাশ কার রচনা?

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজের পার্থক্যগুলি আলোচনা করুন।

২। মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার অবদান কতটা?

৩। বাঙ্গলাদেশে পাশ্চাত্যে শিক্ষা বিস্তারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ আলোচনা করুন।

৪। ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের অবদান কী?

গ। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। 'প্রথম আধুনিক মানুষ' রূপে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান আলোচনা করুন।

২। মহারাষ্ট্র ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের ভূমিকা কি ছিল?

৩। নব্যবঙ্গ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ কী ছিল?

৪। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন?

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. অমিতাভ মুখার্জী—Reform and Regeneration in Bengal.
2. R.C. Majumdar (ed)—British Paramountcy and Indian Renaissance.
3. Tarachand— History of Freedom Movement in India—VOl. II.
4. Sumit Sarkar— Modern India. 1885.
5. N.S. Bose— Indian Awakening and Bengal.

পর্যায় — ৩

একক ১(ক) ❑ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সামাজিক উৎস

গঠন

১(ক).০ উদ্দেশ্য

১(ক).১ প্রস্তাবনা

১(ক).২ জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১(ক).৩ ব্রিটিশ বিরোধিতার উৎস সন্ধানে

১(ক).৩.১ কৃষক শ্রেণীর ক্ষোভ

১(ক).৩.২ রাজা, মহারাজা ও জমিদারদের ক্ষোভ

১(ক).৩.৩ পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষোভ

১(ক).৩.৪ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষোভ

১(ক).৩.৫ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষোভ

১(ক).৪ রাজনৈতিক সংগঠনের সূত্রপাত

১(ক).৪.১ বাংলায় রাজনৈতিক সংগঠন

১(ক).৪.২ পশ্চিম ভারতের (বোম্বাই প্রেসিডেন্সি) রাজনৈতিক সংগঠন

১(ক).৪.৩ দক্ষিণ ভারতের (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি) রাজনৈতিক সংগঠন

১(ক).৫ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা— তর্ক বিতর্ক

১(ক).৫.১ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেরণা ও উদ্যোগ

১(ক).৫.২ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কারণ ও উদ্দেশ্য

১(ক).৫.৩ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব

১(ক).৬ কংগ্রেসের সামাজিক ভিত্তি

১(ক).৭ সারাংশ

১(ক).৮ অনুশীলনী

১(ক).৯ গ্রন্থপঞ্জী

১(ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

১. জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

২. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মৌলিক সূত্র

৩. রাজনৈতিক সংগঠনের সূত্রপাত

৪. জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা—তর্ক ও বিতর্ক

৫. জাতীয় কংগ্রেসের সামাজিক ভিত্তি

১(ক).১ প্রস্তাবনা

১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের প্রবল উন্মাদনা ও উত্তেজনা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গেলেও এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসক ভারতবাসীর ক্ষোভ ও অসন্তোষ সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য শাসনকার্যে ভারতীয়দের সংযুক্ত করার নীতি— যাকে আমরা "Policy of association" বলি— গ্রহণ করলেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবের অবসান ঘটে নি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিবাদী আন্দোলন কোন পথ ও পদ্ধতিতে এবং সর্বোপরি কোন প্রাতিষ্ঠানিক ছত্রছায়ায় গড়ে তোলা যায়, তা নিয়ে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তখনই পাওয়া যায় নি। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এই অভাব পূর্ণ করে। এই প্রথম এমন একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়, যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চালিকা শক্তি রূপে দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। মহাবিদ্রোহের পর থেকেই এই ধরনের একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। কাজেই প্রথমে আমরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানই বিনা কারণে গড়ে ওঠে না। আমরা জানি মানুষ নিজের তাগিদে তখনই একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে, যখন কিছু সমমনস্ক ব্যক্তি নিজেদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের প্রতিকারকল্পে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচী সামনে রেখে সমবেত হয়। সুতরাং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট অনুধাবন করতে হলে, আমাদের এই দিকটি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে। অন্যদিকে কংগ্রেসের জন্মরহস্য ঐতিহাসিকদের কেবলমাত্র কৌতূহল ও আগ্রহেরই সৃষ্টি করে নি, কংগ্রেসের প্রকৃত স্থাপয়িতা কে বা কারা তা নিয়ে এক তীব্র বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে। কাজেই এ বিষয়েও আমাদের আলোকপাত করতে হবে। সবশেষে কংগ্রেস প্রকৃতই একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল কিনা ভারতের সর্বশ্রেণী ও স্তরের মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আলোচ্য এককে আমরা এই প্রসঙ্গেও আলোচনা করবো। কংগ্রেসের সামাজিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে আমরা দেখাতে চেষ্টা করে আমরা দেখাতে চেষ্টা করবো যে, কংগ্রেসের আদি যুগে

এই প্রতিষ্ঠান ছিল মূলতঃ সমাজের উচ্চবিত্ত ও উচ্চ শিক্ষিত উপরতলার একটি সংগঠন। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের সংযোগ রহিত এই প্রতিষ্ঠান তাই এই সময়ে তৃণমূল স্পর্শ করতে পারে নি। মনে রাখবেন শুধু কংগ্রেসের উদ্ভবই নয়, তার সংগঠন, কর্মপদ্ধতি, আন্দোলনের লক্ষ, নেতৃত্বের লড়াই ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ই অত্যন্ত বিতর্কিত এবং এই সম্পর্কে কোন সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। সুতরাং যুক্তি, তর্ক ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনি নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন।

১(ক).২ জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রারম্ভিক কাজটুকু করেছিল। এরপর একশ বছর ধরে ভারতে মূলত মহীশূর, মারাঠা ও শিখদের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করে তবেই ইংরেজরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশাল ইমারত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তখনও তাদের ভারত বিজয় অমস্পূর্ণ ছিল। অসংখ্য দেশীয় রাজ্য তখনও তাদের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অন্য দিকে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ কোনদিনই মসৃণ ছিল না। সাম্রাজ্য গঠনের কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধিতা ও বিদ্রোহের মুখে পড়তে হয়েছিল ইংরেজদের। যেহেতু বাংলাদেশেই প্রথম রচিত হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি, স্বাভাবিক কারণেই তাই এখানকার সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রথম গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ায় বিদ্রোহের পরিধি প্রসারিত হয় এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও একের পর এক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এই সব বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব নীতি, যা একই সঙ্গে জমিদার-তালুকদার ও কৃষক উভয়েরই স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। ভূমিরাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাপ তাদের পক্ষে ক্রমশ দুর্বহ হয়ে পড়ছিল এবং কৃষকেরা দেনার দায়ে তাদের জমিজমা হারাচ্ছিল। ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস বাংলায় চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তন করে অবশ্য জমিদার শ্রেণীকে কিছুটা বশে আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যাই হোক অষ্টাদশ শতক ও ঊনবিংশ শতকে একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ ইংরেজদের গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র উর্বর সমতলভূমিতে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলমান জমিদার ও কৃষকরাই এই সব বিদ্রোহে অংশ নেয় নি; সুদূর এবং দুর্গম পার্বত্য ও মালভূমির অরণ্য অঞ্চলের আদিবাসীরাও এই সব আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তারা গভীর উদ্বেগ ও বেদনার সঙ্গে লক্ষ করেছিল কি ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের লালিত্ব ও সযত্নে পোষিত গ্রামীণ কৃষিব্যবস্থা দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছিল।

ব্রিটিশ আমলের প্রথম একশো বছরের মধ্যে বাংলায় যে সব কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ হয়েছিল, সেগুলির সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছাড়াও মেদিনীপুরের চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৬-৮৩), পার্বত্য চট্টগ্রামে চাক্মা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), মেদিনীপুরের

নায়ক বিদ্রোহ (১৮০৬-১৬), ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৫-২৭), ওয়াহাবী ও তিতুমীর বিদ্রোহ (১৮৩১), কোল বিদ্রোহ (১৮৩১), ফরাজী বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৮), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) ও নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার বাইরে যে সব বিদ্রোহ হয়েছিল তার মধ্যে উড়িষ্যার জমিদার ও পাইক বিদ্রোহ (১৮০৪-১৭), ১৭৯০ এর দশকে মাদ্রাজে পলিগার বিদ্রোহ, ১৮০১ সালে দিন্দিগুল ও মালাবারের পলিগার বিদ্রোহ, ১৮০৫ সালের দেওয়ান ভেলু তাম্পির ত্রিবাংকুর বিদ্রোহ, মোপলা বিদ্রোহ (১৮৩৬-৫৪), ১৮২৪ থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে বারবার গুজরাটের কোলি বিদ্রোহ, মহারাষ্ট্রে ১৮২৪ থেকে ১৮২৯ সালের মধ্যে কিটুর বিদ্রোহ, ১৮২৪ সালের কোলাপুর বিদ্রোহ, ১৮৪১ সালের সাতারা বিদ্রোহ, ১৮৪৪ সালের গদকরী বিদ্রোহ, এবং উত্তরভারতের জাঠ বিদ্রোহ (১৮২৪), আলিগড়ের তালুকদার বিদ্রোহ (১৮১৪-১৭) ও জব্বলপুরের বুন্দেলা বিদ্রোহ (১৮৪২) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত এই সব বিদ্রোহ ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা। স্থানীয় সমস্যা ও ক্ষোভ-অসন্তোষকে কেন্দ্র করে এই সব বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। বিদ্রোহীদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের কতটুকু প্রতিকার হয়েছিল বা আদৌ কোন প্রতিকার হয়েছিল কিনা, আপাতত সে প্রশ্ন অবান্তর। বর্তমানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এগুলির কোনটিরই কোন সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল না এবং এক অঞ্চলের বিদ্রোহীদের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের বিদ্রোহীদের কোন যোগসূত্র ছিল না। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হলেও এই সব বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। তাছাড়া একমাত্র ইংরেজ শাসনই নয়, অনেক সময়েই বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্য স্থল ছিল দেশী জমিদার ও মহাজন শ্রেণী, যারা কৃষকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করতো।

কৃষকেরা ছাড়া ক্ষমতাচ্যুত দেশীয় রাজন্যবর্গ, কোম্পানীতে কর্মরত সিপাহীরা, এমনকি বহু সাধারণ মানুষও ইংরেজ শাসনে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের আগেও সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল। এই প্রসঙ্গে ১৮০৬ সালে ভেলোরের সিপাহী বিদ্রোহের কথা আমাদের মনে আসে। যাই হোক ১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্রোহই— যা প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হলেও, পরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত হিন্দী বলয়ে, একটি গণ বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল— প্রথম ইংরেজ শাসনের ভিত কাপিয়ে দিয়েছিল। এই বিদ্রোহের একটি সর্বভারতীয় চরিত্র না থাকলেও বা এই বিদ্রোহকে একটি জাতীয় বিদ্রোহ বলা চলে কিনা তা নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক থাকলেও আগেকার পুরোমাত্রায় আঞ্চলিক বিদ্রোহের তুলনায় যে এই বিদ্রোহ অনেক ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল এবং এতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অংশ না নিলেও যে এর পরিধি ছিল পরিব্যাপ্ত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আগেকার বিদ্রোহগুলি কখনই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন করে নি। এই বিদ্রোহই প্রথম হিন্দু ও মুসলমান

তাদের ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঐক্যববদ্ধ সংগ্রাম করেছিল। এমন কি তারা ইংরেজ শাসনের বিকল্প হিসাবে দ্বিতী বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার পর অবশ্য কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহে কিছুটা ভাঁটা পড়েছিল। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০), মহারাষ্ট্রের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৫) ও পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৩) ও মোপলা বিদ্রোহ (১৮৭৩-৮০)।

লক্ষ করবেন ভারতের নিম্নবর্গের মানুষ কৃষক ও উপজাতিরা যখন একটানা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলছিল, তখন ভারতের, বিশেষভাবে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, রামমোহন, ডিরোজিও ও বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজ শাসনকে বরণ করে নিয়েছিল ও ইংরেজ বিরোধী সর্বপ্রকার আন্দোলন থেকে দূরে ছিল। এই শ্রেণী চেয়েছিল ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা ও পাশচাত্য সভ্যতাকে বরণ করে আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিজেদের ইংরেজদের সমকক্ষ করে তুলতে। ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ এমনকি নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতেও ঘৃণা বোধ করতেন। পশ্চিম সম্পর্কে তাঁদের এই অন্ধ মোহ ও অনুকরণপ্রিয়তা কাটতে অবশ্য খুব একটা দেরী হয় নি। মহাবিদ্রোহের পর থেকে তাঁদের মধ্যেও হতাশা ও কিছুটা অনুশোচনা দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তে আত্ম-সমালোচনার কথা মনে করতে পারি।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখলাম যে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ কোনদিনই ব্রিটিশ শাসনকে অন্তর থেকে মেনে নেয় নি। কিন্তু তাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন একটি সর্বভারতীয় রূপ না পাওয়ায় এবং তা ঐক্যবদ্ধ পথে পরিচালিত না হওয়ায় ইংরেজদের পক্ষে এই সব আন্দোলন দমন করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। অন্যদিকে এই সব আন্দোলন ভারতবাসীর দাবীদাওয়া পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কাজেই সর্বস্তরের মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষের অবসান হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অব্যাহত ছিল। মহাবিদ্রোহ থেকে শিক্ষা নিয়ে ইংরেজরা অবশ্য কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে ভারতীয় সদস্যদের ঠাঁই দেন, উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মন বোঝা এবং তারা ব্রিটিশ শাসন কিভাবে গ্রহণ করছে বা এই বিষয়ে তাদের মতামত সম্পর্কে অবহিত হওয়া। কিন্তু নির্বাচনের পরিবর্তে মনোনয়নের মাধ্যমে ভারতীয় সদস্যদের নিয়োগ করা হতো বলে এই উদ্দেশ্য ও সাধু সংকল্প অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। বাস্তব এই প্রয়োজন ও তাগিদের অনিবার্য পরিণতি তহলো ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু যে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রাথমিক শর্ত হলো ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষের প্রতিকার করার মানসিকতা এবং তার ওপর ভিত্তি করে দাবীদাওয়া তুলে ধরা। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা তাই ব্রিটিশ বিরোধীতার উৎস অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করবো।

১(ক).৩ ব্রিটিশ বিরোধিতার উৎস সন্ধানে

মহাবিদ্রোহের পর শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের যে সীমিত সুযোগ ইংরেজরা দিয়েছিল, তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল। তাছাড়া পরাধীন দেশকে শোষণ করে মাতৃভূমির সমৃদ্ধিই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল ভিত্তি। ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষা করার কোন দায় বা তাগিদ ইংরেজদের ছিল না। তবু ১৮৫৮ সালের পর কোন দেশীয় রাজ্য গ্রাস না করার নীতি গ্রহণ করে বা ভারতবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ না করে ইংরেজরা তাদের খুশি করতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার অনিবার্যভাবেই সমাজের প্রতিটি স্তরে ক্ষোব ও অসন্তোষের সঞ্চার করেছিল।

১(ক).৩.১ কৃষকশ্রেণীর ক্ষোভ

ভারতীয় জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকশ্রেণী ব্রিটিশ শাসনে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিল। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে ভারতের এক এক অংশে এক এক রকম ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। যেমন বাংলায় ছিল জমিদারদের সঙ্গে চিরস্তায়ী ব্যবস্থা, উত্তরভারতের ছিল মহালওয়ারি ব্যবস্থা এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে ছিল রায়তওয়ারি ব্যবস্থা। কিন্তু সর্বত্রই কর ও রাজস্বের বোঝা ছিল অত্যন্ত চড়া। তাছাড়া ছিল সুদখোর মহাজন সাহুকারদের শোষণ ও অত্যাচার। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় কৃষকদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের কার্যত কোন পথই খোলা ছিল না। সরকার অবশ্য কৃষকদের জন্য কিছুই করে নি, এ অভিযোগ সত্য নয়। বিভিন্ন প্রজাসত্ত্ব আইন ও মহাজন প্রথা বিরোধী কিছু আইৰ সরকার তৈরী করেছিল। কিন্তু এই সব আইনের কার্যকারিতা কতটুকু ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। বস্তুত আইন আদালত, থানা, দারোগা ইত্যাদি সবই ছিল শোষকশ্রেণীর পক্ষে। নানা অজুহাতে কৃষকদের জমিজমা থেকে উৎখাত ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। কৃষকেরা বিদ্রোহ করলে আইনশৃঙ্খলার দোহাই পেড়ে তা নির্মমভাবে দমন করা হতো।

১(ক).৩.২ রাজা, মহারাজা ও জমিদারদের ক্ষোভ

ক্ষমতাচ্যুত রাজা মহারাজারা ইংরেজদের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। তবে ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের (“আমরা বর্তমান সাম্রাজ্য সীমারেখার অধিকতর বিস্তৃতি চাই না”) পর তাঁদের ক্রোধ ও ক্ষোভের উপশম হয়েছিল। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে জমিদার শ্রেণীও সরকারের উপর খুশি ছিল। রায়তদের বিরুদ্ধে তাদের হাত শক্ত করতে জমিদারদের অনুকূলে কিছু আইন (যেমন ১৭৯৫ সালের ৩৫ রেগুলেশন, ১৭৯৯ সালের ৭ম রেগুলেশন ইত্যাদি) প্রণীত হওয়ায় তারা ইংরেজ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সরকার কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কয়েকটি প্রজাসত্ত্ব আইন (যেমন ১৮৫৯ সালের দশম আইন, ১৮৮৫ সালের প্রজাসত্ত্ব আইন, ১৮৬৮

সালের অযোধ্যায় উনবিংশ আইন ইত্যাদি) প্রণয়ন করায় জমিদার শ্রেণী ক্ষুব্ধ হয়। সরকারী নীতির প্রতিবাদ করে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন— "Agitate ! Agitate !! Agitate!!!'

১(ক).৩.৩ পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষোভ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে পুঁজির বিকাশ ঘটে এবং আধুনিক শিল্পের উদ্ভব হয়। বোম্বাই ও আমোদবাদে বস্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছিল ভারতীয় পুঁজিপতিদের উদ্যোগে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করায় তারা ক্ষুব্ধ ছিল। তাদের অভিযোগ ছিল এই যে, ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের বাণিজ্যিক ও শিল্পনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক অমিয় বাগচী দেখিয়েছেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত অবাধ ও মুক্ত বাণিজ্য ছিল সরকারী নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ক্তি এই নীতি ইংরেজদের স্বার্থের অনুকূলে হলেও ভারতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। এই নীতি ভারতীয় পুজির বিকাশের পথে একটা প্রধান অন্তরায় ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় ইংরেজরা ভারতকে একটি কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ বলে মনে করতো। ব্রিটিশ শিল্পপতি ও পুঁজিপতিরা চেয়েছিল ভারতকে তাদের উদ্বৃত পণের বাজারে পরিণ তকে একটি কায়েমী স্বার্থ গড়ে তুলতে। ভারতী পুঁজিপতিদের পক্ষে একটা দীর্ঘ দিন এটা মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। তারা চেয়েছিল সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে ভারতীয় শিল্প প্রয়াসকে উৎসাহ দেওয়া হোক। কিন্তু বিদেশী শাসনে তা কখনই সম্ভব ছিল না। সরকারী আনুকূল্য ও সহযোগিতার কোন সুযোগই ছিল না।

১(ক).৩.৪ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষোভ

উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতের হস্তশিল্প ও কারুশিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ম্যানচেস্টারের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় ভারতীয় তাঁতিদের সর্বনাশ হয়। বিভিন্ন কুটির শিল্পে নিযুক্ত হস্তশিল্পীরা বেকার হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এক নতুন শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। পৃথিবীর সর্বত্র কলে কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের যে ধরনের দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হতো, ভারতের ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। এদের মজুরি ছিল অত্যন্ত কম এবং জীবনযাত্রার মান ছিল অত্যন্ত নিচু। একটি সরকারী প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছে যে আমেদাবাদে শ্রমিকদের ১২ ঘন্টা (বিদ্যুৎচালিত কারখানায় ১৪ ঘন্টা), বোম্বাই-তে ১২ ঘন্টা (বিদ্যুৎচালিত কারখানায় ১৩ ঘন্টা), দিল্লীতে ১৩½ ঘন্টা থেকে ১৪½ ঘন্টা এবং কলকাতার চটকলে ১৫ থেকে ১৬ ঘন্টা পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। কোন কোন ছোট কারখানায় শ্রমিকেরা ১৭-১৮ ঘন্টা, এমনকি ২০-২২ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতো। চা-বাগিচা ও কফি চাষে নিযুক্ত শ্রমিকদের

অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্গীন। এদের অবস্থা ছিল প্রায় ক্রীতদাসের মত। সবচেয়ে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় বাগিচা মালিকদের অন্যায় অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারই ছিল না। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলেও শ্রমিকেরা সব সময় এই সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতো না। ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে ২৫ টি বড় ধরনের ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল।

১(ক).৩.৫ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষোভ

সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ যতই ক্ষুব্ধ থাকুক, তাদের পক্ষে কোন সর্বভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও ব্রিটিশ শাসনে ক্ষুব্ধ হলেও সক্রিয় বিরোধিতার পথে যায় নি। বরং অনেক সময় তারা পুঁজির বিকাশের জন্য শাসক শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল ছিল। সমাজের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ছিল সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ এবং ব্রিটিশ বিরোধিতা তাদের মধ্যেই ছিল সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও তীব্র। এরা প্রথমদিকে ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানালেও ইংরেজদের সহৃদয়তা ও উদারতা সম্পর্কে এদের মোহভঙ্গ হয়। ব্রিটিশ শোষণের চেহারা বা প্রকৃতি এদের কাছেই ছিল সবচেয়ে স্পষ্ট। ভারতের দারিদ্র্যের জন্য এরা ব্রিটিশ সরকারকেই দায়ী করতো। এরা তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের রাজস্বনীতি, শিল্প প্রয়াসে ভারতের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মৌলিক জনকল্যাণকর কাজের প্রতি সরকারের উদাসীনতা, প্রশাসনিক ব্যয়বৃদ্ধি ইত্যাদির সমালোচনা করেছিল। এদের ক্ষোভের একটা বড় কারণ হলো উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বপ্রকার উচ্চ সরকারী পদে তাদের নিয়োগের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। I.C.S পরীক্ষায় ইংরেজ যুবকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল খুব কম। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারীও তাদের হতাশ করেছিল। এদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে উচ্চাকাঙ্খা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরা ভারতের শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল। গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদে ভারতীয় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির দাবীতে তারা সোচ্চার ছিল। এদের অভিযোগের আর একটি বড় কারণ হলো কালা আদমীদের প্রতি ইংরেজদের ঘৃণা ও উন্নাসিকতা। তারা ভারতীয়দের মানুষ বলেই মনে করতো না। ইউরোপীয় ক্লাবে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ট্রেনে একই কামরায় তারা ভারতীয়দের সঙ্গে ভ্রমণ করতো না। অশিক্ষিত নিম্নবর্গের মানুষ মানবতার প্রতি এই অপমান ও জাতি বৈষম্য মেনে নিলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী তা মানতে প্রস্তুত ছিল না। ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় আমরা এই বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর ক্ষোভ ও দৃঢ় প্রতিবাদী মনোভাব প্রত্যক্ষ করি।

১(ক).৩.৬ মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষোভ

ইংরেজ শাসনের মুসলিম জনগণও খুব ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিল। তাদের এই ক্ষোব অস্বাভাবিক ছিল না। প্রথমত; তারা মনে করতো শাসক শ্রেণী হিসাবে তাদের অপসৃত করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কায়েম

হয়েছিল। দ্বিতীয়ত; হুমায়ুন কবীর দেখিয়েছেন যে ইংরেজ শাসনে অধিকাংশ মুসলমান ভূস্বামী তাদের জমিজমা হারিয়েছিল। তৃতীয়ত ঃ প্রশাসনের ভাষা হিসাবে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার তারা মেনে নিতে পারে নি। হিন্দুরা যেমন ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বরণ করে আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলো, মুসলমানেরা তার ঠিক বিপরীত নীতি অনুসরণ করেছিল। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে অবশ্য মুসলিম সম্প্রদায় স্যার সৈয়দ আহমেদের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধিতার পথ পরিত্যাগ করে।

১(ক).৪ রাজনৈতিক সংগঠনের সূত্রপাত

ব্রিটিশ বিরোধিতা একটি সুস্পষ্ট ও কার্যকরী রূপ পেয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে। মহাবিদ্রোহের আগেই এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। মহাবিদ্রোহের আগে যে সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ১৮৩৭ সালে রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি এবং ১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি। ১৮৫১ সালে উভয় প্রতিষ্ঠান মিলিত হয়ে গঠন করে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান। বাংলার বাইরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন ও বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশন।

মহাবিদ্রোহের পর শুধু ভারতেরই নয়, ভারতের বাইরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ভারতের বাইরে প্রতিষ্ঠিত একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সংগঠন হলো ইষ্ট ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। ১৮৬৬ সালে লণ্ডন শহরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দাদাভাই নওরোজীর উদ্যোগে। ভারতে তিনটি প্রেসিডেন্সির (বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত এই রাজনৈতিক সংগঠনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন অধ্যাপক অনিল শীল তাঁর Emergence of Indian Nationalism গ্রন্থে। এই সব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে। উচ্চ বিত্ত ও উচ্চ শিক্ষিত এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষও—যাদের এক কথায় আমরা ''এলিটিষ্ট'' বলে থাকি— এই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল। সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষের কোন ঠাঁই এখান ছিল না।

১(ক).৪.১ বাংলার রাজনৈতিক সংগঠন

মহাবিদ্রোহের পর বাংলায় বেশ কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এই সব প্রতিষ্ঠান ছিল জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার সূতিকাগৃহ। ১৮৬০ সালে রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল হিন্দুমেলা। আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সঞ্জীবনী সভা। রবীন্দ্রনাথ তার ''জীবনস্মৃতি'' গ্রন্থে এদের কথা উল্লেখ করেছেন। এর পর

১৮৭৫ সালে স্থাপিত হয় ইন্ডিয়ান লীগ। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ। এর কর্মকর্তাদের মধ্যে ৬৮% ছিলেন মধ্যবিত্ত, ৩৮% আইনজীবী এবং ১৪% ছোট ও মাঝারি জমিদার এবং ঐ সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মচারী। ইন্ডিয়ান লীগ অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। এর পর ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন। এর প্রাণ পুরুষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ছিল শিক্ষিতদের প্রতিষ্ঠান। এর সদস্যদের ৩৩% ছিলেন শিক্ষক ৩৫% আইনজীবী। অনেকেই ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। বড় জমিদার ও শিল্পপতিরা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রভাব দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৮৭৬ সালে এর শাখা ছিল মাত্র দশটি। দশ বছরের মধ্যে ১৮৮৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় আশিটিতে। বাংলার বাইরেও বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে সুরেন্দ্রনাথ জনমত গঠন করেন। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান দাবীগুলির মধ্যে ছিল I.C.S. পরীক্ষার বয়স বাড়ানো ও তা ইংল্যান্ডের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও নিতে হবে, পৌরসভা ও আইন সভায় অধিকতর আসন দিতে হবে ইত্যাদির প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কৃষক শক্তি সম্পর্কে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনই প্রথম সচেতন হয় এবং কৃষকদের দলে টানার জন্য বাৎসরিক সদস্য চাঁদা নির্ধারিত হয়েছিল মাত্র এক টাকা। অন্যান্য সদস্যের চাঁদার হার ছিল বাৎসরিক পাঁচ টাকা। কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বেশ কয়েকটি কৃষক সভাও ডাকা হয়েছিল। তবু এদের কৃষকবন্ধু বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এই প্রতিষ্টানের অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্যে ছিল দেশীয় সংবাদপত্র আইন, অস্ত্র আইন ও অন্যান্য দমনমূলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা। ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে সেই বিতর্কেও ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের এই সব কার্যকলাপ অবশ্যই সরকারের মনঃপুত ছিল না।

১(ক).৪.২ পশ্চিম ভারতের (বোম্বাই প্রেসিডেন্সি) রাজনৈতিক সংগঠন

পশ্চিম ভারতের সবচেয়ে রাজনৈতিক সংগঠন হলো পুনা সার্বজনিক সভা। ১৮৭০ সালে এই সভা গড়ে উঠেছিল বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, গণেশ বাসুদেব যোশি, এস. এইচ. চিলিংকার প্রভৃতি কয়েকজন উদ্যমী ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টায়। অধ্যাপক অনিল শীলের মতে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকার সঙ্গে পশ্চিম ভারতের রাজনীতিতে পুনার সার্বজনিক সভার ভূমিকা তুলনা করা যায়। এই সভার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সর্দার, জমিদার, ব্যবসাদার, অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী, উকিল, সাংবাদিক শিক্ষক ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষ। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। তবে এই সভা কেবলমাত্র উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামায় নি। কৃষকদের দাবী দাওয়া নিয়েও তারা আন্দোলন করেছিল। ১৮৭২ ও ১৮৭৬-৭৮ দুর্ভিক্ষের সময় তার ত্রাণকার্যে অংশ নিয়েছিল। এই সভা বোম্বাইতে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করেছিল। সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম প্রচার করা ছিল তাদের একটি বড় কাজ। তবু সাধারণ মানুষ বিশেষত কৃষকদের প্রতি তাদের এই করুণা ছিল অনেকটাই লোকদেখানো। এদের ত্রৈমাসিক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল

দরিদ্র মূলধনহীন চাষীদের হাতে জমি দেওয়া সম্ভব নয়।" ১৮৮৮ সালে ফুলে শূদ্রদের সার্বজনিক সভার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে নির্দেশ দেন। পশ্চিম ভারতের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন হলো বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এ্যাসোসিয়েশন। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। এটি গড়ে উঠেছিল ফিরোজ শাহ মেহতা, বদরুদ্দী তায়েবজী ও তেলাঙ্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

১(ক).৪.৩ দক্ষিণ ভারতের (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি) রাজনৈতিক সংগঠন

কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের শাখা হিসাবে ১৮৫২ সালে মাদ্রাজে স্থাপিত হয়েছিল মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু নানা কারণে ১৮৬২ সালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। তবে কয়েক বছরের মধ্যেই সুব্রহ্মণ্য আয়ার, বিজয়রাঘবাচারি, রঙ্গিয়া নাইডু, আনন্দ চার্লু, রামস্বামী মুদালিয়ার প্রমুখের উদ্যোগ ও নেতৃত্বে নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন নবজন্ম লাভ করে। লর্ড রিপনের উদারনৈতিক শাসন, বিশেষত তাঁর সায়ত্তশাসন নীতি এঁদের গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু শীঘ্রই সদস্যদের মধ্যে মতভেদের ফলে সংগঠনে ভাঙ্গন ধরে। ১৮৮৪ সালে প্রতিবাদী নবীন সদস্যরা প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাজ মহাজন সভা। এই সভা প্রতিষ্ঠা করার একটা উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত প্রায় একশো সমিতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে একটি ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলা। এই সভার প্রধান দাবী ছিল— আইনসভার সম্প্রসারণ ও রাজস্ব বিভাগের কাজকর্ম থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ। মহাজন সভার মাধ্যমে মাদ্রাজ দক্ষিণ ভারতের সংকীর্ণ গন্ডি অতিক্রম করে ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হবার সুযোগ পায়। মফঃস্বল শহরে সভা সমিতি আহ্বান করে ও মাদ্রাজ শহরে বাৎসরিক অধিবেশনের মাধ্যমে এই সভা জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের আদর্শ ছড়িয়ে দেয়। লক্ষ করার বিষয় ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম অধিবেশনে এই সভা যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তার সঙ্গে ১৮৮৩ সালে কলকাতায় ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সভা বা ন্যাশান্যাল কনফারেন্সের প্রস্তাবের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল।

১(ক).৫ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা — তর্ক বিতর্ক

১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই শহরে আহুত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রহস্যাবৃত। কার নেতৃত্বে বা উদ্যোগে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র তর্কবিতর্ক ও মতভেদ আছে। লক্ষ করার বিষয় যখন বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল, ঠিক সেই সময়ই কলকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সুরেন্দ্রনাথের ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৩ সালে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে কোন গুরুতর মত পার্থক্য ছিল না। তাহলে এই দুই সংগঠনের অধিবেশন কেন একই সঙ্গে ভারতের দুই

প্রান্তের দুই শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তার কোন সহজবোধ্য ব্যাখ্যা মেলে না। সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বা অবহিত না করেই কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল। কেন তাঁকে অবহিত করা হয় নি, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে ১৮৮৬ সালে কলকাতায় যখন কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসেছিল, তখন সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের অস্তিত্ব বিলোপ করে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু জন্মলগ্নেই একটা বোঝাপড়ার অভাব নিশ্চয় আকাঙ্খিত ছিল না। যাই হোক মূলত তিনটি প্রশ্ন ও বিতর্কের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করবো এই পরিচ্ছদে। (১) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কার উদ্যোগে? (২) কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কারণ কি ছিল? ও (৩) রজনীপাম দত্তের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব।

১(ক).৫.১ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেরণা ও উদ্যোগ

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেরণা ও উদ্যোগ নিয়ে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করেছেন। পট্টভি সীতারামাইয়ার মতে ১৮৭৭ সালে অনুষ্ঠিত দিল্লী দরবারই নাকি প্রথম একটি জাতীয় সভা আহ্বানের প্রেরণা দিয়েছিল। আবার প্রথম কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য জি সুব্রামনিয়া আইনয়ার মনে করেন ১৮৮৩ সালে কলকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়েছিল তাই জাতীয় নেতাদের এক সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছিল। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম সভাপতি হিউমের জীবনীকার ওয়েডারবার্ণ, পট্টভি সীতারামাইয়া, রজনীপাম দত্ত, অধ্যাপক নিমাই সাধন বসু প্রভৃতি লেখক মনে করেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ্যালাই অক্টাভিয়ান হিউমের প্রচেষ্টা ও উদ্যমে। ১৮৮৩ সালের ১লা মার্চ হিউম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখিত এক খোলা চিঠিতে তাদের দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন এবং দেশের কাজে এগিয়ে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এর পর তিনি ১৮৮৫ সালে বড়লাট ডাফরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ করেন। এর ফলেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু চরমপন্থি নেতা লালা লাজপৎ রায় মনে করেন লর্ড ডাফরিণই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। আবার কর্ণেল অলকট, রঘুনাথ রাও, নরেন্দ্রনাথ সেন ও এ্যানি বেসান্ত মনে করেন ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত থিওজফিষ্টদের এক সমাবেশেই প্রথম কংগ্রেসের মতে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কেউই সুরেন্দ্রনাথের দাবী বা অবদানের কথা উল্লেখ করেন নি। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী এর জন্য কিছুটা আক্ষেপ করেছেন।

প্রথমে আসা যাক সুরেন্দ্রনাথের কথায়। এ কথা সত্য যে হিউমের অনেক আগেই সুরেন্দ্রনাথ একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনের কথা ভেবেছিলেন। ১৮৮৩ সালে কলকাতায় জাতীয় সম্মেলনের আহ্বান ছিল তারই বহিপ্রকাশ। কাজেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা না হলেও তাঁর মনের গভীরেই কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। অনেকটা এই কারণেই অধ্যাপক ত্রিপাঠী সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সম্মেলনকে

"জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া" বলে উল্লেখ করেছেন। তবু যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বা যে কোন কারণেই হোক তাঁকেবাদ দিয়েই কংগ্রেস স্থাপিত হয়েছিল, সেহেতু তাঁকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় না। আবার অন্যদিকে কংগ্রেসের পরিকল্পনা তাঁর মাথা থেকেই প্রথম বেরিয়েছিল বলে তাঁকে কংগ্রেসের জনক বলে মেনে নিত আপত্তির কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে থিওজফিস্টদের দাবী কোন ক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, এ্যানি বেসান্তের ভাষ্য ছাড়া আমাদের কাছে এমন কোন তথ্য নেই, যাতে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে থিওজফিস্টদের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া এ্যানি বেসান্তের ভাষ্যের মধ্যেও অনেক গরমিল আছে। অন্যদিকে অধ্যাপক ত্রিপাঠী, ডঃ বিপান চন্দ্র ও ডঃ অনিল শীল প্রভৃতি আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হিউমের দাবী পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। এঁদের মতে হিউম ব্যক্তিগত উদ্যোগ না নিলেও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হতো, কারণ ভারতবাসী এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা যে অনেক দিন আগে থেকেই ভাবছিল, সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সম্মেলন ছিল তার প্রমাণ। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ডাফরিনের দাবী আরও দুর্বল, কারণ তিনি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। বরং কংগ্রেসকে তিনি আগাগোড়াই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। হিউমের প্রস্তাবও তিনি সুনজরে দেখেন নি। হিউমের সঙ্গে তার তীব্র মতবিরোধ ছিল। ডাফরিন যদি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হতেন, তাহলে তিনি কখনই কংগ্রেসকে "আণুবীক্ষণিক সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি" বলে উপহাস করতেন না।

আমাদের ওপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, হিউম, ডাফরিন, থিজফিস্টদের এবং এমন কি সুরেন্দ্রনাথকেও এমনভাবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। আসলে কোন ব্যক্তি বিশেষকে বোধহয় কংগ্রেসের জন্মদাতা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। অধ্যাপক বিপানচন্দ্রের মতে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না বা তাকে কোন "ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা" বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এর পিছনে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ছিল। ১৮৬০-এর দশক থেকে ভারতে যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়েছিল, তার মধ্যেই কংগ্রেসের উৎস অনুসন্ধান করতে হবে। ভারতীয়দের এই রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ছিল বিভিন্ন শহরে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সংগঠনগুলি। এদের মধ্যে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথের ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ছাড়া আর কোন সংগঠনের একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হতে পারে নি। এই অবস্থায় হিউমের উদ্যোগে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবে বিচার করলে হিউমকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে হতে পারে, কারণ তিনি এগিয়ে না আসলে ১৮৮৫ সালেই হয়ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হতো না। আবার অন্য এক বিচারে হিউম ছিলেন কালের হাতে পুতুল মাত্র। অর্থাৎ এই ধরনের এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতবাসীর মানসিক প্রস্তুতি না থাকলেও, তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা আদৌ সফল হতো কিনা সন্দেহ। আর এই মানসিক প্রস্তুতির কাজ অনেকটাই করে দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এক কথায় বলতে পারি যা ছিল সুরেন্দ্রনাথের

স্বপ্ন বা আদর্শ হিউম তার বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ একে চিলে অপরের পরিপূরক। কংগ্রেস ছিল ভারতের জনগণের রাজনৈতিক চেতনা এবং এই যৌথ প্রচেষ্টার পরিণতি।

১(ক).৫.২ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কারণ ও উদ্দেশ্য

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত হবার পর আপনাদের মনে সঙ্গত কারণেই যে প্রশ্ন উদিত হতে পারে, তা হলো একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় ভারতীয়দের উদ্যম ও আগ্রহ থাকলেও হিউমের মত একজন দক্ষ ইংরেজ রাজপুরুষ ও অবসপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান তা নিয়ে কেন মাথা ঘামালেন। কিন্তু আগের কথা আগে। ভারতীয়দের দিক থেকে আগ্রহের কারণ হলো ১৮৮৫ সালের আগে যে সব রাজনৈতিক সংগঠন ইতস্ততভাবে ভারতের বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছিল, তার ফলে কোন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন সঠিক পথে পরিচালিত হবার কোন সুযোগ ছিল না। ভারতীয় জনগণের এই অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা ভারতীয়দের হবার কোন সুযোগ ছিল না। ভারতীয় জনগণের এই অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার ও দাবী থেকে বঞ্চিত করছিল। এই অবস্থায় ভারতে জাতি গঠনের কাজ অত্যন্ত জরুরী ছিল। ভারতের শিক্ষিত মানুষ উপলব্ধি করছিল যে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ছত্রছায়ায় সমবেত করতে না পারলে এই জাতি গঠনের কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে। সুরেন্দ্রনাথ, তিলক প্রভৃতি নেতা এই বাস্তব অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন ছিলেন। এমনকি ১৯২৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর লিখিত বইয়ের নাম রেখেছিলেন— "A nation is Making." ভারতের মানুষেরা যাতে এক অখণ্ড ঐক্য এ জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারে এবং যাতে তারা পরস্পর পরস্পরের আরও কাছে আসতে পারে, তার জন্য স্থির হয়েছিল যে, কংগ্রেসের অধিবেশন প্রতিবছর ভারতের বিভিন্ন শহরে সংগঠিত হবে এবং যে অঞ্চলে সেই অধিবেশন হবে, সেই অঞ্চলের কোন নেতা সভাপতি হতে পারবেন না। অর্থাৎ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশ ও জাতির স্বার্থে।

অন্যদিকে হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যম নিয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের স্বার্থে ও প্রয়োজনে। আবার ভারত প্রেমী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু ভারতে ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। লিটনের আমলে হিউম যখন সরকারী উচ্চপদে আসীন ছিলেন, তখন নাকি সাতখণ্ডের এক সরকারী নথি বা রিপোর্ট তাঁর হাতে আসে। এগুলি পাঠ করে তাঁর মনে হয় ভারতের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ এবং ভারতে এক গণবিদ্রোহ আসন্ন। ১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের কথা তখনও ইংরেজরা বিস্মৃত হয় নি। হিউমের আশঙ্কা হয় যে, এই পরিস্থিতিতে যদি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীও এই বিদ্রোহে অংশ নেয়, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হতেপারে। এই সংকট থেকে ইংরেজদের রক্ষা করার জন্য এবং ভারতবাসীর মন বোঝার উদ্দেশ্যে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার কথা চিন্তা করেন। তিনি জানতেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীও নানা কারণে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। এই জন্যই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় স্নাতকদের উদ্দেশ্যে

একটি খোলা চিঠি লেখেন। এর পর তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা ডাফরিনের কর্ণগোচর করেন। লালা লাজপৎ রায় মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করা, ভারতের স্বার্থ রক্ষা করা নয়। অর্থাৎ ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার বা স্বাধীনতার মত কোন মহৎ আদর্শের দ্বারা হিউম অনুপ্রাণিত হন নি।

১(ক).৫.৩ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যে তত্ত্ব সব চেয়ে বেশি বিতর্ক ও উত্তপ্ত আলোচনার সৃষ্টি করেছে, তা হলো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। এর দুটি দিক ছিল। প্রথমটি হল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় হিউম ও কংগ্রেস নেতাবৃন্দের সুরেন্দ্রনাথকে পুরোপুরি অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা। হিউম যখন তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য ১৮৮৫ সালের মার্চ মাসে কলকাতা এসেছিলেন তখন তিনি নরেন্দ্রনাথ সেন (Indian Mirror পত্রিকার সম্পাদক) ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন নি। আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে হিউম তাঁর সঙ্গেও এ বিষয়ে কোন কথা বলেন নি। নভেম্বরের শেষে সুরেন্দ্রনাথ যখন হিউমের পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন, তখন তিনি তাঁর জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং তাঁর পক্ষে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন হিউম ইচ্ছাকৃতভাবেই এ কাজ করছিলেন। তিনি আরও মনে করেন উমেশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথও এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র আরও গভীর ও ভয়ংকর। এই ষড়যন্ত্রও হয়েছিল কংগ্রেস ন্তোদেরসঙ্গে হিউম-ডাফরিনের। ভারতীয় জনগণের ত্বীর ক্ষোভ ও রাষ যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে না পারে, তার জন্য কংগ্রেস ইংরেজদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছিল। ইংরেজরা চেয়েছিল কংগ্রেসকে এক "নিরাপত্তামূলক যন্ত্র" বা "রক্ষা কবচ" হিসাবে ব্যবহার করতে। ১৯১৬ সালে চরমপন্থী নেতা লালা লাজপৎ রায় নরমপন্থী নেতাদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে "নিরাপত্তা মূলক যন্ত্র" তত্ত্ব ব্যবহার করেন। এর প্রায় পঁচিশ বছর পরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার উপর ভিত্তি করে প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও লেখক রজনীপাম দত্ত এই ভিমত প্রকাশ করেন যেন হিউম, ডাফরিন ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সবাই মিলে আসন্ন এক গণ অভ্যুত্থানের কণ্ঠ রোধ করার জন্য এক চক্রান্ত গড়ে তুলেছিলেন। অর্থাৎ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পিছনে কেবলমাত্র "নিরাপত্তামূলক যন্ত্র" বা "রক্ষাকবচ" তত্ত্বই নয়, গভীরতর আরও একটি দুরভিসন্ধি ছিল। রজনীপাম দত্তের মতে শুধু সরকার নয়, কংগ্রেস নেতারাও আসন্ন গণ আন্দোলন সুনজরে দেখেন নি। তাই তাঁরাও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। সি. এফ. এন্ড্রুজ ও গিরিজা মুখার্জীও "নিরাপত্তামূলক যন্ত্র" বা "রক্ষাকবচ" তত্ত্ব স্বীকার করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে এস.আর. মেহরত্র রজনীপাম দত্তের এই তত্ত্বের আংশিকভাবে সমর্থন করেছেন।

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী, অধ্যাপক বিপান চন্দ্র প্রভৃতি ঐতিহাসিক রজনীপাম দত্তের ষড়যন্ত্র তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করেছেন। অধ্যাপক ত্রিপাঠীর মতে ডাফরিন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় আদৌ আগ্রহী ছিলেন না এবং তাঁর সঙ্গে হিউমের গুরুতর মতভেদ ছিল। সুতরাং তার পক্ষে এই ধরনের ষড়যন্ত্র অংশ গ্রহণ করা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে হিউম ডাফরিন সম্পর্কে অনেক মনগড়া কথা বলতেন এবং উমেশচন্দ্রদের কাছেও বলেছেন। "তারই ওপর ভিত্তি করে উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের জন্মকাহিনী লেখেন এবং সীতরামাইয়া, রজনীপাম দত্ত সবাই তা বিশ্বাস করে বসেন।" অন্যদিকে যে সাতখণ্ড সরকারী নথির উপর নির্ভর করে হিউম এক ব্যাপক গণ বিদ্রোহের আশঙ্কা করেছিলেন তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলেছেন অধ্যাপক বিপানচন্দ্র। জাতীয় মহাফেজখানা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নাকি এই ধরনের কোন নথি পাওয়া যায় নি। হয়ত ইংরেজরা ভারত ছাড়ার আগে তা ধ্বংস করে দিয়ে ছিল। সবচেয়ে বড় কথা লিটনের সময়ই যদি হিউম একটি তীব্র গণবিদ্রোহের আশঙ্কা করে থাকেন, তাহলে কেন সাত বছর ধরে সরকার এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অধ্যাপক বিপানচন্দ্রের মতে আসলে কোন সরকারী নথি থেকে নয়, হিউম আসন্ন এই গণবিদ্রোহের কথা জানতে পেরেছিলেন কয়েকজন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মগুরু ও চেলাদের কাছ থেকে। হিউম প্রাচ্যধর্ম সম্পর্কে খুব আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মগুরুর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন অলৌকিক তত্ত্বেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। এই সব ধর্মগুরু ও চেলারাই তাঁকে আসন্ন এই গণ অভ্যুত্থানের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করার জন্য নাকি আবেদন জানিয়েছিলেন আর তার ভিত্তিতেই হিউম ডাফরিনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। ডাফরিন যে তাঁর সব কথা বিশ্বাস করতেন না এবং মনে করতেন তার মাথায় ছিট আছে, সে কথা আগেই বলেছি। যাই হোক ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউম ভারতীয় নেতাদের দ্বারা নয় বরং ঐ সব গুরু ও তাদের চেলাদের অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের কোন অবকাশ ছিল না। তবে অনেকে একটি প্রশ্ন তুলতে পারেন, তা হলো কংগ্রেস নেতারা যধি ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে না থাকেন, তা হলে তাঁরা কেন হিউমের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন? এর উত্তরে বলা যায় ভারতপ্রেমী হিসাবে হিউমের খ্যাতি ছিল ও ভারতীয় জনগণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। তাই তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে ভারতীয় নেতাদের কোন অসুবিধা হয় নি। তার চেয়েও বড় কথা হলো কংগ্রেস নেতারা ভেবেছিলেন যে, হিউমের মত একজন উচ্চপদস্থ প্রাক্তন সরকারী কর্মচারীর উপস্থিতি কংগ্রেস সম্পর্কে সরকারের মন থেকে সর্বপ্রকার সন্দেহ সরিয়ে দেবে, অর্থাৎ হিউমের সঙ্গে সহযোগিতা ছিল এক বাস্তব প্রয়োজনীতা ও কৌশলমাত্র। এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র ছিল না।

১(ক).৬ কংগ্রেসের সামাজিক ভিত্তি

কংগ্রেসই ভারতের প্রথম জাতীয় সংগঠন, যার ছত্রছায়ায় সমবেত হয়েছিল জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ। আগে যে সব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল,

তাদের প্রভাব ছিল আঞ্চলিক, লক্ষ্য ছিল সীমিত এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সঙ্কীর্ণ। প্রচলিত অর্থে অবশ্য, কংগ্রেসকে কোন রাজনৈতিক দল বলা যায় না, কারণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত এর কোন সংবিধান ছিল না বা অন্তত প্রথম দিকে কোন একজন ব্যক্তি বিশেষ এর প্রধান বা নেতা ছিলেন না। এমনকি এর কোন সুস্পষ্ট সংগঠন ও মজুদ অর্থভাণ্ডার ছিল না। তবু কংগ্রেসকে ঘিরেই ভারতবাসী তাদের আশা আকাঙ্খা ও দাবীদাওয়া তুলে ধরতে ও তা আদায় করতে সক্রিয় ছিল। সাধারণ মানুষ তাই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকতো।

কংগ্রেসের শ্রেণী চরিত্র ও সামাজিক ভিত্তি নিয়ে নানা জনে নানা অভিমত প্রকাশ করে এসেছেন। বামপন্থীরা আগাগোড়াই বলে এসেছেন যে কংগ্রেস হলো একটি বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান। প্রথম যুগের কংগ্রেস নেতাদের সম্পর্কে এই ধরনের অভিযোগ ভ্রান্ত বলে মনে করেন অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী। সি.এস. বেইলির প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই সময়ে কংগ্রেসে জমিদার শ্রেণীরই প্রাধান্য ছিল। কংগ্রেসকে মোটা টাকার চাঁদা দিতেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজের মত বড় জমিদার বা ভিজিয়াননবগ্রাম ও বরোদার দেশীয় রাজন্যবর্গ। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যয় ভার বহন করেছেন নাটোর, ময়মনসিংহ, গৌরীপুর, নাড়াজোল, টাকী ও উত্তরপাড়ার জমিদার। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে কংগ্রেস তহবিলে মোটা টাকা দিতেন জমিদার বা ভূস্বামী শ্রেণী। উদাহরণ স্বরূপ মহারাষ্ট্রের নাটু ভ্রাতৃদ্বয়, পাঞ্জাবের রামভুজ দত্ত চৌধুরী ও মাদ্রাজের রামনাদের রাজার নাম করা যায়। উত্তর ভারতে তালুকদাররা অবশ্য সরকারের অনুগত ছিল। কংগ্রেসে জমিদার শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল বলেই কংগ্রেস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক ছিল।

জমিদাররা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও কংগ্রেসকে কখনই তাদের প্রতিষ্ঠান বা মুখপাত্র বলা যায় না। সাধারণভাবে কংগ্রেস ছিল উচ্চ শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। অবশ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে ঠিক কাদের বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা কঠিন। অনেক সময়ে দেখা গেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আসলে ব্যাঙ্কার, বণিক বা জমিদার শ্রেণীর অনুগ্রহ পুষ্ট এবং তাদের হয়ে কাজ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ সি.এস. বেইলি এলাহাবাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আইনজীবী ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত মানুষের কথা বলেছেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজ সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন ক্রিষ্টিন ডবিন ও ডি.এ. ওয়াব্রুক। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী অবশ্য এই ধরনের ব্যাখ্যা পুরোপুরি গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। তাঁর মতে কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে ফিরোজ শা মেহতা, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কখনই অন্যের কথায় চলতেন না। এঁদের জমিদার বা বণিক শ্রেণীর মুখপাত্র বলেও মনে করার কোন কারণ নেই। আবার আনন্দমোহন বসু একজন শিক্ষাব্রতী ও ব্যারিষ্টার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও আসলে তিনি ছিলেন জমিদার সন্তান। কে কথায় বলা যায় কংগ্রেসের আদি পর্বে জমিদার, বণিক এবং মধ্যবিত্ত সকলেই সক্রিয় থাকলেও বণিকদের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য। গান্ধীর আবির্ভাবের পর অবশ্য বণিকদের প্রাধান্য চোখে পড়ে।

কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে যে সব সদস্য অংশ গ্রহণ করতেন, তা থেকে কংগ্রেসের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যায়। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত যে সব সদস্য কংগ্রেস অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাতে আইনজীবীদের সংখ্যাধিক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত ৪ বছরে কংগ্রেস অদিবেশনে মোট ২৩৬১ জন সদস্য যোগদান করেছিলেন। এঁদের মধ্যে আইনজীবীর সংখ্যা ছিল ৮৮৬ জন। আবার ১৮৯২ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানকারী ১৩,৮৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ৫,৪৪২ জন সদস্যই ছিলেন পেশায় আইনজীবী। ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত যে সব পেশাদারী মানুষ কংগ্রেস অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রতিনিধি সংখ্যা নিচে দেওয়া হলো।

	১৮৮৫	১৮৮৬	১৮৮৭	১৮৮৮
প্রতিনিধি সংখ্যা	৭২	৪৩৪	৬০৭	১২৪৮
আইনজীবী	৩৯	১৬৬	২০৬	৪৫৫
ডাক্তার	১	১৬	৮	৪২
সাংবাদিক	১৪	৪০	৪৩	৭৩

১৮৯২ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত কংগ্রেস অদিবেশনে যোগদানকারী আইনজীবীদের সংখ্যা আগে বলেছি। ঐ সময়ে অন্যান্য শ্রেণী বা বৃত্তিজীবী সদস্যদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে জমিদার ২৬২৯, বণিক ২৯০১, সাংবাদিক ৪৪১, ডাক্তার ৪০৮, ও শিক্ষক ৪৩৮। কংগ্রেসে যোগদানকারী সদস্যের মধ্যে শতকরা ২৫ জন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। সরকারী কর্মচারীদের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানে প্রথম দিকে উৎসাহ দেওয়া হতো না। পরে তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। কংগ্রেসে শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুব অল্প। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মাত্র দু-জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। চতুর্থ অধিবেশনে অবশ্য এই সংখ্যা ছিল ৫৯। তবে অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন কংগ্রেস আন্দোলনের সমর্থক। কংগ্রেসে আইনজীবীদের সংখ্যাধিক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডুডিথ ব্রাউন বলেছেন যে, শুধু ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা বা সংবিধান সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান নয়, বড় দিনের ছুটির অবসরও, যা অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের কাছে সহজলভ্য ছিল না, তাঁদের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করার সুযোগ এনে দিয়েছিল।

ভৌগোলিক মাপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই তিন প্রেসিডেন্সি থেকে অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা ও সদস্য আসতেন। এর কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ এই সব অঞ্চলেই ছিল সব চেয়ে বেশি। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কত জন সদস্য কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন, নিচের পরিসংখ্যানে তা দেওয়া হলো।

বাংলা ও আসাম	—	৩,৯০৫
বোম্বাই ও সিন্ধু	—	৪,৮৫৭
মাদ্রাজ	—	৪,০৬২
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা	—	৩,০২৩
পাঞ্জাব	—	১,৫৪৭
মধ্যপ্রদেশ (C.P.) ও বেবার	—	২,১৭০
	মোট	১৯,৫৬৪

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৯৫ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত কংগ্রেস অধিবেশনে যে ১৯,৫৬৪ সদস্য যোগদান করে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১২,৮২৪ জনই এসেছিলেন বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে।

কংগ্রেস একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হলেও সেখানে হিন্দুদের, এবং বিশেষভাবে বর্ণহিন্দু বা ব্রাহ্মণদের সংখ্যাধিক্য আমাদের চোখে পড়ে। ১৮৯২ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত যে ১৩,৮৩৯ জন সদস্য কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ হিন্দুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫,৫২৩ ও ৬৮৬০। অশিক্ষিত ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের কোন ঠাঁই হয় নি। কংগ্রেসের কাজকর্ম সব কিছুই হতো সাধারণের দুর্বোধ্য ইংরেজী ভাষায়। আসলে কংগ্রেসের সদস্যরা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। উভয়ের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দূরত্ব ছিল অনতিক্রম্য। সাধারণ মানুষ এঁদের সমীহ, এমন কি ভয় করতেন। কংগ্রেস নেতারা আচার আচরণ ও মানসিকতার দিক থেকে ছিলেন পুরোমাত্রায় ইউরোপীয়। তাই তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারতেন না। সুমিত সরকারের ভাষ্য থেকে জানতে পারি ফিরোজ শাহ মেহতা নাকি রেলের বিশেষ সেলুনে যাতায়াত করতেন। দাদাভাই নৌরজী নিজেদের এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, —"আমরা নিজেদের শ্রেণী ছাড়া অন্যান্যদের সম্পর্কে কতটুকু জানি?" লালা লাজপৎ রায় কংগ্রেসের এই সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

অন্যদিকে কংগ্রেস অধিবেশনে মুসলিম সদস্যদের সংখ্যাল্পতাও আমাদের বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ১৮৯২ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত যে ১৩,৮৩৯ জন সদস্য কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন, তাদের মধ্যে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল মাত্র ৯১২ জন এবং এর মধ্যে আবার ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনেই ৩১৩ জন মুসলিম সদস্য যোগদান করেছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে একমাত্র বদরুদ্দীন তায়েবজী ছাড়া অন্য কোন মুসলিম নেতা র নাম পাওয়া যায় না। দুটি কারণে মুসলিম সম্প্রদায় কংগ্রেসে যোগ দেয় নি। প্রথমতঃ শিক্ষাদীক্ষায় মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। স্বাভাবিক কারণেই তাই শিক্ষিতদের প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে তাদের ঠাঁই হয়

নি। দ্বিতীয়ত, স্যার সৈয়দ আহমেদ মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে কংগ্রেস রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেন। তিনি কংগ্রেসকে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করেন। বদরুদ্দীন তায়েবজ স্যার সৈয়দ আহমেদের এই নীতির বিরোধিতা করেও কিছু করতে পারেন নি। স্যার সৈয়দ আহমেদ তাঁর দ্বি-জাতি তত্ত্বে অটল থাকেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তায়েবজীর তুলনায় স্যার সৈয়দ আহমেদের প্রভাব ছিল বেশি। ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কংগ্রেসে যোগ দেয় নি এবং কংগ্রেস অধিবেশনে তাদের সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকে। ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদ অধিবেশনে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল মাত্র ২২২ জন। কিন্তু ছোটলাট কলভিনের মতে এতে কোন সম্ভ্রান্ত বা সম্পন্ন মুসলমান অংশগ্রহণ করে নি। পরের বছর বোম্বাই অধিবেশনে ২৪৮ জন মুসলিম প্রতিনিধি যোগ দেন। কিন্তু তার পর থেকেই তাদের সংখ্যা দিন দিনি হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৯৪ সালে মাদ্রাজ ও ১৮৯৫ সালে পুনায় আহুত কংগ্রেস অধিবেশনে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল মাত্র ২৩ ও ২৫ জন। পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে এই সংখ্যা আরও কমতে থাকে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ১৮৯৯ সালে আহুত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস, যার কথা আগেই বলেছি।

কংগ্রেস প্রথম সর্বভারতীয় বা জাতীয় সংগঠন হলেও সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ যে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না, এ কথা স্বীকার্য। আগেই বলেছি কংগ্রেস ছিল মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপাত্র। তবুও কংগ্রেসের অভিনবত্ব এইখানে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সমস্ত ভারতবাসীর আশা আকাঙ্খা ও ইংরেজ বিরোধিতার প্রতীক হিসাবে নিজের ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীকালে কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও কংগ্রেস যে একেবারে তাদের কথা ভাবে নি তা নয়। কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আধুনিক। ব্রিটিশ শাসনের ঔপনিবেশিক শোষণ ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরে কংগ্রেস নেতারা সমস্ত ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। দেশের সাধারণ মানুষের ওপর ইংরেজ রাজপুরুষদের অত্যাচার ও জাতি বৈষম্যের নগ্ন রূপ উন্মোচন করে তাঁরা সমস্ত ভারতবাসীর ক্ষোভ ও অসন্তোষের অনুভূতিকে বাঙ্ময় করেছিলেন। কংগ্রেসের আগে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এই ধরনের সর্বব্যাপী সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ও সাক্ষ্য দিতে পারে নি।

১(ক).৭ সারাংশ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা হলেও পরবর্তী একশো বছর ধরে ইংরেজরা একটু একটু করে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করতে তৎপর হয়েছিল। ভারতবাসীর কিন্তু অন্তর থেকে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে চায় নি এবং এই সময়ের মধ্যে একের পর এক অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন করেছিল। ভারতবাসীর এই ইংরেজ বিরোধিতা সবচেয়ে বেশি তীব্র আকার ধারণ করেছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে। সারা ভারত জুড়ে এই বিদ্রোহ

সংগঠিত না হলেও উত্তর ও মধ্যভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হলেও ইংরেজ বিরোধিতার অবসান হয় নি। ইংরেজ বিরোধিতাকে একটি ঐক্যবদ্ধ পথে পরিচালিত করার জন্য যে তাগিদ ভারতবাসী অনুভব করছিল, ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা সফল হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এর পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি।

জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। শ্রেণীগত বিচারে অবশ এই ক্ষোভের প্রকৃতি এক ধরনের ছিল না। কৃষকদের ক্ষোভের কারণ ছিল অতিরিক্ত করের বোঝা জমিদার ও মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচার এবং সরকারী ঔদাসীন্য। জমিদারদের ক্ষোভের কারণ ছিল ঊনিশ শতকের দ্বিতয়ার্ধে কৃষকদের অনুকূলে প্রণীত বিভিন্ন প্রজাসত্ত্ব আইন। পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্ষোভের কারণ ছিল ভারতীয় পুঁজির বিকাশে সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ। শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ক্ষোভের কারণ ছিল স্বল্প মজুরি ও অনুন্নত জীবনযাত্রার মান। সমাজে সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। মুসলিম সম্প্রদায়ও ব্রিটিশ শাসনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল।

ক্ষোভ ও অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে গড়ে তোলা অসংখ্য রাজনৈতিক সংগঠনের মারফৎ। ভারতের বাইরেও কিছু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। সমাজের শিক্ষিত এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষই এই সব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল, এই সব রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, পুনার সার্বজনিক সভা ও মাদ্রাজের মহাজন সভা।

কিন্তু এই সব রাজনৈতিক প্রতিষ্টানের কোন সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল না। সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থও তারা তুলে ধরে নি। এই অভাব পূর্ণ করতেই গড়ে উঠেছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। কেউ বলেছেন এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হিউম, কারও মতে ডাফরিন আবার কেউবা মনে করেন থিওজফিষ্টরাই এর প্রতিষ্ঠাতা। আবার অনেকে মনে করেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। আধুনিক মত অনুসারে কোন ব্যক্তি বিশেষকে কংগ্রেসের স্থাপয়িতা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েও নানা কথা উঠছে। হিউমের উপস্থিতি ও উদ্যোগ এই বিতর্কের মূলে। একটি মত অনুসারে হিউমের উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন এক গণ বিপ্লবের হাত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের এক শ্রেণীর জনগণকে হাত করা। কংগ্রেসকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন এক "নিরাপত্তামূলক" যন্ত্র হিসাবে। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই রজনীপাম দত্ত গড়ে তুলেছেন তাঁর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব তাঁর মতে সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্যই কংগ্রেসও এই ষড়যন্ত্র অংশীদার হয়েছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করেছেন।

কংগ্রেসের সামাজিক ভিত্তি নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে। কারও মতে কংগ্রেস ছিল বুর্জোয়াদের মুখপত্র। আবার কারও মতে তা ছিল জমিদার শ্রেণীর সংগঠন। আসলে কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় সমবেত হয়েছিল অনেকেই। তার মধ্যে জমিদার ও বণিকরাও ছিল। তবে কংগ্রেস ছিল মূলত শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন। সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের সেখানে ঠাঁই হয় নি। মুসলিম সম্প্রদায়ও কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ব্যতিক্রম ছিলেন বদরুদ্দীন তায়েবজীর মত কিছু মানুষ।

১(ক).৮ অনুশীলনী

১. ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেন ক্ষুব্ধ ছিল?

২. ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতে যে সব রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল, সেগুলি উল্লেখ করে দেখান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের কোথায় অমিল ছিল।ড়

৩. কংগ্রেসের উদ্ভব সম্পর্কে রজনীপাম দত্তের "ষড়যন্ত্র তত্ত্ব" আপনি কি যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করেন?

৪. আপনি কি মনে করেন যে কংগ্রেস ছিল মূলতঃ শিক্ষিত ও মধবিত্ত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র?

৫. মুসলিম সম্প্রদায় কংগ্রেস যোগদান করতে অনিচ্ছুক ছিল কেন? আপনি কি মনে করেন এর জন্য সৈয়দ আহমেদ দায়ী ছিলেন?

১(ক).৯ গ্রন্থপঞ্জী

১. অমলেশ ত্রিপাঠী— স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

২. Bipan Chandra and Others—Indians struggle for Independence.

৩. সুমিত সরকার— আধুনিক ভারত

৪. অমলেশ ত্রিপাঠী, বিপান চন্দ্র ও বরুন দে— স্বাধীনতা সংগ্রাম (Freedom struggle—N.B.T.)

৫. Anil Seal—Emergence of Indian Nationalism.

একক ১(খ) ❑ আদি কংগ্রেস এবং নরমপন্থী জাতীয়তাবাদের আদর্শগত কাঠামো

গঠন

১(খ).০ উদ্দেশ্য

১(খ).১ প্রস্তাবনা

১(খ).২ প্রারম্ভিক কথা

১(খ).৩ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১(খ).৪ নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের আদর্শ ও কর্মসূচী

১(খ).৪.১ ব্রিটিশ অর্থনীতির সমালোচনা—নির্গমন তত্ত্ব বা জেন থিয়োরী

১(খ).৪.২ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী

১(খ).৪.৩ নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম

১(খ).৪.৪ স্বায়ত্তশাসনের দাবী

১(খ).৫ আদি জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি

১(খ).৬ নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের দুর্বলতা

১(খ).৭ জাতীয় আন্দোলনের আদি পর্বে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া

১(খ).৮ আদি জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ

১(খ).৯ সারাংশ

১(খ).১০ অনুশীলনী

১(খ).১১ গ্রন্থপঞ্জী

১(খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদিপর্বের ইতিহাস বা—

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের আদর্শ ও কর্মসূচী।
- আদি জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি ও তাদের দুর্বলতা।
- জাতীয় আন্দোলনের আদিপর্বে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া।
- আদি জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ।

১(খ).১ প্রস্তাবনা

ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনাকাল থেকেই এদেশের মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। ব্রিটিশের গ্রাস থেকে নিজেদের রাজ্য রক্ষা করার জন্য লড়াই চালিয়েছিলেন হায়দার আলি, টিপু সুলতানের মতো দেশীয় শাসকেরা, আবার বিদেশী শাসনের সমস্ত অত্যাচারের ভার যাদের বহন করতে হত সেই কৃষকেরা ক্রমাগত তাদের সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন যা চরম রূপ পেয়েছিল ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের মধ্যে। উনিশ শতকের এই সব কৃষক বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থানগুলি কোনসময়েই হয়তো ঔপনিবেশিক শাসনের শিকড়কে আলগা করতে পারে নি। কিন্তু এগুলি ছিল ঔপনিবেশিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংখ্যায় অগণিত হলেও এ বিদ্রোহগুলি সুসংগঠিত ছিল না। তাই ব্যর্থতাই ছিল তাদের চরম পরিণতি। অসাফল্য সত্ত্বেও উনিশ শতকের গণ-আন্দোলনগুলি জনসাধারণের মধ্যে সুপ্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিরই পরিচয় দেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের রশি ধরেছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতারা। ভারতের জাতীয়তাবাদ নিয়ে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে লিখেছিলেন যে এ দেশে নানা জাতি। এই নানা জাতির মধ্যে রয়েছে একতা জ্ঞানের অভাব। রবীন্দ্রনাথ 'সমস্যা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন "যে দেশে একটা মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই, সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না।" ১৯২৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীর নাম দিয়েছিলেন A Nation in Making। বাঙালী, শিখ, রাজপুত, মারাঠী বা তামিল প্রভৃতি জাতিসত্তার ভারতীয় হয়ে ওঠা, এক জাতীয়তাবোধের সূত্রে সহস্র প্রাণের বাঁধা, পড়া, এই হোল জাতীয়তা।

ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারকম পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনই জন্ম দেয় জাতীয়তাবাদের। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার নিঃসন্দেহে ভারতীয় সমাজ জীবনে

একগভীর প্রভাব ফেলেছিল। ধর্মীয় ও সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলি জাতীয় চেতনার প্রাথমিক সোপান তৈরী করেছিল। আবার ব্রিটিশ প্রশাসন অর্থাৎ সমস্ত দেশে এক শাসনব্যবস্থা, একই রকম আইন, যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ দেশের মানুষকে একে অপরের কাছে নিয়ে এসেছিল। ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব এ দেশের মানুষের কাছে ক্রমাগতই পীড়াদায়ক হয়ে উঠছিল। ব্রিটিশ শাসক হয়ে উঠেছিল তাদের সাধারণ শত্রু। ইংরেজদের বর্ণ বিদ্বেষ নীতি, ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ইংরেজদের আন্দোলন ভারতবর্ষের মানুষকে তাদের সাধারণ শত্রু সম্পর্কে আরো সজাগ করে তুলেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিল্পপুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল এবং জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের অস্তিত্ব ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ভারতীয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র ধার করে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করতে তৈরী হচ্ছিল। এই অস্ত্রগুলি হলো শিক্ষা, সংবাদপত্র ও আইন। এই তিনটি অস্ত্রই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার হয়েছিল। জাতীয়তাবাদীদের এক বিরাট সংখ্যক ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। ইংরাজী শিক্ষা এক রাজনৈতিক চিন্তা ও সচেতনতার ভিত্তি তৈরী করেছিল। আর সংবাদপত্রের ছিল ভারতীয় জনমত সংগঠনের ভূমিকা। জাতীয় আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার ছিল সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্রিকা। এই সবেরই ফল হলো এক সুসংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ। এই জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিকাশই আমরা এখানে পড়ব।

১(খ).২ প্রারম্ভিক কথা

সুসংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিলেন ভারতের আধুনিক বুদ্ধিজীবী সমাজ। তাঁরা রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসার করার জন্য ও অন্যান্য রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য কিছু কিছু রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায় ও প্রখ্যাত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শিক্ষক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদের (ডিরোজিয়ান) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইয়ং বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেছিল 'অ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন।' যোগেশ বাগলের মতে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সভা হল 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'। তবে জমিদার সমিতিই ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সমিতি বলে অনেকে মনে করেন। এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৩৮ সালে জমিদার সমিতির নাম হয় ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ টমসনের প্রেরণায় জন্ম নিল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'। ১৮৫১ সালে স্থাপিত হয় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন।' প্রায় একই সময়ে ১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশন' এবং 'বোম্বে এ্যাসোসিয়েশন।' এ ছাড়া নানারকম সমিতি ও ক্লাব স্তাপিত হয়েছিল সারা দেশ জুড়ে। এদের বেশীরভাগেরই চরিত্র ছিল আঞ্চলিক। ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার গোষ্ঠীরা এগুলিতে আধিপত্য করতেন। শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, শাসনবিভাগে বেশীসংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ, শিক্ষা বিস্তার এবং ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতির ওপর তাঁরা জোর দিতেন।

তবে এই বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব কৃষকসমাজের সহজাত প্রতিক্রিয়ার তুলনায় ছিল অনেক বেশী সতর্ক ও দ্বিধাগ্রস্ত। ব্রিটিশশাসন সম্পর্কে মোহ ঘুচতে তাদের আরো অনেকদিন সময় লেগেছিল। ১৮৬৬-তে দাদাভাই নৌরজী লন্ডনে 'ইস্ট ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের সমস্যাকে ব্রিটেনের জনসাধারণের কাছে তুলে ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ও দেশের সম্পদ লুণ্ঠনই যে ভারতের দারিদ্র্যের কারণ এ কথা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। 'Drdin of Wealth' বা সম্পদ নির্গমনের তত্ত্ব নিয়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Poverty and Un-British Rule in India' তে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। ১৮৭০ সালে বিচারপতি রাণাডে, গণেশ বাসুদেব যোশী, এস.এইচ. চিপলুংকর প্রভৃতির উদ্যোগে 'পুনা সার্বজনিক সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়।

লিটনের (১৮৭৬-১৮৮০) প্রতিক্রিয়াশীল শাসননীতি জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কর্মধারাকে গতিসম্পন্ন করে তোলে। তরুণ সমাজ বিশেষ করে বাংলাদেশে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের জমিদার ঘেঁষা রাজনীতি আর পছন্দ করতে পারছিলেন না। ১৮৭৬ সালের জুলাই মাসে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলো 'ভারতসভা বা Indian Association। এটি ছিল একেবারেই মধ্যবিত্তদের সংস্থা যার চাঁদার হার ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা নিয়ে আন্দোলন শুরু করে এরা চাইছিলেন সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক আবর্তে সক্রিয় করে তুলতে। একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হতেলাগল সারা দেশ জুড়ে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় 'জাতীয় কংগ্রেস' কথাটি ব্যবহার করলেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক শিক্ষায় অনেকখানি পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। সব মিলিয়ে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত এক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট তৈরী হয়ে নিয়েছিল।

১(খ).৩ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ হলে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ রাজকর্মচারী এ.ও. হিউমের সহযোগিতায় ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ৭২ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন।

কংগ্রেসের জন্মের ইতিহাস নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় হিউমের উৎসাহ কেন ছিল এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। হিউমকে জাতীয় কংগ্রেসের জনক বলে মনে করেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হিউমের জীবনীকার ও কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনের সভাপতি ওয়েডারবার্ণ, কংগ্রেসের সরকারী ঐতিহাসিক পট্টভি সীতারামাইয়া ও প্রখ্যাত বামপন্থী তাত্ত্বিক ও কংগ্রেসের কঠিনতম রজনীপাম দত্ত। ওয়েডারবার্ন লিখেছেন যে হিউমের হাতে এমন সব কাগজপত্র

আসে যাতে তার বিশ্বাস হয় যে ভারতে একটি গণবিপ্লব ঘটতে চলেছে। তাই প্রয়োজন একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা Introduction to Indian Politics (1898) গ্রন্থে এর পরের ঘটনা লেখা আছে। হিউম তাঁর প্রস্তাব ডাফ্‌রিনকে দেওয়াতে ডাফ্‌রিন তাঁর নিজের একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ডাফরিনের প্রস্তাব মতো পুনায় সর্বভারতীয় সম্মেলন বসবে ঠিক হয়েছিল। হিউম তার নাম দিয়েছিলেন Indian National Union। পুনায় কলেরা দেখা যাওয়ায় শিষ মুহূর্তে সম্মেলনের স্থান সরিয়ে নেওয়া হলো বোম্বাই শহরে। সম্মেলনের নাম হলো Indian National Congress. অ্যানি বেসান্তের How India Wrought for Freedom গ্রন্থে কংগ্রেসের একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। তবে অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)** গ্রন্থে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পিছনে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকাকে খাটো করে দেখতে চান নি। ১৮৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনকে জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া বলা চলে। রজনী পাম দত্ত হিউমের সহযোগিতার মধ্যে যে ষড়যন্ত্রের ছায়া দেখেছিলেন তাকে বাতিল করে দিয়েছেন অমলেশ ত্রিপাঠী, সুমিত সরকারের মতো ঐতিহাসিকেরা। অমলেশ ত্রিপাঠী মনে করেন যে "ভারতীয় নেতারা কোনকালেই ডাফরিন বা আমলাদের সঙ্গে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন নি। হিউমের নানা স্বকপোলকল্পিত উক্তি ও তাঁর ওয়েডারবার্ণ —উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ভাষ্য ইতিহাস বলে চলছে। তার ওপর নির্ভর করতে গিয়ে রজনী পাম দত্তও ভুল করেছেন।" আসলে ভারতের রাজনৈতিক নেতারা হিউমের সহযোগিতা চেয়েছিলেন শুধুমাত্র এই কারণে যে, ব্রিটিশ সরকার যেন প্রথম থেকেই কংগ্রেসকে সন্দেহের চোখে না দেখে। সুমিত সরকার মনে করেন যে সেইসময়ে যে রাজনৈতিক বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল হিউম তার পুরো সুযোগটা নিয়েছিলেন। হিউমকে কংগ্রেসের জনক হিসেবে স্বীকার করতে হলে অস্বীকার করতে হয় ভারতীয়দের দীর্ঘকালের জাতীয়তাবাদের প্রকাশ, রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক গৌরবজনক ইতিহাস।

১(খ).৪ নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের আদর্শ ও কর্মসূচী

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা সাধারণভাবে 'মডারেট' বা 'রমপন্থী' বলে পরিচিত। নরমপন্থী এই কারণে যে তারা সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে দেশের পরিস্থিতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূল নয়। বরং তাঁরা জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন, আর চেয়েছিলেন রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের বোধ গড়ে তুলতে। এই বিশ্বাস ও এই কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে তারা তাদের কর্মসূচীকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ভারতীয় জনসাধারণের দাবীগুলিকে একটি সুসংবদ্ধ রূপ দেওয়া যাতে তার মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় জনমতের প্রতিফলন হয়। শুধু তাই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সক্রিয় জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মধ্যে যাতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে সে চেষ্টাও ছিল তাদের

কাম্য। মোটামুটি ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতারা তাদের অধিবেশনে যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তা বিশ্লেষণ করলেই প্রথম পর্বের কংগ্রেসের চরিত্র ও পদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কংগ্রেসের ইতিহাসের প্রথম কুড়ি বছরকে একটি অভঙ্গ পর্ব হিসাবেই দেখা হয়। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার লিখছেন যে গোটা পর্ব জুড়েই লক্ষ্য আর কর্মপদ্ধতি একই ছিল। প্রতি বছর শেষে কংগ্রেস তিনদিনের জন্য মিলিত হতো এবং তা যেন হয়ে উঠেছিল এক বিরাট সামাজিক উপলক্ষ্য। বক্তৃতা হতো ইংরেজীতে এবং তা ছিল বিস্তর লম্বা। প্রস্তাব নেওয়া হতো নানান রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে। প্রত্যেক অধিবেশনেই প্রায় একই ছাঁদের প্রস্তাব নেওয়া হতো। এই প্রস্তাবগুলিকেই আমরা আলাদা করে নীচে আলোচনা করব।

১(খ).৪.১ ব্রিটিশ অর্থনীতির সমালোচনা নির্গমন তত্ত্ব বা জেন থিয়োরী

ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক কুফল প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিতর্কের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতে অংশ নেন দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, গোখলে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। দেশের সমগ্র অর্থনীতির পর্যালোচনা করে তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির অর্থই হচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতিকে পুরোপুরি ব্রিটিশ অর্থনীতির কবলে রাখা। তাঁরা বলতে চাইলেন যে ব্রিটিশ ক্লাসিকাল অর্থনীতি ভারতের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে দুর্দশা ডেকে আনা হয়েছে। এই মত সম্পর্কে তাদের প্রভাবিত করেছিলেন জন ডিকিনসন, মেজর ইভানসবেল, জন ব্রাইট প্রভৃতি কোম্পানীর সমালোচক ও ক্লিফ লেসলি, ফ্রেডরিক লিস্ট প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণ। দেশের সম্পদেরও নির্গমণ বা বাইরে চলে যাওয়া এই সমালোচনা থেকে উঠে আসে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি দেশের শিল্পকে ধ্বংস করেছে, ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ দেশবাসীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে আর রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাপ জনগণকে দারিদ্র্যের চরম সীমায় এনে পৌঁছে দিয়েছে। ২ প্রান্তলিপি—বিস্তৃত বিবরণের জন্য পড়ুন বিপানচন্দ্রের The Rise and growth of economic nationalism in India (New Delhi 1966).

নেতৃবৃন্দ দেখিয়েছিলেন যে তিনভাবে এদেশে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল। প্রথমতঃ ব্রিটিশরা এদেশকে কাঁচামালের সরবরাহক রূপে পরিণত করেছিল। দ্বিতীয়তঃ এদেশকে তারা করে তুলেছিল ব্রিটিশ পণ্যের বাজার। তৃতীয়তঃ এদেশকে তারা কাজে লাগিয়েছিল ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে। এই সবের বিরুদ্ধেই আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের তদন্ত দাবী করে বারবার প্রস্তাব পাশ করা হয়। রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের একটি ভয়াবহ চিত্র তারা ফুটিয়ে তোলেন। দাদাভাই নৌরজী দেখান যে ভারতীয়দের গড় বার্ষিক আয় সে সময়ে ছিল মাত্র কুড়ি টাকা। ১৯০১ সালে কার্জনও একে তিরিশ টাকার ওপর নিয়ে

যেতে পারেন নি। দাদাভাই লিখেছিলেন, ভারতীয়দের অবস্থা "নিতান্তই ভূমিদাসের মতো। আমেরিকান দাসেদের চেয়েও তাদের অবস্থা শোচনীয়, কারণ আমেরিকান প্রভুরা অন্তত নিজের সম্পত্তির মতো তাদের দাসেদের যত্ন নেয়"। গোখলে ভারতের জাতীয় ঋণের একটি হিরসাবে দেখান যার পরিমাণ ১৮৮১-৯৪ তে সত্তর কোটি টাকা। অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে** লিখছেন যে গোখলে ও রমেশচন্দ্র হোমচার্জ বাবদ পাউণ্ডে দেয় অর্থের পরিমাপ করেছিলেন। "তাঁদের সিদ্ধান্ত ফাঁপানো, মনে হলে আধুনিক জন ম্যাকলেনের (পড়ুন John Maclane, Indian Nationalism and the Early Congress (1977.) হিসাব— ২৫ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা— মানতে আপত্তি না হওয়াই উচিত। এর জন্য দায়ী ছিল মাথাভারী প্রশাসনিক ব্যয়, অস্বাভাবিক সামরিক ব্যয় (সামগ্রিক ব্যয়েক ৩৫%) রেলওয়ের গ্যারান্টিকৃত লভ্যাংশ বাবদ ব্যয়, ঋণের সুদ বাবদ ব্যয়। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার ও সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য যে খরচ হয়েছিল তার প্রতিটি পেনী জুগিয়েছে ভারত স্বয়ং।"

এই ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য নরমপন্থীদের দাবী ছিল মূলতঃ তিনটি। **এক,** করভার কমিয়ে দেশের জনগণের ভার লাঘব করা। **দুই,** ভারতে শিল্পায়নের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ নীতি আধুনিক শিল্পবিকাশের পথকে বন্ধ করেছিল তার প্রতিকার করা। **তিন,** অবাধ বাণিজ্যনীতি বর্জন করা। এই অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে ভারতের রেলপথ, চা বাগিচা, শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে লগ্নি করার জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক পুঁজি আমদানি হচ্ছিল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা চেয়েছিলেন শাসনতান্ত্রিক উপায়ে এদেশে বৈদেশিক পুঁজির অনুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হোক। তাঁরা চেয়েছিলেন দেশের শিল্পকে উন্নত করতে এবং এর জন্য সরকারের যে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে সে কথা তারা সরকারকে মনে করিয়ে দিতেন। শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচার ও সম্প্রসারণ করাও সরকারের উচিত বলে তারা মনে করতেন। সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা ছাড়াও দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য তারা স্বাদেশী ভাবধারাকে জনপ্রিয় করে তুলতে চাইছিলেন। "গণেশ বাসুদেব যোশী যখন ১৮৭৭ সালের রাজদরবার পরিদর্শন করেন, তখন তাঁর পরনে ছিল নিখুঁত হাতে বোনা খাদি। ১৮৯৬ সালে মহারাষ্ট্রে একটি বড়ো স্বদেশী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। ছাত্রেরা সেখানে প্রকাশ্যে পুড়িয়েছিলেন বিদেশী কাপড়ের স্তূপ।" পড়ুন 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুন দে।

স্বদেশী ভাবধারা জিইয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে তারা সর্বভারতীয় আন্দোলন চালিয়েছিলেন সরকারী কিছু কিছু নীতির বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ সরকার এ দেশের বস্ত্রশিল্পের ওপর করচাপানোর যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য দাবী সম্পর্কেও তাঁরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ভূমিরাজস্বের অত্যধিক চড়া হারকে তারা তীব্রভাবে সমালোচনা করেছিলেন। গ্রামাঞ্চলে ঋণ জোগাবার জন্য ১৯০২ সালে কৃষি ব্যাঙ্কের দাবি তোলা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশে যে অসাম্যের সৃষ্টি করেছিল তার কারণ ব্যাখ্যা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদেশীয় কৃষক'-এ।

১৮৭৩ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত কার্জনকে লেখা এক খোলা চিঠিতে কৃষকদের খাজনা চিরস্থায়ী করার পরামর্শ দেন। কংগ্রেসের আদি জাতীয়বাদীনেতোরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার দাবী করেছিলেন যদিও তার কোন ফল হয় নি।

কংগ্রেস কৃষির সঙ্গে কুটির শিল্পকেও যুক্ত করেছিল। ১৮৮৭তে আধুনিক কৃষ্ণকৌশলে শিক্ষাদান দাবী করা হয়। ১৮৯৮ সালে জাপানী আদর্শে শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। ১৯০১ থেকে প্রতি বছর কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী বসত। ১৮৯৯ তে লালা মুরলীধর বিলাতী বিলাসদ্রব্য বর্জনের এবং ১৮৯৮ তে মদনমোহন মালব্য দেশী শিল্পদ্রব্য ব্যবহারের আহ্বান জানান। আমরা বঙ্গভঙ্গের পূর্বেই স্বদেশী ও বয়কটের মৃদু মেঘমন্দ্র শুনি। পড়ুন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)— অমলেশ ত্রিপাঠী।

ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতির সমালোচনা করতে গিয়ে আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা যে তত্ত্বটি খাড়া করেছিলেন তা হলো 'নির্গমন তত্ত্ব' বা 'ড্রেন থিয়োরী'। পূর্বে এ সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছিলেন যে ভারতের অর্থসম্পদ ও মূলধনের একটি বড়ো অংশ বিভিন্ন রকম ভাবে বিদেশে চলে যাচ্ছে। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখছেন যে ভারতের মাটি থেকে উৎপন্ন রস সূর্য শোষণ করে নিয়ে গেছে। আকাশ থেকে তা আবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে ভারতে নয়, ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ড সম্পদশালী ও সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যমে ছিল তিনটি (১) হোম চার্জেস, (২) বিনিয়োগ, (৩) বিদেশী ব্যাঙ্ক, বীমা ও জাহাজ কোম্পানী। পলাশীর যুদ্ধের পর একের পর এক নবাবের পরিবর্ত্তনের প্রক্রিয়া কোম্পানীকে প্রভূত অর্থলাভের সুযোগ দেয়। এ ছাড়া কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ড দেওয়া হতো ভারত থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে। ভারতীয় রাজ্যদখলের জন্য কোম্পানীর যে টাকা খরচ হতো তাও আসতো ভারতেরই রাজস্ব থেকে। আবার ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ সেনাদল তাদের বেতনের একটা মোটা অংশ পাঠিয়ে দিত নিজের দেশে। ভারতে বিদেশী মূলধন যা আসতো তার সুদ দিতে হতো ভারতকে। আবার সার্ভিস চার্জ হিসাবে বিপুল পরিমাণে অর্থ এদেশ থেকে নিষ্কাশিত হতো। কংগ্রেসের আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা এই সম্পদ নির্গমণের তত্ত্বকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে ব্রিটিশ শোষণের ভয়াবহ রূপকে তাদের বোঝাতে পেরেছিলেন। তাদের আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ রাজত্বের পকৃত চরিত্র সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় ধারণা গড়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছিল।

১(খ).৪.২ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি

আদি জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে প্রথম দাবী ছিল ইংল্যান্ডে ও ভারতে একযোগে আই.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে ঐ পরিষেবার ভারতীয়করণ। ভারতীয়করণের দাবী তুলে তারা বর্ণবিদ্বেষের উপর একটি আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার তাঁর 'আধুনিক

ভারতে' লিখছেন, ''শ্বেতাঙ্গ বড়কর্তাদের মোটা মাইনে বা অবসরভাতা চলে যাচ্ছিল ইংল্যাণ্ডে। ভারতীয়করণ হলে তা বন্ধ হয়ে সম্পদ নির্গমও কমত আর প্রশাসনও ভারতের প্রয়োজনের দিকে বেশী মন দিত।'' তাঁদের দ্বিতীয় দাবী ছিল বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা, জুরির সাহায্যে বিচারের বিস্তার ঘটানো, অস্ত্র আইন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের জন্য আরও উঁচু পদ ও ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন। তাঁদের তৃতীয় দাবীতে তারা জনশিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। তারা চেয়েছিলেন সরকার প্রযুক্তিবিদ্যা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা আরো বাড়িয়ে দিক। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের প্রতিও তারা সমান গুরুত্ব আরোপ করেন।

১(খ).৪.৩ নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম

ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক নীতি ক্রমাগতই ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করছিল। ১৮৭৮ এ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের প্রবর্তন এর একটি দৃষ্টান্ত। এই আইনটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রচন্ড গণ-আন্দোলনের ফলে সরকার এই আইনটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম এক তীব্র আকার ধরেণ করে। তিলককে দেওয়া হয়েছিল ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। পুনায় দুই নাটুভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাবিচারে দেশান্তরে পাঠানো হয়েছিল। এ ছাড়া কয়েকজন সংবাদপত্র সম্পাদককেও দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এর প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি ও রাজনৈতিক সমিতিগুলি প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিবাদকে মোকাবিলা করার জন্য সরকার নতুন নতুন আইনের মাধ্যমে বাক্‌স্বাধীনতাকে খর্ব করে পুলিশের ক্ষমতার মাত্রাকে বাড়াতে চেয়েছিলেন। এর প্রতিবাদেও জনগণ নিজেদের সংগঠিত করতে লাগল। এই নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম এক হয়ে মিশে গেল দেশের মুক্তির বৃহত্তর সংগ্রামে।

১(খ).৪.৪ স্বায়ত্তশাসনের দাবী

আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা বিশ্বাস করতেন স্বায়ত্তশাসনে যা হবে গণতন্ত্রভিত্তিক। তবে তারা এও জানতেন যে স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে তাদের এগোতে হবে ধীরে ধীরে, অনেক স্তর পেরিয়ে। এই অনেক স্তরের প্রথম স্তরটি ছিল আইনসভাগুলির বিস্তার ও সংস্কার সাধনের দাবী। তাঁরা মনে করেছিলেন এর ফলে ভারতীয়রা অধিক পরিমাণে সরকারী ক্ষমতা লাভ করতে পারবে। ১৮৬১-র ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্টে কিছু বেসরকারী ব্যক্তি আইনসভায় মনোনয়নের অধিকার পেয়েছিলেন কিন্তু এরা বেশীরভাগই ছিলেন জমিদার বা ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীর। জাতীয়তাবাদী নেতারা দাবী করলেন যে মনোনয়ন নয় জনসাধারণের প্রতিনিধিরা আইনসভাগুলির সভ্যপদ লাভ করবে নির্বাচনের ভিত্তিতে। এরই সাথে তারা আইনসভাগুলির ক্ষমতার সীমা বাড়ানোর দাবী করলেন। এই দৈনন্দিন শাসনের

ক্ষেত্রে তাঁদের প্রশ্ন করার ও সমালোচনার অধিকারের দাবী তারা জানালেন।

১৮৯২ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্টে এই দাবীগুলির মধ্যে কয়েকটি মেনে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু ভোট দেবার অধিকারকে মানা হলো না অর্থাৎ গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রথাকে অস্বীকার করা হলো। মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত তালিকা থেকে সরকারই শেষ মনোনয়ন করতেন। ‘‘সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকবে, পরিষদে বাজেট নিয়ে ভোটাভুটি হবে না, সভ্যরা কোন প্রস্তাব আনতে বা সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারবেন না এবং সর্বোপরি বড়লাটের যে কোন আইন বা রেগুলেশান করার ক্ষমতা থাকবে—এই সব অগণতান্ত্রিক প্রথাও চালু থাকল’’— লিখছেন ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী। তবে বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে তারা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করলেন। এই দাবী প্রথম উত্থাপন করেছিলেন দাদাভাই নৌরজী ১৯০৪ সালে। ১৯০৫-এ গোপালকৃষ্ণ গোখলে আবার এই দাবী জানান। ১৯০৬ সালে ‘স্বরাজ্য’ কথাটির মাধ্যমে দাদাভাই নৌরজী এই দাবীকে আরো জোরদার করে তুললেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আদি জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে তাদের উত্তরসূরীদের লক্ষ্যের কোন পার্থক্য ছিল না। পার্থক্য ছিল পদ্ধতিতে, পার্থক্য ছিল পথে।

১(খ).৫ আদি জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি

আদি জাতীয়তাবাদীদের মডারেট বা নরমপন্থী বলাটাই প্রথাসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের ইতিহাসের প্রথম কুড়ি বছর তাঁরাই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁদের কাজের ধরন ও কায়দার জন্যই তারা নরমপন্থী আখ্যা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের কাজের ধরনের মূল সুরটি নৌরজীর কথায় বলা চলে ‘অ-ব্রিটিশ শাসন’। ব্রিটিশ শাসনকে সরাসরি আক্রমণ করতে তারা চান নি। বরং তারা দেশের জনসাধারণকে আধুনিক রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন আর চেয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ জনমতকে প্রভাবিত করে সংস্কার ও পরিবর্তনের পথ সুগম করতে। স্মারকপত্র ও আবেদনত্রের দ্বারা এই কাজটি তাঁরা করতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ব্রিটিশ কমিটি নামে একটি স্বতন্ত্র কমিটি ১৮৮৯ সালে গঠিত হয়েছিল। ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষ ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রচারকার্য চালানোর জন্য দাদাভাই নৌরজী তাঁর জীবন ও সম্পদের একটি বিরাট অংশ ব্যয় করেছিলেন।

নরমপন্থী নেতাদের ইংরেজদের ন্যায়বিচারের ওপর অগাধ আস্থা ছিল। তাদের নীতিই ছিল আবেদন নিবেদনের। অধ্যাপক সুমিত সরকার তার ‘আধুনিকভারতে’ নরমপন্থীদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, ‘‘বেশীর ভাগ নরমপন্থীর ক্ষেত্রেই রাজনীতি ছিল অনেকটা আংশিক সময়ের কাজ— কংগ্রেস কোন রাজনৈতিক দল ছিল না, ছিল বছরে তিন দিনের এক মেলা। তার দু-একজন সচিব ছিল, আর কিছু স্থানীয় সমিতি। কাগজে কলমে তার সংখ্যা ছিল বিস্তর, আসলে কিন্তু সেগুলো ছোট ছোট ঘোঁট (সাধারণত আইনজীবীদের) ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজেদের মধ্যে থেকে সে বছরের

কংগ্রেস প্রতিনিধি 'নির্বাচন বা কোনো তাৎক্ষণিক অভিযোগ নিয়ে প্রস্তাব পাশ করার জন্যে মাঝে মধ্যে সেগুলোর বৈঠক হতো, না হলে ভোগ করত লম্বা নিশ্চিন্ত শীত ঘুম।''

নরমপন্থীদের সামাজিক বিন্যাসই জন্ম দিয়েছিল এ ধরনের মনোভাবের। ব্যক্তিগত জীবনে নরমপন্থী নেতারা ছিলেন ইংরেজ ভাবিত ও নিজেদের পেশায় অত্যন্ত সফল। তাই ইংরেজদের সম্পর্কে তাদের এক দোলাচল গ্রস্ত মনোভাব ছিল। ইংরেজদের কিছু কিছু নীতির তারা সমালোচনা করতেন বটে কিন্তু সাধারণভাবে ব্রিটিশ শাসন তাদের কাছে ছিল মঙ্গলময় বিধাতার আসীর্বাদ। পেশায় সফল বলে তাদের রাজনৈতিক কাজকর্মের সময়ের অভাব ছিল। বেশীর ভাগ নেতার জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত উঁচুমানের। অনেকসময়েই এ সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ সম্পর্কে তাঁরা অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। ১৮৮৭ তে একবার সুরাপান নিবারণী প্রচারের সময় সুরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, নিচু তলার মানুষেরা একেবারেই বিজাতীয়। ইদানীংকালের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে গোড়ার দিকের কংগ্রেসের পেশাদার বুদ্ধিবত্তিজীবীদের সঙ্গে সম্পত্তিশালী গোষ্ঠীগুলির যোগাযোগ ছিল। অতএব এই নেতৃত্বের পক্ষে র‍্যাডিক্যাল কর্মসূচী নেওয়া সম্ভব ছিল না।

১(খ).৬ নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের দুর্বলতা

কংগ্রেসের মঞ্চে ও কাউন্সিলকক্ষে নরমপন্থীরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণের দিক তুলে ধরেছিলেন। তাঁদের এ সমালোচনা শুধু চরমপন্থী নয় গান্ধীবাদীদেরও চিন্তাধারার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। তবু তাদের দুর্বলতাগুলি অস্বীকার করা যায় না। কংগ্রেসের সংগঠনের ভেতরেই ছিল দুর্বলতার বীজ। শক্তিমান ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের রাজনীতি গড়ে উঠেছিল। তিলকের চারদিকে ও গোখলের চারদিকে যেমন পুনায় আলাদ বৃত্ত গড়ে উঠেছিল তেমনি আলাদ বৃত্ত গড়ে উঠেছিল বোম্বাইতে মেহতা য়োচাকে ঘিরে আবার বাংলায় কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু। প্রাদেশিক ও গোষ্ঠী স্বার্থ বিসর্জনে এরা সকলেই ছিলেন নারাজ। এতে কংগ্রেসের ঐক্যের প্রশ্নটি বিঘ্নিত হয়েছিল। রানাডে সমাজ-সংস্কারকে রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক তথা অচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করতেন। কিন্তু তিলক-এ দুটোকে এক করতে রাজী ছিলেন না। রানাডের দল ১৮৯১ সালে সহবাসবিষয়ক আইনকে সমর্থন জানালে তিলক সংস্কারকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বহু প্রাচীনপন্থী, দেশীয় ভাষায়, শিক্ষিত এমনকি অশিক্ষিত লোকের সমর্থন পেলেন। সমর্থন সম্প্রসারিত করার জন্য তিনি 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তন করলেন। ১৮৯৫ সালে পুনায় কংগ্রেস বসলে চাপেকারদের মত উগ্র তরুণদের সাহায্যে তিনি ন্যাশনাল কনফারেন্স বন্ধ করে দেন।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দুর্বলতা ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের কংগ্রেসের প্রতি অনীহা। প্রথম যুগের নেতাদের ধর্মনিরপেক্ষ তা কিন্তু মুসলিমদের কংগ্রেসের পতাকাতলে আনতে পারে নি। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল তার ফল হয়েছিল বিষময়। আলিগড়

আন্দোলনের হোতা স্যার সৈয়দ আহমেদ জাতীয়তাবাদী নেতা বদরুদ্দিন তায়েবজীকে লিখেছিলেন "এই জাতীয় কংগ্রেস কেবল আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষেই ক্ষতিকর নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর। ভারতকে এক জাতি মনে করে এমন যে কোন ধরনের কংগ্রেসে আমার আপত্তি রয়েছে।" (পড়ুন অমলেশ ত্রিপাঠী, **স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস,** পৃঃ ৪৮) কংগ্রেসকে তিনি একটি হিন্দু সংগঠন বলে মনে করতেন আর তার প্রস্তাবগুলিও তাঁর কাছে ছিল মুসলিমদের পক্ষে ক্ষতিকর।

নরমপন্থীদের তৃতীয় দুর্বলতা ছিল তারা ঔপনিবেশিক শোষণ সম্পর্কে সজাগ হলেও দরিদ্র অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের জন্য কোন সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করতে পারেন নি। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর Bengal 1920-1947 The Land Question গ্রন্থে কংগ্রেসের এই অক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ক্রমাগত দুর্বল হয়ে কংগ্রেস এক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জালে জড়িয়ে পড়েছিল।

১৮৮৫-১৯০৫-এর মধ্যে সরকারের কাছে কংগ্রেসের দাবীদাওয়াগুলি প্রায় সবই নাকচ হয়ে গিয়েছিল বা অতি খণ্ডিতাকারে গৃহীত হয়েছিল। এর ফলে নরমপন্থীদের রাজনৈতিক আদর্শ ও পদ্ধতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ উদারতন্ত্রে তাঁদের ছিল অমোঘ বিশ্বাস। তাঁরা ব্রিটিশ জনচিত্তকে ভারত সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ কাজে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন।

আসলে নিজের দেশের মানুষের চিত্তেই কংগ্রেসের মূল শক্তিশালী ছিল না। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে নরমপন্থীরা ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত উঁচুতলার মানুষ। ইংরেজীতে দেওয়া তাঁদের বক্তৃতা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। এ ছাড়া ১৮৯৯ সালের আগে কংগ্রেসের কোন গঠনতন্ত্র ছিল না। কোন নিয়মিত আয়েরও ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৯৭-র অধিবেশনে শেষে অশ্বিনী দত্ত কংগ্রেসকে "তিনদিনের তামাশা" আখ্যা দিয়েছিলেন। তিলক বারবার নতুন গঠনতন্ত্র দাবি করছিলেন। এ সব তথ্য বড়লাটের অজ্ঞাত ছিল না। ১৯০০ সালের ১৮ই নভেম্বর কার্জন ভারতসচিব হ্যামিলটনকে লেখেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্রেস ভেঙ্গে পড়ছে এবং ভারতে থাকাকালীন আমার উচ্চাকাঙ্খা হবে তার শান্তিপূর্ণ মরণে সাহায্য করা।"

১(খ).৭ জাতীয় আন্দোলনের আদিপর্বে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি সরকার প্রথমে খুব একটু বিরূপতা প্রকাশ করেন নি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন কিছু কিছু সুবিধা দিয়ে জাতীয় নেতাদের তারা স্ববশে রাখতে পারবেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি কংগ্রেসের রাজনৈতিক বার্তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছোনোর জন্য একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ, তার শোষণের বীভৎস মুখ উদঘাটিত হচ্ছিল জনসাধারণের কাছে। এর গুরুত্ব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ খুব সহজেই ধরতে পেরেছিলেন। ১৮৮৬ সালে,

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে ডাফ্‌রিন লিখেছিলেন, "এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই সংবাদপত্রগুলি যারা পড়ে তাদের দৃঢ় ধারণা জন্মাবে, আমরা সমগ্র মানবজাতির এবং বিশেষ করে ভারতবাসীর শত্রু।"

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এর পর থেকেই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে লাগলেন। "দেশদ্রোহ সৃষ্টির কারখানা" বলে তারা কংগ্রেসকে বর্ণনা করলেন। ১৮৮৭ সালে ডাফ্‌রিন একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় কংগ্রেসকে "দেশের জনসংখ্যার এক অতি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধি" বলে অভিহিত করলেন।

এমতাবস্থায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের বিভাজন ও শাসননীতিকে আরো জোরদার করে কাজে লাগাতে চাইলেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান রচনার কাজটি তারা খুব ভালোভাবেই করতে লাগলেন। মদত জোগালেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান ও রাজা শিবপ্রসাদের মত ব্রিটিশ অনুগতদের। অন্যভাবেও তারা এই নীতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। "নব্য বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীগুলিকে উত্তেজিত করে, এক প্রদেশের বিরুদ্ধে অন্য প্রদেশকে ক্ষেপিয়ে তুলে, আর জাতি ও সামাজিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিরোধের বীজ রোপণ করে 'শাসন ও বিভাজনের' চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ।" জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ সৃষ্টি করারও চেষ্টা করেছিলেন তারা। কখনোও সুযোগ সুবিধা দিয়ে দলে টানা কখনোও বা অত্যাচারের ভয় দেখানো—এই ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া। ভারতবাসীদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে ভাইসরয় এলগিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, "অসির সাহায্যে আমরা ভারত জয় করেছি, অসি দিয়েই তাকে শাসন করব।" নানারকম আইন পাস করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছিল এবং পুলিশ ও শাসক সম্প্রদায়ের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রসারকে রোধ করার জন্য শিক্ষার ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৩ সালে এডুকেশন এ্যাক্ট প্রবর্তিত করা হলো। পাশাপাশি তারা মদত দিতে লাগলেন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অধীনে শিক্ষায়তনগুলিকে। অর্থাৎ প্রগতিশীল যুক্তিবাদী শিক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইলেন প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষাব্যবস্থাকে। সরকারী এই বিরূপতার মধ্যে আদি জাতীয়তাবাদীদের পথ তৈরী করতে হয়েছিল তাই তাদের সাফল্য ছিল সীমিত।

১(খ).৮ আদি জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ

আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা তাদের 'ভিক্ষুকসুলভ' নীতির জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হন তাঁদের উত্তরসূরীর কাছে। ১৮৯৩-৯৪ সালে অরবিন্দ ঘোষের লেখা 'পুরনোর বদলে নতুন বাতি' নামে এক প্রবন্ধগুচ্ছে কংগ্রেস 'ভিক্ষাবৃত্তি'কে আক্রমণ করা হয়। অশ্বিনীকুমার দত্ত কংগ্রেসের অধিবেশনকে তিন দিনের তামাশা আখ্যা দেন। রবীন্দ্রনাথও সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন কংগ্রেসের ভিক্ষাবৃত্তিকে। সমালোচকেরা ব্যঙ্গ করে আদি জাতীয়তাবাদীদের রাজনীতিকে "ভীরু এবং উদাসীন" বলেছেন এবং

তার কারণও ছিল। এ কথা সত্যি যে সরকারের কাছ থেকে সুবিধা ও সুবিচার আদায়ের জন্য কুড়ি বছর ধরে তারা যে আন্দোলন করেছিলেন তা প্রায় বিফলই হয়েছিল। লালা লাজপত রায় মন্তব্য করেছেন যে তারা চেয়েছিলেন রুটি আর পেয়েছিলেন পাথরের টুকরো। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদনের নীতিতেই এঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রাজনীতির ধারাও সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়। এককথায় তাঁদের আন্দোলন ১৯০৫-এর আগেই তার গতি হারিয়েছিল।

কিন্তু এ কথা মনে করা কিছুতেই ঠিক হবে না যে আদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোনরকম অবদান ছিল না। মনে রাখতে হবে তাদের দুস্তর বাধার কথা যে বাধাকে অতিক্রম করে তারা অন্তত একটা কথা মানুষকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদাই তাদের একমাত্র শত্রু। এই চেতনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন এক জাতীয়ত্ববোধে। তাঁদের প্রচারের জন্যই দেশের মানুষ পরিচিত হতে পেরেচিলেন আধুনিক রাজনীতির তত্ত্ব ও চিন্তাধারার সঙ্গে।

তাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণের দিকটি তুলে ধরা। এই উদ্দেশ্যে তাদের মোটামুটি সফল হয়েছিল। নরমপন্থী কংগ্রেসের অবদান সম্পর্কে বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠি ও বরুণ দের "স্বাধীনতা সংগ্রাম" গ্রন্থে সুন্দর করে আলোচনা করা হয়েছে। "১৮৮৫-১৯০৫ এ যুগ ছিল জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনের যুগ। আদি জাতীয়তাবাদীরা সে ভিত্তি সযত্নেই স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের জাতীয়তাবোধ কোন সংকীর্ণ আবেগ বা চকিত উত্তেজনার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য কোন বিমূর্ত আকর্ষণ বা তমসাচ্ছন্ন অতীতপ্রিয়তার ওপরও তাঁদের নির্ভর করতে হয় নি। তাঁদের জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের অত্যন্ত বাস্তব ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণকে আশ্রয় করে, যার মধ্যে দিয়ে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এ দেশের মানুষ ও ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে প্রধান স্বার্থের দ্বন্দ্ব কোনখানে। এর ফলেই তাদের পক্ষে সর্বোপযোগী একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে পরবর্তী যুগে দেশের মানুষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিলেন।"

তাই অনেক ব্যর্থতা অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে আদি জাতীয়তাবাদীদের আবদানকে অস্বীকার করা যায় না। যে সময়ে যে কালে তারা দেশের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন তার সাফল্য সীমিত হতে বাধ্য। তাঁদের ব্যর্থতার মধ্যেই ভবিষ্যতের মহান সাফল্যের শক্তি লুকিয়ে ছিল।

১(খ).৯ সারাংশ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর মোম্বাই-এর তেজপাল সংস্কৃত কলেজ হলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যারা

নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা সাধারণভাবে 'মডারেট' বা নরমপন্থী বলে পরিচিত। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করা। এই কুড়িবছর ধরে তাদের কর্মপদ্ধতি প্রায় একইরকম ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক কুফলই তাদের আলোচনার মূল বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির অর্থই হচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতিকে পুরোপুরি ব্রিটিশ অর্থনীতির কবলে রাখা। ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতির সমালোচনা করতে গিয়ে তারা যে তত্ত্বটি খাড়া করেছিলেন তা হলো 'নির্গমন তত্ত্ব' বা 'ড্রেন থিয়োরী'। প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে তাঁরা চেয়েছিলেন প্রশাসনে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের অংশগ্রহণ। নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামও কংগ্রেসের আন্দোলনের মূল স্রোতে মিশে গিয়েছিল। আদি জাতীয়তাবাদীদের একটি প্রধান দাবী ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবী। তারা জানতেন যে আইনসভাগুলির বিস্তার ও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে তারা এই দাবীগুলি কার্যকর করতে পারবেন। তাদের নীতি ছিল আবেদন নিবেদনের। ভাষণ ও স্মারকপত্র পেশের মধ্যে তাঁরা তাদের আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। নানা প্রচারের মাধ্যমে তারা ব্রিটিশ জনমতকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন।

নরমপন্থীদের সামাজিক বিন্যাসই ছিল তাদের প্রধান দুর্বলতা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। মুসলিম সমাজ কংগ্রেস থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল। ১৮৯৯ সালের আগে কংগ্রেসের কোন গঠনতন্ত্র ছিল না। কোন নিয়মিত আয়েরও ব্যবস্থা ছিল না।

এ সব দুর্বলতা সত্ত্বেও আদি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তরকে তাঁরাই স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা তাদের উত্তরসূরীদের কাছে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে তাঁরাই দেশের মানুষকে আধুনিক রাজনীতির তত্ত্ব ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। তাঁরাই প্রথমে একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই কর্মসূচীই পরবর্তী যুগে দেশের মানুষকে সংগ্রামের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল।

১(খ).১০ অনুশীলনী

১। পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন—

ক. নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের আদর্শ ও কর্মসূচীগুলি কি ছিল?

খ. নির্গমন তত্ত্বের' অর্থ কি? কি কি প্রকারে দেশের সম্পদ বাইরে চলে যেত?

গ. আদি জাতীয়তাবাদীদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ঘ. নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের দুর্বলতা কি ছিল?

ঙ. সংক্ষেপে আদি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল্যায়ন করুন।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন—

ক. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীর নাম ________________।

খ. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন ____________।

গ. ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতির সমালোচনা করতে গিয়ে আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা যে তত্ত্বটি খাড়া করেছিলেন তা হলো ___________ বা ____________।

ঘ. বেশীর ভাগ নরমপন্থীর ক্ষেত্রেই রাজনীতি ছিল অনেকটা ________ _________ কাজ।

ঙ. কংগ্রেসের সংগঠনের ভেতরেই ছিল ____________ ___________।

৩। সঠিক উত্তরটি (✓) চিহ্ন দ্বারা চিহ্নত করুন—

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৮৩, ১৮৮৫) সালে।

খ. কংগ্রেসের আদি যুগের নেতাদের বলা হতো (নরমপন্থী, চরমপন্থী)।

গ. আদি জাতীয়তাবাদীরা চেয়েছিলেন (পূর্ণস্বরাজ, স্বায়ত্তশাসন)।

ঘ. তাঁদের নীতি ছিল (সশস্ত্র সংগ্রাম, আবেদন-নিবেদনের)।

ঙ. আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা বক্তৃতা করতেন (ইংরেজীতে, হিন্দীতে, বাংলায়)।

৪। একটি বাক্যে উত্তর দিন—

ক. সুসংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে কারা ছিলেন?

খ. বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি কার প্রেরণায় জন্ম নিয়েছিল?

গ. 'ভারতসভা' কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

ঘ. ভারতের সম্পদ লুণ্ঠনের মাধ্যম কি কি ছিল?

ঙ. দাদাভাই নৌরজী ব্রিটিশ শাসনকে কি মনে করতেন?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন—

১। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লিখুন।

২। প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতারা কিভাবে ব্রিটিশ অর্থনীতির সমালোচনা করেছিলেন?

৩। নরমপন্থী নেতারা কি কি দাবী ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন?

স্বল্প কথায় লিখুন—

১। প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুর্বলতা ও সাফল্য সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন।

১(খ).১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। জন ম্যাকলেন, ইন্ডিয়ান ন্যাশানালিজম এ্যান্ড দি আর্লি কংগ্রেস

২। বিপান চন্দ্র, দি রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশানালিজম ইন ইন্ডিয়া

৩। অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)

৪। সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত (Modern India)

৫। অনিল শীল, দি ইমার্জেন্স অব ইন্ডিয়ান ন্যাশানালিজম্

৬। বি. বি. মিশ্র, দি ইন্ডিয়ান মিডল ক্লাসেস দেয়ার গ্রোথ ইন মডার্ন টাইমস্

৭। রজতকান্ত রায়, আরবান রুটস অব ইন্ডিয়ান ন্যাশানালিজম, প্রেসার গ্রুপ্স অ্যান্ড কনফ্লি* অব ইন্টারেস্টস ইন ক্যালকাটা সিটি পলিটিক্স।

৮। নিখিল সুর, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমি

৯। রজনী পাম দত্ত, ইন্ডিয়া টুডে

১০। উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ, অ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম

১১। বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুন দে স্বাধীনতা সংগ্রাম

একক ২(ক) ❑ চরমপন্থা এবং স্বদেশী আন্দোলন

গঠন

২(ক).০ উদ্দেশ্য

২(ক).১ প্রস্তাবনা

২(ক).২ প্রারম্ভিক কথা

২(ক).৩ চরমপন্থার উদ্ভব

২(ক).৩.১ চরমপন্থী আন্দোলনের ভাবাদর্শগত পটভূমি

২(ক).৩.২ চরমপন্থী আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি

২(ক).৩.৩ চরমপন্থী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব

২(ক).৩.৪ চরমপন্থী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ

২(ক).৩.৫ চরমপন্থী আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমি

২(ক).৪ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব

২(ক).৫ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ঃ স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন

২(ক).৫.১ শ্রমিক ও কৃষক বিক্ষোভ

২(ক).৫.২ স্বদেশী আন্দোলনের যুব-সম্প্রদায়

২(ক).৫.৩ স্বদেশী আন্দোলনের সমিতির ভূমিকা—সন্ত্রাসবাদের দিকে মোড়

২(ক).৫.৪ স্বদেশী আন্দোলনের মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকা

২(ক).৬ স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য

২(ক).৭ স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

২(ক).৮ সূরাটে কংগ্রেসের ভাঙন

২(ক).৯ সারাংশ

২(ক).১০ অনুশীলনী

২(ক).১১ গ্রন্থপঞ্জী

২(ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের চরমপন্থার উদ্ভব এবং কংগ্রেসের ভাঙন অর্থাৎ—

- চরমপন্থী আন্দোলনের আদর্শগত পটভূমি।
- চরমপন্থী আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি।
- চরমপন্থী আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমি।
- বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন।
- স্বদেশী আন্দোলনের নানা প্রবণতা।
- সুরাটে কংগ্রেসে ভাঙন।

২(ক).১ প্রস্তাবনা

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। অবশ্য কংগ্রেসের সুচনাকালে তার প্রকৃতি ছিল সীমিত, দ্বিধাগ্রস্ত এবং মৃদু। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাঁরা মডারেট বা নরমপন্থী বলে পরিচিত। ব্রিটিশ সরকারের তারা সমালোচনা করতেন বটে, কিন্তু তাঁদের নীতি ছিল আবেদন নিবেদনের। ব্রিটিশ ন্যায়নীতির উপর তাঁদের অগাধ আস্থা ছিল। ব্রিটিশ শাসনের শোষণের রূপটিকে তাঁরা 'অ-ব্রিটিশ শাসন' বলে ভাবতে পছন্দ করতেন। এ ছাড়া সমাজের উচ্চবিত্ত স্তর থেকে তাঁরা এসেছিলেন বলে জনসমাজ থেকেও তাঁরা কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিলেন। সময় এবং পরিস্থিতির বদলের সঙ্গে সঙ্গে আদি জাতীয়তাবাদী নেতাদের নীতি গতি হারিয়ে ফেলেছিল। তারা ক্রমাগতই সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছিলেন।

২(ক).২ প্রারম্ভিক কথা

আদি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মধ্যে যে দুর্বলতাগুলি দেখা দিচ্ছিল সেগুলিই কংগ্রেসের মূল সমালোচনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কংগ্রেসের সংগঠনের ভেতরেই ছিল দুর্বলতার বীজ। কংগ্রেসের ভেতরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব খুবই প্রকট ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর 'বেঙ্গলী'র সঙ্গে মোতিলাল ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর একটানা ঝগড়া চলেছিল। হিন্দু ও শিখ ধর্মের তিক্ততা পঞ্জাবের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে তীব্র করে তুলেছিল। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের মতে অবশ্য কেমব্রিজ ঘরানার

ঐতিহাসিকরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিষয়টাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেন। কংগ্রেসের আরেকটি দুর্বলতা ছিল। কংগ্রেসের আদি নেতারা মুসলমানদের তাঁদের কর্মকান্ডে আকৃষ্ট করতে পারেন নি। আলিগড় আন্দোলনের হোতা স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের দ্বিজাতি তত্ত্ব পরবর্তীকালে মুসলীম লিগের জন্ম দিয়েছিল এবং মুসলমানেরা কংগ্রেসকে একটি হিন্দু সংগঠন বলেই মনে করতেন। আদি জাতীয়তাবাদী নেতাদের অন্য আরেকটি দুর্বলতা ছিল। তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ নিয়ে কথা বলতেন বটে, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণের জন্য কোনরকম সুষ্ঠু নীতি তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি। এ ছাড়া জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের শিকড় প্রোথিত ছিল না।

এ সকল সীমাবদ্ধ তা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে, আদি জাতীয়তাবাদী নেতারা জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করে সে চেতনার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে পেরেছিলেন। তাঁদের কাজই ছিল রাজনৈতিক বিষয়ে জনসাধারণের কৌতূহলকে জাগ্রত করে তোলা এবং দেশে ও বিদেশে জনমত গড়ে তোলা। হয়তো বাস্তবক্ষেত্রে তাঁরা খুব একটা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি, কারণ শাসনতান্ত্রিক যে সব সংস্কারের দাবীতে তাঁরা আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার মধ্যে শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা সরকারকে উৎসাহিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তারাই এদেশে প্রথম সাংগঠনিক রাজনীতির নানা পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তাঁদের যুগে তাঁরাই ছিলেন প্রগতির অগ্রদূত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তাঁরাই প্রথম নির্মমভাবে সমালোচনা করেছিলেন। রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মধারায় মধ্যপন্থী হলেও অর্থনৈতিকভাবে ভারতবর্ষের দূরাবস্থার কারণ তাঁরা উদঘাটিত করেছিলেন এবং বিদেশী শাসকের প্রকৃত রূপটি উন্মোচন করেছিলেন। তাঁরা আধুনিক সাম্রাজবাদকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। সুতরাং এ কথা পরিষ্কার ভাবেই বলা যায় যে, তাঁদের উদ্যোগকে ভিত্তি করেই পরবর্তী যুগের আন্দোলন সমৃদ্ধতর হয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের এই পথিকৃতদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মধ্যপন্থীদের অন্যতম শেষ মহান প্রতিনিধি গোপালকৃষ্ণ গোখলে লিখেছিলেন ঃ

> "আমাদের ভুললে চলবে না যে দেশের অগ্রগতি এখন যে স্তরে আছে তাতে আমাদের সাফল্য সীমিত হতে বাধ্য। নিরন্তর দুঃসহ নিরাশার গ্লানি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। ভাগ্যবিধাতা মুক্তি সংগ্রামে আমাদের এই স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, নির্দিষ্ট কাজ আমরা যখন শেষ করতে পারব, আমাদের দায়িত্বেরও তখন সমাপ্তি হবে। ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন তাঁরা দেশকে সেবা করবেন তাঁদের সফল সাধনা দিয়ে; আমাদের ব্যর্থতা দিয়ে দেশমাতৃকার আরতি করেই আমরা তৃপ্ত হবো; কঠিন হলেও এই উপলব্ধিতে সান্ত্বনা পাব যে আমাদের ব্যর্থতার মধ্যেই ভবিষ্যতের মহান সাফল্যের শক্তি লুকিয়ে আছে।[১]"

---

১. প্রান্তলিপি—নরমপন্থী সমকালেই সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। তাঁদের ভূমিকাকে কটাক্ষ করা হয়েছে 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি' বা Political mendicancy বলে। বিপানচন্দ্র বলেছিলেন যে ইংরেজ সরকারের কাছে অধিকার ভিক্ষে চাওয়া নিরর্থক। বঙ্কিমচন্দ্রও এই রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। নরমপন্থী নেতাদের মধ্যে গোখলেই এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।

গোখলে আরো বললেন, "আমরা ভিক্ষুক নই এবং আমাদের নীতি ভিক্ষুকজনোচিত নয় "We are not beggars and our policy is not that of mendicancy"—তিনি আরো বলেন, "দেশের স্বার্থের উপর নজর রাখা ও তা রক্ষা করার জন্য বিদেশী দরবারে আমরা জনগণের রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছি।"

সমকালীন সময় ও পরিস্থিতি গুরুত্ব দিলে বোঝা যায় যে, জাতীয়তাবাদী নেতারা এক কঠিন অবস্থার মধ্যেও দিশারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নেতৃত্ব ছিল প্রাচীন ও বৃদ্ধদের হাতে। তাদের সাহসের অভাব থাকাটাই সঙ্গত ছিল। তবুও একটি বৃহৎ আন্দোলনের শুরু তারা করেছিলেন যা, শেষ হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে এইটি আমাদের মনে রাখতে হবে।

২(ক).৩ চরমপন্থার উদ্ভব

উনিশ শতকে শেষ দিকে নরমপন্থী চিন্তাধারার সমালোচনা ক্রমেই সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এর কারণ ছিল নরমপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে এক হতাশা বোধ। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার তার 'আধুনিক ভারতে' বলেছেন যে, "১৮৯০ এর দশকে নরমপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে মোটামুটি সুবিন্যস্ত একটা সমালোচনা গড়ে উঠছিল বিশেষ করে পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদের তিনটি প্রধান ঘাঁটিতে অর্থাৎ বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে।' এই সমালোচনা ছিল দ্বিমুখী। এক, নরমপন্থী নেতাদের ব্রিটিশ জনমতের কাছে আবেদনের 'ভিক্ষুকসুলভ' কৌশলকে নিষ্ফল ও অসম্মানজনক বলে মনে করা হল। দুই, আবেদন-নিবেদনের বদলে নতুন শ্লোগান হল আত্মনির্ভরতা ও গঠনমূলক কাজ। সূচনা হলো স্বদেশী উদ্যোগের। একটি কথা মনে রাখা দরকার। নরমপন্থী বা 'মডারেট' কিংবা চরমপন্থী বা 'এক্সট্রিমিট' উভয়েই ছিল কংগ্রেসের ভিতরকার গোষ্ঠী। অর্থাৎ চরমপন্থা বলতে সাধারণত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ চরমপন্থাকেই বোঝায়, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদকে নয়। নর মপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে আভ্যন্তরীণ চরমপন্থাকেই বোঝায়, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদকে নয়। নরমপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, একটি অ-রাজনৈতিক ধারা যার ধরণ ছিল গঠনমূলক কাজর মাধ্যমে জাতিকে আত্মবিকাশের পথে নিয়ে যাওয়া এবং বিদেশী শাসনকে সোজাসুজি আক্রমণ না করে তাকে উপেক্ষা করা, দুই, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা Passive Resistance এর নীতি যার প্রথম প্রবক্তা হলেন লালা লাজপৎ রায়।[২] তিন, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ যা না স্বাধীনতার জন্য ব্যক্তিহনন বা ষড়যন্ত্রের পথকে বেছে নিয়েছিল। এখানে আমাদের চরমপন্থার পর্যালোচনায় (যার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন) বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ

২. প্রান্তলিপি—"It is seldom realised that amongest the nationalist leaders of India Lal Lajpat Rai was the earliest expeonent of nilitant nationalsism in the country. He was the first spokesman of the doetrine of Passive Resistance. Addressing the twenty first session of the Indian National Congress at Varanasi in 1905 he said : 'That anethod which is perfectly legidmate, perfectly constidutional and perfectly justifiable is the method of passive resistan.— Militant national in India— Bimanbehari Majumdar P 65-66.

ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে চরমপন্থী ভূমিকায় মূল্যায়ন করব।

আগেই বলা হয়েছে যে, নরমপন্থী নেতৃত্ব ক্রমাগতই তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাদের দমনমূলক নীতি চালিয়েই যাচ্ছিল যা কিনা নাগরিক স্বাধীনতাকে খর্ব করছিল। এ ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণ, ভারতীয় সম্পদের বহির্গমন, ভারতের অপরিসীম দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব ভারতীয়দের মধ্যে ক্রমাগতই ক্ষোভের সঞ্চার করছিল। বেকারত্ব ও অমর্যাদা শিক্ষিত ও বুদ্ধি জীবী শ্রেণীর মোহভঙ্গ ঘটিয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে, এই বুদ্ধি জীবী শ্রেণীরাই একসময় ব্রিটিশ শাসনকে 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ' বলে মনে করতেন। অরবিন্দ ঘোষ 'পুরানোর বদলে নরম বাতি' নামে এক প্রবন্ধগুচ্ছে নরমপন্থী রাজনীতির সমালোচনা করেন। কংগ্রেস ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি আক্রমণ করেন এবং মধ্যশ্রেণীর সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের সর্বহারার যোগসূত্র গড়ে তোলার কথা বলেন। অবশ্যই অরবিন্দের কাছে 'সর্বহারার' অর্থ ছিল গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা।

বাংলায় কংগ্রেস সম্বন্ধে মোহভঙ্গ করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। ১৮৯৭-এ কংগ্রেসের অমরাবতী অধিবেশনকে তিনি 'তিন দিনের তামাশা' বলে ব্যঙ্গ করেন। অশ্বিনীকুমার বরিশালে স্কুল শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু তার নিজের জেলায় সমাজসেবার মাধ্যমে তিনি এক অনন্য ধরনের গণসমর্থন গড়ে তোলেন। ১৯০৫ এর স্বদেশী আন্দোলনের দিনগুলিতে বরিশাল একটি বড় ঘাঁটি ছিল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথও কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গের কথা ব্যক্ত করেন। "য়ুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল, দেখেছিলুম জ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে।" য়ুরোপের প্রতি তার এই মনোভাব পর্যবসিত হচ্ছে অন্য এক উপলব্ধিতে যখন তিনি একই প্রবন্ধে[৩] লিখলেন, "ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্য।' কংগ্রেসের ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি ধিক্কার জানিয়েছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন যে কংগ্রেসের আন্দোলন ছিল বাইরের দিকে। "দেশের জনগণের অন্তরের দিকে সে তাকায় নি, তাকে জাগায় নি, স্বদেশের পরিত্রাণের জন্য সে করুণ দৃষ্টিতে পথ তাকিয়ে ছিল বাইরেকার উপরওয়ালার দিকে। পরবশতার ধাত্রীক্রোড়েই তার স্বাধীনতা আশ্রয় নিয়ে আছে, এই স্বপ্ন তার কিছুতে ভাঙতে চায় নি। সেদিনকার হাতজোড় করা দোহাইপাড়া মুক্তিফৌজের চিত্তদৈন্যকে বার বার ধিক্কার দিয়েছি, সে তুমি জ্ঞান"। ভিক্ষাবৃত্তি বর্জন করে তিনি জোর দেন আত্মশক্তির ওপর। স্বদেশী উদ্যোগ ও জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমেই আত্মশক্তির বিকাশ হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। শিক্ষা অথবা রাজনৈতিক কাজ— যে কোন ক্ষেত্রেই তিনি মাতৃভাষা ব্যবহার করাকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে আইরিশ ও অন্যান্য ইওরোপীয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতা

---

৩. প্রান্তলিপি— বিশদভাবে পড়ার জন্য পড়ুন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধটি।

নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন বিবেকানন্দের শিষ্যা মার্গারেট নোবেল বা নিবেদিতা। আরো অনেকেই স্বদেশেই উদ্যোগের কথা বলেছিলেন এবং সেইমতো কাজ করতে চাইছিলেন। ১৮৯৩-এ প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল শুরু করেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্থাপিত করেন তাঁর ডন সোসাইটি।

দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষের জনমানসে এক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ঘটে চলছিল। মধ্যপন্থীদের সংস্কার আন্দোলনের মানুষের মনে আর কোন সাড়া জাগাতে পারছিল না, তাঁদের জায়গায় অভ্যুত্থান ঘটছিল এক নতুন শ্রেণীর নেতার। তাঁদের দাবী আরো চরম ছিল বলে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁরা চরমপন্থী বলে পরিচিত। নরমপন্থী বা মধ্যপন্থীরা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাইরে তাদের প্রভাবকে বিস্তার করতে পারেন নি, এবার চরমপন্থী নেতারা আন্দোলনের ডাক পৌঁছে দিলেন এক ব্যাপকতর সামাজিক পরিধিতে। নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ, ছাত্রসমাজ ছাড়িয়েও কৃষক ও মজুরদের কাছে তাঁদের আহ্বান পৌঁছে গেল।

২(ক).৩.১ চরমপন্থী আন্দোলনের ভাবাদর্শগত পটভূমি

চরমপন্থীদের চিন্তাধারার মধ্যে গড়ে উঠেছিল যাকে উয়েনবী বলেছেন archaism বা অত্যধিক প্রাচীনতা প্রীতি। এই চিন্তাধারাকে অমলেশ ত্রিপাঠি[৪] তিনটি স্তর থেকে দেখেছেন আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। আধ্যাত্মিকভাবে চরমপন্থীরা সনাতন হিন্দুধর্ম খ্রীষ্টধর্মের মুখোমুখি হয়ে যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল তার প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ও হিন্দু ধর্মের মহিমা সম্বন্ধে রামমোহন থেকে অরবিন্দ বেশ ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন। উপনিষদের যুক্তি ও অঘ্যাত্মচেতনা, কর্মোদ্যম ও ফলত্যাগের দিকে তারা জনমানসের মনোযোগকে আকৃষ্ট করেছিলেন। সাংস্কৃতিক ভাবে তাঁরা পশ্চিমী যান্ত্রিক, জড়বাদী এবং স্বাতন্ত্র্যবাদী সভ্যতাকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি সব দিক দিয়েই ভারতের অবদান প্রথম ও শ্রেষ্ঠ। পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছ থেকে ভারতীয়দের আর নতুন কিছু শেখার প্রয়োজন নেই। সেখানকার সংস্কৃতি বস্তুবাদের বিষে জীর্ণ বলে তাঁরা মনে করতেন; অন্যদিকে তাঁরা বিশ্বাস করতেন ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যার ভেষজই পারবে এই জড়বাদী বিশ্বকে পুনরুজ্জীবন দান করতে। তাই রাজনীতিগতভাবে তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতের জাতীয় অস্তিত্বকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে, চেয়েছিলেন নিজেদের সভ্যতার উৎসে ফিরে তাকাতে। পশ্চিমী অনুকরণ নয় ভারতের প্রাচীন আত্মা আবিষ্কারের মধ্যেই রয়েছে মুক্তির পথ। অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পাল বললেন, রাজনৈতিক সমস্যার

৪. প্রান্তলিপি—"A rebound from the mimess fo the west, it (extremism) oscillatred to another extreme — memesses of ancient India Baru of a psycology of fear, it inclucated aggressiveness in tone and temper. Repelled by the inferiority complex of the anglisized Indian, it bred the equality unhealthy superiority complex of the Orghodex Indian."— The extremist Challange, Amalesh Tripathi P.1.

সমাধান না হলে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না, সে সমাধানের জন্য ইংরেজ বহিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী সভ্যতার বহিষ্কারও দরকার।

নরমপন্থা বা মডারেট রাজনীতির নরম সুরের বদলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নিয়ে এল এক কড়া ও আগ্রাসী মনোভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তাঁরা তাদের আকাঙ্খিত জাতীয় বীরকে দেখতে পেলেন। বালগঙ্গাধর তিলক গীতার একটি টীকাভাষ্য লিখলেন। তার ভূমিকাটি লিখলেন অরবিন্দ ঘোষ। লালা লাজপত রায় উর্দুতে শ্রীকৃষ্ণের একটি জীবনী রচনা শেষ করলেন আর অশ্বিনীদত্ত ভক্তিযোগ নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলেন। 'শ্রীকৃষ্ণতত্ব' লিখলেন ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যয়। আবার যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'ভারতবর্ষের আত্মা' বা The soul of India। আবার শুধু ধর্মে নয় ইতিহাসের মধ্যে তাঁরা শিবাজী, রানা প্রতাপ সিংহ, ও গুরু গোবিন্দ সিংহের মধ্যে তাঁদের নায়ককে খুঁজে পেলেন। এই ভাবনা থেকে জন্ম নিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ, আনন্দমঠ, রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী, রমেশচন্দ্র দত্তের রাজপুতজীবন সন্ধ্যা, 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ইত্যাদি রচনা। ১৯০৪ সালে তিলক শুরু করলেন শিবাজী উৎসব।

এ কথা মনে করা হয় যে, চরমপন্থীরা তাদের প্রেরণা পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায়, বিবেকানন্দের শিক্ষায় এবং দয়ানন্দের পাশ্চাত্যবিমুখীতায়। মহাভারত, গীতা ও ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনার উৎস। হিন্দু ধর্মকে বিশ্লেষণ করে তিনি দেখলেন যে বহু দেববাদ ও বিভূতি, দেশাচার ও লোকাচার ধর্ম নয়। "ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশে ও সেই বিকশিত ব্যক্তিত্ব মানবহিতে উৎসর্গে হিন্দুধর্মের সারতত্ব নিহিত। তিনি এর নাম দিলেন অনুশীলন ধর্ম।" ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তিনি দেখলেন সেই পুরুষোত্তমকে যিনি সুকঠিন প্রয়াসে পূর্ণতা লাভ করেছেন এবং মানবহিতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। বুদ্ধ বা যীশুর মত শ্রীকৃষ্ণ সংসার ত্যাগ করেন নি বরং সংসারের দুঃখকে বরণ করেছেন বীরের মত, কর্ম করেছেন নিরাসক্তভাবে। ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য তিনি যুদ্ধ করেছিলেন তাই সে যুদ্ধ ছিল ধর্মযুদ্ধ। নতুন এক কুরুক্ষেত্রের আহ্বান করলেন তিনি, নতুন এক ধর্মযুদ্ধের ডাক দিলেন। তাঁর এই কল্পনা চরমপন্থী ভাবধারার মানুষকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিলক, অরবিন্দ লাজপৎ রায় তো বটেই, ব্রাহ্ম বিপিন পাল ও ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ব্রহ্মব্রান্ধবও এই প্রভাব থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন নি। তাঁর 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত সারা দেশে এক প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি করল। দেশ হলেন 'মা', ভারতবর্ষ হলো ভারতমাতা। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে কালীকে তিনি তার রূপে দেখলেন—'মা যাহা ছিলেন, মা যাহা হইয়াছেন, এবং মা যাহা হইবেন।' 'মা যাহা হইয়াছেন' এর কালী 'হৃতসর্বস্বা তাই নগ্নিকা'। অরবিন্দ এই কালীর মধ্যে দেখলেন ব্রিটিশ শোষিত ভারতকে। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন 'মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার করিতে বসে.....না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়?" বঙ্কিম অবশ্য সত্যানন্দের গুরুর মুখ দিয়ে জড় বিজ্ঞানশিক্ষা প্রসারে ও জাতীয়তাবোধ জাগরণে ইংরেজদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন কিন্তু অরবিন্দ তাতে গুরুত্ব দেন নি। আর বঙ্কিমের দু দশক পর তিলক গীতার যে

ভাষ্য রচনা করেছিলেন তাতে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য ধর্মযুদ্ধে কোন পন্থাকেই তিনি অন্যায় বলে মনে করেন নি। এমন কি 'শিবাজী উৎসব'-এ (১৮৯৭) আফজল খাঁর হত্যাকান্ডকে তিনি কৃষ্ণের উক্তি দ্বারাই সমর্থন করেছিলেন। অর্থাৎ কিনা বঙ্কিমের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে চরমপন্থীরা তাদের চিন্তাধারকে আরো অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

চরমপন্থীদের সামনে স্বামী বিবেকানন্দ অন্য এক আদর্শের পরে স্বপ্ন তুলে ধরেছিলেন। অতীত নিয়ে ভারতবর্ষ যে দিবাস্বপ্নে মগ্ন ছিল তা ভেঙে দিয়ে বিবেকানন্দই শক্তির কথা বললেন, সাহসের কথা বললেন, যা দিয়ে এক ভবিষ্যতের সৌধ গড়ে তোলা যায়। প্রাচ্য ও পশ্চাতের সমন্বয়ের মধ্যে বিবেকানন্দ ভারতের মঙ্গলকে দেখতে পেয়েছিলেন। পশ্চিমের বীর্য, কর্মোদ্যম, সুকঠিন শৃঙ্খলাবোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে দুঃখমোচনের নিরলস প্রয়াসকে তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। আর পশ্চিমে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতবর্ষের সত্য, ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শ। তিনি বললেন, শূন্য উদরে ধর্মাচরণ সম্ভব নয়। তিনি যে ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন তার লক্ষ্য ছিল বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করে আত্মার ব্রহ্মস্বরূপকে ব্যক্ত করা। অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর The extremist challange-এ লিখছেন, "The master left a mission, Diserimination, detachment, devotion should all be geared to one great purpose—awakening and unfolding the divinity in man." শিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি বেদান্তের বাণী ও রামকৃষ্ণের উপদেশ প্রচারের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। উপনিষদের মন্ত্রকে অবলম্বন করে জাতির উদ্দেশ্যে তিনি আহ্বান জানালেন, 'ওঠ জাগো'। প্রবল পৌরুষের কথা তিনি বলেন; বললেন, "আমরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত"। বঙ্কিমের দেশ ছিল কবির কল্পনা। তাতে বিবেকানন্দ দিলেন রক্ত, মাংস, মজ্জা। দেশ কোন বায়বীয় বস্তু নয়, সর্বস্তরের মানুষকে নিয়েই দেশ। বিবেকানন্দের কাছে দেশ হলো তাঁর শৈশবের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের উপবন এবং বার্ধক্যের বারাণসী। এই দেশ দরিদ্র্যের দেশ— তাকে অন্নদান, আরোগ্যদান, জ্ঞানদান করতে হবে। আত্মজ্ঞান আসবে তখনই। বললেন, কোন মানুষ কোন জাতি পরস্পরকে ঘৃণা করে বাঁচতে পারে না। ভারতবর্ষের কাল তখনই ঘনিয়ে এসেছে যেদিন থেকে সে 'ম্লেচ্ছ' কথাটি আবিষ্কার করেছে অন্যের সাথে এক ব্যবধান তৈরী করেছে। এই জাতপাতের বিভেদ দূর করতে পারলেই সৃষ্টি হবে এক মহান শক্তির যে শক্তির কাছে যে কোন বাধাই তুচ্ছ হয়ে যাবে। ভারতীয়দের দুর্বলতাকে কটাক্ষ করে তিনি বললেন, "পৃথিবীতে পাপ যদি কিছু থাকে, দুর্বলতাই সেই পাপ। সবরকমের দুর্বলতাকে বর্জন করো, দুর্বলতাই পাপ। দুর্বলতাই মৃত্যু.......তোমার শরীর, মন, আধ্যাত্মবোধকে যা দুর্বল করে তাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করো। দুর্বলতা জীবনহীনতার, অসত্যের লক্ষণ।" চরমপন্থীরা বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন, উদ্দীপিত হলেন তাঁর উপদেশবাণীতে। বিবেকানন্দ ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে জড়াতে চান নি কিন্তু চরমপন্থীর দুই হোতা অরবিন্দ ও তিলক রাজনীতিতে হিন্দুধর্মকে কাজে লাগালেন। বিপিল পাল বললেন, ভারতবর্ষের রাজনীতি হলো একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বর্তমান। ঈশ্বর যেহেতু অনন্তকালের জন্য

মুক্ত, মানুষের মুক্তিও অনন্তকালের। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার।[৫] অরবিন্দ ও বিপিন পাল দুজনেই বললেন যে, স্বরাজ বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা সবচেয়ে বড় কথা। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না হলে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

চরমপন্থীরা উনিশ শতকের আরেকজন ধর্মীয় নেতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন— তাঁর নাম দয়ানন্দ স্বরস্বতী। রামমোহন ও বিবেকানন্দ বেছে নিয়েছিলেন বেদান্তের ঐতিহ্য, বঙ্কিমের উৎস ছিল গীতা ও ভাগবত, দয়ানন্দ বেছে নিলেন বেদকে। বেদকে তিনি অমোঘ ও অভ্রান্ত বলে মেনে নিলেন অস্বীকার করলেন পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের যে কোন বিবর্তনকে। শুধু বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম নয়, তিনি অদ্বৈততত্ত্ব গীতার ভক্তিবাদ, পুরাণের মূর্তিপূজা সবই বর্জন করেছিলেন। দয়ানন্দের চিন্তাধারায় ইউরোপীয় সংস্কৃতি কোনরকম প্রভাব ফেলতে পারে নি। চরমপন্থীরা ইংরেজদের জাত্যাভিমানের উত্তর দিতে চেয়েছিলেন আর্য শ্রেয়োমন্যতা দিয়ে। এইখানে তাদের গুরু ছিলেন দয়ানন্দ স্বামী। দয়ানন্দের কাছে বেদ ছিল ঈশ্বরের বাণী, তার মধ্যে শুধু আধ্যাত্মিক, জীবনের প্রথম ও শেষ কথা নেই, আছে জড়বিজ্ঞানের সকল তথ্য। বেদ ব্যাখ্যায় ম্যাক্সমুলারকে তিনি অবজ্ঞা করতেন আবার সায়নভাষ্যও সব জায়গায় মানেন নি। তিনি মনে করতেন ঋক্‌বেদ শুধুমাত্র প্রকৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রার্থনা নয়, তা একেশ্বরবাদের প্রথম ও পূর্ণরূপ। তাঁর নিজের মত তিনি প্রকাশ করেছিলেন নিজের রচনা 'সত্যার্থপ্রকাশে'। তাঁর অন্যধর্ম সম্পর্কে এই অসহিষ্ণুতা চরমপন্থীদের চিন্তায় স্থান পেয়েছিল। দয়ানন্দের আর্যসমাজ শুদ্ধি'র মাধ্যমে অ হিন্দুদের হিন্দুত্ব দিতে গিয়ে মুসলিমদের সন্দেহভাজন হলো। পঞ্জাবে আর্যধর্ম ছড়িয়ে পড়ল, লালা লাজপৎ রায় তা বরণ করলেন।

বঙ্কিম, বিবেকানন্দ এবং দয়ানন্দের আদর্শে চরমপন্থীদের যে চিন্তার জগতটি রচিত হয়েছিল তা হলো এক 'আদর্শ ভারতে'র স্বপ্ন। সে আদর্শ ভারতটি কেমন? এই আদর্শ ভারতের ধমনীতে প্রবাহিত হবে আর্যরক্ত এবং হিন্দুধর্মই হবে এই ভারতের ধর্ম। এই আদর্শ ভারতের গৌরবময় ইতিহাস গড়েছেন শ্রীকৃষ্ণের মত অতিমানব ও শিবাজীর মত যোদ্ধা। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব দিক দিয়ে তার অবদান প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ। অরবিন্দ ও বিপিন পালের মতে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মত মহৎ পশ্চিমে কিছু নেই। তবে রাজনীতি ও হিন্দু ধর্মকে একাকার করে ফেলে চরমপন্থীরা অন্য ধর্মের সমর্থন হারালেন।

---

৫. প্রান্তলিপি— বিপানচন্দ্রের বক্তৃতার জন্য পড়ুন 'The New Movement, leature at Madras 1907, Swadeshi and Swaraj.

"It (politics) has its application in social, in economic in political life of the sublime philosophy of the Vadanta. It means the desire to carry the message of freedeom.......and we are to carry out that messafe, to realize that ideal in the social, economic and the political life. What isthe message of the Vedanta ? The message of the Vedanta is the that every man has we their himself, in his own soul as the very root and realization of his own being the spirit of god, and as god is elenally free, self realized, so is every man eternally free and; self-realized. Freedom is mans birth right."

২(ক).৩.২ চরমপন্থী আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি

চরমপন্থী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক মনে করতেনযে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সমাজসংস্কার মিশিয়ে ফেললে গোঁড়া রক্ষণশীলরা কংগ্রেসের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে। তাতে ক্ষতি হবে আন্দোলনের। তিনি চাইলেন ঐতিহ্যপন্থী, ইংরেজী শিক্ষা বঞ্চিত অথচ দেশী ভাষায় শিক্ষিত জনগণের এক বৃহদাংশকে কংগ্রেসে সামিল করতে। সামাজিক ভাবে চরমপন্থীরা তাই হয়ে উঠলেন প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁরা বললেন যে বিদেশী রাজশক্তির আইনের মাধ্যমে যদি সমাজ সংস্কার করা হয় তবে তা বিদেশী রাজশক্তিরই শক্তি বৃদ্ধি করবে। তাই ১৮৯১ সালে তিলক সহবাস বিষয়ক আইনকে সমর্থন জানান নি। তিনি সংস্কারকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ও বহু পুরাতনপন্থী, দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত, এমনকি অশিক্ষিত লোকের সমর্থন পেলেন।[৬]

ঔপনিবেশিক শোষণের ধারা অব্যাহত থাকাতে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিয়েছিল এক হতাশাবোধ। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ না পেয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকেরা ক্রমশঃ সরকারী চাকুরী বা আইন ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকেছিলেন। অনেক উদ্যোগী যুবক আবার সাংবাদিকতাকে তাঁদের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তবে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্র ছিল অত্যন্ত সীমিত। ১৯০৩ সালে সারা ভারতে মাত্র ১৬,০০০ ভারতীয় কর্মচারী ছিলেন যাঁদের মাইনে ৭৫ টাকার বেশি। আইনের ক্ষেত্রেও সাফল্যের সম্ভাবনা কম ছিল আর সাংবাদিকতা তখনও খুব অনিশ্চিত পেশা। সফল ডিগ্রীধারীদের চাইতে পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে এমন যুবকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। চাকুরীর ক্ষেত্রে এরা ছিল যোগ্যতাহীন। এদের মধ্যেই হতাশার ভাব সবচেয়ে বেশী তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সম্পন্ন পল্লীজীবী এবং সাধারণ কৃষকদের মধ্যেও অসন্তোষের হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছিল। মধ্যপন্থীদের সংস্কার আন্দোলন এদের নাড়া দিতে পারে নি। চরমপন্থী আন্দোলনের নেতারা এদের কাছে তাঁদের ডাককে পৌঁছে দিলেন।

২(ক).৩.৩ চরমপন্থী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাইরের জগতে এক পরিবর্তনের হাওয়া বইতে থাকে। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ এ পরিবর্তনে প্রচুর উৎসাহ ও প্রেরণা পেল। ১৮৬৮ র পরে জাপানের এক আধুনিক ও শক্তিশালী জাতিরূপে অভ্যুত্থান হয়। পঞ্চাশ বছরেরও কম সময়ে জাপান গড়ে ওঠে এক শিল্পোন্নত, শক্তিশালী, সামরিক দেশ হিসাবে। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে জাপান বাধ্যতামূলক করেছিল আর তার শাসনব্যবস্থা হয়ে উঠল দক্ষ এবং আধুনিক। পশ্চিমের কোনরকম সাহায্য ছাড়া এশিয়ার একটি ছোট

৬. প্রান্তলিপি— জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে তখনকার চরমপন্থীদের সমাজ প্রগতি বিরোধী ভাবধারার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

দেশের এ হেন উন্নতি ভারতীয়দের মধ্যে এক প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করল। তাই জাপান ভারতীয়দের কাছে হয়ে উঠল এক অননুকরণীয় আদর্শ। ১৮৯৬-এ ইথিওপিয়ার কাছে ইটালীর পরাজয় ঘটল এবং ১৯০৫ এ রাশিয়া হেরে গেল জাপানের কাছে। এ দুটি ঘটনা পাশ্চাত্য শ্বেত জাতি যে অপরাজেয় নয় সে কথা প্রমাণ করল। এদিকে আয়ারল্যাণ্ড, রাশিয়া, মিশর, তুরস্ক এবং চীনে সাধারণ মানুষের মুক্তিসংগ্রাম ভারতবাসীর মনে এক নতুন আশার বানী শুনিয়েছিল। তারা বুঝতে পারল যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে নিজের আদর্শের জন্য প্রচন্ডতম রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়।

২(ক).৩.৪ চরমপন্থী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ

চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বালগঙ্গাধর তিলক, যিনি পরবর্তীকালে লোকমান্য আখ্যা অর্জন করেন। সি. জি. আগারকরের সহযোগিতায় তিনি ইংরেজীতে 'মারাঠা' ও মারাঠীতে 'কেশরী' নামে দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন। তিনি তাঁর সাংবাদিকতার দক্ষতাকে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সমর্থনে দলমত সংগঠিত করতে কাজে লাগিয়েছিল। তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে তিনি জাতীয়তাবাদের বার্তা পৌঁছে দিতেন, উদ্বুদ্ধ করতে তাদের আত্মত্যাগী ও নির্ভীক হতে। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার লিখেছেন যে, ''অনেক দিন থেকে তিলক ছিলেন পথিকৃৎ। যেমন ধর্মীয় গোঁড়ামিকে গণসংযোগের পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার (সহবাস সম্মতি বিষয়ে তিনি জোট বাঁধেন সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে, আর তারপরে ১৮৯৪ থেকে সংগঠিত করেন গণপতি উৎসব), জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রীয় প্রতীক হিসেবে একই সঙ্গে স্বাদেশিক তথা ঐতিহাসিক ভজনা গড়ে তোলা (শিবাজী উৎসব, এটি তিনি সংগঠিত করেন ১৮৯৬ থেকে) এবং এর সঙ্গে ১৮৯৬-৯৭ এ এক ধরনের রাজস্ব বন্ধ অভিযানের পরীক্ষা।'' ভাইসরয় এলিগন যখন ভারতীয় মিলে তৈরী কাপড়ের ওপর শুল্ক বসালেন তিলক তখন ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, 'যদি আমরা বছরে একবার ব্যাঙের মতো গ্যাঙর গ্যাঙর করি তাহলে আমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল হবে।' ১৯০২ এ একটি বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন, ''নিপীড়িত ও অবহেলিত হলেও ইচ্ছে করলে প্রশাসনকে অকেজো করে দেওয়ার ক্ষমতা তোমাদের আছে; নিজেদের সেই ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। তোমরাই রেলপথ ও টেলিগ্রাফ পরিচালনা কর, তোমরাই যারা বসত গড়ো ও রাজস্ব আদায় কর.....।'' 'কেশরীতে' একটি প্রবন্ধে তিলক শিবাজীর হাতে বিজাপুর সেনাপতি আফজল খাঁর হত্যাকে সমর্থন জানান। সব মিলিয়ে তিলক ব্রিটিশ সরকারের উদ্‌বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ান। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে ১৮৯৭ সালে গ্রেপ্তার করা হয়। দুবছরের কারাদন্ডে তাঁকে দন্ডিত করা হয়। কংগ্রেসের সবাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, কারণ এক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রশ্নটি বিপন্ন হয়েছিল। তিলকের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত সারা দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করল। দেশবাসী নতুন জাতীয়তাবাদের প্রতীকরূপে তিলককে স্বীকার করে নিল।

লোকমান্য তিলক ছাড়া আর যারা চরমপন্থী আন্দালনের পথিকৃৎ তাঁরা হলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং লালা লাজপৎ রায়। এদের বিষয়ে পূর্বেই বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এঁদের কর্মসূচীর তিনটি দিক ছিল। এক, তারা চেয়েছিলেন ভারতবাসীকে তাদের হীনাবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হবে এবং এ সংগ্রামের পথ ক্ষুরধারসম তীক্ষ্ণ। তাঁরা তাই তাদের দেশবাসীকে সাহস, আত্মবিশ্বাস ও আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। দুই, বিদেশী শাসনকে তাঁরা ঘৃণা করতেন। স্বরাজ ছিল তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্য। তিন, তাঁরা জানতেন যে তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে গণ আন্দোলনের পথ ধরে তাই তারা আস্থা স্থাপন করেছিলেন জনসাধারণের ওপর।

২(ক).৩.৫ চরমপন্থী আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমি

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পালে যখন চরমপন্থার হাওয়া জোরদার হয়ে বইতে শুরু করেছে তখন ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। উনিশ শতকের শেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এক সংকটের মুখে এসে পড়েছিল। ফরাসী ও রুশ সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও তাকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হতে হয় এবং পশ্চিমে আমেরিকা ও প্রাচ্যে জাপানের মত দুটি প্রবল শক্তির অভ্যুদয় হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এ সংকটের দিনে অনেকের মধ্যে কার্জনও সাম্রাজ্যরক্ষার কাজে এগিয়ে এলেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেসবিরোধী, হিন্দুবিরোধী ও খানিকটা বাঙালী বিরোধী। শাসিতের প্রতি কোন সহানুভূতিই তাঁর ছিল না। ভারতীয়দের চরিত্র, সততা ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল খুব খারাপ। কার্জনের শাসননীতি দেশবাসীর মৌলিক অধিকারে আঘাত হানল।

প্রথমেই তিনি স্বায়ত্তশাসনের অধিকারে হাত দিলেন। কলকাতা পৌরসভা ছিল স্বায়ত্তশাসনের প্রতীক। সুতরাং পৌরসভার গঠনতন্ত্রের ওপর আঘাত করে তাঁর অভিযান শুরু হল কলকাতা কর্পোরেশনে ভারতীয় সদস্যদের সংখ্যা হ্রাস পেল। সদস্য সংখ্যা হল একশতের জায়গায় পঞ্চাশ।

দ্বিতীয় আঘাত পড়ল শিক্ষার ওপর। শিক্ষা সংস্কারের নাম করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাতন্ত্র্য কেড়ে নেওয়া হল। সরকারী কর্তৃত্বকে আরো জোরদার করা হলো। কার্জন যে ইউনিভার্সিটি কমিশন নিয়োগ করলেন তার সুপারিশ হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি তুলে দিতে হবে, আইনের ক্লাস বন্ধ করতে হবে এবং ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। কমিশন আরো বললেন যে সিনেট সদস্যদের কার্যকাল ও সংখ্যা কমিয়ে আনা দরকার। কলেজগুলিকে স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রেও তাঁরা সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়াবার সুপারিশ করেন। শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথের আইন কলেজ টিকে গেল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যা শাসনতন্ত্র ঠিক হল তাতে ইউরোপীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলো। গোখ্‌লে বললেন যে, এই নীতি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী বিভাগে পরিণত হবে। সরকারী শিক্ষাব্যবস্থাকে বর্জন করে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন এই সময় তাই জোরালো হয়ে উঠেছিল।

এরপর কার্জন প্রবর্তন করলেন Official Secrets Amendment Act. এই আইনের বলে অসামরিক গুপ্ত তথ্য প্রকাশনার জন্য সংবাদপত্রকে দণ্ডনীয় করা হয়। কার্জন চেয়েছিলেন গণ সমালোচনার হাত থেকে অত্যাচারী রাজকর্মচারীদের বাঁচাতে। এ নীতি প্রেস স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে তুমুল আপত্তি উঠল। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। চরমপন্থীরা এ সুযোগ ছাড়লেন না।

কার্জনের বিদেশনীতিও ভারতীয়দের সমালোচনার সম্মুখীন হলো। বৈদেশিক খাতে ভারতের অর্থসম্পদ অকাতরে ব্যয় করতেন কার্জন। দিল্লীর দরবারে এবং তিব্বতের অভিযানে তিনি ভারতের অর্থ জলের মতো ব্যয় করেন।

এমনিতেই নানা কারণে অসন্তোষ ঘনীভূত হচ্ছিল। কার্জনের জনবিরোধী নীতি সেইসব অসন্তোষে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সব অসন্তোষ ফেটে পড়ল বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে। ১৯০৩ সালে নানা আলোচনার পর কার্জন ঠিক করেছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত হবে। উড়িষ্যার সম্বলপুর ও গঞ্জাম বাংলার সঙ্গে যুক্ত হবে। ব্রিটিশ প্রশাসনের যুক্তি ছিল যে, এর ফলে আসামের উন্নতি ঘটবে এবং বাংলার ভার কমবে। কিন্তু ১৯০৫ সালে দেখা গেল পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে যে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়েছে তাতে যুক্ত করা হয়েছে চট্টগ্রাম ছাড়াও ঢাকা ও দার্জিলিং বাদে রাজশাহী বিভাগ, ত্রিপুরা ও মালদহ। বাংলায় এর প্রতিক্রিয়া হয় প্রচণ্ড। ব্রিটিশ সরকার এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অস্বীকার করলেও স্বরাষ্ট্র সচিব এইচ. এইচ. বিজলির নোটে ভারত ভারত সরকারের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই নোটে বিজলি বলেন, “সংযুক্ত বাংলা শক্তিশালী। বিভক্ত বাংলা ঐক্যহীন। ......আমাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্রিটিশ রাজত্বের বিরোধী এক সুসংহত দলকে টুকরো করে দুর্বল করে দেওয়া...........একথা খুলে না বলে একটা সরকারী নথিতে এর উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়।”

কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবই চরমপন্থীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিল। সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হবার আগেই ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকা বিদেশী বর্জনের ডাক দিল।

২(ক).৪ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব

কার্জনের দমননীতি ভারতীয় জনসাধারণের কাছে খুবই অপ্রিয় হয়ে উঠছিল। সবচেয়ে অপ্রিয় হলো বঙ্গভঙ্গ। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, কার্জনই বঙ্গভঙ্গের প্রথম প্রস্তাব দেন নি। যখন বাংলা প্রেসিডেন্সি ১৮৫৪ সালে এক স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয় তখনই তার আয়তন ছিল ২,৫৩,০০০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ৪ কোটি ৬০ লক্ষ। ওড়িশার দুর্ভিক্ষের সময় প্রশ্ন ওঠে এতবড় প্রদেশের সুশাসনের জন্য কি করা উচিত। তখনকার বড়লাট জন লরেন্স বললেন যে বাংলার কিছু অংশ, যেমন আসাম ও তার সন্নিহিত জেলাগুলিকে, আলাদা করে দেওয়া যেতে পারে। ১৮৭৪ সালে বাংলাভাষী সিলেট কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাসহ আসাম এক স্বতন্ত্র চীফ কমিশনারের প্রদেশ বলে ঘোষিত হল। কিন্তু কোন

সিভিলিয়ান এই ক্ষুদ্র প্রদেশে যেতে রাজী হল না বলে ১৮৯৬ সালে চীফ কমিশনার উইলিয়ম ওয়ার্ড চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু প্রবল প্রতিবাদের ফলে এ প্রস্তাব কার্যকরী করা যায় নি। তারপর বিস্তর আলোচনার পর ১৯০৩ সালে ঠিক হল চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামে যাবে, ছোটনাগপুর যাবে মধ্যপ্রদেশে, বাংলা পাবে সম্বলপুর ও গঞ্জাম। এতে বাংলার লোকসংখ্যা কমবে এক কোটি নয় লক্ষ, আসাম প্রশাসনের সুবিধা বাড়বে, ওড়িশাবাসীরা এক শাসনাধীনে আসবে। প্রশাসনিক কারণ ছাড়াও বলা হল যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা পূর্ববঙ্গ কলকাতাতর বিপজ্জনক প্রভাব থেকে মুক্ত হবে এবং মুসলিম অধিবাসীদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা সম্ভব হবে। সাম্প্রদায়িকতার সুর এবং ভেদ ও শাসনের নীতি এখানে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। রিজলে মন্তব্য করলেন, ‘‘সংযুক্ত বাংলা, শক্তিশালী। বিভক্ত বাংলা বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হবে। কংগ্রেস নেতারা এই ভয় করছেন। তাঁদের আশঙ্কা নির্ভুল এবং সেটাই এই প্রস্তাবের সবচেয়ে বড়ো গুণ। আমাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্রিটিশ রাজত্বের বিরোধী এক সুসংহত দলকে টুকরো করে দুর্বল করে দেওয়া।’’ কার্জন ঢাকার বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন— মুসলিমদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আলাদা প্রদেশ রচনাই তাঁর লক্ষ্য। রিজলে ও ফ্রেজারের মন্তব্যে ফরিপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলার চরমপন্থী কার্যকলাপের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রশাসনের আশা ছিল বাংলাকে ভাঙলে এদের দমন করার সুবিধা হবে বঙ্গভঙ্গের পূর্ণ প্রস্তাব ১৯০৫ এর ১৯ এ জুলাই ঘোষিত হল এবং ১৬ অক্টোবর তা কার্যে পরিণত করা হল।

২(ক).৫ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন : স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন

সরকারের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে সারা বাংলা তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকায় বঙ্গব্যবচ্ছেরে পরিকল্পনাকে একটি ‘‘গভীর জাতীয় বিপদ’’ বলে অভিহিত করলেন। সকল স্তরের বাঙালী ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে সামিল হলো। জমিদার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, দরিদ্র নগরবাসী এবং ছাত্রসম্প্রদায় সকলেই কমবেশী করে প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হলেন। কার্জন যে ঐক্যের মূলকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন তা আরো পল্লবিত হয়ে উঠল। আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্যোগ ছিল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ মধ্যপন্থীদের হাতে, কিন্তু অচিরেই বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ চরমপন্থীরা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন।

আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় যেহেতু মডারেট নেতাদের নেতৃত্বে ছিল তাঁরা তাদের কৌশলমাফিকই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার লিখেছেন যে, ‘‘১৯০৩-১৯০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন হিসাবে মডারেটদের চিরাচরিত কৌশলের পূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।’’ অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তারা সভা-সমিতি করে তাঁদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। কলকাতা ছাড়াও মফঃস্বলের ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় অসংখ্য প্রতিবাদী সভা-সমিতির অনুষ্ঠান

হয়। ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে ও ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতার টাউন হলে বহু জেলা প্রতিনিধিরা উপস্থিতিতে বড় দুটি সম্মেলন হয়। বাংলার জমিদারদের অনেকে তাঁদের রাজভক্তি দূরে সরিয়ে রেখে আন্দোলনকে সমর্থন জানান। মহারাজা মণীন্দ্রনাথ নন্দী, এমনকি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই প্রতিবাদ সভায় সামিল হন।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অন্ততঃ পাঁচটি বিখ্যাত পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এগুলির মধ্যে বিখ্যাত ছিল ''লর্ড কার্জনকে খোলা চিঠি।'' ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে এটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাগুলিতে বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু মডারেটপন্থীদের সমস্ত আবেদন নিবেদন নীতি ব্যর্থ হয়ে গেল যখন সবকিছু অগ্রাহ্য করে সরকার ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। মডারেটরপন্থীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে সুরু হলো আন্দোলনের নতুন নতুন প্রক্রিয়ার সন্ধান। কৃষ্ণকুমার মিত্রের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সঞ্জীবনী'তে ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কটের ডাক দেওয়া হল। টাউন হলের সভায় সুরেন্দ্রনাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রতিষ্ঠিত নেতারা যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর সেটি গ্রহণ করেন। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ দিবসে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রাখীবন্ধন ও অরন্ধনের আবেদন জানান। এই দিনটি সারা দেশে উদ্‌যাপিত হলো শোকদিবস হিসেবে। সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হলো। রবীন্দ্রনাতের স্বদেশী গানে উত্তাল হলো সারা দেশ। হিন্দু মুসলমানের হাতে, মুসলমানেরা হিন্দুর হাতে ভ্রাতৃবন্ধনের রাখী পরালেন। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল বরিশাল, ময়মনসিংহের মতো মফঃস্বল জেলাগুলিতেও। বারাণসীতে কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে গোখ্‌লে বললেন, বঙ্গভঙ্গ ''নিষ্ঠুর অবিচারের পরিচায়ক''। ''বর্তমান আমলাতান্ত্রিক শাসনের নিকৃষ্টতম দিকগুলি বঙ্গভঙ্গের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। আমলাতন্ত্র মনে করে বিচক্ষণতায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অথচ জনমতের প্রতি তার ঘৃণা অপরিসীম, মানুষের সযত্নলালিত আবেগ, অনুভূতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। শাসিতের স্বার্থের চেয়ে শাসনযন্ত্রের স্বার্থ তার কাছে অনেক বড়ো।''

'স্বদেশী' ও 'বয়কট' সংগ্রামের পদ্ধতি হিসাবে নতুন ছিল না। আমেরিকা, আয়ার্ল্যান্ড ও চীনের সংগ্রামীরা ১৯০৫ এর আগেই এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। ভারতবর্ষেও স্বদেশী ভাবাদর্শ আগেও প্রচারিত হয়েছে। বয়কটের কথাও ১৮৭০ এর দশকে ভোলানাথ চন্দ্র ব্রিটিশ জনমতকে জাগ্রত করার উপায় হিসাবে বলেছিলেন। তিলক ১৮৯৬ এ একটি বয়কট আন্দোলন পরিচালনা করেন। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে আবার স্বদেশী ও বয়কট নতুন ভাবে গুরুত্ব পেল।

স্বদেশী আন্দোলনের ত্রিধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। গঠনমূলক স্বদেশী ছিল তার প্রথম ধারা। নিষ্ফল ও আত্মঅবমাননাকর ভিক্ষাবৃত্তির রাজনীতি বর্জন করে, স্বদেশী শিল্প গ্রামোন্নয়ন ও সংগঠনের মাধ্যমে আত্মসহায়তাকেই গঠনমূলক স্বদেশী বলে বলা হল। রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশীসমাজ' প্রবন্ধে এই গঠনমূলক কাজের কথা বিশদ্ করে বলেছিলেন। আত্মশক্তির উদ্বোধনের কথাই তিনি বার বার করে বলেছেন। তবে বয়কটকে তিনি মনে করতেন 'দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ।' শুধুমাত্র ভাঙন কোনদিনই দেশের কল্যাণ করতে পারবে না তাই আত্মশক্তির ধীর ও অনাড়ম্বর বিকাশের কথাই তিনি বলেছিলেন।

শিক্ষিতজনের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগের মাধ্যম হল মাতৃভাষা— বললেন রবীন্দ্রনাথ। অধ্যাপক সুমিত সরকার তাঁর The swadeshi Movement in Bengal—1903-1908 এ দেখিয়েছেন যে "From July 1905, reliance on self help or atmasakti seemed to have become for a time the creed of whole bengal." এই সময় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের মত স্বদেশী কাপড়ের কল, উন্নত তাঁত, চীনামাটি, চামড়া, দেশলাই ও সাবানের কারখানা, এমনই কি জাহাজ নির্মাণের উদ্যোগ গড়ে ওঠে। স্বদেশী বলতে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নীলরতন সরকার বৃহদাকার ও আধুনিক শিল্পের কথাই বুঝেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে বেঙ্গল কেমিক্যাল স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করেচিলেন তা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথও একটি স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হয়েছিলেন। সবরকম সরকারী বা বৈদেশিক সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি শিল্পমূলধন গড়ে তুলেছিলেন শুধুমাত্র স্বদেশী চাঁদাকে অবলম্বন করে। আজও এই কোম্পানী দেশের গর্বের বিষয় হয়ে রয়েছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও স্বদেশী আন্দোলন এক নতুন প্রাণের জোয়ার এনেছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের কবিতা ও গান এবং অন্যান্য প্রবন্ধাবলী জাতির জীবনে এক আবেগের সঞ্চার করেছিল। স্বদেশপ্রেমের গান রচনা করলেন রজনীকান্ত সেন, মুকুন্দ দাশ প্রমুখ কবিরা। মুকুন্দ দাশের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' বহু সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। নতুন ধরনের সাংবাদিক রচনা প্রকাশিত হতে লাগল।

স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারা 'বয়কট'কে প্রাধান্য দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও গোখলের মত নরমপন্থীরা বয়কটকে একটা সাময়িক এবং রাজনৈতিক হাতিয়াররূপে দেখতেন। গোখলের মতে 'বয়কট কথাটির মধ্যে "অপরের প্রতি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার বাসনা" রয়েছে। বয়কট "নিজেদের মধ্যেই অপ্রয়োজনীয় অন্তর্বিরোধ জাগিয়ে তোলে।" নরমপন্থীরা মনে করতেন যে বয়কট দ্বারা ব্রিটিশ অর্থনীতির ওপর চাপ পড়লেই বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হবে। কিন্তু তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ আরো ব্যাপকভাবে বয়কটের কথা বললেন। বয়কটের মাধ্যমে তারা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ উৎপাদনকেন্দ্র ম্যাঞ্চেষ্টারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা ছাড়াও সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করে তুলতে। তিলক এই বয়কটের নাম দিয়েছিলেন 'বহিষ্কারের যোগ।' তাঁরা বয়কট বলতে শুধু কাপড়, চিনি, নুন বর্জন বোঝেননি, তাঁরা শিক্ষা, বিচার, পৌরসভা, আইন পরিষদ সর্বক্ষেত্রেই একে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। অরবিন্দ এর নাম দিয়েছিলেন 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'।[৭] আবেদন নিবেদন, স্বনির্ভরতা আগ্রাসী প্রতিরোধ এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের থেকে এর প্রকৃতি আলাদা।

৭. প্রান্তলিপি— "The theory of passive resistance acquired its finished form mainly through the writings of Bipinchandra and Aurobindo during 1906-07 'Our method is passive resistenced which means as organised determination to refuse to render any voluntary and honorary service to the government, declared pal in september 1906..........But the classic statement of course came from Aurobindo April 1907-clearly demarcating "passive resistance" from "petidioning", "self development and self help and and also from "aggressive resistance" of armen revolt"—Sumit Sarkar, The Swadesbahi Movement in Bengal—1903-1908.

জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা এই ব্যাপক বয়কটের একটি অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। ‘স্বরাজ লাভ’ করার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার শিক্ষা প্রয়োজন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন সোসাইটি স্থাপন করে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তনের পথ দেখান। অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালে ব্রজমোনহ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সতীশচন্দ্র ডন পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) ও কার্লাইল সার্কুলার (১৯০৫) জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে সক্রিয় করল। স্থাপিত হল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বেঙ্গল ন্যাশানাল কলেজ। নরমপন্থীদের চেষ্টায় স্থাপিত হলো বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। প্রথমটির অধ্যক্ষ হলেন অরবিন্দ। তিন বললেন যে, এ শিক্ষায় যে সাংস্কৃতিক জমি তৈরী হবে তাতে উৎপন্ন হবে স্বাধীনতার ফসল।[৮] ন্যাশানাল কলেজের লক্ষ্য ছিল ভারতীয়দের বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক এবং শিল্পোদোগী রূপে গড়ে তোলা। ছাত্রদের স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত করার জন্য ঠিক হয়েছিল যে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। প্রযুক্তিবিদ্যা শেখার জন্য নেতারা বৃত্তি দিয়ে অনেক ছাত্রকে জাপান পাঠালেন। ক্রমে ক্রমে সারা দেশে অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলো।

বয়কট নিয়ে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মতদ্বৈধতা থাকা সত্ত্বেও কলকাতার টাউন হলের সভায় বয়কট প্রস্তাব পাশ হলে বয়কট আন্দোলন সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকরা বয়কট বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রকাশ্যভাবে শুরু হল ব্রিটিশ পণ্যের বহ্ণ্যুৎসব। যে সব দোকানে ব্রিটিশ দ্রব্য বিক্রী হতো সেগুলোতে স্বেচ্ছাসেবকরা পিকেটিং করতে লাগল। স্বদেশী জিনিস উৎপাদন ও বিক্রিকে কেন্দ্র করেও তুমুল উৎসাহ দেখা গেল। স্বদেশী শিল্পোদ্যোগের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

এই স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্য মোটেই সীমিত ছিল না। বয়কট আন্দোলন সরকারের সঙ্গে সকল সংস্রব বর্জন করার দিকে এগিয়ে চলল। সংগঠিত অসহযোগিতা দিয়ে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অত্যাচারী হাত তাঁরা পঙ্গু করে, চেয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে বিকল করে দিতে।

২(ক).৫.১ শ্রমিক ও কৃষক বিক্ষোভ

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক কৃষকেরাও যোগ দিলেন। চরমপন্থীরা কৃষক ও মজুরি শ্রেণীর মধ্যে সাড়া জাগাতে পেরেছিলেন। সূক্ষ্ম রাজনৈতিক তত্ত্বের চাইতে ‘স্বদেশীর’ কথা তাদের মর্মমূলে পৌঁছল। তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে স্বদেশীর ডাকে সাড়া দিল। বিহারে চম্পারণে নীল চাষীরা বিদ্রোহ করল। আসাম ও ময়মনসিংহেও কৃষক বিক্ষোভ দেখা দিল। বরিশালের মুসলমান চাষীদের আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। শ্রমিক আন্দোলন এইসময় এমনই তুঙ্গে ওঠে যে ইঙ্গ ভারতীয়

৭. প্রান্তলিপি— সুমিত সরকার তাঁর আধুনিক ভারতে লিখেছেন “অবশ্য ছাত্রসম্প্রদায়ের বড় অংশকে জাতীয় শিক্ষা আকর্ষণ করতে পারে নি, কারণ তাতে চাকরীর সম্ভাবনা ছিল নগণ্য।”

পত্রিকা ‘পায়োনিয়ার’ ২৭ আগষ্ট ১৯০৬ প্রবল অসন্তোষের সঙ্গে লেখে যে, রাজনীতিবিদ মনের খুশীতে বঙ্গবিভাগের ব্যাপারে বা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারেন। কিন্তু যখন তিনি অজ্ঞ শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন করেন......সমগ্র প্রদেশের মঙ্গলকে বিঘ্নিত করেন.......তখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সরকারের নিজেকে জানান দেওয়ার সময় হয়েছে। ধর্মঘট হলো প্রেসে, গড়ে উঠল মুদ্রাকরদের উিনিয়ন, ১৯০৬ এর জুলাই মাসে পুর্বভারতীয় রেলপথের কেরানী ধর্মঘটের থেকে গড়ে উঠল রেলপথকর্মী ইউনিয়ন। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ এর মধ্যে চটকলগুলিতেও প্রায়শই ধর্মঘট হয়। কিছু কিছু চরমপন্থী পত্রপত্রিকা রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের রুশীয় পদ্ধতির বিরাট সম্ভাবনা সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা করছিল। তবে এ ধর্মঘটগুলি প্রকৃতপক্ষে কোনটাকেই রাজনৈতিক ধর্মঘট বলা যায় না। ‘‘স্বদেশীদের যোগাযোগ বেড়েছিল মূলত কেরানীদের, বা খুব বেশী হলে, বাঙালী চটকল শ্রমিকদের সঙ্গে।’’ ১৯০৮ এর পর শ্রমিকদের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীরা হঠাৎই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

২(ক).৫.২ স্বদেশী আন্দোলনে যুবসম্প্রদায়

দেশের যুবসম্প্রদায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান দায়িত্বটি বহন করেছিল। দেশ জুড়ে তাদের উদ্দীপনা সংগ্রামের বাণঈকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ‘সন্ধ্যা’ ‘যুগান্তর’ ‘কেশরী’ প্রভৃতি চরমপন্থী পত্রিকাগুলি তাদের আরো উৎসাহিত করতে লাগল। যে যুবসম্প্রদায় ও ছাত্রসমাজ তীব্র নৈরাশ্যে দিন কাটাচ্ছিল তারাই প্রতিটি শহরে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলল। ‘‘মাথায় হলদে পাগড়ি, গায়ে লাল সার্ট’’ এই সাজে সজ্জিত হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক সরকারী স্কুল, কলেজ এবং অফিস বর্জন করে বেরিয়ে এল, কণ্ঠে তাদের স্বদেশী গান আর বন্দেমাতরম ধ্বনি।’’[৯] সরকারের দমননীতির কশাঘাত তাদের ওপরই তীব্রভাবে পড়ল। ছাত্ররা সরকারী বযত্তি বা সরকারী চাকরির সুযোগ হারাল। সারা পূর্ব বাংলা এবং আসাম জুড়ে চলল এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। ছাত্রদের ভাগ্যে জুটল জরিমানা, বহিষ্কার, এমনকি নিদারুণ শারীরিক প্রহার। এই দমননীতির ফলই পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে গিয়ে দাঁড়াল।’’

২(ক).৫.৩ স্বদেশী আন্দোলনের সমিতির ভূমিকা-সন্ত্রাসবাদের দিকে মোড়

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার জেলাগুলিতে বহু সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতিগুলি নানা ধরনের কাজে যুক্ত ছিল। সমিতিগুলিতে শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হতো, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও উৎসবের সময় সমিতির সদস্যরা সক্রিয় ভাবে সমাজ সেবায় অংশ গ্রহণ করত ও নানারকমভাবে স্বদেশে স্বাদেশিকতার বাণী প্রচার করত। ১৯০৭ এ পুলিশের খবর অনুযায়ী কলাকাতায় ১৯টি সমিতি ছিল। পূর্ববঙ্গে গড়ে উঠেছিল কিছু সমিতির যারা পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদের পথ নেয়। সমিতিগুলির মধ্যে বরিশালের ‘স্বদেশ বান্ধব’ ফরিদপুরের ‘ব্রতী’, ঢাকার ‘অনুশীলন’ ও ‘যুগান্তরে’র নাম উল্লেখযোগ্য।

৯. প্রান্তলিপি— বিশদ বিবরণের জন্য পড়ুন ‘স্বাধীনতা সংগ্রাম’ বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠি, বরুন দে।

এই সমিতিগুলির কাজের মধ্যে নানা বৈচিত্র্যও ছিল। কলকাতাভিত্তিক সার্কুলার বিরোধী সমিতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, বরিশালের স্বদেশবান্ধব সমিতির নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত তার জেলায় হিন্দু ও মুসলমান চাষীদের মধ্যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। পুলিনবিহারী দাস প্রতিষ্ঠিত ঢাকা অনুশীলন গুপ্ত প্রশিক্ষণে সদস্যদের শিক্ষিত করে তুলেছিল। সুমিত সরকার আধুনিক ভারতে লিখছেন, ..."১৯০৮ পর্যন্ত সমিতিগুলির একটা বড়ো অংশের মুখ্য কাজ ছিল গণসংযোগ, কখনও কখনও তা আবার নানান ধরনের খুবই কল্পনা ঋদ্ধ মাধ্যম গ্রহণ করেছিল, শুধুই প্রচুর পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা বা ভাষণ নয়, তার সঙ্গে ছিল দেশাত্মবোধক গানের বন্যা, নাটক ও যাত্রার মতো লোক মাধ্যমের ব্যবহার। বিভিন্ন উৎসবের ব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় বাগ্‌রীতির পরিচর্চা।" তবে ক্রমশই জনসাধারণের কাছে পৌঁছনোর জন্য হিন্দুধর্মকেই ব্যবহার করা হতে লাগল।

তবে ১৯০৮-০৯-এর মধ্যেই পুলিশী নির্যাতনের জন্য প্রকাশ্য সমিতিগুলি প্রায় লুপ্ত হলো। অনুশীলন ও যুগান্তর বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিলো। অরবিন্দ তাঁর ভাই বারীন্দ্রের এবং যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে কলকাতায় অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।[১০] সমিতিগুলিকে তিনি জাতির গৌরব বলে আখ্যা দিলেন (The glory of our national life for the last three years) এবং সমিতিগুলি শরীর শিক্ষার ওপর জোর দিলেন। ধীরে ধীরে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রথম বিপ্লবী প্রজন্মের মধ্যে হেমচন্দ্র কানুনগোকে এক অনন্য নাম বলা যেতে পারে। ১৯০৮ এ বিদেশ থেকে সামরিক শিক্ষা নিয়ে তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন। স্থাপিত হয়েছিল মানিকতলার বাগান বাড়িতে একটি বোমার কারখানা। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর হাতে কেনেডী হত্যার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অরবিন্দ সমেত গোটা দলই ধরা পড়ল। পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে ঢাকা অনুশীলন আরো অনেক বেশী করে সংগঠিত ছিল। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে খুব বেশী করে প্রভাবিত করেছিল। "দেশাত্মবোধক গানের সম্পদ ও অন্যান্য যথেষ্ট পরিমান সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব ছাড়াও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদই শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল স্বদেশী বাঙলার সবচেয়ে মূল্যবান অধিকার।" সুমিত সরকার 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটিকে সমর্থন করেছেন কারণ এই বিপ্লবী আন্দোলন কখনই নাগরিক গণ অভ্যুত্থান বা গ্রামাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধের রূপ নেয় নি। "অত্যাচারী রাজকর্মচারী বা বেইমানদের খতম করা, তহবিল জোগাড়ের জন্য স্বদেশী ডাকাতি আর খুব বেশি হলে, ব্রিটেনের বিদেশী শত্রুদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশায় সামরিক চক্রান্ত—বিপ্লবী আন্দোলন এইসব রূপ নিয়েছিল।"

বাংলার এই চরমপন্থী আন্দোলনের জোয়ার পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র এবং মাদ্রাজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবে বাংলার অনুকরণে বিলাতী কাপড় ও বিলাতী পণ্যদ্রব্যের বয়কট কিছুকাল চলে। অজিত সিং

---

১০. প্রান্তলিপি— 'The best conemporary analysis of the origins of the samitis-certainly the most significant organisation contribution of the swadeshi age-was made by Aurobind in a specie at Howrale in 1909"— The Swadeshi Movement in Bengal— 1903-1908. Sumit Sarkar.

(যিনি আঞ্জুমান-ই-মোহিবান-ই-ওয়াতন নামে একটি সংগঠন লাহোরে স্থাপন করেছিলেন) বাঙালী চরমপন্থীদের একাংশের পথে চলে যান। সরকার লাজপৎ ও অজিত সিংকে দীপান্তর পাঠালে, দমন নীতির সঙ্গে অর্থনৈতিক সংস্কার চালু করায় পাঞ্জাবে আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে।

মহারাষ্ট্রে তিলক এই সময়ে বিলাতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব শুরু করেন। তাঁর উদ্যোগে বোম্বাই-এ মদের দোকান প্রভৃতিকে ১৯০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দে পিকেটিং করা শুরু হয়। বাংলায় সন্ত্রাসবাদের সমর্থনে কেশরী পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে তিলককে সরকার ছয় বছর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করলে শ্রমিকরা দাঙ্গা হাঙ্গামা ও ধর্মঘট দ্বারা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বোম্বাই এর দোকান পাট স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়। মহারাষ্ট্রের নাসিক ও শোলাপুরে প্রচণ্ড দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধে। এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে, মহারাষ্ট্রের আন্দোলনের পিছনে বেশ ভালোরকমই গণসমর্থন ছিল।

মাদ্রাজেও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে অন্ধ্র এবং মাদ্রাজে প্রতিবাদ সভা হয়। বিপিন পাল অন্ধ্র ও মাদ্রাজ ভ্রমণ করার পর এই আন্দোলন আরো প্রবল হয়। ছাত্রেরা "বন্দেমাতরম" লেখা জামা পরে প্রতিবাদ জানায়। স্বদেশীর প্রভাবে তেলেগু সাহিত্য নবজীবন পেল। কিন্তু মাদ্রাজের চিদাম্বরম পিল্লাই এবং অন্ধ্রের হরিসর্বোত্তম রাও গ্রেপ্তার হলে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। চরমপন্থীরা বাংলার মতই সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নেন।

২(ক).৫.৪ স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকা

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় অংসখ্য মুসলমান নাগরিক এগিয়ে এসেছিলেন। পাটনার লিয়াকৎ হোসেন বয়কটের চিন্তাধারার অংশীদার ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়ার রেলওয়ের ধর্মঘটেরও তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। বরিশালের সভার সভাপতি ছিলেন আবদুল রসুল। আইনজীবী আবদুল হালিম গজনাভি স্বদেশী শিল্পের উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। ব্রিটেনে তৈরী চামড়ার জিনিস বয়কট করার আন্দোলন তিনিই পরিচালনা করেন। বাংলার বাইরে বিপ্লবী রাজনীতি ছড়িয়ে দেবার কাজে অরবিন্দের সঙ্গে মিলিত হন আবুল কালাম আজাদ। তবুও এই সময়েই মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল। যদিও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা বারবারই বলা হচ্ছিল এবং হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রেরা এক স্মরণীয় শোভাযাত্রা ১৯০৫ এ করেছিল। আন্দোলনে মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও ব্রিটিশের বিভেদ ও শাসন পদ্ধতিই সফল হয়েছিল। মুসলমানদের ব্রিটিশরা বোঝাতে পেরেছিল যে নতুন প্রদেশ মানেই আরো বেশী চাকরি, আরো বেশি মুসলমানদের জন্য সুবিধা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন মানেই হিন্দুদের আন্দোলন, এ থেকে দূরে থাকাই মুসলমানদের বাঞ্ছনীয়, ইংরেজদের এই টোপ মুসলমানরা খুব সহজেই গ্রহণ করল। হিন্দু মুসলমানের বিচ্ছিন্নতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যখন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহার নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে মুসলমানদের একটি পৃথক সংগঠন তৈরী হল যার নাম হল মুসলীম লীগ। পূর্ববঙ্গে বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আন্দোলনের ক্ষতি করছিল। অবশ্যই দাঙ্গাকারীদের লক্ষ্য

ছিল হিন্দু জমিদার ও মহাজনেরা। কিছু কিছু মুসলিম প্রচারমূলক লেখাপত্রে জমিদার মহাজন শোষকদের সঙ্গে এক করা হয়েছিল হিন্দুদের।

তবে ১৯০৭-০৮ এ পাবনার প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, দাঙ্গার জন্য শুধু ব্রিটিশদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দেশবাসীকে তিনি সাবধানবানী শোনালেন, "এ কথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইয়া চলিবে না যে, হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোন পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে করিয়াছে.....শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে।" স্বদেশী নেতারা অনেকেই এই ছিদ্রের সমস্যা সমাধান না করে বয়কট জোর করে চাপাতে চেয়েছিলেন।

২(ক).৬ স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য

ঐতিহাসিক সুমিত সরকার তাঁর The Swadeshi Movement in Bengal—1903-1908 এ বলেছেন যে স্বদেশী যুগে যে ভাবধারা ও আদর্শবাদের উদ্ভব হয়েছিল তা ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত দেশবাসীর জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছিল—এটি স্বদেশী যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এই সত্যকে সামনে নিয়ে আসে যে ইংরাজ ও ভারতবাসীর স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। সুতরাং ভারতবাসীর মঙ্গল ইংরেজদের দ্বারা হবে এ ধারণা একেবারেই ভুল। স্বরাজই হবে ভারতবাসীর একমাত্র আকাঙ্খিত দাবী। মডারেটদের সংস্কারপন্থী দাবীতে সন্তুষ্ট না থেকে দেশবাসী স্বরাজ সাধনের দাবীতে তীব্র হয়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে গঠনমূলক স্বদেশীর কথা বলা হয় অর্থাৎ গ্রাম সংগঠন, গ্রামীণ আদালত গঠন, মাতৃভাষায় জাতীয় শিক্ষা, কুটির শিল্পের প্রসার এবং বিলাতী মাল বয়কট ও স্বদেশী জিনিসের প্রতি আগ্রহ, এ সবই ভবিষ্যতের গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ভূমি রচনা করেছিল। সুমিত সরকার বলেছেন যে, গান্ধীজীর আন্দোলনের কলাকৌশলের অভিনব যেটা ছিল সেটি হল অহিংসার বাণী।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালীর যে সৃজনশীলতা, সাহিত্য শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছিল তা এক কথায় অভূতপূর্ব। বাঙলা ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে গবেষণাগ্রন্থ লেখেন দীনেশচন্দ্র সেন। আবার বাংলার রূপকথাকে 'ঠাকুরমার ঝুলি' রূপে প্রকাশ করেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে' রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশকে অবলম্বন করে গানগুলিও এই সময়ে রচিত হয়। স্বদেশপ্রেমকে অবলম্বন করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন ছোট গল্প আর ঐতিহাসিক গবেষণামুলক গ্রন্থ হিসেবে নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজউদ্দৌলা এবং মীরকাশিম উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক চিত্র পত্রিকা এবং রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অক্ষয়কুমার। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ যুগে তাদের অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

স্বদেশীভাবে উদ্দীপিত হয়ে রাধাকুমুদ মুখার্জী, হারানচন্দ্র চাক্‌লাদার রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এবং সমাজবিদ বিনয় কুমার সরকার তাদের রচনাগুলি লিখেছিলেন। আচার্য যদুনাথ সরকার এইসময় তাঁর বিখ্যাত ঔরংজেব রচনা শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যার সম্পাদক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৯০৪ থেকে ১৯১১) ১৯০৭ সাল প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয়। এর সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

পরোক্ষে হলেও স্বদেশী আন্দোলন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার প্রভাব ফেলেছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের প্রাণ ও অনুভব শক্তির প্রমাণ দেন। বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে স্বদেশ প্রেম যুক্ত হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অগ্রণী ব্যক্তিগণ মনে করতেন যে তাঁদের বিজ্ঞান সাধনা বিশ্বসংস্কৃতির জগতে বাঙলার একটি চিরস্থায়ী স্থান করে দেবে।[১১] মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ এইসময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর স্নাতক হন ও পরবর্তীকালে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। শিল্প ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বদেশীয়ানা খুব বড় রকমের প্রভাব ফেলে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও নাটোরের মহারাজার উদ্যোগে ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ স্থাপিত হলে বাংলায় ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চা বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ অনুপ্রেরণা পান ওকাকুরা, নিবেদিতা এবং হ্যাভেলের কাছ থেকে। ইয়োরোপীয় শিল্প বর্জন করে তিনি ভারতীয় শৈলীতে ফিরে আসেন। ভারতের মহান শিল্প ঐতিহ্যকে সামনে তুলে এনেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রাজপুত ও মুঘল শিল্পকলা বা অজন্তার গুহাচিত্র অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীদের প্রেরণা জোগায়। ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য তার গুরুর রীতিকে আরো সমৃদ্ধ করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কোন পর্যায়ই সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এত সমৃদ্ধ ছিল না। এই সময়ে রচিত সঙ্গীতগুলি পরবর্তীকালের আন্দোলনগুলিকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন ধীরে ধীরে তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলে। ১৯০৯ সালে মর্লে মিন্টো সংস্কার কোন গোষ্ঠীকেই খুশী করতে পারল না বরং মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিল। ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ প্রত্যাহার করা হল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অনুপ্রেরণা হয়ে রইল পরবর্তীকালের গান্ধীর আন্দোলনের জন্য। সুমিত সরকার বলছেন যে, নিশ্চিতভাবেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ব্যর্থতা ছিল সাময়িক কারণ ১৯১৮ সালের পর থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনগুলি স্বদেশী দিনের অনেক কলা অনেক কৌশলকেই পুনর্বার ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু অন্তবর্তী বছরগুলিতে আন্দোলনের গতি যে ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল সে কথা প্রশ্নাতীত ভাবেই সত্য।

---

১১. প্রান্তলিপি— অধ্যাপক সুমিত সরকার বলছেন যে এই অগ্রণী ব্যক্তিদের কাছে বিজ্ঞান ও দেশপ্রেম সমার্থক ছিল। তাঁরা সঠিকভাবেই মনে করতেন যে তাঁদের গবেষণা ভারত তথা বাংলাকে বিশ্বসংস্কৃতির মানচিত্রে স্থান করে দেওয়ার কাজে সহায়তা করেছে। এই সচেতনতা আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপে বিস্তারিতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

২(ক).৭ স্বদেশী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

স্বদেশী আন্দোলন থিতিয়ে পড়ার পেছনে অনেকগুলি কারণকে ঐতিহাসিকরা দায়ী করেছেন। অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর ‘Extremist Challange’ গ্রন্থে বলেছেন যে ‘The movement began with a bang and ended with a whimper’ পুলিশী নির্যাতনকে অবশ্যই একটি কারণ হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। বলা হয় যে আন্দোলনকারীরা বেশীদিন পুলিসের অত্যাচার সহ্য করতে পারে নি। সন্ত্রাসবাদীদের কঠোর হাতে দমন করা হয়। সভা সমিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা নেতাদের গ্রেপ্তার ও ফাঁসী, কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর প্রভৃতি শাস্তিদানের ফলে আন্দোলন হীনবল হয়ে পড়ে। তবে পুলিশী অত্যাচারই যে আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ সে কথা বলা যায় না। আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই আন্দোলনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছিল। মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরা বয়কটকে সমর্থন করেন বটে কিন্তু ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণীদের সহায়তা ছাড়া বিলাতী মালের বয়কট সম্ভব ছিল না। অমলেশ ত্রিপাঠী একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখিয়েছেন যে, বয়কট আন্দোলন আদপেই বিলাতী মাল আমদানীর ওপর ছাপ ফেলতে পারেনি। এছাড়া বয়কট আন্দোলন সফল হবার জন্য প্রয়োজন ছিল স্বদেশী দ্রব্যের প্রাচুর্য্য। কিন্তু স্বদেশী প্রচার করলেও যথেষ্ট প্রমাণ তাঁত ও রেশমের কাপড় উৎপন্ন না হওয়ায় সে প্রাচুর্য্য ছিল না। গরীব চাষীদের ওপর জোর করে বয়কট চাপানোর ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা দেখা যায়। কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করে বাংলার বিরাট ছাত্রদের স্থান সঙ্কুলান ও তাদের ভবিষ্যৎ তৈরী করা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছিল চাকুরী লাভের সোপান। বয়কটের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও তাঁর ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হলো, আন্দোলনে ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রাধান্য। কৃষকদের অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে আন্দোলনকে যুক্ত করা হয় নি। কৃষকরা তাই এই আন্দোলনের সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগাযোগ খুঁজে পায় নি। মার্কসবাদীদের মতে আন্দোলনটি ছিল অনেকাংশেই এলিটিষ্ট। এছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের হিন্দু জাগরণবাদের আদর্শ মুসলমানদের ক্ষুন্ন করেছিল ও তারা আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।[১২] মৌলভী আবদুল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন প্রভৃতি নেতারা যারা গোড়ায় স্বদেশী আন্দোলন সহযোগিতা করেছিলেন, তারাও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

চরমপন্থী আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের পথ ধরায় তা গণ সংযোগ হারিয়ে ফেলে। যদিও বিপ্লবীদের মধ্যে সাহস, দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গের অভাব ছিল না। তবুও সন্ত্রাসবাদের ফলে ব্রিটিশ প্রশাসন কখনোই ভেঙে পড়ার মতো বড়ো বিপদে পড়ে নি। চরমপন্থীরা জনতার সংগ্রামকে সংঘটিত করার

১২. প্রান্তলিপি— দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে ১৯০৬এর মে মাসে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জে, কুমিল্লায় (মার্চ ১৯০৭) জামালপুরে (এপ্রিল-মে, ১৯০৭) দেওয়ানগঞ্জ ও বক্সীগঞ্জে।

কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন নি। সংগ্রামের আন্তরিক আহ্বানকে তাঁরা শ্রমিক চাষী বা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন নি। "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং অসহযোগের আদর্শ তাঁদের কাছেও শুধুই ভাববিলাস হয়েই রইল। তাঁদের নেতৃত্বেও এমন কোন সম্ভাবনাময় জাতীয় সংগঠন গড়ে উঠল না, যার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া যায়। তিলক প্রমুখ নেতারাও মনে করতেন যে, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি একমাত্র ধনতান্ত্রিক পথেই সম্ভব, তাঁদের দৃষ্টিও ধনতন্ত্রকে অতিক্রম করতে পারে নি। চরমপন্থীরা তাঁদের পূর্বসূরী মধ্যপন্থীদের চেয়ে একটি ক্ষেত্রে পশ্চাৎপর ছিলেন। এ দেশ যে বহু ধর্ম, বহু জাতি, বহু অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত এ সত্যটি তাঁরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তি সুদৃঢ় হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের আন্দোলনের ভাবাদর্শে ছিল উচ্চ বর্ণ এবং হিন্দুধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। সাম্প্রদায়িকতার যে বীভৎস পরিণতি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিল চরমপন্থীদের ভাবাদর্শ তার জন্য অনেকখানি দায়ী।"

২(ক).৮ সুরাটে কংগ্রেসের ভাঙন

মডারেট বা নরমপন্থী চিন্তাধারার সঙ্গে এক্সট্রিমিস্ট বা চরমপন্থীদের চিন্তাধারার বিরোধ তুঙ্গে ওঠে ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে। নরমপন্থী নেতাদের ব্রিটিশ জাতির ন্যায় বিচারের প্রতি আস্থা অটুট ছিল এবং তাদের দাবী বড়জোর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস অবধি যেত। কিন্তু চরমপন্থীরা স্বরাজ বা স্বশাসনের কথা ভাবতেন। তাঁরা নরমপন্থী চিন্তাধারাকে স্থবির ও বস্তাপচা বলে মনে করতেন। অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কংগ্রেস যেহেতু ছিল নরমপন্থী নেতাদের নিয়ন্ত্রণে সেহেতু চরমপন্থীর তার দখল নেবার চেষ্টা করেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যান। অরবিন্দ, তিলক, লাজপৎ ও বিপিন পাল ছিলেন চরমপন্থীদের মুখপাত্র। প্রথম থেকেই চরমপন্থীরা নরমপন্থীদের সমালোচনা করতে থাকে এবং এ সমালোচনা দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবধান বাড়ায়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাবকে নিন্দা করা হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে গোখলে ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন কিন্তু বিষয় নির্বাচনী সভায় আলোচ্য বিষয়সূচী নির্ধারণের সময় ভয়ানক গণ্ডগোল দেখা যায়। বয়কট ও স্বদেশী প্রস্তাব আলোচনায় নরমপন্থীরা সমর্থন জানালেও প্রস্তাবটি ঘুরিয়ে গ্রহণ করা হয়। চরমপন্থীরা এতে প্রথমে আনন্দ প্রকাশ করলেও বুঝতে পারেন যে, কংগ্রেসে প্রত্যক্ষভাবে বয়কট প্রস্তাব না করালে সর্বভারতীয় স্তরে আবেদন-নিবেদন নীতি চলতেই থাকবে।

চরমপন্থীরা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসে তিলককে সভাপতি পদে বসাতে চাইলেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ মেহতা কুটবুদ্ধি খাটিয়ে সর্বজনমান্য বর্ষীয়ান নেতা দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি করায় চরমপন্থীরা নিরস্ত হন। এই কংগ্রেসে চরমপন্থীরা স্বরাজ, বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাব পাশ

করিয়ে নেন। কিন্তু দাদাভাই নৌরজী স্বরাজের ব্যাখ্যা দেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত্ব শাসন বা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস বলে। বয়কট ও স্বদেশী সম্পর্কেও নরমপন্থীরা এড়িয়ে যাবার মনোভাব দেখান। চরমপন্থীরা যারপরনাই ক্রুদ্ধ হন।

১৯০৭ এর কংগ্রেস নাগপুরে হবার কথা ছিল। কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসে চরমপন্থীদের লড়াকু মনোভাব দেখে ফিরোজ শাহ মেহতা ১৯০৭ এবং কংগ্রেসের স্থল নাগপুর থেকে সুরাটে সরিয়ে নিয়ে যান। নরমপন্থী রাসবিহারী ঘোষকে নির্বাচন করাটাও তিনি ঠিক করেন। একটা মোকাবিলার জন্য দুপক্ষই তৈরী হয়ে আসে। সভাপতি হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ রাসবিহারী ঘোষের নাম সমর্থন করতে উঠলে প্রচণ্ড গণ্ডগোল ও হাতাহাতি এমন কি জুতো ছোঁড়াছুঁড়িও হয়। পুলিশের সাহায্যে অবশেষে শান্তি রক্ষা হয়। নরমপন্থীরা ভোটে জয়লাভ করেন। চরমপন্থীরা কংগ্রেস মঞ্চ ত্যাগ করেন। সংঘাতের জন্য ঠিক কারা দায়ী এ নিয়ে বিতর্ক আছে। লাজপত রায়, তিলক এবং বাঙলায় তার বেশীর ভাগ বন্ধুই সুরাটে অধিবেশনের পরের মাসগুলোয় কংগ্রেসের পুনর্মিলনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বোম্বাই এর নরমপন্থী গোষ্ঠী খুব কঠোর মনোভাব দেখান। ১৯০৮ এর এপ্রিলে এলাহাবাদ কনভেনশনে এই ভাঙন চূড়ান্ত হয়। "যেখানে একটি সংবিধান খাড়া করে কংগ্রেসের পদ্ধতিকে কঠোরভাবে নিয়মতান্ত্রিক বলে স্থির করে দেওয়া হয়, আর প্রশাসনের বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে নিয়মিত সংস্কার সাধনের ভেতরে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো— 'তিন বছরের বেশী স্থায়ী স্বীকৃত সংস্থার মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনকে বেঁধে রাখা হয়। আগামী অধিবেশনগুলি থেকে চরমপন্থীদের বাদ রাখার জন্যই এইভাবে ইচ্ছে করেই সবরকমের চেষ্টা করা হয়েছিল।" আসলে নরমপন্থী নেতারা এইসময় ভারতসচিব লর্ড মর্লের কাছ থেকে শাসন সংস্কারের আশ্বাস পান। তারা মনে করেন যে ইংল্যান্ডে উদারতন্ত্রী দল ক্ষমতায় আসায় তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবীগুলি ব্রিটিশ সরকার শুনবেন।

এই সুযোগে ব্রিটিশ সরকার নরমপন্থীদের কিছু আশ্বাস দিয়ে চরমপন্থীদের ওপর দমননীতি চাপিয়ে দেন। তিলকের ৬ বছরের জেল হয়। অরবিন্দকে মুরারিপুকুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত করায় তিনি অব্যাহতি পাবার পর রাজনীতি ত্যাগ করে পণ্ডিচেরীতে যোগ সাধনায় ব্রতী হন। সুতরাং চরমপন্থীরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েন।

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য "মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কংগ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্ত ভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকিতেন—দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশহিতের সত্যকার সাধনা ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কংগ্রেস সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না।"

অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭) এ লিখছেন ‘‘তবু চরমপন্থীরা একটা কথা প্রাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে, ‘আবেদন নিবেদনের মালা বহি বহি নতশির’ নরমপন্থীদের কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই। এরাই প্রমাণ করলেন শর্তহীন সহযোগিতার নীতি ভ্রান্ত তা মর্লের শাসন সংস্কারের বেশী কিছু আদায় করতে পারে না। তাঁরা বোঝালেন ইংরাজদের কাউন্সিল মায়ার ছলনা, তার মোহে পড়লে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে হয়। তাঁরা দেখালেন ভারতের লক্ষ্য—পূর্ণ স্বরাজ এবং তা অর্জন করতে হবে বীর্য ও মৃত্যুর শুল্কে। নঞর্থক বয়কট ও সদর্থক স্বদেশীর সাফল্য যতই সীমিত হোক, গান্ধীকেও তা গ্রহণ করতে হয়।’’

সুরাটের ঘটনার পর মিন্টো মর্লেকে লিখলেন ‘‘কংগ্রেসের পতন আমাদের পক্ষে একটা বড় জয়।’’ মর্লে তার উত্তরে লেখেন ‘‘আপাত পতন মনে হলেও চরমনপন্থীরাই একদিন কংগ্রেস দখল করবে।’’ কংগ্রেসকে আবার নতুন প্রাণ ফিরে পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরেকজন নেতার যিনি ভারতরে ম্রিয়মান জাতীয় জীবনে এনেছিলেন এক গণ আন্দোলনের জোয়ার। তিনি হলে গান্ধীজী।

২(ক).৯ সারাংশ

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা মডারেট বা নরমপন্থী বলে পরিচিত। ব্রিটিশ ন্যায় নীতির উপর তাদের অগাধ আস্থা ছিল। তাঁদের ‘আবেদন-নিবেদন’ নীতির জন্য ক্রমাগতই তারা সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। তাঁদের দুর্বলতার জন্য তারা সমালোচিত হলেও এ কথা মনে রাখতে হবে যে তারা একটি বৃহৎ আন্দোলন শুরু করেছিলেন যা, শেষ হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে। সমালোচনা যারা করছিলেন তাদের দাবী আরো চরম ছিল বলে তাঁরা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে চরমপন্থী বলে পরিচিত। এই নতুন শ্রেণীর নেতৃত্ব বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দের ভাবাদর্শে জারিত ছিলেন। তাঁদের উদ্ভবের পেছনে কাজ করেছিল কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণও সামাজিক দিক দিয়ে চরমপন্থীরা মনে করতেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন মিশিয়ে ফেলা উচিত হবে না। আর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ব্রিটিশ শোষণ প্রত্যেকের মনেই এক ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। চরমপন্থী নেতারা এই শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিও চরমপন্থীদের প্রভাবিত করেছিল।

চরমপন্থী আন্দোলনের নেতারা ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং লালা লাজপৎ রায়। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বাঙলায় যে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন নামেই পরিচিত। এই স্বদেশী আন্দোলন ত্রিধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। তার প্রথম ধারাটি হল গঠনমূলক স্বদেশী। আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারা বয়কটকে প্রাধান্য দিয়েছিল। জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনাও এই বয়কটেরই অঙ্গ ছিল। আন্দোলন নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদের দিকে মোড় নেয়। এইটি স্বদেশী আন্দোলনের তৃতীয় ধারা। আন্দোলনের সময় শ্রমিক ও কৃষকেরাও

তাদের নিজস্ব দাবীতে মুখর হয়ে ওঠেন। বাংলার এই চরমপন্থী আন্দোলনের জোয়ার পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র এবং মাদ্রাজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনেরসূচনায় অসংখ্য মুসলমান নাগরিক এগিয়ে আসা সত্ত্বেও এই সময়েই মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছিল। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে গঠিত হলো মুসলীম লীগ। পূর্ববঙ্গে বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আন্দোলনের ক্ষতি করেছিল।

তবুও একথা বলা যায় যে স্বদেশী যুগে যে ভাবধারা ও আদর্শবাদের উদ্ভব হয়েছিল তা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশবাসীর জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু চরম দমমনীতির মুখে পড়ে স্বদেশী আন্দোলনকে ধীরে ধীরে তার গতিকে হারিয়ে ফেলেছিল। এর জন্য দায়ী ছিল আন্দোলনের মধ্যকার দুর্বলতা। আন্দোলন মোটামুটি ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের অর্থনৈতিক চাহিদাকে চরমপন্থীরা তাঁদের কর্মসূচীর অন্তর্গত করতে পারেন নি। হিন্দুজাগরণবাদ আন্দোলন থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের পথ ধরার পর তা গণসংযোগ হারিয়ে ফেলল। এই দুর্বলতাগুলি সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে দেশবাসীকে তাঁরা আত্মোৎসর্গ ও দেশপ্রেমের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

নরমপন্থী এবং চরমপন্থী আদর্শের বিরোধ তুঙ্গে ওঠে ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে। সভাপতি হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ রাসবিহারী ঘোষের নাম উত্থাপন করাতে প্রচণ্ড গণ্ডগোল হয়। পুলিশ দিয়ে অবশেষে শান্তি রক্ষা হয়। নরমপন্থীরা ভোটে জয়লাভ করেন এবং চরমপন্থীরা মঞ্চ ত্যাগ করেন। ১৯০৮ এর এপ্রিলে এলাহাবাদ কনভেনশনে এই ভাঙন চূড়ান্ত হয়। সংস্কারবাদীর নরমপন্থীরা অপেক্ষা করেছিলেন ভারতসচিব লর্ড মর্লের কাছ থেকে শাসন সংস্কারের জন্য। তাঁরা মনে করেছিলেন যে ইংল্যান্ডে উদারতন্ত্রী দল ক্ষমতায় আসায় তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবীগুলি ব্রিটিশ সরকার শুনবেন। কিন্তু মর্লে-মিন্টো সংস্কার তাদের হতাশাই বাড়িয়েছিল। মিন্টো কংগ্রেসের পতনকে ব্রিটিশ সরকারের জয় বলে অভিহিত করলেও মর্লে কিন্তু বলেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে চরমপন্থীরাই কংগ্রেস দখল করবে। গান্ধীজীর গণ আন্দোলন কিছু বছর বাদে কংগ্রেসে আবার প্রাণের জোয়ার এনেছিল।

২(ক).১০ উদ্দেশ্য

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন—

১। চরমপন্থী আন্দোলনের ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কে করেছিলেন? জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এই প্রস্তাব কি ভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৩। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কয়টি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য ও সীমাবদ্ধতা কি ছিল?

স্বল্পকথায় লিখুন—

১। স্বদেশী আন্দোলনের শ্রমিক ও কৃষকেরা কি ভাবে সামিল হয়েছিলেন?

২। সুরাট কংগ্রেসে ভাঙনের কারণ কি ছিল?

অনুশীলনী—

১। চরমপন্থার উদ্ভবের কারণগুলি দশটি বাক্যে লিখুন।

২। স্বদেশী আন্দোলনের মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকাকে পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৩। একটি বাক্যে উত্তর দিন—

ক. বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কে করেছিলেন?

খ. চরমপন্থী আন্দোলনের নেতা কারা ছিলেন?

গ. কোন পত্রিকা বিদেশী বর্জনের ডাক দিয়েছিল?

ঘ. 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' কথার অর্থ কি?

ঙ. 'মুসলিম লীগ' কে প্রতিষ্ঠা করেন?

৪। সঠিক উত্তরটি (✓) চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করুন ঃ

ক. বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কোন সালে ঘোষিত হয়েছিল? (১৯০৩, ১৯০৫, ১৯০৭)।

খ. 'ডন' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত)।

গ. জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ ছিলেন (অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক)।

ঘ. সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রভাবিত করেছিল (শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে)।

ঙ. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন (আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অবনীন্দ্রনাথ)

৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন —

ক. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্যোগ ছিল________________প্রমুখ মধ্যপন্থীদের হাতে।

খ. স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারা ____________ কে প্রাধান্য দিয়েছিল?

গ. পার্টনার ____________ বয়কট চিন্তাধারার অংশীদার ছিলেন।

ঘ. স্বদেশী আন্দোলনের সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ____________ ও ____________ রচনা করেন।

ঙ. হিন্দু রসায়নের ইতিহাস রচনা করেছিলেন ____________।

২(ক).১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908— Sumit Sarkar.
2. Modern India— Sumit Sarkar.
3. স্বাধীনতা সংগ্রাম— বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুন দে।
4. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, (১৮৮৫-১৯৪৭)— অমলেশ ত্রিপাঠি।
5. The Extremist Challenge—Amlesh Tripathi.
6. Militant Nationalism in India— Biman Behari Mukherjee.
7. Indias Struggle for Independence— 1857-1947— Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, Sucheta Mukherjee, K.N. Panikkar.
8. গোরা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
9. ঘরে বাইরে— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
10. কালান্তর— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একক ২(খ) ❑ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ

গঠন

২(খ).০ উদ্দেশ্য

২(খ).১ প্রস্তাবনা

২(খ).২ জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা

২(খ).২.১ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি।

২(খ).২.২ সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ভূমিকা

২(খ).২.৩ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ এবং সশস্ত্র বিপ্লব

২(খ).২.৪ প্রথম পর্ব ঃ ১৯০৫-১৯১৪

২(খ).২.৫ দ্বিতীয় পর্ব ঃ ১৯১৪-১৯২০

২(খ).২.৬ তৃতীয় পর্ব ঃ ১৯২০-১৯৩৯

২(খ).৩ সারাংশ

২(খ).৪ অনুশীলনী

২(খ).৫ গ্রন্থপঞ্জী

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

২(খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি ভারতীয় সংগ্রামী বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। আপনি জানতে পারবেন সংগ্রামী বিপ্লব আন্দোলন, বিভিন্ন পর্যায়ে, কীভাবে, কোন সময়ে, কোন অঞ্চলে, কেমন করে আন্দোলিত হয়েছিল।

বিপ্লবীদের চিন্তাভাবনা, আদর্শ, কার্যক্রম, বিভিন্ন বিপ্লবী ব্যক্তিত্বদের কথা, তাঁদের সফলতা ও ব্যর্থতা, বিপ্লবী আন্দোলনে মেয়েদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা এই আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে।

২(খ).১ প্রস্তাবনা

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা। প্রারম্ভিক আলোচনায় কি ভাবে উনিশ শতকের ব্যাপ্তিতে নানা পরিস্থিতি, ঘটনা এবং ব্যক্তিত্বের মতাদর্শের সমন্বয়ে জাতীয়তাবোধ, এবং জাতীয় চেতনা দানা বেঁধেছিল তা বলা হয়েছে।

২(খ).২ জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা

জাতীয়তাবাদ এই সংজ্ঞাটির উদ্ভব হয় উনিশশতকে। একই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের আচার, ব্যবহার, ভাষা প্রচলিত সংস্কার ও সংস্কৃতির সাযুজ্য থেকে একাত্মবোধের অনুভব থেকে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। আবার সেই একাত্মবোধের অনুভব যখন একটি বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চলের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়, অর্থাৎ সেই সব মানুষেরা, যারা একটি ভাষা বা একটি সংস্কৃতি ও একই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে একটি অঞ্চলের মধ্যে পিতৃ পরম্পরায় একত্রিত হয়ে বসবাস করে, সেই অঞ্চলটি ঘিরে তাদের একত্রিত মনোভাবটি এবং সেই একাত্মবোধকে জাতীয়তাবোধ বলা যেতে পারে।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, আরেকটি ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে শুরু হয়েছিল। এখানে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের সরাসরি প্রতিক্রিয়া হিসেবে। এই উন্মেষের দুটি ধারা ছিল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে দেশীয় রাজ্যগুলি এবং দেশীয় শাসক শ্রেণীর দ্রুত পতন ও ইংরেজ শক্তির ক্রমশ উত্থান, ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল। প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবক্ষয়ের ফলে ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কারিগর শ্রেণী থেকে শুরু করে সামান্য চাষী, জঙ্গলবাসী মানুষদেরও অবস্থার শোচনীয় পরিবর্তন ঘটে। পরিস্থিতি যত অসহনীয় হয়ে ওঠে, ততই নিরুপায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, অসন্তোষ, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে দানা বাঁধতে থাকে, এবং আলোড়ন তৈরী করে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে এই ধরনের বিক্ষোভ ও অসন্তোষের প্রকাশ অনেক সময়ে সশস্ত্র লড়াই-এর রূপ নিয়েছিল। বিদেশী শাসন সমস্ত দুরাবস্থার কারণ, এই প্রাথমিক বোধ এবং সেই শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা থেকে একধরনের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল।

দ্বিতীয় ধারার জাতীয়তাবোধ, পশ্চিমী শিক্ষাও সংস্কৃতির সংস্পর্শ থেকে গড়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে শিক্ষিত, আধুনিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম ছিল মানবতাবাদী মূল্যবোধ। নতুন চিন্তাধারার মখপাত্র ছিলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্যরা। এরা প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কারগুলি দূর করার আন্দোলন তৈরী করেছিলেন। আন্দোলনগুলি সফলও হয়েছিল। তারই সঙ্গে নারীশিক্ষা প্রচার ও প্রসার সমকালীন ইওরোপের নতুন নতুন চিন্তাধারাগুলি ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছিল। বাংলা ছাড়াও মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, তামিল অঞ্চলে নানাধরনের সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। আঠারো শতকের ফরাসী বিপ্লবের সাম্যবাদ এবং স্বাধীনতার তত্ত্ব, উনিশ শতকের ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের সাফল্য, শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে উদ্দীপ্ত করে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিক জীবনের আস্বাদে আপ্লুত ও পরিতৃপ্ত মধ্যবিত্ত ভারতীয় প্রথমে ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ইংরেজ শাসকদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে অসমনীতি এবং ঔপনিবেশিকতার রূঢ় বাস্তবতা তাদের সচেতন করে তোলে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসন্তোষ থেকে তৈরী হল রাজনৈতিক সচেতনতা এবং ভারতবর্ষ, ভারতীয়ত্বকে

ঘিরে একাত্মবোধ; এই একাত্মবোধ থেকেই জাতীয়তাবাদের জন্ম হল। কাগজপত্রে লেখালেখি, সাহিত্য রচনা, সংগঠন এবং বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আত্মসচেতন মধ্যবিতত শ্রেণীর প্রতিবাদ গড়ে উঠতে থাকে।

এভাবে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং আন্দোলনের দুটি ধারার মূলে রয়েছে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিরোধিতা এবং স্বাধীনতার স্পৃহা।

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই এর মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের প্রথম অস্ফুট প্রকাশ হয়েছিল বহু আগে থেকেই। ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং ভারতবাসীর স্বার্থের সংঘাতের মধ্যেই আমরা প্রথম ধারার জাতীয়তাবোধ অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়াস দেখতে পাই। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের গোড়ার দিকে এ ধরনের বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন অস্ত্রে লড়াই এর হদিস পাওয়া যায়। ইংরেজ কোম্পানির যথেচ্ছাচার ও শোষণ ভারতীয় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যকে ধ্বংস করেছিল। কৃষক ও কারিগর শ্রেণী থেকে শুরু করে বণিক, ব্যবসাদার, সচ্ছল, সম্পন তালুকদাররাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আদিবাসী, উপজাতি গোষ্ঠীগুলি ও কোম্পানির অর্থনৈতিক শোষণের বাইরে থাকেনি। নিম্নবর্গীয় মানুষের বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল কোম্পানির আমলে, নানা বিদ্রোহ, অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। গোটা আঠারো শতক এবং উনিশ শতকের প্রথম ভাগে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চুয়ার বিদ্রোহ, ভীল বিদ্রোহ, কোল, সাঁওতাল, মুণ্ডাদের লড়াই, অন্যদিকে খরায়েজি, ওয়াহাবি আন্দোলন এমনকি মহাবিদ্রোহের আগের এবং পরের দশকের কৃষক বিদ্রোহগুলি, ও নীল বিদ্রোহকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং মুক্তির সশস্ত্র লড়াই বললে সম্ভবতঃ ভুল বলা হবে না।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে স্পষ্ট এবং পরিণত ধারণা না থাকলেও এই সব আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারীরা অত্যাচারী বিদেশীকে চিহ্নিত করে নিয়েছিল। জাতি, ধর্ম, অঞ্চল এবং ঐতিহ্য এর কোন একটি বা সবটাই নিয়ে একত্রিত হয়েছিল বা একাত্মবোধ করে একজোট হয়ে লড়াই করেছিল। এই সব সশস্ত্র আন্দোলনগুলির মধ্যে আমরা পরবর্তীকালের সশস্ত্র বিপ্লবের পূর্বাভাস পাই। অর্থাৎ অস্ত্রের মাধ্যমে বিদেশী শাসনের অত্যাচারের মোকাবিলা করার চেষ্টা আগেই হয়েছিল, একথা মনে রাখা দরকার।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একটি সর্বব্যাপী আন্দোলন। মহাবিদ্রোহে, জাতীয় চেতনার প্রথম আত্মপ্রকাশ হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৫৭ সালের ১৫ই আগস্ট বেনারস থেকে ষাট মাইল উত্তরে আজমগড় শহরে দ্বিতীয় শাহ আলম বাদশার নামে একটি ঘোষণা পত্র জারি করা হয়। আজমগড় ঘোষণাপত্রে বিদেশী অপশাসনের অপসারণের পর স্বাধীন দেশীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে একই বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রিত করার সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। সাধারণতঃ উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যতের সংগঠনের রূপায়ণের Blue Print নিয়ে জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠে। সুতরাং সেদিক থেকে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ জাতীয় চেতনার প্রথম প্রকাশ এবং স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম বলা যেতে পারে।

উনিশ শতকের প্রথম দুই এবং তিন শতকের আন্দোলনগুলি ও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতীয় সংগ্রামী জাতীয়তা বাদী আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল। পরবর্তী কালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাও এখান থেকে তৈরী হয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষের দিকে নানা ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ঘটনার সমাবেশের মধ্য থেকে সংগ্রামী বা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের ধারা ক্রমশ স্পষ্ট রূপ দিতে থাকে।

অবিরাম অর্থনৈতি শোষণের কারণে উনিশ শতকের শেষাশেষি দারিদ্র, কর্মহীনতা, কৃষি ও শিল্পে অনুন্নতি এবং সর্বব্যাপী হতাশা সর্বভারতীয় চেহারা নিয়েছিল। ইংরেজ শাসনের হিতকারী রূপটি ক্রমশ ভারতীয় মন থেকে সরে যাচ্ছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসনের প্রকৃত স্বরূপ কী তা বুঝে নিতে আর কোন সংশয় ছিল না। এই সময়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলিতে শাসনগত এবং তাত্ত্বিকভাবে শাসনক্ষমতা জোরদার করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্র থেকে শুরু করে আর্থিক, সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদী নীতির দাম্ভিক প্রয়োগ দেখা যায়। পার্কে, রাস্তায়, স্টেশনে, রেলগাড়ীতে কালোচামড়ার প্রতি ঘৃণা এবং শারীরিক নিগ্রহ ঐ সাম্রাজ্যবাদী নীতির বাহ্যিক প্রকাশ ছিল। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে সবল শক্তিমান ও সতেজ স্বাস্থ্যবান ভারতীয় চরিত্র তৈরির প্রয়াস দেখা গেল। অর্থাৎ সবল ইংরেজের সমকক্ষ এমনকি প্রতিপক্ষ সবল ভারতীয় এমন বিন্যাসের আকাঙ্খা তীব্রতর হল।

উনিশ শতকের পরবর্তী অর্থাৎ মহাবিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে প্রধানত বাংলা এবং মহারাষ্ট্রে শরীরচর্চার প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল। ব্যায়ামাগার, এবং আখড়ায় ব্যায়াম ও শরীর চালনার মধ্য দিয়ে সবলদেহ এবং লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, কুস্তি ইত্যাদি নানা অনুশীলনের মাধ্যমে শারীরিক ক্ষিপ্রতা ও অস্ত্রচালনার কুশলতা তৈরী করার প্রয়াস তীব্রতর হয়ে ওঠে। ভারতীয় মনে প্রাচীন কালের শক্তিমান যোদ্ধা, ক্ষত্রিয় ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি আদর্শ হয়ে ওঠে।

১৮৭৫ থেকে ১৮৮৫ সালের মাঝের বছরগুলিতে নতুন রাজনৈতিক প্রবণতা গড়ে উঠেছিল। স্পষ্ট এবং তীব্রতর রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন একদল তরুণ বুদ্ধি জীবী দল তৈরী হয়েছিল—এদের কাছে উনিশ শতকের প্রথমদিকের সংগঠনগুলির প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মনে হয়েছিল এই সংগঠনগুলি ভিত্তি এবং গঠন দুইই সংকীর্ণ ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রও সীমিত। যেমন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন তার আগেকার ব্রিটিশ বিরোধী ধার হারিয়ে ফেলে শুধুমাত্র জমিদার শ্রেণীর সুবিধা রক্ষার ব্যাপারেই আগ্রহী থাকছিল, বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন বা মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশনগুলিও বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলার ফলে ক্রমশঃ গুরুত্ব হারাচ্ছিল। বাংলায় নতুন প্রজন্মের রাজনীতিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন তৈরী করলেন (১৮৭৬)। ১৮৮৪ সালে এম. বীর রাঘবাচারিা, জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, পি. আনন্দবাবলু এরা সবাই মিলে শুরু করলেন মাদ্রাজ মহাজন সভা। ১৮৮৫ নতুন ঘরানার রাজনীতির প্রতিনিধি কে.টি.

তেলাঙ্গ এবং ফিরোজ শাহ মেহতার নেতৃত্বে তৈরী হল বোম্বে প্রেসিডেন্ট এ্যাসোসিয়েশন। এমনকি পুরোনো সংগঠনগুলির মধ্যে পুনা সার্বজনিক সভাও নতুন সংগঠন-গুলির পাশাপাশি বেশ কিছু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু হয়েছিল—দি হিন্দু, ট্রিবিউন, বেঙ্গলি, মারাঠা এবং কেশরী। বাংলা ভাষায় অমৃতবাজার পত্রিকা আগেই প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৮৭৮ সালের সংবাদপত্রের নিষেধাজ্ঞা আইন কার্যকরী হলে অমৃতবাজার রাতারাতি ইংরেজী পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর ও নতুন সাহসী রাজনীতির প্রকাশভঙ্গী বলে মনে করতে হবে।

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও ক্রমশঃ বাড়ছিল। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে লর্ড লিটনের সময়কালে পরপর কতগুলি ঘটনা ভারতীয় রাজনীতির তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়, গতিও দ্রুততর হয়। অস্ত্র আইন, সংবাদ পত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা, দ্বিতীয় আফগান অভিযান উপলক্ষে বিশাল অর্থব্যয়, যা সেই সময়ের দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে অনাবশ্যক এবং নিষ্করুণ বলে প্রতিটি সচেতন ভারতীয়র মনে হয়েছিল। এইসব ঘটনা এবং আশির দশকের চা বাগান সংক্রান্ত আইনগুলি, ও ইলবার্ট বিল উপলক্ষ করে ইউরোপীয় সমাজের প্রতিরোধ, ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাগুলি জাতীয় চেতনাকে সংহত ও তীব্রতর করেছিল। বুদ্ধিজীবীরা একটি সর্বভারতীয় মঞ্চ ও সংগঠনের কথা ভাবছিলেন।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক চিন্তাভাবনায় ভারতীয় জাতির কোন অস্তিত্ব ছিল না। তাদের কাছে ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক উপাখ্যান মাত্র, নানা গোষ্ঠী, নানা জাতির বসবাসের একটি বৃহৎ ক্ষেত্র বিশেষ। রিসলি (H.H. Risley Census Commissioner এবং ethmologist) তার পিপল অফ ইন্ডিয়া (Herbert Risley, The people of India London 1915) ভারতীয়দের এ ভাবেই মনে করেছিলেন। তার মনে বহিরাগত শক, কুষান, আরব, মোগল এই সব বহিরাগত বিদেশীরা এদেশের আদি মানুষদের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে তাদের শক্তি এবং বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে দুর্বল এবং নির্জীব হয়ে যায়। এমন কি রিসলির মতে ভারতীয়দের দুভাগে ভাগ করা যায়, সবল এবং পুরুষোচিত গুণ ও শক্তি সমন্বিত পাঞ্জাবী, পাঠান ও অন্যান্য উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বাসিন্দারা এবং নারীজনোচিত কমনীয়, দুর্বল এবং ভীরু বাঙালী এবং অন্যান্যরা। এভাবে ভারতীয়দের কয়েকটি কাঠামোর মধ্যে আটকে দেওয়ার যে প্রবণতা তৈরী হল, তার প্রতিবাদেই সম্ভবত শরীর চালনা ও ব্যায়ামচর্চার প্রাবল্য দেখা গেল। সুস্থ সবল শরীর এবং নির্ভীক সাহসী মনের তরুণ ভারতীয় তৈরী হবে যারা ইংরেজ শাসনের মুখোমুখি হতে পারবে—এমন ধারণা থেকে নুতন ধরনের সংগঠন তৈরী হচ্ছিল। এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৮৫ সালে শুধুমাত্র ইউরোপীয়ানদের জন্য সংরক্ষিত ভলান্টিয়ার্স কোরে Volunteers Corpe ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি করার জন্য জোরদার আন্দোলন হয়েছিল।

১৮৮৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, বোম্বেতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হল। সর্ববিধ ব্যবধান ও প্রভেদ সত্ত্বেও রিসলির বক্তব্যকে অতিক্রম করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ পরিণত হওয়ার মুহূর্তে পৌঁছেছে এমন তত্ত্ব পাওয়া গেল, বালগঙ্গাধর তিলক এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়। সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন A Nation in Making। জাতীয় কংগ্রেস, সদ্য গঠিত জাতীয়তার মঞ্চ এবং মুখপত্র একাধারে দুই। উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন সর্বভারতীয় ঐক্য এবং জাতীয় চেতনার উদ্রেক করাই হল জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে সকল রকম ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও ব্যবস্থা দূরে সরিয়ে জাতীয় কংগ্রেসকে পুরোপুরি একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। উত্তর আমেরিকার ইতিহাস থেকে কিছু মানুষের সমাবেশ এই অর্থে জাতীয় কংগ্রেসের ধারণা নেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনায় সচেতন করা। বিক্ষোভ, অসন্তোষ এব দাবীগুলিকে একটি সংগঠিত চেহারায় উপস্থাপন করা এবং বক্তৃতা, লেখাপত্র, সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে পরিস্থিতি সম্বন্ধে পরিচিত করা। কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি পার্লামেন্টের মত কাজ করত। আলোচনা, বিতর্ক এবং ভোটগ্রহণের মধ্য দিয়ে সভার কাজ চালনা করা হত।

প্রথম থেকেই কংগ্রেস ছিল একটি আন্দোলন, কোন দল নয়। অক্টাভিয়ান হিউমকে প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকায় প্রয়োজন ছিল এই কারণে, যে হিউমের মত একজন প্রাক্তন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল, না হলে এই আন্দোলন প্রথমেই চেপে দেওয়া হত—হিউম সম্পর্কে গোখ্‌লের এই অভিমত যথার্থ (W. Wedderfurn, Aurn Octavian Hume, PP 63-64, Bipan Chandra and others India is struggl for Independence, P 81)। হিউম এবং অন্যান্য উদারনৈতিক ইংরেজদের উপস্থিতিতে ইংরেজরা কংগ্রেস আন্দোলনকে একটি সীমাবদ্ধ এবং নিরাপদ পরিস্থিতিতে দেখতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস উগ্র এবং অনিয়ন্ত্রিত যাতে না হয়, এবং হিউম কংগ্রেসকে নিরাপদে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, ইংরেজ সরকার যেমন ভাবলেন, তেমনি কংগ্রেসের আদি নেতারা হিউমকে দেখলেন, অগ্নিসংযোগকারী বা উত্তাপ পরিবাহী হিসাবে। অর্থাৎ হিউম এ ধরনের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যতের আন্দোলনের সম্ভাবনা তৈরী করে দিলেন একথা সমসাময়িক নেতারা মনে করেছিলেন।

২(খ).২.১ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার পেছনে কংগ্রেসের প্রথম দিকের কাজকর্মের একটা বড় ভূমিকা ছিল। এছাড়া, দ্রুত পরিবর্তিত, উনিশ শতকের শেষের দুই দশকের সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের চিন্তাভাবনা ও আদর্শ গড়ে ওঠার জন্য দায়ী ছিল। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয়তাবা কেমন চেহারা নেবে, সে বিষয়ে প্রথম দিকের কংগ্রেস নেতাদের কোন স্পষ্ট ধারণা তৈরী হয়নি, তাঁদের সামনে কোন পূর্ব নির্দিষ্ট আদর্শ বা দৃষ্টান্তও ছিল না। ঔপনিবেশিকতাকে মুখ্য প্রতিপক্ষ মনে করে এবং নিজেদের সেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একজোট হওয়া একটি জাতি, এই সংজ্ঞা তৈরী করা আবশ্যকীয় ছিল। ব্রিটেনের শাসন কি ভারতের মঙ্গলের জন্যই? ইংরেজ শাসকপক্ষ এবং ভারতীয় প্রজাবর্গের স্বার্থ কি এক? না কি এর মধ্যে কোন বিরোধ

থাকছে? বিরোধ কি শুধু ভারতের ইংরেজ শাসকেরদের সঙ্গে না কি ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে, কিংবা বৃহত্তর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটার সঙ্গে? ভারতীয়রা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়াই এ পারবে? আর সেই লড়াই কি ভাবে হবে। এই সব নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই প্রথম দিকের নেতাদের কাজ ছিল। উত্তরের সন্ধানের মধ্যে ভুল ত্রুটি হয়েছিল। তবুও মনে রাখতে হবে কংগ্রেসের প্রথম নেতারা সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই সত্য হল জাতীয়তাবাদের স্বরূপ নির্ণয় করা। কোন গণআন্দোলন কংগ্রেসের নেতারা তৈরী করতে পারেননি। কিন্তু ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে মতাদর্শের লড়াই তারা শুরু করেন। একটি পথ তৈরী হয়, এবং সেই পথের যাত্রাও তাঁরা শুরু করে দেন।

সামাজিক/সাংস্কৃতিক পটভূমি ঃ

একদিকে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির দ্রুত প্রসার অন্যদিকে ইংরেজ শাসকদের উন্নাসিক মনোভাব একটি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া তৈরী করেছিল। দেশীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরার একটা সচেষ্ট প্রয়াস প্রায় গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া ও প্রভাবের বিরুদ্ধে দেশজ সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষার গুরুত্ব এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার একটি সমান্তরাল ধারাও একই সঙ্গে কাজ করছিল। রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনগুলির অগ্রসরতার সঙ্গে দেশজ সংস্কৃতির আবেগ সঞ্চালিত আন্দোলনের কিন্তু তাল মেলেনি। ভারতীয় ধর্ম ও দেশজ সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য থেকে, বিদেশী শাসনের সর্বগ্রাসী প্রভাবের বাইরে একটি সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব খুঁজে নেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই প্রচেষ্টা অনেক সময় ভিন্নতা এবং রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করছিল। কিন্তু অন্যভাবে দেখলে দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও দেশাচারকে আঁকড়ে, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আরেক ধরনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের ভূমিকাও তৈরী হচ্ছিল। ধর্মশাস্ত্রগুলির ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ, অথবা বর্ণাশ্রম প্রথার আদর্শগত ব্যাখ্যা ভারতীয় ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়গুলির দিকে ফিরে তাকানো, কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির সাহসিকতা, আত্মত্যাগ, বীরত্বের দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা, এই সবের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় একটি সাংস্কৃতিক ধারার অনুসরণ, পরবর্তী সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরী করে দেয়।

অর্থনৈতিক পটভূমি ঃ

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম নেতারা ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও সমালোচনাও তৈরী করে ছিলেন। প্রথম দিকে ভাবা হয়েছিল ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবর্ষ যথার্থ আধুনিক হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে ভারতবর্ষীয় অর্থনীতিও উন্নত ও অগ্রসর হবে। মোহমুক্তি ঘটল ১৮৬০ এর পর থেকে। এই সময় থেকেই ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের চেহারাটি প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগের দিনগুলিতে যে ভাবে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল তার পরিচয় ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অবতারণা হয়েছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধার জন্য—একথা প্রাকমহাবিদ্রোহ সময়ের মানুষেরা সঠিক বুঝেছিলেন। হয়ত ঔপনিবেশিক শাসনের প্রক্রিয়াটি তারা সঠিক নির্ধারণ করতে পারেন নি, কিন্তু অনুভবে তা

উপলব্ধ হয়েছিল। সেই অনুভূতি থেকে মহাবিদ্রোহের সময়ে কৃষক, কারিগর তালুকদের জোট সম্ভব হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তখনও ব্রিটিশ শাসনের ঘোরে আচ্ছন্ন ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত। মহাবিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে ঘোর কাটতে শুরু করে।

দাদাভাই নৌরজী প্রথম ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও রিক্ততার কথা বললেন। রমেশচন্দ্র দত্ত বললেন ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনই ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অবনতির কারণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল উদ্দেশ্য হল, ভারতীয় অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ দখলে রাখা, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে প্রমুখ নেতারা এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। বিদেশী পুঁজি ভারতীয় সম্পদের নির্গমন এবং অর্থনীতির অবক্ষয় ঘটিয়েছে, এ কথা বললেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। ভারতীয় কারিগরি শিল্পের ধ্বংস এদের উদ্বিগ্ন করেছিল। রেলপথের সম্প্রসারণ, তারা ঔপনিবেশিক দখলের সম্প্রসারণ বলে মনে করলেন। ভারতবর্ষের সম্পদের হস্তান্তর এবং নির্গমন এদের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। নির্গমন তত্ত্বের প্রধান বক্তা ছিলেন দাদাভাই নৌরোজি। ব্রিটিশ চেম্বার অফ কমার্সই ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজনীতি নির্ধারণ করছে, বললেন সচ্চিদানন্দ সিনহা।

অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সর্বাঙ্গীন চেহারাটি পরিষ্কার করে তুলে ধরে, এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সঠিক কারণ হিসেবে ঔপনিবেশিকতাকে দায়ী করেছিলেন, কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতারা। জাতীয় সচেতনতার ক্ষেত্রে এই অনুসন্ধান এবং সিদ্ধান্তের একটা বড় ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালের সংগ্রামী জাতীয়তা বাদের মূলে বড় কারণ ছিল ইংরেজ শাসকদের যথেচ্ছাচার। অর্থনৈতিক যথেচ্ছাচারের চেহারাটা তাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন, কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতারা।

২(খ).২.২ সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ভূমিকা

জাতীয় চেতনার প্রকাশের মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং জাতীয়তা বোধ প্রচারের ক্ষেত্রেও সংবাদপত্রের বড় ভূমিকা ছিল। কংগ্রেস অধিবেশনের কার্য বিবরণী, প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্তগুলিও প্রকাশিত হত সংবাদপত্রে। এইভাবে সংবাদপত্র, কংগ্রেসের কার্যাবলী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিত। তাছাড়া নির্ভীক সাংবাদিকতা ও জোরালো বক্তব্যের জন্য বেশ কিছু সংবাদপত্রের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। পি. সুব্রহ্মণ্য আয়ারের পরিচালনায় হিন্দু, বালগঙ্গাধর তিলকের, ‘কেশরী’ এবং ‘মারাঠা’ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বেঙ্গলি’, শিশির কুমার ঘোষ এবং মতিলাল ঘোষের ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ পঞ্জাব থেকে প্রকাশিত ‘আখবরি আম’, বোম্বাইতে প্রকাশিত ‘ইন্দু প্রকাশ’, বাংলার ‘সোমপ্রকাশ’ ইত্যাদি কাগজগুলির সঙ্গে বুদ্ধিজীবীরা কোন না কোন ভাবে যুক্ত থাকতেন। তাদের চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটত এই খবরের কাগজগুলির পাতায়। সংবাদপত্রগুলির আরও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, শহরে প্রকাশিত হয়ে এগুলি পৌঁছে যেত গ্রামাঞ্চলে। এভাবে শহরের মানুষ এবং গ্রামের মানুষ, একই রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণে একই

সঙ্গে আন্দোলিত হতেন। যাবতীয় রাজনৈতিক আলোড়ন ও বিতর্কগুলি খবরের কাগজের পাতাতেই হত। শুধু ভারতীয় ভাষাতেই নয়, ইংরেজী ভাষাতেও খবরের কাগজগুলি কখনও সোজাসুজি, আবার কখনও তীর্যকভাবে ইংরেজ সরকারকে আক্রমণ করত, সরকারী নীতির সমালোচনাও করত।

এইভাবে সংবাদপত্রগুলি রাজনৈতিক সামগ্রিকতা তৈরী করেছিল। তাছাড়া রাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তন, এবং মতবাদের পরিবর্তনও খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের মতাধর্স প্রথম দফায় বিশেষ কিছু খবরের কাগজের লেখালেখিতেই ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়।

১৮৮১ সালে বালগঙ্গাধর তিলক দুটি কাগজ বার করেন। মারাঠা প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে, কেশরী মারাঠি ভাষায়। ১৮৯৩ সালে তিলক, গণপতি উৎসব এবং ১৮৯৬ সালে শিবাজী উৎসব শুরু করলেন। মারাঠি সংস্কৃতি, আচরণীয়, ধর্ম ও ঐতিহ্যের মূলে ফিরে গিয়ে তারই ভিত্তিতে জাতীয় সচেতনতা গড়ে তোলাই তিলকের উদ্দেশ্য ছিল। শিবাজীকে মহারাষ্ট্রের জাতীয় বীর হিসাবে পরিচিত করে মারাঠা বীর হিসেবে পরিচিত করা, মারাঠা ইতিহাসের অতীত গৌরব ও মহিমা প্রচার করা এবং তরুণ মারাঠীদের উদ্বুদ্ধ করাও তিলকের লক্ষ্য চিল। এভাবে স্বদেশের মাটিতে স্বদেশের অতীত থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বাদেশিকতার ভাবনা তৈরী করেছিলেন তিলক। একই সঙ্গে কৃষক, কারিগর, শ্রমিকদের জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারার অন্তর্গত করার কথা তিলকই সর্বপ্রথম ভেবেছিলেন। ১৮৯৬-৯৭ সালে পুনাতে সার্বজনিক সভার তরুণ সদস্যদের নিয়ে তিলক No tax আন্দোলন সুরু করলেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মহারাষ্ট্রের কৃষকদের তিলক বললেন অজন্মার সময় তারা যেন কোনমতেই কর না দেয়। ১৮৯৭ সালে পুনাতে প্লেগ মহামারী হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তার নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে তিনি প্লেগ নিরোধের কাজে যুক্ত হন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের প্লেগে আক্রান্ত রোগীদের প্রতি সহানুভূতিহীন, হৃদয়হীন নির্বিকার মনোভাব ও ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনাও তিনি করেছিলেন। প্লেগরোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, সেই উপলক্ষ্যে সরকারের ব্যবস্তাকে কার্যকরী করার জন্য যে সব সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের উন্নাসিক ব্যবহারে এবং অমানবিক আচরণে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ ক্রমশই বাড়তেই থাকে। ১৮৯৮ সালের ২৭শে জুন পুনা প্লেগ কমিটির চেয়ারম্যান র‍্যান্ড (Rand) এবং লেফটেনান্ট আর্মাস্টকে হত্যা করলেন চাপেকর, দুই ভাই। আর্য়াস্ট এবং র‍্যান্ডের হত্যাকান্ড, সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হল। চাপেকর ভাইদের এই কাজকে আমরা বৈপ্লবিক সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সূচনা বলে মনে করতে পারি।

২(খ).২.৩ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ এবং সশস্ত্র বিপ্লব

সংগঠন ও প্রতিবাদ আন্দোলন ঃ

১৮৯৪ থেকেই মহারাষ্ট্রে, সরকারের মুদ্রা tariff এবং দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত নীতিগুলি এবং তার বিলিব্যবস্থা সাধারণ মানুষের ভালো লাগেনি। জাতীয় নেতাদের একাংশের মধ্যে প্রতিবাদী এবং লড়াইয়ের মনোভাব

স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সংবাদপত্রের কলমে, ইংরেজ সরকারের সমালোচনা তীব্রতর হচ্ছিল। এরই মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলক সর্বজনপ্রিয় নেতা হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলেন, তেমনি ইংরেজ সরকারের সন্দেহও তার সম্বন্ধে বেড়ে যাচ্ছিল। র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্টের হত্যাকান্ড একটি ষড়যন্ত্র মনে করে এবং চাপেকর ভাইদের সঙেঘগ তিলকের যোগাযোগ রয়েছে কিনা, তার অনুসন্ধান শুরু হল। 'কেশরী' পত্রিকায় তিলক তার সরকারের বিরুদ্ধ সমালোচনা বন্ধ করেন নি। কেশরী পত্রিকায় শিবাজীর উক্তি নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে বর্ণিত শিবাজীর আফজল খানের হত্যার সমর্থনের মধ্যে ইংরেজ সরকার, ইউরোপীয়ান কর্মচারীদের হত্যার উসকানির ছায়া দেখল। ফলে বোম্বে লেজিস লেটিভ কাউনসিলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তিলকের ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল।

ভারতবর্ষে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ এবং বিপ্লবী রাজনীতির সূত্রপাত, বালগঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং কারাদণ্ডের ঘটনার মধ্যে দিয়ে হয়েছিল একথা বলা যেতে পারে। যদিও সশস্ত্র সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ পরিণত রূপে শুরু হয়েছিল ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাজন এবং নরমপন্থা ও চরমপন্থা এই দুই শিবিরে কংগ্রেসের ভাগ হয়ে যাওয়ার পর থেকে।

চরমপন্থী নেতাদের চিন্তাভাবনার এবং অনুভবের তীব্রতা থেকেই কিন্তু সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের জন্ম। চরমপন্থী নেতাদের তরুণতর যারা, তাঁরাই ক্রমশঃ অস্ত্রের শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রের লড়াইতে বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন।

সংগঠন ঃ

উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকেই বিপ্লবী চিন্তার সূচনা হয়। এই সময় বাংলা এবং মহারাষ্ট্রে বেশ কতগুলি গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। ১৮৭৬ সালে রাজনারায়ণ বসু এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সঞ্জীবনী' সভা তৈরী করেন। ১৮৭৭ সালে তৈরী হয় কলকাতার হিন্দুস্তান ইউনিয়ন। ১৮৭৬ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম যুবকদের নিয়ে 'ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী' গঠন করলেন। এই সমিতির বক্তব্য ছিল স্বরাজ শাসনই একমাত্র বিধাতা নির্দিষ্ট শাসন। ১৮৭২ সালে, মহারাষ্ট্রে প্রথম গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কে। এই সমিতিতে মারাঠা তরুণদের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কাজ নেওয়া হল। ১৮৯৫ সালে দামোদর চাপেকর এবং বালকৃষ্ণ চাপেকর এমন একটি সংগঠন তৈরী করলেন যেখানে তরুণদের অস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্টের হত্যা পরিকল্পনার জন্য এই দুই চাপেকর ভাই এর ফাঁসি হয়। সম্ভবত চাপেকর ভাই রাই মহাবিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে প্রথম অস্ত্রের মাধ্যমে অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটালেন। সশস্ত্র জাতীয়তাবোধের ধারণাকে তারাই প্রথম রূপ দিয়েছিলেন।

১৮৯৩ সালে অরবিন্দ ঘোষ নামে এক যুবক ইংল্যান্ডে পড়াশুনো শেষ করে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং বরোদায় কাজে যোগ দেন। অরবিন্দ প্রথম থেকেই কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতাদের রাজনীতি এবং কর্মপন্থার বিরোধী ছিলেন। অরবিন্দও গুপ্তসমিতি তৈরী করেছিলেন। মহারাষ্ট্রে, পুনাতে

ঠাকুর সাহেবের গুপ্তসমিতি ওয়ার্ধায় 'বালসমাজ' এবং আর্যবান্ধব সমাজ', এছাড়া নাগপুর, বোম্বাই, বরোদা, লাহোর, হায়দ্রাবাদ এ সমস্ত জায়গাতে সর্বত্র গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। সশস্ত্র সংগ্রামী আন্দোলনের Blue Print এই গুপ্তসমিতিগুলিতে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাতেও নানা বিপ্লবী সংগঠন তৈরী হয়েছিল। ১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র ও সতীশচন্দ্র বসু। ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুশীলন সমিতি তৈরী করলেন পুলিন বিহারী দাস। যুগান্তর দল তৈরী হল ১৯০৬ সালে। রবীন্দ্রনাথের ভাগনি সরলাদেবী এবং বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাও এই সময়ের বাংলার বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসার কিছুদিনের মধ্যেই বিপ্লবী প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত হন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশনের বাইরে থেকে নিবেদিতা রাজনৈতিক জগতে সক্রিয় অংশ নেন। নিবেদিতা সম্ভবত রাশিয়ান অনার্কিষ্ট (Anarchist) নেতা পিটার ক্রোপটকিমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দর দেখা হয় বরোদায়। অরবিন্দকে তিনি কলকাতার গুপ্তসমিতিগুলির খবর দেন। এছাড়া বাংলার গুপ্তসমিতিতে দুষ্প্রাপ্য ম্যাৎসিনির (Matzzim) আত্মজীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লব প্রচেষ্টায় উদ্যোক্তাদের অন্যতম ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নিবেদিতার প্রচার কার্য সম্বন্ধে বলেছিলেন ম্যাৎসিনির আত্মজীবনীর ছয় খণ্ডের প্রথম খণ্ডটি তিনি বৈপ্লবিক সমিতিকে প্রদান করেন.....এই পুস্তকের শেষে, গেরিলা যুদ্ধ কি প্রকারে করিতে হয় তৎ বিষয়ে একটি অধ্যায় আছে। ইহা টাইপ করিয়া চারিদিকে প্রেরিত হইত,......এই যুদ্ধ পদ্ধতিই আমাদের লক্ষ্য ছিল।" (সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পৃ ১৪৯)।

জাপানি অধ্যাপক ওকাকুরা কিছুদিন বেলুড় মঠে বসবাস করেছিলেন। তার আইডিয়াল অফ দি ইস্ট (Ideal of the East) গ্রন্থে, ইওরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদের পদানত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুক্তির কথা বলা হয়। ওকাকুরা, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিবেদিতা এবং হেমচন্দ্র মল্লিকের সঙ্গে একটি সংগঠন তৈরী করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী তরুণদের মনে বিপ্লবী চিন্তা ও চেতনা জাগিয়ে তোলা।

সরলাদেবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিত হন, এবং বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন।

সাহিত্য, দর্শন, সমকালীন লেখক ও চিন্তাবিদদের প্রভাব ঃ

উনিশশতকের বেশ কিছু চিন্তাবিদ এবং লেখক বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। এদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ছিল সব চাইতে বেশী। তাঁর আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস বিপ্লবীদের স্বাধীন বাংলা এবং শক্তিমান বাঙালীর আদর্শ স্থাপন করেছিল এবং বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিশেষ করে আনন্দমঠ উপন্যাসের 'বন্দেমাতরম' গানটি বিপ্লবীদের স্বদেশী সঙ্গীতের রূপ নেয়। 'বন্দে মাতরম' বিপ্লবীদের সংগ্রামী স্লোগানে পরিণত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা

ভাবনায় স্বদেশ, বৃহ ভারতের স্তর আকার নেয়নি। স্বদেশ বলতে তিনি বাংলা বুঝেছিলেন। কিন্তু আনন্দমঠ উপন্যাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী উপস্থাপন করে, আঠারো শতকের ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে সংগ্রামী বিপ্লবীদের সামনে ঐতিহাসিক আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুর্নীতি এবং অপশাসনের প্রত্যক্ষ ফলাফল 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' (১৭৭০) ভয়াবহ বিবরণ বিপ্লবীদের কাছে ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের দিকটিও তুলে ধরেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ বিপ্লবীদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার মানুষ ছিলেন। ১৯০১ সালে বিবেকানন্দ ঢাকা শহরে যান। সেখানে পরবর্তীকালের বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ ও তার সহকর্মীরা তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করেছিলেন। বিবেকানন্দ তাদের একটি কর্মীদল গঠন করতে বলেছিলেন। বিবেকানন্দ প্রাথমিক ভাবে হিন্দুভারতের ঐক্যসাধন এবং হিন্দুধর্মের প্রচারক হলেও কোন এক সময় সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও চিন্তা করেছিলেন। বিপ্লবোদ্দেশ্যে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান প্রস্তুত করিব......কিন্তু ভারত পালিত হইয়াছে। এই জন্যই আমি একদল কর্মী চাই, যাহারা ব্রহ্মচারী হইয়া দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া এই দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করিবেন (সুপ্রকাশ রায় পৃঃ ১৩১)।

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের শক্তি সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস ছিলেন তিনি। বিপ্লব সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও বিবেকানন্দ বার বার, সাহস এবং শক্তি ধ্বংসের দেবতা কালীর উপাসনার কথা বলে বিপ্লবীদের অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই এ উজ্জীবিত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ জন্মভূমিকে কালী এবং দূর্গা এই দুই মাতৃশক্তির সঙ্গে অভিন্ন করে দেন। কালী বা দূর্গা তাই প্রথম যুগের সংগ্রামী বিপ্লবীদের আরাধ্য দেবতা হয়েছিলেন। যেমন গণেশ দেবতাকে তিলক বিপ্লবীদের জাতীয় দেবতা বলে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন মহারাষ্ট্রে। এই সময়কার অর্থাৎ প্রথম পর্বের সংগ্রামী বিপ্লব ছিল সম্পূর্ণভাবে হিন্দুত্বের আবরণে আচ্ছাদিত এবং সে কারণে সীমাবদ্ধ। ১৯০৫ সালে অরবিন্দ ঘোষের 'ভবানীমন্দির' প্রকাশিত হয়। দেবী ভবানী একাধারে দূর্গা এবং কালী আবার দেশমাতার প্রতীক। ভবানীদেবীর মন্দির বিপ্লবীদের গোপন সংগঠনের প্রতীক।

এভাবে প্রথম পর্বের সংগ্রামী বিপ্লবীরা জাতীয়তা থেকে ধর্ম বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে একীকরণ করেছিলেন।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ধারাটি কিন্তু কোন ঘটনা পরম্পরায় গড়ে ওঠেনি। পাশ্চাত্য শিক্ষা, পশ্চিমী উদারনৈতিক রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাব এবং ইউরোপীয় বিপ্লবগুলির প্রভাবে যে মূল ধারার জাতীয়তা বাদ উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল, এবং যার প্রকাশ ছিল বৈধতা ও নৈতিকতার দাবী ভিত্তিক সংসদীয় প্রথার বক্তৃতা, প্রতিবাদ মিটিং এবং আবেদনের রাজনীতিতে, তারই পাশাপাশি অন্তঃস্রোতের মত সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ধারাটিও বইছিল। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রেরণা ছিল ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। প্রতাপ সিং, শিবাজী, এমনকি বাংলার বারোভুঁইএঁাদের

অন্যান্য প্রতাপাদিত্যের মত মধ্যযুগীয় চরিত্ররা। প্রাক মহাবিদ্রোহ সময়ের, সাওতাল কোল মুন্ডা, ওয়াহাবি ইত্যাদি একাধিক অভ্যুত্থানগুলি সশস্ত্র সংগ্রামের পটভূমি এবং অনিবার্য দিক নির্দেশ করেছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সশস্ত্র সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় বলে মনে করা যেতে পারে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর। বিপ্লবী ভাবনা চিন্তা এবং সশস্ত্র সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ধারাটি অতএব সমান্তরালভাবে পাশাপাশি কাজ করছিল। রণকৌশলও তৈরী হয়েছিল পাশাপাশি।

রাশিয়া এবং জাপান যুদ্ধে জাপানের জয় বিপ্লবীদের প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছিল। বিংশ শতকের গোড়ায় (১৯০৫) একটি প্রবল প্রতাপ ইউরোপীয় শক্তিকে এশিয়ার কোন দেশ পরাজিত করতে পারল, এই ঘটনা বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করল। এর অল্পপরেই রাশিয়ার প্রথম বিপ্লবে জারতন্ত্রের অবসানও বিপ্লবীদের উৎসাহিত করে। অত্যাচারী শাসককে রণক্ষেত্রে পরাজিত করা সম্ভব, এই বাস্তব ঘটনা, ভারতীয় বিপ্লবীদের চেতনাকে উজ্জীবিত করল।

২(খ).২.৪ প্রথম পর্ব

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিল উনিশশতকের শেষের দিকে। বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও তাঁর দাদা গণেশ দামোদর সাভারকর ১৮৯৯ সালে 'মিত্রমেলা' নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। ১৯০৪ সালে ইটালির ঐক্য আন্দোলনের অন্যতম নায়ক মাৎসিনির 'ইয়ং ইটালির' (Young Italy) অনুকরণে সাভারকর ভাইরা অভিনব নব্যভারত সংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। বিনায়ক সাভারকর শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার বৃত্তি পেয়ে ইংল্যান্ড চলে যান। ১৯০৫ সালে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা ছটি বৃত্তি ঘোষণা করেছিলেন। এই বৃত্তির উদ্দেশ্য ছিল, তরুণ ভারতীয়দের বিদেশে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা। বিনায়ক সাভারকর ইংল্যান্ডে চলে গেলেও, গণেশ সাভারকর বোম্বাই এবং পুনায় প্রতিটি কলেজে অভিনব সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। মাৎসিনির আত্মজীবনী মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করে বিলি করারও ব্যবস্থা হয়েছিল।

সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম যুগের অন্যতম নায়ক ও প্রচারক হলেন বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। ফাড়কে বিভিন্ন অনুন্নত উপজাতির মানুষদের নিয়ে একটি সক্রিয় বাহিনী তৈরী করেছিলেন। ডাক ও রেল চলাচল বিপর্যস্ত করা, জেলখানা ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করা, শাসকদলের মনে সন্ত্রম সৃষ্টি করা এবং সরকারী তোষাখানা লুট করা, এই সব তার পরিকল্পনা ও লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বাসুদেব বলবন্তের প্রয়াস সফল হয়নি। তার পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায় এবং পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে ফাড়কের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। জেলের ভেতরেই ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে ফাড়কের মৃত্যু হয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বৈধ নীতির সমর্থক কংগ্রেসের প্রথম দিকের নেতাদের জনপ্রিয়তা যেন ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। অন্যদিকে বালগঙ্গাধর তিলক এবং তারই মতের নেতারা ব্রিটিশ সরকারের

নীতি ও কার্যকলাপের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। কংগ্রেসের এ যাবৎ ঐক্যে ফাটল ধরছে দেখা গেল। তিলক এবং তার সমর্থকরা চরমপন্থী বলে পরিচিত হচ্ছিলেন। উত্তরোত্তর বিরোধের ফলে কংগ্রেসের দুই শিবিরে ভেঙ্গে যাওয়া ঘটল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-এর পর। কিন্তু তার আগেই নরমপন্থী এবং চরমপন্থী এই দুই দলের মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

১৯শে জুলাই ১৯০৫ গভর্নর জেনারেল কার্জন বাংলা বিভাজনের কথা ঘোষণা করলেন। আসাম এবং পূর্ববঙ্গ নিয়ে একটি প্রদেশ, এবং বাকি বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার অংশ নিয়ে দ্বিতীয় প্রদেশ— কার্জনের বঙ্গভঙ্গের এই প্রস্তাব বলাবাহুল্য প্রতিবাদের প্রবল আলোড়ন তুলল। কার্জন অবশ্য বলেছিলেন যে বাংলা একটি বৃহৎ প্রদেশ, এবং একক কোন শাসন ব্যবস্থার পক্ষে বাংলা শাসন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ শুধু মাত্র শাসন কার্যের সুবিধার জন্য এই বিভাজন প্রয়োজন। কিন্তু স্বদেশী বুদ্ধিজীবীদের কাছে কার্জনের আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা বুঝেছিলেন বাঙালী জনগণকে বিভক্ত করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করাই ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য। এছাড়া এযাবৎ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি নষ্ট করে ঐক্যকে ভেঙ্গে দেওয়ার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। উচ্চবংশীয় আশরফ 'সম্ভ্রান্ত' মুসলিমদের তুষ্ট করা ইংরেজ সরকারের নতুন নীতি ছিল। সমগ্র পূর্ববঙ্গ ঘুরে কার্জন এই মর্মে বক্তৃতা দিলে, যে প্রস্তাবিত নতুন প্রদেশটিতে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য হবে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে, সরকারপক্ষের অবহেলাজনিত যে ক্ষোভ জমে ছিল, তার অবসান ঘটানোই ইংরেজ সরকারের নতুন নীতির লক্ষ্য হবে। ঢাকা শহরের লুপ্ত গৌরবকে নতুন করে উজ্জীবিত করার কথাও কার্জন বলেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সরকারীভাবে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব গণআন্দোলন শুরু হয় এবং অল্পসময়ের মধ্যেই দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে যায়। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলকাতা শহরের একটি বিশাল জনসভায় জাতীয় নেতারা ব্রিটিশ পণ্য বয়কট বা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করা হয়। সেদিনটি জাতীয় শোকদিবস হিসেবে পালিত হল। বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্র করে ভারতীয় স্বাধীনতার যথার্থ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আন্দোলনের প্রধান দুটি কার্যসূচী ছিল, বিদেশী পণ্য বর্জন, এবং স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার— বয়কট এবং স্বদেশী।

বয়কট এবং স্বদেশী উপলক্ষ করে কংগ্রেসী নেতাদের মতবিরোধ দেখা দিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনকে বিদেশী পণ্য বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। অন্যদিকে গোখলের নেতৃত্বে অন্য নরমপন্থীরা প্রাথমিকভাবে বয়কট এবং স্বদেশীকে বাংলার ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক বিপিনচন্দ্র পাল নতুন সংগ্রামী নেতারা শুধু যে এটিকে সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত করতে চাইলেন তাই নয়, বয়কট বা বর্জনের ক্ষেত্রসীমা প্রসারিত করে শুধুমাত্র বিদেশী পণ্য নয় বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে চাইলেন। তিলক এতদিনে তিনি লোকমান্য নামে খ্যাত হয়েছেন, পুনা, বোম্বাই এবং মহারাষ্ট্রের অন্যত্র স্বদেশী ও বয়কটের কথা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। লালা লাজপৎ রায় এবং অজিত সিং পাঞ্জাবের সর্বত্র স্বদেশীর বার্তা পৌঁছে

দেন। সৈয়দ হায়দর রাজা দিল্লী আন্দোলনের নেতৃত্বে দেন। রাওয়ালপিন্ডি, কাংড়া, জম্মু, মুলতান এবং হরিদ্বার সর্বত্র স্বদেশী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। চিদাম্বরণ পিল্লাই মাদ্রাজ এবং তামিলনাড়ু অঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা মাদ্রাজ স্বদেশী চিন্তাকে জোরদার করেছিল।

বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনও তীব্র হয়ে উঠেছিল। স্বদেশী আবেগ অন্তঃপুরের মেয়েদেরও স্পর্শ করেছিল। প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেসের বরিশাল অধিবেশনে আবদুল রসুল সমস্ত ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে 'যা পঞ্চাশ বা একশো বছরেও হয়তো ঘটত না, তা ছ মাসেই ঘটে গেল।' স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বও যেমন তৈরী হল, তেমনি তার গতিও দ্রুত হল। স্বদেশী শশব্দের অর্থ নতুন এবং গভীর তাৎপর্য নিল। স্বদেশী গান, কবিতা, আগেও লেখা হয়েছে, এখন তা গভীরতর অর্থে ব্যাপকতর মাত্রায়, চেতনায় অনুভূত হল। রবীন্দ্রনাথ তার এই সময়কার লেখাপত্রে, গানে, কবিতায় স্বদেশী শব্দটিকে অনুভূতিময় করে তুললেন। সরলাদেবী, নিবেদিতা এরা প্রত্যেকেও স্বদেশী ভাবনা এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। আরেকটি গ্রন্থ এই সময়ে বিশেষভাবে স্বদেশী চেতনা এবং আত্মশতির কথা বলেছিল, তা হল সখারাম গণেশ দেওস্করের 'দেশের কথা।' এই বইটিতে স্পষ্ট করে বলা হল, আত্মিক ও আর্থিক আত্মপ্রতিষ্ঠা স্বদেশী চেতনার বড় দিক। অতএব স্বদেশী শিল্প, স্বদেশী সংস্কৃতি ও জাতীয় শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হোক—একথাই বললেন সখারাম গণেশ দেওস্কর।

সখারাম গণেশ দেওস্কর প্রথম 'স্বরাজ' শব্দটি স্বাধীনতার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন। আর এই শব্দটিকে মেঘগর্জনের মত জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রকম্পিত করলেন বালগঙ্গাধর তিলক। স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার—তিলকের এই ঘোষণা জাতীয় আন্দোলনের চরিত্রই পালটে দিল। অরবিন্দ ঘোষ বন্দেমাতরম পত্রিকায় স্বরাজ অর্জনের আকাঙ্খাকে স্পষ্টতর করে তোলেন। দাদাভাই নৌরজি বললেন স্বরাজ হল ব্রিটিশ শাসন মুক্ত আত্মকর্তৃত্ব।

স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তরুণ ছাত্র সমাজ। ইংরেজ সরকারের দমননীতির উৎপীড়ন পুরোটাই তাদের ওপর পড়েছিল। ১৯০৫ সালে আর ডব্লিউ, কার্লাইল (R.W. Carlyle) সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সার্কুলার পাঠান এই মর্মে যে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ শুরু হয়। পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা তৈরী করবার জন্য ডন (Dawn) সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বসু এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি (Anti Circular Society) তৈরী করলেন। ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) স্থাপিত হল। এই সঙ্গে ন্যাশনাল কলেজ তৈরী করেছিল। এই কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিতে বরোদা থেকে বাংলায় এলেন অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষের 'কর্মযোগী', 'বন্দেমাতরম', ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর 'যুগান্তর' এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' এই সমস্ত সমকালীন পত্রিকা গুলি স্বদেশী চেতনার তীব্রতর করেছিল। অন্যদিকে 'মারাঠা' এবং 'কেশরী' বিপ্লবী চেতনায় মারাঠি তরুণদের জাগিয়ে তুলল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী এবং বয়কট সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ভাবনা এবং পরিকল্পনাকে স্পষ্ট করে তুলেছিল, বঙ্গভঙ্গের ফলে যে রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরী হয়েছিল, সেই উত্তাপ সংহত হয়ে বিস্ফোরণের মত সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত হল।

১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে স্বদেশী আন্দোলনের গতি এবং চরিত্র কেমন হবে এই প্রবল বিতর্কের মধ্যে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীরা ভাগ হয়ে গেলেন। চরমপন্থীদের রাজনীতির মধ্য থেকেই সংগ্রামী সশস্ত্র জাতীয়তাবাদ শুরু হয়েছিল। এবং তার প্রথম সূচনা হয়েছিল মহারাষ্ট্রে। তিলকের 'গণপতি উৎসব' বা 'শিবাজী উৎসব' মারাঠি তরুণদের বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শুধু করে নি, পাশ্চাত্যের দিকে না তাকিয়ে, ভারতের অভ্যন্তরে জাতীয় ইতিহাসের দিকে নির্দেশিত করেছিল। প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবী চাপেকর ভাইরা, দামোদর এবং বালকৃষ্ণ, অত্যাচারী ইংরেজ র‍্যাণ্ড (Rand) এবং আর্য়াস্ট (Eyrst) কে হত্যা করলেন। বিপ্লবী রাজনীতির সূত্রপাত সেখান থেকে। ফাড়কে, চাপেকর দুই ভাই এবং সাভারকর দুই ভাই বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেছিলেন উনিশ শতকের শেষের দিকে। বিশশতকের গোড়ার দিকে (১৯০৭) গণেশ সাভারকর গ্রেপ্তার হন ও তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সাভারকরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ২১শে ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হলেন বিপ্লবীদের হাতে। ১৯১০-১১ সালে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। বিচারে অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরে, বিনায়ক নারায়ণ দেশ পাণ্ডে এবং কৃষ্ণগোপাল কার্বের ফাঁসি হল। দামোদর বিনায়ক সাভারকরকেও ইংল্যান্ড থেকে বন্দী করে আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পাঠানো হল।

একই সময়ে বাংলায় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ গোপনে তরুণ বিপ্লবীদের সংগঠিত করছিলেন। ১৯০২ সালের অনুশীলন সমিতি এবং ১৯০৬ সালের যুগান্তর গোষ্ঠী তরুণদের বিপ্লবী ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্রচালনায় শিক্ষিত করতে থাকে। অরবিন্দর 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকা এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা কাগজের লেখাগুলি তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। গুপ্ত সংগঠন গোপন পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হল অত্যাচারী ইংরেজকে নির্দ্দিষ্ট করে, অতর্কিতভাবে তাকে হত্যা করে শাসকগোষ্ঠীর মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, এবং সেইভাবে ব্রিটিশ শাসনের ওপর চাপ তৈরী করা।

প্রথম পর্বের বিপ্লবীদের একটি প্রধান ক্রটি থেকে গিয়েছিল ইংরেজ সরকারের নিরন্তর বিরোধিতা এই কর্মপন্থা তারা চরমপন্থীদের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। তিলক ছিলেন এ ব্যাপারে শিক্ষাগুরু। কিন্তু একটি আন্দোলন কেমন হবে, তা নিয়ে সঠিক ভাবনা চিন্তা হয়নি। একটি সংগঠিত সশস্ত্র গণআন্দোলন শুরু করা দুরূহ কাজ; সময় সাপেক্ষ তো বটেই। এর জন্য দরকার তৃণমূল পর্যায় থেকে সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক আদর্শে শিক্ষিত করা। এঁদের মধ্যে অনেকে গোপনে, এবং তলে তলে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিপ্লবের সংগঠন কে ছড়িয়ে দিতে চাইছিলেন, যেমন হয়েছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময়। কিন্তু এও কঠিন কাজ ছিল। তবু ঠিক হল গণ আন্দোলন এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া— এই দুই উদ্দেশ্যই ভবিষ্যতের কর্মসূচী হবে। আপাতত সশস্ত্র বিপ্লবীরা আইরিশ জাতীয়তাবাদী

এবং রাশিয়ান নিহিলিস্টদের মত শাসকগোষ্ঠীকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে পরাস্ত করতে চাইলেন। সন্ত্রাসের মূল লক্ষ্য হল অত্যাচারী, পীড়নকারী ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হত্যা করা। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনে শাসকের ক্ষমতা সম্বন্ধে যে ভয়, তা দূর করা এবং ভারতীয়দের সাহস শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা। হত্যাকারী বিপ্লবী ধরা পড়লে, তার বিচারকার্যকে সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রচার কার্যসূচী বলে মনে করা হবে ঠিক করা হল। প্রয়োজন ছিল মৃত্যুভয়হীন সাহসী এবং দেশপ্রেমিক তরুণ দল। খুব স্বাভাবিক ভাবে তৎকালীন সময়ের উত্তপ্ত আবহাওয়ার ভারতীয় তরুণদের বড় অংশ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হল, এবং বিপ্লবী দলে যোগ দিল। বীরত্বের স্বপ্ন ও উদ্দীপনাও তাদের উৎসাহিত করেছিল।

১৯০৫ সালের পর থেকেই বেশ কিছু পত্রপত্রিকা সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের পরিকল্পনাকে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছিল। ফলে পরিবেশও তৈরী ছিল, এর আগে চাপেকর ভাইদের কথা এবং সাভারকর ভাইদের কথা, বাংলায় এসে পৌঁছেছে। ১৯০৭ সালে তৎকালীন বাংলার লেফটেনান্ট গভর্ণরকে হত্যা করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে মজফফরপুরে পীড়নকারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে একটি গাড়ীর ওপর বোমা ছোঁড়া হয়। কিন্তু সেই গাড়ীতে কিংসফোর্ড ছিলেন না। ছিলেন দুজন ইংরেজ মহিলা, যারা মারা গেলেন। বোমা ছুঁড়ে ছিলেন নিতান্ত তরুণ দুই ছেলে। এদের মধ্যে প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন। অন্যজন ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয় ক্ষুদিরামের বয়স ছিল মাত্র ষোল। ষোল বছরের বালকের এই সাহস, বীরত্ব, আত্মত্যাগ দেশবাসীকে উদ্বেলিত করল। ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছিল। প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম জাতীয় বীর হিসেবে পরিচিত হলেন। এমন কি তাদের নিয়ে বিশেষ করে ক্ষুদিরামকে নিয়ে লোকসংগীত রচনা হয়েছিল এবং সারা দেশে এই লোকসংগীতের মাধ্যমে ক্ষুদিরামকে ঘিরে কিংবদন্তী তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এভাবে সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রাথমিক উদ্দেশ্যের একটি অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে নির্বিকার উদাসীন্য থেকে উজ্জীবিত করে দেশপ্রেমে এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীতে সচেতন করার উদ্দেশ্য সফল হল।

বিশ শতকের প্রথম দুই শতকে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংগঠনগুলির কার্যধারা ছিল এই রকম— একদিকে নিপীড়ক ইংরেজ বা দেশীয় সরকারি কর্মচারীদের হত্যা, একই সঙ্গে দলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক বা খবর পাচারকারীদের নির্মূল করা; অন্যদিকে ডাকাতি করে অস্ত্র কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। দ্বিতীয় কাজটি লোকমুখে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্বদেশী ডাকাতি হিসেবে পরিচিত হল।

১৯০৭-১৯০৮ সাল— এই বছরটাই ছিল স্বদেশী ডাকাতি এবং বিদেশী শাসকদের হত্যার মাধ্যমে বিপ্লবী তৎপরতার সময় সাল। পুর্ববঙ্গের গভর্নর র‍্যামফিল্ড ফুলার (Ramfield Fuller) এবং বাংলার লেফটেনান্ট গভর্ণর অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে (Andrew Fraser) হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯০৪ সালে কলকাতার মানিকতলায় মুরারিপুকুর অঞ্চলে এক বাগানবাড়ীতে একটি ধর্ম বিদ্যালয়ের আড়ালে বোমা তৈরীর কারখানা শুরু করেচিলেন অরবিন্দের ছোটভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন উপেন্দ্রনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বোমার তৈরীর দায়িত্ব পড়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের

ছাত্র উল্লাসকর দত্তের হাতে। ইউরোপ থেকে বোমা তৈরীর কৌশল শিখে এসেছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো। ১১ই আগস্ট ১৯০৮ সালে মানকিতালর বাড়ী তল্লাসি করে পুলিশ, অরবিন্দ, বারীন্দ্র সহ ছত্রিশজনকে গ্রেপ্তার করে। কলকাতার আলিপুর কোর্টে এদের বিচারের মামলা শুরু হল। আলিপুর বোমার মামলা বা মানিকতলা বোমার মামলা চলাকালীন বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী বিপ্লবীদের হাতে মারা গেলেন। মামলা চলাকালীন জেলের ভেতর রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করলেন কানাইলালা দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু। দুঃসাহসিক কাজ, খবর হয়ে বেরোনো মাত্র সাধারণ মানুনষ তাদের বিজয়ী বীর বলে অভিনন্দিত করল। কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেরন বসুর ফাঁসি হয়। আলিপুর বোমার মামলায় বিপ্লবীদের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। চিত্তরঞ্জন দাশের সওয়ালের ফলে অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হলেও উল্লাসকর, বারীন্দ্র এবং আরো তেরোজন বিপ্লবীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। অরবিন্দ কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। উত্তরপাড়া, চন্দননগর হয়ে শেষপর্যন্ত তিনি পণ্ডিচেরী চলে গেলেন। চন্দননগর এবং পণ্ডিচেরী দুইই ফরাসী উপনিবেশ ছিল। ইংরেজ বিরোধী ফরাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তার ছিল কিনা জানা যায় না। শেষপর্যন্ত তিনি রাজনীতির জগৎ এবং কর্মক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ দূরে চলে গিয়েছিলেন।

একই সময়ে পাঞ্জাবে কতগুলি গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। গুপ্তসমিতিগুলি গড়ে তোলার পেছনে যার সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তিনি একজন প্রবাসী বাঙালী জে.এম. চট্টোপাধ্যায়। ১৯০৬ সালে অরবিন্দের শিষ্য যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবী প্রচার কার্যের জন্য পাঞ্জাবে এসেছিলেন। পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের নেতা ছিলেন অজিত সিং এবং অম্বাপ্রসাদ। চরমপন্থী নেতা লাজপত রায় এদের সমর্থন করেছিলেন। মহাবিদ্রোহের পঞ্চাশ বছর পূর্তির বছর হিসেবে ১৯০৭-১৯০৮ সাল বিপ্লবীদের কাছে গভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য তৈরী করে ছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বিপ্লবীদের আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা হল।

অজিত সিং এর ভাই পরমানন্দ এবং হরদয়ালও এই সময়ে বিপ্লবী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯১২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে (Lord Hardinge) হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। হার্ডিঞ্জ আহন হন কিন্তু মারা যাননি। ভাইরসরয়ের ওপর এই আক্রমণ দেশ ব্যাপী চাঞ্চল্য তৈরী করে। বোমানিক্ষেপকারী কিন্তু ধরা পড়েনি। দ্বিতীয় চাঞ্চল্যকর ঘটনা হল লাহোরের লরেন্সগার্ডেনের ইংরেজ অফিসারদের হত্যার প্রচেষ্টা। লাহোরের গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন বসন্ত বিশ্বাস, দীননাথ, অবোধ বিহারী বালমুকুন্দ এবং আমির চাঁদ। গুপ্ত সমিতির পরিচালক রাসবিহারী বসু। অন্যরা ধরা পড়লেও রাসবিহারী বসুকে ধরা যায় না। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামালায় বাকীরা অপরাধী সাব্যস্ত হন। এদের সকলেরই ফাঁসির হুকুম হয়।

১৯০৯-১৯১১ সালের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবেকে নানা ভাবে দমন করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন বন্ধ করা যায়নি। অরবিন্দ ঘোষের নিষ্ক্রিয়তা, নানা বিভ্রান্তি তৈরী করলেও তা কেটে যেতে সময় লাগে নি। ১৯১১ সাল থেকে নতুন করে বিপ্লবী তৎপরতা শুরু হয়। ১৯১৪ সালে যতীন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বিদেশ থেকে বিশেষ করে ব্রিটেনের বিরোধী দেশগুলি থেকে অস্ত্রসংগ্রহ করার আয়োজন করেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে (পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ রায় বলে খ্যাত হন) বাটাভিয়া বা ইন্দোনেশিয়াতে পাঠানো হয়। প্রথমে ফাদার সি. আর মার্টিন (Father C.R. Martin) এবং পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে নরেন্দ্রনাথ বিখ্যাত হন। ঠিক হল ম্যাভেরিক (Maverick) নামে একটি জার্মান জাহাজে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বাংলার সুন্দরবন, উড়িষ্যার বালেশ্বর ও হাতিয়াতে বিদেশী অস্ত্র নামাবে। কিন্তু ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ আগেই খবর পেয়ে যাওয়ায় ম্যাভেরিক যাত্রা শুরু করতে পারেনি। ওদিকে অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, জ্যোতলাল, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন দাশগুপ্ত এবং বাঘা যতীন উড়িষ্যার বুড়িবালাম নদীর ধারে লুকিয়ে ছিলেন, এ খবর পুলিশ পেয়েছিল। কলকাতা থেকেই পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট (Charles Tegart) দলবল নিয়ে বালেশ্বর পৌঁছল। ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর, বুড়ীবালাম নদীর ধারে পুলিশের সঙ্গে যে সংঘর্ষ হয়, তাকে যুদ্ধ না বললে, অংশগ্রহণ কারীদের সাহস, বীরত্ব এবং তেজকে যথার্থ সম্মান দেখানো হয় না। সাদাকাপড় উড়িয়ে অবসন্ন এবং ক্ষতবিক্ষত যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ বন্ধ করার সংকেত দিলে পুলিশ গুলি চালানো বন্ধ করে। যতীন্দ্রনাথ এবং তার সহযোগীদের বীরত্বে স্বয়ং ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাদের সম্মান দেখিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ হাসপাতালে মারা যান। নীরেন দাশগুপ্ত এবং মনোরঞ্জন সেনগুপ্তর ফাঁসি হয়। জ্যোতিষের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কথিত আছে স্বয়ং টেগার্ট যতীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন বলেছিলেন, তিনিই একমাত্র বাঙালী, যিনি ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছেন (সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পৃ ৩৮৮)

বুড়ীবালামের ধারে বাঙালী সাহসী যুদ্ধে এবং যোদ্ধা বিপ্লবীদের মৃত্যু ও ফাঁসি, কিছুকালের মত বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন স্থগিত রাখল। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের কার্যক্ষেত্র এই সময়ে উত্তর প্রদেশের বাঁকি পুর, বেনারস এবং বিহারের পাটনা ও অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়েছিল। অন্যদিকে ভারতের বাইরে শ্যামজীকৃষ্ণ বর্মা, বিনায়ক সাভারকর ও হরদয়াল লণ্ডনে, এবং মাদাম কামা ও অজিত সিং ইউরোপে, ভারতীয়দের সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শে আকৃষ্ট করার চেষ্টা বজায় এবং সশস্ত্র সংগ্রামী বিপ্লবের ধারাকে সচল রাখলেন।

২(খ).২.৫ দ্বিতীয় পর্ব ঃ ১৯১৪-১৯১৯

পাঞ্জাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার গর্ডনের হত্যার ষড়যন্ত্রের অন্যতম অভিযুক্ত রাসবিহারী বসু বেনারসে পালিয়ে এসেছিলেন। সেখানে ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর সঙ্গে মারাঠি বিপ্লবী বিষ্ণু গণেশ পিংলের দেখা হল। কর্তার সিং নামে আরেক বিপ্লবীও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এক সর্বভারতীয় সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হল। কিন্তু পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার আগেই পুলিশি তৎপরতায় বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হন। ১৯১৫ সালের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় রাসবিহারী বসুকে

এক নম্বর আসামী সাব্যস্ত করা হয়, কিন্তু এবারও তাঁকে ধরা গেল না। লাহোর থেকে তিনি বাংলায় চলে এলেন। ১৯১৫ সালের ১২ই ছদ্মবেশে এবং পি.এন. ঠাকুর ছদ্মনামে, রাসবিহারী বসু জাপানে পালিয়ে গেলেন।

রাসবিহারী বসুর বাকী জীবন কাটে জাপানে। সেখান থেকে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্য অভিযুক্ত কর্তার সিং এবং গণেশ পিংলের ফাঁসি হয়।

দ্বিতীয় পর্বের সশস্ত্র জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে অনেকখানি প্রসারিত হয়েছিল। তাছাড়া এই সময়ের বিপ্লবী কার্যধারা ও আদর্শের ব্যাপ্তি, প্রথমপর্বের কার্যসূচীকে অনেক ভাবেই অতিক্রম করে গিয়েছিল। আগেকার বিপ্লবীদের শুধুমাত্র হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু সংস্কৃতি ভিত্তিক চিন্তাভাবনা এখন আর দেখা যায়না। ধর্ম এবং সম্প্রদায়কে অতিক্রম করে সেকুলার এবং রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনাকে অবলম্বন করে দ্বিতীয় পর্বের সংগ্রামীরা অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পৃথিবীর অন্য দেশগুলির রাজনৈতিক দর্শন এবং আন্দোলনগুলির সঙ্গে এক করার উদ্যোগও তারা নিয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন, তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করায় বিক্ষুব্ধ ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সরকারের বিরোধিতা প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে পাঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যে বিপ্লবী সচেতনতা প্রখর হয়ে ওঠে। লাহোর এবং পেশোওয়ারের বিপ্লবীদের নেতা হয়েছিলেন মৌলভি ওবেদুল্লাহ সিন্ধি। পরে এদের অনেকেই সীমান্ত পার হয়ে আফগানিস্তানে চলে যান। কাবুলে যে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠিত হয়েছিল রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ (হাতরাস জমিদার বংশের) ও বরকতুল্লার প্রচেষ্টায় তাতে তারা যোগ দিয়েছিলেন (১৯১৪-১৬)।

১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সংগ্রামী সশস্ত্র আন্দোলন পৃথিবীর অন্যত্র ব্যাপ্ত হল। পৃথিবীর অন্যত্র যেখানে ভারতীয়দের বসবাস সেই সব দেশে প্রবাসী ভারতীয়দের মনে বিপ্লবী সচেতনতা জাগিয়ে তোলার প্রয়াস শুরু হল।

১৯০৪-১৯০৫ থেকেই উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে পাঞ্জাবের জলন্ধর, হোসিয়ারপুর এই সব অঞ্চল থেকে পাঞ্জাবীদের যাওয়া শুরু হয়েছিল। ফিজি, মালয় এই সব অঞ্চলেও ভারতীয়দের বসবাস ছিল। এদের মধ্য অনেকেই ছিলেন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ভারতীয় সেনা। নতুন দেশে, নতুন জীবন তৈরী করার অভিপ্রায়ে তারা রওনা হয়েছিলেন। পশ্চিমী আদবকায়দায় অপরিচিত এবং অনভ্যস্ত এইসব ভারতীয়দের প্রতিপদে শ্বেতাঙ্গদের জাতিগত বৈষম্য ও অসহযোগিতার শিকার হতে হয়। অন্যদিকে ভারতসচিব চাইছিলেন না এইসব ভারতীয়রা পাশ্চাত্য সমাজ দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হোক, যাতে জাতীয়তাবোধে সচেতন হয়ে এরা নানা ধরনের আন্দোলন শুরু না করতে পারে। ১৯০৮ সাল থেকে ভারতীয়দের কানাডা আসার অনুমতি ক্রমশ সঙ্কুচিত করে দেওয়া হয়। তারকনাথ দাস নামে এক ভারতীয় ছাত্র 'Free Hindustan' কাগজে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর বক্তব্য হল এই

যে ফিজিতে ব্রিটিশ প্লান্টার (Planter)-দের কুলি মজুর হিসেবে ভারতীয়রে যাওয়া আসাতে ব্রিটিশ সরকার উদগ্রীব, কিন্তু উত্তর আমেরিকায় মোটেও রাজি নয়, কারণ সেখানে 'মুক্তি', 'স্বাধীনতা', ইত্যাদি চিন্তাভাবনায় তারা সংক্রামিত হতে পারে। তারকনাথ দাসের Free Hindustan-এ স্পষ্টতই জাতীয়তার সুর শোনা গেল। ১৯০৭ সালে রামনাথপুরি নামে এক রাজনৈতিক নির্বাসিতের প্রকাশিত Circular-e-Azadi তে শোনা গেল স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য। কানাডার ভ্যানকুভারে জি.ডি কুমার লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের অনুকরণে তৈরী করে ছিলেন স্বদেশ সেবক হোম। একই সঙ্গে গুরুমুখী ভাষায় একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হত। প্রথম প্রথম এই পত্রিকাটিতে সমাজ সংস্কারের কথা বলা হলেও শেষের দিকে এর লেখাগুলি ক্রমশ রাজনৈতিক চরিত্র নিচ্ছিল। এমন কি ভারতীয় সেনাদের ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথাও বলা হয়েছিল।

জি ভি কুমার এবং তারকনাথ দাস ভ্যানকুভার ছাড়তে বাধ্য হন। আমেরিকায় এসে সেখানকার সিয়েটল (Seattle) শহরে তারা ইন্ডিয়া হাউস নামে একটি সংগঠন তৈরী করলেন। এখানে তারা প্রতি শনিবার ভারতীয় শ্রমিকদের কাছে বক্তৃতার মাধ্যমে সমকালীন পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করতেন। ১৯১৩ সালে খালসা দিওয়ান সোসাইটির সঙ্গে একত্রিত হয়ে তাঁরা ভারতবর্ষে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান। ভাইসরয় বা পাঞ্জাবের লেফটেনান্ট গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করাটা প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলেও পাঞ্জাবের সর্বত্র এরা সমাবেশে মিলিত হন। অঞ্চলের সংবাদপত্রগুলিও তাদের সমর্থন করেছিল। এইভাবে দেশের বাইরের সংগঠরা, দেশের ভিতরের মানুষদের সঙ্গে সংযোগ তৈরী করেছিল। ১৯১৩ সালে ভগবান সিং নামে এক শিখ ভ্যানকুভারে পৌঁছন। ভগবান সিং খোলাখুলিভাবে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের অপসারণের কথা প্রচার করতে শুরু করেন। বন্দেমাতরম বিপ্লবীদের পরস্পরের সম্বোধন ধ্বনি হবে, একথাও ভগবান সিং বলেন। ভগবান সিং ভ্যানকুভার (Vancuver) থেকে বহিস্কৃত হলে, বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু হল আমেরিকায়। এই সময় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন লালা হরদয়াল নামে একজন রাজনৈতিক কর্মী। হরদয়াল কিছুকাল স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেছিলেন, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপের খবর তাঁকে উদ্দীপ্ত করে। হরদয়ালের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ভাই পরমানন্দ, সোহম সিং ভাকনা এবং হরনাম সিং তুণ্ডিলাত। হরদয়ালের বক্তব্য ছিল আমেরিকানদের সঙ্গে যুদ্ধ নয়, আমেরিকায় ভারতীয়রা যে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা পাচ্ছে তাই ব্যবহার করা হবে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। হরদয়াল সশস্ত্র সংগ্রামে সকলকে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। হরদয়ালের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে একটি কার্যকরী সমিতি তৈরী হল এবং একটি পত্রিকাও চালু করা হল। পত্রিকার নাম গদর। সানফ্রান্সিসকো শহরে গদর পত্রিকায় কেন্দ্রীয় অফিস তৈরী হল। বিভিন্ন শহরে শহরে মিটিং এবং আলোচনাও সংগঠিত করা হল। পোর্টল্যান্ডের প্রথম মিটিং এ গদর আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনও শুরু হয়ে গেল।

১৯১৩ সালে উর্দু এবং গুরুমুখী দুই ভাষায় গদর প্রকাশিত হয়। গদর কথাটির অর্থ হল বিপ্লব,

বিদ্রোহ। পত্রিকার শিরোনামে লেখা ছিল 'আংরেজ রাজ কা দুশমন'। অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের শত্রু। প্রথম সংখ্যাটিতে ইংরেজ সরকারের শাসনের ১৪ টি ক্ষতিকরনীতি কথা লেখা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে প্রধান ধরা হয়েছিল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, ভারতীয় কারিগরি শিল্পের ধ্বংস ইত্যাদি। এককথায় ইংরেজ সরকারের অপশাসনের বিবরণের যে কাহিনী ও ব্যাখ্যা জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাই সংক্ষিপ্ত আকারে গদরের প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছিল। গদরের প্রতিটি সংখ্যায় বারবার করে একটি বিষয়ের উল্লেখ থাকত— ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ছাপান্ন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, দ্বিতীয় বিদ্রোহের সময় এখন উপস্থিত। এছাড়া বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (The Indian War of Independence) লেখাটি ধারাবাহিকভাবে গদর পত্রিকাতেই প্রকাশিত হচ্ছিল। লোকমান্য তিলক, অরবিন্দ, বিনায়ক দামোদর, মাদাম কামা, শ্যামজীকৃষ্ণ বর্মা, অজিত সিং এদের লেখাও গদরের পাতায় প্রকাশিত হত। অনুশীলন সমিতি বা যুগান্তর দল, এমন কি রাশিয়ান গুপ্ত সমিতিগুলির কথাও থাকত।

গদরের প্রকাশিত কবিতাগুলির প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। 'গদর কি গুঞ্জ' নামে এগুলি ছেপে বিতরন করা হত বিনা পয়সায়। কবিতাগুলির বিপ্লবাত্মক ভাব তো ছিলই, কিন্তু বিশেষ করে লক্ষ্যণীয় ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতার সুর।

হিন্দু, শিখ, পাঠান এবং মুসলিম
এবং যারা সব সৈন্যবাহিনীতে আছো
শোনো আমাদের দেশকে লুণ্ঠন করছে
ব্রিটিশ
আমাদের যুদ্ধ করতে হবে,
এখন পন্ডিত আর কাজিকে দরকার নেই
পুজো উপাসনার সময় পার হয়ে গেছে,
এখন সময়, হাতে তলোয়ার নেওয়ার

প্রথম পর্বের ধ্যান ধারণা থেকে দ্বিতীয় পর্বের গদর বিপ্লবীদের মানসিকতা এবং চিন্তার পরিণতি যে অনেকটাই এগিয়ে ছিল। গদর প্রকাশিত এই কবিতাটি থেকে বোঝা যায়। (Bipanchandra and others. Indias struggle for Independence P 150)

উত্তর আমেরিকার ভারতীয়দের মধ্যে গদর প্রচারিত হলেও পরে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ, হংকং, চীন, মালয়, সিঙ্গাপুর, ত্রিনিদাদ এবং হনডুরাসে শেষপর্যন্ত ভারতেও গদর পৌঁছে গিয়েছিল। গদরের লেখাগুলি অপ্রত্যাশিত এবং অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া তৈরী করল। নানা জায়গায়, আলোচনা ও বিতর্ক হত লেখাগুলি নিয়ে। গদরের কবিতাগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরত।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে গদর পাঞ্জাবী অধিবাসীদের চরিত্র বদলে দিল। একদা যারা ব্রিটিশ রাজের

প্রভুভক্ত ছিল, তারাই এখন বিদ্রোহী সংগ্রামী। লালা হরদয়াল অবাক হয়ে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবী তরুণদের উদ্দীপনা দেখে। এর আগে তার মনে হয়েছিল, আগামী দশ বছরের মধ্যে বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা নেই। এখন তার মনের হল দশ বছর অনেকখানি সময়, যে কোন মুহূর্তে বিপ্লব শুরু হয়ে যেতে পারে। দশ বছরের প্রতীক্ষার দরকার নেই।

১৯১৪ সালে ২৫শে মার্চ নৈরাজ্যবাদী কাজকর্মের অভিযোগে হরদয়াল গ্রেপ্তার হন। যদিও সকলেরই ধারণা, ব্রিটিশ সরকারের হাত ছিল এতে। জামিনে মুক্তি পেয়ে হরদয়াল গোপনে আমেরিকা ছেড়ে চলে যান। এভাবে তাঁর সঙ্গে গদর আন্দোলনের সরাসরি যোগাযোগ হঠাৎই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ঐ বছরেরই মার্চ মাসে কোমাগাতামারু নামে একটি জাহাজে কিছু ভারতীয় কানাডার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। জাহাজটি ভাড়া করেছিলেন গুরু দিৎ সিং নামে একজন ব্যবসায়ী। পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে যাত্রীরা কানাডা অভিমুখে কর্মসন্ধানে রওনা হয়েছিল। যাত্রীরা সংখ্যায় ছিল ৩৭৬ জন। এর আগে কানাডার সরকার ভারত থেকে ভারতীয়দের কানাডায় আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট সরকারের আদেশ লঙ্ঘন করে ৩৫ জন যাত্রীকে কানাডায় আসার সুযোগ দেয়। গুরুদিত সিং এতেই উৎসাহিত হয়ে কোমাগাতামারু জাহাজের ব্যবস্থা করেছিলেন। কানাডার সরকার কিন্তু যাত্রীদের অবতরণে বাধা দেয়, যাত্রীদের নামতে দেওয়া হল না। এর কারণ অনেকগুলি; প্রথম, ভারতীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে কানাডিয়ানের অনীহা ছিল, তারা মনে করছিল এতে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যাঘাত ঘটবে। তাছাড়া গদর কর্মীদের প্রচার এবং বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম, কানাডার সরকারকে ত্রস্ত করেছিল। কোমাগাতামারুর যাত্রীদের সঙ্গে এই ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিদ্রোহের ডাক দিলেন, বরকতুল্লা খান, ভগবান সিং, রামচন্দ্র এবং মোহন সিং ভাকনা। এরই মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী জাহাজের কোন যাত্রীকেই কোনও বন্দরেই নামার অনুমতি দেওয়া হল না। অবশেষে যখন কলকাতার বজবজ বন্দরে জাহাজ পৌঁছল ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ক্ষুব্ধ যাত্রীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হল। তার কারণ যাত্রীরা সরকারের ঠিক করা ট্রেনে চড়তে অস্বীকার করেছিল, কারণ তাদের মনে হয়েছিল এই ট্রেনে তাদের নজরবন্দী করে পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাদের অনুমান কিন্তু ভুল ছিল না। বজবজের রক্তাক্ত যুদ্ধের পর পরই বিদ্রোহীদের একত্রিশ জনকে জেলে আটকে রাখা হয়, এবং বাকীদের ট্রেনে চাপিয়ে নজরবন্দী করে পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

কোমাগাতামারু জাহাজের ঘটনার পরেপরেই প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে ইংরেজদের প্রাথমিক অসুবিধার সুযোগে গদর বিপ্লবীরা আবুলান এ জঙ্গ বা যুদ্ধের ঘোষণা করল। মহম্মদ বরকতুল্লা খান, রামচন্দ্র, ভগবান সিং সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দিলেন। চীন, হংকং মালয়, জাপান, সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের হিন্দুস্তানে গিয়ে বিপ্লবে যোগ দেওয়ার ডাক দেওয়া হল। কর্তার সিং এবং রঘুবীর দয়াল গুপ্ত ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলেন। ভারত সরকার গদর পরিকল্পনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। ফলে ভারতীয় অভিবাসীদের, ভারতে পৌঁছন মাত্র, সন্দেহজনক এই অভিযোগে বিরাট সংখ্যককে গ্রেপ্তার করা হল, অন্যদেরও

গতিবিধি ওপর কড়া নজর রাখা হল।

যে আশা, উদ্দীপনা নিয়ে গদর বিপ্লবীরা এসেছিলেন অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তার অবসান ঘটল। পাঞ্জাবের বেশীর ভাগ মানুষ উদ্বেলিত হলনা। সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপনের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

সাংগঠনিক নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। ১৯১৫ সালে রাসবিহারী বসু পাঞ্জাবে পৌঁছলেন বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবার জন্য। রাসবিহারী সেনা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটগুলিতে গোপনে বিপ্লবী প্রচার কার্য শুরু করলেন। ঠিক হল ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ শুরু হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের সি.আই.ডি বিভাগ আগে ভাগে খবর পেয়ে যাওয়ার প্রায় সমস্ত বিদ্রোহী নেতাদের সকলেই গ্রেপ্তার হলেন। একমাত্র রাসবিহারী বসু পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

ইংরেজ সরকারের দমননীতি চূড়ান্ত আকার নিয়েছিল। পাঞ্জাবে মাণ্ডালে ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। পঁয়তাল্লিশ জন বিপ্লবীর ফাঁসির হুকুম হয়। ২০০ জনের কারাদণ্ড হয়। এভাবে প্রায় এক প্রজন্মের পাঞ্জাবের জাতীয়তা বাদী নেতৃত্বের অবসান ঘটানো হল।

বরকতুল্লা এবং মহেন্দ্রপ্রতাপের প্রচেষ্টায় স্বাধীন ভারত সরকার তৈরীর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

গদর বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহের সাফল্য তৈরী হল অন্যত্র। খুব সহজ ভাবে গদর বিপ্লবীরা সাধারণ স্বল্প শিক্ষিত মানুষের কাছে দাদাভাই নৌরোজীর সম্পদের নির্গমণের তত্ব থেকে শুরু করে অবশিল্পায়ন, ভারতীয় অর্থনীতির অবক্ষয়ের ইতিহাস, তিলকের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এবং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সম্বন্ধে সাভারকরের ব্যাখ্যা, পৌঁছে দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী অন্য সশস্ত্র বিপ্লবীদের লেখাও গদর পত্রিকায় ছাপা হত। এই লেখাগুলি একত্রিত ভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিবাদ, প্রতিকার এবং বিদ্রোহের ইতিহাস অভিবাসী ভারতীয়দের কাছে ব্যক্ত করেছিল। আধুনিক অর্থে গদর পত্রিকা এবং গদর গুঞ্জের কবিতাগুলি যথার্থ প্রচারপত্রের ভূমিকা নেয়।

গদর বিদ্রোহের দ্বিতীয় সাফল্য হল সাম্প্রদায়িক ঐক্য, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি এবং ঐক্যের সচেষ্ট সচেতন এবং সফল প্রয়াস এবং রূপায়ণ তৈরী করা। গদর বিপ্লবীদের মধ্যে কোন আঞ্চলিকতার প্রবণতা ছিল না। হিন্দু পাঞ্জাবী হরদয়াল অনায়াসে বরকতুল্লার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন একই বিপ্লবী চিন্তা ভাবনায়। অন্যদিকে বাঙালী রাসবিহারী বসুকে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব দিতে তাদের দ্বিধা ছিল না। তিলক, অরবিন্দ, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল দত্ত সবাই গদর বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণার আদর্শ ছিলেন। বাঙালী বিপ্লবীদের বন্দেমাতরম ধ্বনি তাদের পরস্পরের অভিবাদনের সম্বোধন ছিল। এভাবে জাতি ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশপ্রেমকে তারা সর্বভারতীয় চেতনায় উন্নীত করেছিলেন।

গদর বিপ্লবীরা নৈরাজ্য বাদ (anarchism), (Syndicalsim) সিন্ডিক্যালিজম সমাজবাদ্ বা Socialism,- এই সব ইউরোপীয় রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশ প্রেমের ধারণাকে

মিলিয়ে দেন। এটি তাঁদের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য বা অন্যতম সাফল্য ছিল। মুক্তি সংগ্রামের আকাঙ্খাকে শুধু মাত্র দেশকালের সীমায় আটকে না রেখে বৃহত্তর জীবন সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতীয় বিপ্লবকে তারা অন্য এবং ব্যাপকতর মাত্র দিয়েছিলেন।

গদর বিপ্লবীদের চতুর্থ সাফল্য হল, বিপ্লবের সংজ্ঞা ও ব্যাপ্তির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র তৈরী করা।

গদর বিপ্লবের প্রধান ত্রুটি হল প্রকৃত সংগঠনের অভাব। একটি বিপ্লবী আন্দোলন সফল করতে হলে যে সাংগঠনিক ব্যবস্থা, নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক সাহায্য এবং যথাযথ রণকৌশল দরকার, গদর বিপ্লবীদের এর কোনটিই ছিল না। ফলে বিপ্লব সফল হল না। চূড়ান্ত দমননীতি কর্তার সিং প্রমুখ পঁয়তাল্লিশজন বিপ্লবীদের ফাঁসি, বাকী কুড়ি জনের দীর্ঘকালীন কারাবাস, প্রায় এক জন্মের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়েছিল। পাঞ্জাবে বিপ্লবের কাজে ব্যাপৃত কোন নেতাই আর রইল না। ফলে আগামী দিনগুলিতে একটা শূন্যতা দেখা গেল।

২(খ).২.৬ তৃতীয় পর্ব ঃ ১৯২০-১৯৩৯

সশস্ত্র সংগ্রামী বিপ্লবীদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই চূড়ান্ত ভাবে দমন করা হয়েছিল। যুদ্ধের পর মন্টেগু-চেমসফোর্ড (Montagu Cheimsford) আইনের সংস্কারগুলি কার্যকরী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার বন্দী বিপ্লবীদের ছেড়ে দেয়। ১৯২০ সালে গান্ধীজীর অসহেযোগ আন্দোলন শুরু হল। গান্ধীজী চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতাদের তাগিদে বিপ্লবীদের কেউ কেউ এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। অন্যরা, এই বিপুল আকারের এবং অভিনব গণ আন্দোলনকে সফল করার জন্য কিছুকাল সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তাভাবনা এবং কাজকে স্থগিত রাখলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন আকস্মিক বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, অহিংস সত্যাগ্রহের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বহুজনের মনে সংশয় দেখা দিল। অসহযোগ আন্দোলন থেমে গেল— এই পরিস্থিতিতে অনেকেই সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে ঝুঁকলেন। তবু একথা মনে রাখা দরকার ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, সূর্যসেন, যতীন দাস, যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুখদেব—পরবর্তী পর্বের সশস্ত্র বিপ্লবীরা কিন্তু প্রাথমিক ভাবে অহিংস সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ আন্দোলনে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯২০ সালের পর থেকে একদিকে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং বিহার অন্যদিকে বাংলা, এই দুই অঞ্চল নিয়ে দুটি ধারায় সশস্ত্র বিপ্লবের পরবর্তী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দুটি ধারাতেই নতুন কিছু সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছিল। প্রথমটি হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্তর্নিহিত বিপ্লবী সম্ভাবনাকে জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম করার প্রচেষ্টা দেখা গেল। দ্বিতীয় প্রভাব এল রুশ বিপ্লব এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাফল্য থেকে। এর পাশাপাশি ভারতীয় কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীগুলির প্রভাব এবং ওয়াকার্স এ্যান্ড পেজান্টস পার্টি (Workers and Peasants Parties WWP) বা শ্রমিক,

কৃষক, দলের এই একটি সংগঠনে সংঘবদ্ধ হওয়া কম্যুনিজম, সোসালিজম, প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর গুরুত্ব তৈরী করা ইত্যাদি চিন্তা ভাবনাগুলি বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের ভিন্নতর পরিবেশ তৈরী করল।

১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে, কানপুরে, রামপ্রসাদ বিসমিল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, এবং সচ্চিদানন্দ সান্যালের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (Hindustan Republican Association) তৈরী হল। এই সংগঠনের প্রাথমিক কার্যসূচী হল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক, শাসনের অবসান ঘটানো এবং প্রাচীন ভারতের গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় তৈরী করা।

একটি কার্যসূচী রূপায়িত করার জন্য, প্রচার কার্য, তরুণ ভারতীয়রে আন্দোলনে সামিল করা, এবং অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া এই সব ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন ছিল। অর্থ সংগ্রহের জন্য হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি (Hindustan Republican Army) কিছু সদস্য ৯ই আগষ্ট ১৯২৫ লখনউ শহরের কাছে কাকোরি নামে একটি ছোট গ্রামে আট নম্বর ডাউন ট্রেনে ডাকাতি করে, রেলের সরকারি তহবিলের টাকা লুঠ করে। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় আসফাখউল্লা কান, রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন সিং এবং রাজেন্দ্র লাহিড়ীর ফাঁসির হুকুম হয়। বাকী চারজনকে আন্দামানে এবং সতেরোজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হল। চন্দ্রশেখর আজাদকে ধরা যায়নি।

কাকোরি মামলা উত্তর ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের আন্দোলনকে ঘোরতর আঘাত করলেও, আন্দোলনকে পুরোপুরি বন্ধ করতে পারেনি। চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্ব নতুন করে আন্দোলন শুরু হল, কিছু পরেই, উত্তরপ্রদেশে বিজয়কুমার সিনহা, শিববর্মা, জয়দেব কাহর আর পাঞ্জাবের ভগত সিং, ভগবতী চরণ ভোবা, এবং সুখদেব, পাঞ্জাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন। এই সময়ের বিপ্লবীরা সোসালিস্ট চিন্তাভাবনায় গভীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ৯ই এবং ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৮ দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা ময়দানে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনই ভবিষ্যৎ কার্যসূচী হবে, এই পরিকল্পনা নিয়ে দলের নতুন নামকরণ হল হিন্দুস্তান সোশালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন অথবা আর্মি। (Hindustan Socialist Republican Association or Army) ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষ করে দেশব্যাপী প্রতিবাদ সভা, মিছিল, হরতাল হয়। এরকমই একটি মিছিলে, পুলিশের লাঠি চার্জে, লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যু হল। পাঞ্জাবের সর্বজনপ্রিয় নেতা, শের ই পঞ্জাব লালা লাজপৎ রায়ের এ হেন মৃত্যুকে হিন্দুস্তান সোসালিস্ট দলের রোমান্টিক তরুণ নেতারা ইংরেজ সরকারের সরাসরি চ্যালেঞ্জ বলে মনে করল। ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৮ ভগত সিং, আজাদ এবং রাজগুরু লাহোরে পুলিশ সন্ডার্সকে (Saunders) হত্যা করলে। সন্ডার্স লাজপত রায়ের ওপর লাঠি চালানোর ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন। হত্যার পর হিন্দুস্তান রিপ্লাবিকান দল একটি প্রচারপত্র তুলে ধরে, তাতে বলা হল লক্ষ লক্ষ মানুষের অসীম শ্রদ্ধার নেতার মৃত্যু একজন সাধারণ পুলিশ কর্মচারীর হাতে,— এই ঘটনা সমগ্র জাতির পক্ষে অপমানজনক। ভারতের তরুণ দলের কর্তব্য এই অপমানে প্রতিশোধ নেওয়া, অপমানকে মুছে ফেলা, যে কোন ব্যক্তির হত্যাই অনভিপ্রেত। কিন্তু সরকারের অমানবিক আচরণের জন্য এবং অন্যায় একটি ব্যবস্থার অংশীদার

এই মানুষটির বিলুপ্তি একান্ত প্রয়োজন হিসেবে একে হত্যা করা হয়েছে। (Bipachandra, Indias Struggle for Independence P 249).

হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মির নেতারা বিপ্লবের আদর্শ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিপ্লবকে জনমুখি করতে চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সরকার নিরাপত্তা এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত দুটি বিল পাশ করাতে চাইছিল। সচেতন ভারতীয়দের মনে হয়েছিল বিল দুটি সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে শ্রমিকদের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। এরই সূত্র ধরে, বটুকেশ্বর দত্ত এবং ভগত সিং ৮ই এপ্রিল ১৯২৯ দিল্লীর সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্লির হলে বোমা ছুড়লেন কোন হত্যার উদ্দেশ্যে নয়। বধিত সরকারকে সাধারণ মানুষের বক্তব্যকে শোনানোর জন্য, এই ঘটনাকে প্রচার কার্যের মত ব্যবহার করে, সাধারণ মানুষকে সরকারের জনবিরোধী কার্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার জন্য।

ভগত সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, সুখদেব এবং রাজগুর বিখ্যাত মামলার প্রতিদিনের কাহিনী সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। বিচার চলাকালীন ভগত সিং এবং অন্যদের নির্ভীক সাহসী মনোভাব সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ ভগত সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুর ফাঁসি হয়। এর প্রতিবাদেই সারা দেশের মানুষ স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে অনুপস্থিত থেকে স্বতঃস্ফূর্ত শোক পালন করে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষ, অধ্যায় তৈরী করছিল। সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে রিপাব্লিকান এ্যাসোসিয়েশন নতুন আদর্শ এবং চিন্তাধারা তৈরী করেছল। ১৯২৫ সালে দলের ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে ব্যবস্থা মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার এবং শোষণ তৈরী করে, তার চূড়ান্ত অবসান ঘটানোই তাদের উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে বলা হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং কম্যুনিস্ট আদর্শ প্রচারই বিপ্লবীদের লক্ষ্য। দলের মুখপত্র রেভ্যুলিয়শনারি (Revultionary) তে যানবাহন ব্যবস্থা, বড় শিল্প এবং রেলপথগুলিকে জাতীয়করণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। মূল সংগঠিত সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলন তৈরী করাও দলের অন্যতম কাজ, একথাও বলা হয়েছিল।

আগেকার গোপন ষড়যন্ত্র এবং ব্যক্তি হত্যার কার্যসূচী বর্জন করে খোলাখুলি সশস্ত্র আন্দোলনই সঠিক পন্থা, একথা এসময়ে বিপ্লবীদর মনে হয়েছিল। তাছাড়া হিন্দু মুসলমান এবং অন্যধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনই হওয়া উচিৎ এমন কথাও তারা বলেছিলেন।

হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নেতা ভগত সিং ছিলেন আগেকার যুগের বিপ্লবী অজিত সিং এর ভাইপো। ভগতসিং একজন বুদ্ধিজীবী ছিলেন। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব (Bolshevik) এবং সোভিয়েত আন্দোলন ইটালি এবং আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন আন্দোলনগুলি তাকে প্রভূত প্রভাবিত করেছিল। ভগত সিং এবং সুখদেব দলের সদস্যদের পাঠচক্রের মাধ্যমে নিয়মিত বিপ্লবী এবং কম্যুনিস্ট চিন্তাধারায় শিক্ষিত করতেন। এমন কি জেলের ভেতরেও তিনি রীতিমত একটি লাইব্রেরী তৈরী করেছিলেন এবং পাঠচক্রের ব্যবস্থা করেন। ভগত সিং মনে করতেন, যে কোন বিপ্লবে, উদ্দেশ্য

চিন্তা এবং আদর্শের ভূমিকাই মুখ্য- অতএব সেই চিন্তা এবং আদর্শকে স্পষ্ট এবং বিস্তারিত ও গভীর ভাবে জানা দরকার। সুখদেব ভগবতীচরণ ভোরা, শিব ভার্মা, বিজয় সিনহা, যশপাল প্রত্যেকেই বুদ্ধিজীবী ছিলেন। এমন কি চন্দ্রশেখর আজাদ যিনি ইংরেজী কমই জানতেন, কিন্তু চাইতেন তার কাছে স্পষ্টভাবে সব কিছু ব্যাখ্যা করা হোক। মূলত তার তাগিদেই ভগবতী চরণ ভোরা ফিলসফি অফ দি বম্ব (Philosophy of the Bomb) বইটি রচনা করেছিলেন। বইটিতে বিপ্লববাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পাঞ্জাব নওজোয়ান ভারত সভা বা লাহোর ছাত্র ইউনিয়নের মত সংগঠনগুলি ছিল বিপ্লববাদ প্রচারের উপযুক্ত জায়গা। একক ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ নয়, সচেতন মানুষের সংগঠিত, সশস্ত্র খোলাখুলি সংগ্রাম, সঠিক পথ একথাই ভগত সিং এবং তার সহযোদ্ধাদের অভিমত ছিল।

অধ্যাপক বিপান চন্দ্রের মতে সন্ত্রাসবাদ থেকে গণ আন্দোলনের আদর্শে পরিবর্তিত হওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা এবং স্বাভাবিক সময়কালের প্রয়োজন ছিল, বিপ্লবীদের ব্যগ্রতা এবং অতিব্যস্ত তাগিদের কারণে তা সম্ভব হল না। তাছাড়াও দলের কর্মী নির্বাচনের সমস্যা ছিল। কর্মীদের শিক্ষিত করার মধ্যেও তাড়াহুড়োর ব্যাপার ছিল। তবু হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন জাতীয়তাবাদের নতুন সংজ্ঞা তৈরী করেছিল। জাতীয়তাবাদে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদের নিপাত নয়। সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে, জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলেও সমস্ত রকম শোষণ, উৎপীড়নের অবসান ঘটিয়ে সর্বব্যাপী সকল মানুষের মুক্তিই সঠিক জাতীয়তাবাদ। স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকও বটে। এভাবে ভগত সিং এবং তার সহকর্মীরা সশস্ত্র বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিলেন। মার্কসবাদী দর্শনে বিরোধী ছিলেন। ফলে সাধারণ নিপীড়িত মানুষের শোষণ ও অত্যাচারের থেকে মুক্তি স্বাধীনতার যুদ্ধের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। ভগত সিংদের প্রস্তাবিত স্বাধীনতার যুদ্ধে ধর্মের কোন ভূমিকা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এবং নাস্তিক ভগতসিং ধর্ম এবং কুসংস্কারের উর্দ্ধে যুক্তিবাদী চিন্তা ও বলিষ্ঠ নির্ভীক ভাবনায় সহকর্মী সহযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন।

ভগত সিং-এর ফাঁসির পরে পরেই আরেকটি ঘটনা দেশবাসীকে আলোড়িত করেছিল। জেলের ভেতরে বিচারাধীন বিপ্লবীরা জেলের অব্যবস্থা এবং একথ্য শোচনীয় অবস্থার প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিল। এই সঙ্গে তাদের দাবী ছিল, তাদের যেন সাধারণ অপরাধী নয় রাজবন্দী হিসেবে দেখা হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর চোষট্টি দিন অনশনের পর রাজবন্দী যতীনদাসের মৃত্যু হয়। যতীনদাসের মরদেহ ট্রেনে লাহোর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসার পর প্রতিটি স্টেশনে হাজার হাজার মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য জমায়েত হয়েছিল। কলকাতায় ছ লাখ মানুষের আড়াই মাইল লম্বা শোভাযাত্রা তার মরদেহ অনুসরণ করে।

বাংলাতেও এইসময় বিপ্লবীরা দলবদ্ধ হচ্ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিপ্লবীদের একদল চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করে। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর কংগ্রেসের মধ্যে দুটি দল

তৈরী হয়— সুভাষচন্দ্র বসু এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের আলাদা নেতৃত্বে। অনুশীলন দলের সদস্যরা যোগ দিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর সঙ্গে। যুগান্তর দলের সদস্যরা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

ইতিমধ্যে ১৯২৪ সালে গোপীনাথ সাহা, কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে অন্য আরেকজন ইংরেজকে হত্যা করলেন। বিচারে গোপীনাথ সাহা দোষী সাব্যস্ত হন এবং তার ফাঁসি হয়। এই সময় থেকে এইধরনের নির্দয়, অমানবিক বিচার এবং শাস্তির বিরুদ্ধে জনমত ক্রমশ সরব হচ্ছিল। গোপীনাথ সাহার ফাঁসি এবং সেই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারে কিছুকালের জন্য বাংলার রাজনৈতিক জগতে শূন্যতা তৈরী করল। পুরোনো অনুশীলন এবং যুগান্তর দলের সদস্যদের মধ্যেও কর্মসূচী নিয়ে বিবাদ হচ্ছিল। সশস্ত্র বিপ্লববাদ কি স্থগিত হল, এমন ভাবনা চিন্তা শুরু হওয়ার আগেই, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সংগ্রামী বিপ্লবের নতুন পর্ব শুরু হল। এই পর্বের নেতা হলেন মাস্টার সূর্য সেন।

চট্টগ্রামের জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। এই জন্যই সেই অঞ্চলের মানুষেরা তাকে মাস্টারদা বলত। সূর্য সেন মাস্টারদা নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৬-২৮ সালের মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য তিনি গ্রেপ্তার হল। প্রতিভাবান সংগঠক হিসাবে সূর্যসেনের খ্যাতি ছিল। তার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় মানবিকতার বড় ভূমিকা ছিল। একজন বিপ্লবীর বড় ধর্ম হচ্ছে মানবিকতা, এ কথা তিনি সবসময়ে মনে করতেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই সূর্যসেন তার চারপাশে উৎসাহী আদর্শবাদী তরুণদের সমাবেশ তৈরী করলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল এবং আরও অনেকেই। এই দলের কার্যসূচীর প্রধান লক্ষ্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরোয়া না করে মুখোমুখি সংগ্রাম শুরু করা। চট্টগ্রামকে মুক্ত স্বাধীন অঞ্চলে পরিণত করা প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেললাইন উপড়ে দিয়ে চট্টগ্রামকে সমগ্র ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত দশটায় পরিকল্পনা কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভারতীয় গণতান্ত্রিক সেনাবাহিনী, চট্টগ্রাম শাখা এই নামে গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে প্রথম চট্টগ্রামের পুলিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়। অন্যদিকে লোকনাথ বলের নেতৃত্বে (Auxilliary) অক্সিলিয়ারী ফোর্সের অস্ত্রাগারও আক্রমণ করা হল। কিন্তু মুশকিল হল যে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিপ্লবী আক্রমণকারীরা অস্ত্রগুলি কোথায় ছিল তার খোঁজ পেলেন না। এর ফল শোচনীয় হয়েছিল। সেই মুহূর্তে অবশ্য সূর্যসেন 'বন্দেমাতরম' এবং 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির সঙ্গে সাময়িকভাবে বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলেন। সকাল হওয়ার আগেই বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে আশে পাশের পাহাড়ে পালিয়ে যান। জালালাবাদ পাহাড়ের ওপরে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংগ্রাম শুরু হয়। যুদ্ধে বারোজন বিপ্লবীর মৃত্যু হল। এরপর সূর্যসেন চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে তার দল নিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন। সরকার পক্ষের তল্লাসি এবং ভয়ানক শাস্তি সত্ত্বেও গ্রামের মানুষরা, যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান খাদ্য

এবং আশ্রয় দিয়ে বিপ্লবীদের লুকিয়ে রাখে। এই ভাবে প্রায় তিন বছর আত্মগোপন করে থাকার পর ১৬ই ফ্রেবুয়ারি ১৯৩৩ সূর্যসেন ধরা পড়লেন। ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪ সূর্যসেনের ফাঁসি হল। সহযোদ্ধাদের প্রায় সকলেরই দীর্ঘকাল কারাবাস বা আন্দামানে দ্বীপান্তর হল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনী তৎকালীন বাংলায় কিংবদন্তীর মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। পরবর্তীকালের পর্যালোচনাতেও এই সংগ্রাম ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে। বিশ শতকের তিরিশের দশককে বাংলার ইতিহাসে বিপ্লবের দশক বলে অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুর পরোয়া না করে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে বিপ্লবীদের বীরত্ব ও সাহসিকতার যুদ্ধ কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরত, এই সময়।

বহু তরুণ বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সংগ্রাম তখনও তীব্র; ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেলের হত্যা এবং অন্তত দুজন গর্ভনরকে হত্যার চেষ্টা, এই সব ঘটনায় পরিষ্কার, বোঝা যায় সংগ্রামী বিপ্লবীরা তখনও তৎপর।

ঘটনার দ্রুততায় এবং অতর্কিত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের আকস্মিকতায় ব্রিটিশ সরকারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আতঙ্ক। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই বিমূঢ় ভাব কেটে গিয়ে প্রবল ভাবে দমননীতি প্রয়োগ করা হল। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে চট্টগ্রামে সরকারী সন্ত্রাসের শাসন শুরু হয়। অন্যত্র, সর্বত্র, নানাধরনের দমন মূলক আইন তৈরী করে, সংগ্রামী বিপ্লবকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করার সরকারী প্রচেষ্টা চলল। সর্বভারতীয় জাতীয় নেতারাও গ্রেপ্তার হলেন। বিপ্লবীদের অভিনন্দন জানানোর জন্য জওহরলাল নেহেরুকেও রাজদ্রোহিতার অপরাধে দুবছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল।

বিশের এবং তিরিশের দশকের বাংলার বিপ্লবীরা আগেকার ধর্মীয় বাতাবরণের বাইরে চলে এসেছিলেন। আগের মত তারা আর ধর্মীয় শপথ বা প্রতিজ্ঞা নিতেন না। হিন্দুত্বকে অতিক্রম করে মুসলমানদের সঙ্গে বিপ্লবী যোগাযোগ এই দশকের বিপ্লবের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। চট্টগ্রাম বেভুলিউশনারী আর্মির অনেক সদস্যই ছিলেন মুসলমান। সাত্তা, মির আহমেদ, ফকির আহমদ খান, টুনু মিঞা, এরা সব সক্রিয় কর্মী ছিলেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা গ্রামবাসী মুসলমানদের সক্রিয় সাহায্য পেয়েছিলেন। তবু কোথাও একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। বিপ্লবীরা, চাষী, শ্রমিক, অগণিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে সামাজিক অর্থনীতিক যোগাযোগ করতে পারেন নি। এটাই তাদের ত্রুটি, ব্যর্থতা।

বিশের এবং তিরিশের দশকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একটা বড় লক্ষণ ছিল তরুণ মেয়েদের বিপ্লবী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে গৃহের অভ্যন্তর থেকে এবং বাইরের জগতেও মেয়েরা সংগ্রামী বিপ্লবের অংশীদার হয়েছিলেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে সরলাদেবী, ভগিনী নিবেদিতা বা আনি বেসান্ত (Annie Basant) পরে মাদাম কামা, বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। মাদাম ভিকাজি কামা ১৯১৮ সালে জার্মানীর স্টু গার্ট শহরের আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। মাদাম কামাই প্রথম ইউরোপের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। এ ছাড়া বন্দেমাতরম নামে একটি কাগজ লালা হরদয়ালের সহায়তায় বার করেছিলেন। লন্ডনে ফ্রি ইন্ডিয়ান সোসাইটি নামে একটি সংগঠন করেন, উদ্দেশ্য ছিল প্রবাসী ভারতীয়দের একত্রিত করার।

কিন্তু ব্রিটেনের দমননীতি ও নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ফ্রান্সে পালিয়ে যান, সেখানে বিপ্লবীদের ঘাঁটি তৈরী হয়। মাদাম কামা জার্মানির ভারতীয় বিপ্লবীদের বার্লিন কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

মাদাম কামার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিশ শতকের বিশ এবং তিরিশের দশকে বহু মেয়ে নিজেদের বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই দুই দশকে মেয়েদের পড়াশোনাও বিস্তার পেয়েছিল। কুড়ির দশকের শেষ, এবং তিরিশের দশকে নারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রসারিত। নারীশিক্ষা ও সচেতনতা মুক্তি সংগ্রামেরই আরেকটি দিক, এবং পরিপূরক আন্দোলন এ কথা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই সময়। এ ব্যাপারে কলকাতার বেথুন কলেজের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সরকারী কলেজ হিসেবে বেথুন কলেজের ছাত্রীদের প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আবাসিক কলেজের সুরক্ষার কারণে বহু ছাত্রী পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে পড়তে আসতেন। পূর্ববঙ্গ তখন বিপ্লবী রাজনীতির কেন্দ্রস্থল, এদের মধ্যে অনেকেই কলেজের ছাত্রী থাকাকালীনই বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষে, বেথুন কলেজের ছাত্রীরা কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং সরকারী শিক্ষা বিভাগের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে একজোট হয়ে হরতাল পালন করেছিলেন। শিক্ষা অধিকর্তা ওটেন সাহেবের মত জবরদস্ত মানুষের চোখ রাঙানিতেও তারা ভয় পাননি। হরতালে যোগ দেওয়ার জন্য কিছু ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে বীনা দাশ, কল্যাণী দাশ, ইলা সেনগুপ্তর নেতৃত্বে দীর্ঘকাল ব্যাপী আন্দোলন চলে। শেষ পর্যন্ত ছাত্রীরাই জয়ী হয়। কলেজের বাইরে, ছাত্রীরা সুভাষচন্দ্র এবং সরলাদেবীর সমর্থন পেয়েছিলেন। বীনা দাশ, কল্যানী দাশ, কমলা দাশগুপ্ত, ইলা সেনগুপ্ত এরা সকলেই পরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষ ভাবে বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। বলা যেতে পারে কলেজের ঘটনায় তাদের রাজনীতির হাতে খড়ি হয়েছিল।

কমলা দাশগুপ্ত বিপ্লবী দলে বোমা পাচারের কাজে যুক্ত ছিলেন। যুগান্তর দলের দীনেশ মজুমদার তার শিক্ষা গুরু ছিলেন। ১৯৩০ সালে ডালহৌসি বোমা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বীনা দাশ বি.এ. পরীক্ষার কনভোকেশনের সময় গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসেনকে (Stanley Jackson) গুলি করার প্রচেষ্টা করেন গুলি গভর্নরের গায়ে লাগেনি। কিন্তু বীণা দাশ গ্রেপ্তার হন এবং সাতবছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাশের মত প্রীতিলতা ওয়াহেদ্দারও তিরিশের দশকে বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন এবং তাদের মতই কলেজের ছাত্রী থাকাকালীন গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামী রাজনীতির আদর্শে বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রীতিলতা মাস্টারদা সূর্যসেনের দলে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা কয়েকজন বিপ্লবীদের সাথে চট্টগ্রামের পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। ক্লাবের একজন মারা যান। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে প্রীতিলতা সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। উজ্জ্বলা মজুমদার দার্জিলিং এ গভর্নর অ্যান্ডরসন (Anderson) কে হত্যার ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে উজ্জ্বলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। পরে হাইকোর্টের আপিলে তা কমিয়ে চোদ্দ বছর করা হয়েছিল।

শান্তিঘোষ, সুনীতি চৌধুরী ১৯৩১ সালের কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করেছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হয়েছিল ওদের। ১৯৩৯ সালে গান্ধীজীর সুপারিশে এরা মুক্তি পেলেন। কল্পনা দত্ত মাস্টারদা সূর্য সেনের দলের সহযোদ্ধা ছিলেন। ১৯৩৩ সালে, সুর্যসেনকে জেল থেকে বার করে আনার এক ষড়যন্ত্র কল্পনা দত্ত অন্যান্যদের সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে লড়াইতে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেও ১৯৩৯ সালে একইভাবে গান্দীজির সুপারিশে মুক্তি পেয়েছিলেন। পরবর্তী কালের বহু সশস্ত্র সংগ্রামীদের মত কল্পনা দত্ত মার্কসবাদী রাজনীতিতে পরিবর্তিত হন।

তিরিশের দশকেই সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। সরকারের দমননীতির ফলে বিপ্লবীদের সংখ্যাও ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৩১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে, এলাহাদাবাদের একটি পার্কে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে চন্দ্রশেখর আজাদের মৃত্যু হয়। আজাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার অঞ্চলের সশস্ত্র বিপ্লব বন্ধ হয়ে গেল। সূর্যসেনের মৃত্যু বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকেও রোধ করল। জেলে, আন্দামানে, কারাবন্দী বিপ্লবীরা নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। বিপ্লবীদের বড় অংশ মার্কসবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হলেন। এরা কম্যুনিস্ট পার্টি, এবং অন্য বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে যুক্ত হন। বিপ্লবীদের আরেকটি দল গান্ধীজীর কংগ্রেসে যোগ দেন।

সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনে কতগুলি গুরুতর সীমাবদ্ধতা ছিল। সবচেয়ে বড় কথা এদের রাজনীতি কখনই কোন রকম গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। একমাত্র ভগত সিং ছাড়া, অন্য নেতারা ব অন্য সংগঠন গুলি এ বিষয়ে সে রকম কোন চিন্তা করেনি। সাধারণ মানুষ— কৃষক, শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা এবং চেতনায় সংঘবদ্ধ করার কথাও ভাবা হয়নি।

তবুও ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিপ্লবীদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এদের সাহস, আত্মত্যাগ, তেজ ভারতীয় চেতনায় গভীর দাগ কেটেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে এবং সম্মুখ সংগ্রাম বা আক্রমণের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারকে তারা ত্রস্ত, বিপর্যস্ত, এবং ভীত করেছিল, ইতিহাসে তার প্রমাণ থেকে গেছে।

২(খ).৩ সারাংশ

ভারতবর্ষের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সময়কাল উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, জাতীয়তাবোধ স্পষ্টভাবে সেই সময় জেগে না উঠলেও, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সংগ্রামকে যদি জাতীয়তাবোধের প্রকাশ বলা হয় তা হলে, অষ্টাদশ শতকের কিছু কৃষক আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামের একটি পূর্বতন ধারা আগেই ছিল।

বিশ শতকের সূচনায় চরমপন্থী থেকে পরবর্তী সংগ্রামী আন্দোলনের জন্ম হয়। বহু সংগঠন, সংবাদপত্র এবং ব্যক্তি মানুষের চিন্তাভাবনা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদকে পরিণত রূপ দিয়েছিল। প্রথম

পর্বে ১৯০৬-১৯১৪ এই পর্বে, মহারাষ্ট্র, বাংলা এবং পাঞ্জাবে সংগ্রামী সশস্ত্র আন্দোলনের চরিত্র ছিল এইরকম— গোপন সংগঠন ও ষড়যন্ত্র, অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীকে শাসকপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নিয়ে অতর্কিতে হত্যা করা। এই হত্যার মাধ্যমে শাসকপক্ষের মধ্যে সন্ত্রাস তৈরী করাই প্রথম পর্বের বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ছিল। ধরা পড়ার পর তাদের বিচারকার্যের বিবরণগুলি প্রচার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম পর্বের বিপ্লবীরা হিন্দু ধর্মের গন্ডীর বাইরে যেতে পারেন নি। ধর্মের নামে শপথ এবং প্রতিজ্ঞা তাদের অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এই পর্বের বিপ্লবীদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন বাংলার ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ এবং বারীন্দ্র, প্রফুল্লচাকী, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহারাষ্ট্রের চাপেকর এবং সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়।

দ্বিতীয় পর্বের সংগ্রামী আন্দোল, ভারতবর্ষ থেকে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই পর্বের আন্দোলনের বিশেষত্ব হল ধর্মের এবং সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করে, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস। এই ব্যাপারে গদর পত্রিকা এবং গদর আন্দোলন তৎকালীন ইংরেজ সরকারকে কানাডা, আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সন্ত্রস্ত করে রাখে। গদর আন্দোলন শুরু করেছিলেন লালা হরদয়াল। একই সময় কোমাগাতামারু জাহাজের ঘটনা, এবং বজবজের যুদ্ধ, সংগ্রামী আন্দোলনকে অন্য এবং ব্যাপকতর মাত্রায় নিয়ে যায়।

তৃতীয় পর্বের সূচনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। এই পর্বের নায়ক হলেন ভগত সিং, এবং তার সহযোদ্ধারা। হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন সশস্ত্র বিপ্লবকে কম্যুনিস্ট দর্শনের প্রভাবে সকল শ্রেণীকে একত্রিত করে মুখোমুখি সংগ্রামে পরিণত করেছিল। বাংলায় সূর্যসেন, মাস্টারদা, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং কল্পনা দত্ত, চট্টগ্রাম বাহিনী তৈরী করে সংঘবদ্ধ লড়াইতে চট্টগ্রাম স্বাধীন করার প্রচেষ্টা নেন।

তৃতীয় পর্বের সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জাতীয় সংগ্রামে, মেয়েদের অংশ গ্রহণ। বহু অল্পবয়েসী মেয়েরা, সরাসরি লড়াইতে, অথবা, বোমা, রিভলবার পাচারের কাজ করে বিপ্লবের অংশীদার হন।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের অনেক ত্রুটি ছিল। তবু কংগ্রেস পরিচালিত মূলধারা জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লব, ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তৈরী করেছিল। বস্তুত ইংরেজ সরকারকে সশস্ত্র বিপ্লবীরাই সন্ত্রস্ত ও ভীত করেছিল। এখানেই সশস্ত্র বিপ্লবের সাফল্য।

২(খ).৪ অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন—

১। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের পটভূমি আলোচনা কর।

২। সংগ্রামী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম পর্বের আলোচনা কর।

৩। বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে গদর আন্দোলনের ভূমিকা কি ছিল?

প্রবন্ধ রচনা কর—

১। হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন এবং ভগৎ সিং।

২। চট্টগ্রামে অভ্যুত্থান ও চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা।

৩। সংগ্রামী বিপ্লবী আন্দোলনে ইতিহাসে মেয়েদের ভূমিকা।

টীকা লেখো—

(ক) মাদাম কামা, (খ) প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, (গ) চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়, (ঘ) অনুশীলন ও যুগান্তর, (ঙ) বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে, (চ) শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, (ছ) বাঘা যতীন, (জ) ক্ষুদিরাম, (ঝ) মারাঠা ও কেশরী, (ঞ) ভবানী মন্দির, (ট) সরলা দেবী, (ঠ) ওকাকুরা, (ড) গদর কি গুঞ্জ।

দু এক কথায় উত্তর দাও।

(ক) 'মিত্রমেলা' কারা স্থাপন করেছিলেন এবং কোথায়?

(খ) বালসমাজ ও আর্যবান্ধব সমাজ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

(গ) 'অনুশীলন সমিতি' প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন কে ?

(ঘ) 'গদর শব্দের অর্থ কি?

(ঙ) 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকেশন এ্যাসোসিয়েশন' এর মুখপত্রের নাম কি ছিল?

(চ) কোন বিখ্যাত বিপ্লবী জাপানে পালিয়ে যান?

(ছ) বীনা দাশ কাকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করেন, এবং কোথায়?

(জ) কল্পনা দত্ত পরবর্তী জীবনে কোন রাজনৈতিক দর্শন গ্রহণ করেন?

২(খ).৫ উদ্দেশ্য

1. Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K.N. Panikkan, Sucheta Mahajan : India struggel for Independence, Penguin Books, 1989.
2. সুপ্রকাশ রায়. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, DNBA Brothers কলকাতা ১৯৭০।
3. কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬৪।

একক ৩(ক) ❑ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতের রাজনীতি এবং গান্ধী

গঠন

৩(ক).০ উদ্দেশ্য

৩(ক).১ প্রস্তাবনা

৩(ক).২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতবর্ষ

৩(ক).৩ মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন

৩(ক).৩.১ সম্ভাবনা

৩(ক).৩.২ অসন্তোষ

৩(ক).৪ গান্ধীর আবির্ভাব এবং প্রাথমিক আন্দোলনসমূহ

৩(ক).৪.১ চম্পারন সত্যাগ্রহ

৩(ক).৪.২ খেড়া সত্যাগ্রহ

৩(ক).৪.৩ আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ

৩(ক).৪.৪ রাওলাট সত্যাগ্রহ

৩(ক).৫ ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর ভূমিকা

৩(ক).৫.১ গান্ধী, সত্যাগ্রহ এবং অহিংস আন্দোলনের আদর্শ

৩(ক).৫.২ গান্ধীর আবেদন এবং জনপ্রিয়তা

৩(ক).৬ সারাংশ

৩(ক).৭ অনুশীলনী

৩(ক).৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩(ক).০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানবেন ঃ

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি।
- ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর উত্থানের প্রেক্ষাপট।
- রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীর জনসাধারণের কাছে আবেদনের কারণ।

৩(ক).১ প্রস্তাবনা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তথা ভারতের রাজনৈতিক জীবনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর অবদান শত্রু-মিত্র সকলের কাছেই অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক এবং আদর্শগত ভাবে যারা গান্ধীর সঙ্গে একমত নন তাঁরাও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীর নেতৃত্বকে খাটো করে দেখেন না, কারণ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গান্ধী ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির এবং রাজনৈতিক চেতনার মূর্ত প্রতীক। এই এককে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট আলোচিত হবে।

এই এককের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন কীভাবে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধী সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং অচিরেই ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। সবশেষে গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শ এবং তাঁর আবেদন, উভয়ের মাধ্যমে গান্ধীর নেতা হিসাবে জনপ্রিয়তার কারণ আলোচিত হবে।

৩(ক).২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতবর্ষ

১৯১৪ সালে ইউরোপের একটি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন কেউই অনুমান করতে পারেনি যে সেই যুদ্ধ প্রায় চার বছর ধরে চলবে, এবং রণাঙ্গন হবে বিশ্বের একটা বড় অংশ। যুদ্ধ চলতে থাকার ফলে বিশ্বের বহু অংশে অপ্রত্যাশিত কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলতে থাকে। যুদ্ধরত অবস্থায় ব্রিটেনকে আর্থিক এবং সামরিক সাহায্যের জন্য বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিকে তাকাতে হয়। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা অর্থাৎ সাম্রাজ্যের যে সমস্ত অঞ্চলে খানিকটা স্বশাসন আগেই দেয়া হয়েছিল তারা ডমিনিয়ন (Dominion) স্বশাসনের মাত্রা বাড়ানোর শর্তে ব্রিটিশ সামরিক প্রয়াসকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল। ভারতবর্ষ তখন স্বশাসনের অধিকার না পাওয়াতে ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরাই নিঃশর্তে ভারতবর্ষের তরফে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন।

ভারতীয় রাজনীতিবিদরাও অবশ্য ব্রিটেনের যুদ্ধপ্রয়াসে অকুণ্ঠ সমর্থনের ঘোষণা করেন, এবং অনেকেই (যেমন তিলক, পরে গান্ধী) যুদ্ধ প্রয়াসকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিবিদদের আশা ছিল যুদ্ধ শেষ হলে ভারতবর্ষ অন্যান্য ডমিনিয়নের মত স্বশাসন পাবে। বালগঙ্গাধর তিলক এবং অ্যানি বেসান্ত "হোমরুল" আন্দোলন গড়ে তোলেন ১৯১৬ সাল থেকে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল স্বশাসনের পক্ষে জনমত গড়ে তুলে স্বশাসন বা Home rule-এর দাবি জোরদার করা।

এ সময়ে ব্রিটিশ সরকারও প্রথমে পরোক্ষভাবে এবং পরে প্রত্যক্ষভাবে এই আশার পুষ্টি করে। ১৯১৭ সালে ভারতসচিব এডউইন মন্টেগু ঘোষণা করেন যে ক্রমশ স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দায়িত্বশীল সরকার স্থাপন করাই ভবিষ্যতের ব্রিটিশ নীতি। ফলে ভারতের রাজনীতিতে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যায়।

ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পড়ে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ থেকে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়তে থাকে, এবং শিল্পদ্রব্যের যোগান সমানুপাতে না

বাড়ায় পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। একই সময়ে কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রেও মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকে, যার মূল প্রভাব পড়ে সাধারণের ভোগ্য কৃষিপণ্যের ওপর। বস্তুত কৃষিপণ্যের বাণিজ্যীকীরণের সূচনার সময় থেকেই, অর্থাৎ ১৮৭০-এর দশক থেকেই উন্নতমানের কৃষিপণ্য (যেমন ধান, গম) চাষের প্রবণতা বাড়ে, এবং সাধারণ গ্রামবাসীর মূল খাদ্য পণ্য (জোয়ার, বাজরা, অড়হড়) চাষের প্রবণতা কমে। ফলে ধান বা গমের মূল্যবৃদ্ধির থেকেও বেশি বৃদ্ধি হয় অনুন্নত মানের কৃষিপণ্যের। যুদ্ধকালীন চাহিদা যোগানের থেকে অনেক বেশি হওয়াতে যেখানে গমের দাম ৫০% মতন বাড়ে সেখানে বাজরার মূল্য হয়ে যায় প্রায় দ্বিগুণ। তাই, যুদ্ধের ফলে লাভবান কিছু লোককে বাদ দিলেও ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবনযাত্রার মানে অবনতি দেখা দেয়।

জীবনযাত্রার মানের অবনতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। সরকারি রাজস্ব নীতিতে কৃষকের বিপন্নতা আরও বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধকালীন সেনাবাহিনীতে সৈন্য নিয়োগের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কিছুটা ভার লাঘব হলেও ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শান্তির পরে সেনারা ঘরে ফিরলে গ্রামীণ অর্থনীতির সংকট এক নতুন মাত্রা পায়। ঘরে ফেরা সৈনিকদের কৃষি অর্থনীতিতে পুনর্বার কর্মসংস্থান সহজ ছিল না। বিশেষত যুদ্ধকালীন কৃষি পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায়। একই ভাবে নগরাঞ্চলেও যুদ্ধ-ফেরত সেনাকে বিকল্প কর্মের সন্ধান দেয়া মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়—বিশেষ যুদ্ধকালীন শিল্পপণ্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায়।

সব মিলিয়ে ১৯১৮ সালে যুদ্ধের অবসানের সময় ভারতবর্ষে আশা-হতাশার দোলাচল দেখা দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতেই পাশ হয় ভারত শাসন আইন।

৩(ক).৩ মন্টেগু চেম্‌সফোর্ড আইন

১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন (Government of India Act) পাশ হয়। ভারত সচিব এডউইন মন্টেগু এবং ভাইসরয় লর্ড চেম্‌সফোর্ডের নামানুসারে এটিকে মন্টেগু চেম্‌সফোর্ড বা মন্ট-ফোর্ড আইনও বলা হয়।

মন্ট-ফোর্ড আইনে সর্বভারতীয় এবং প্রাদেশিক শাসনকাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সৃষ্টি হয়। (কাউন্সিল অফ্ স্টেট এবং লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লী) যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই হবে নির্বাচিত, কিন্তু শাসনবিভাগের ওপর আইনসভার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

প্রাদেশিক সরকারের ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয় দ্বৈতশাসন (Dyarchy)। এর মাধ্যমে কয়েকটি মন্ত্রকের (যেমন, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ করে দেয়া হয়।

ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫৫ লক্ষ, এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষেত্রে তা হয় ১৫ লক্ষ। মুসলিম এবং অন্য সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীতেও ভোটারের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়।

মন্ট-ফোর্ড আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ-আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং ভারতীয় সহযোগীদের সংখ্যাবৃদ্ধি। বিশ্বযুদ্ধের জন্য যে ঋণভার ব্রিটেনকে বহন করতে হচ্ছিল তার থেকে অব্যাহতি পেতে সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাজস্ব আদায় এবং ব্যয় উভয়ই আঞ্চলিক প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়ে কেন্দ্রীয় কাঠামোর ওপর ভার লাঘব করাই ছিল শ্রেষ্ঠ পন্থা। ব্রিটিশ রাজনেতাদের অভিপ্রায় ছিল এই আর্থিক- প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের যুক্ত করে দেয়া। ভারতীয় নেতারা আঞ্চলিক শাসনের সঙ্গে যুক্ত হলে তাঁদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা অনেকটা প্রশমিত হবে, এবং তাঁরা সাম্রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের সহজেই মিলিয়ে নিতে পারবেন—এতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহযোগীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হবে।

৩(ক).৩.১ সম্ভাবনা

ব্রিটিশ সরকারের অভীষ্ট যাই থাকুক না কেন, মন্ট-ফোর্ড আইন ভারতীয় রাজনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন আনে। ১৯১৯-এর ওই আইনের সম্ভাবনাগুলি তৎকালীন রাজনীতিবিদদের চোখ এড়িয়ে যায়নি, যদিও সবকটি সম্ভাবনাই যে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, তাও নয়।

ভোটার সংখ্যা একবারে বহুগুণ হয়ে যাওয়ায় অকস্মাৎ সমাজের অনেক স্তরের লোকেদের রাজনৈতিক তাৎপর্য বেড়ে যায়। ফলে প্রাক-যুদ্ধ পর্বে যে দেখা মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবী-দাওয়াতে, তা ১৯১৯-এর পরে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। রাজনীতির পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের প্রয়োজন থেকে জন্ম নেয় জনমুখী রাজনৈতিক আন্দোলন, যাতে সমাজের বহু উপেক্ষিত মানুষের সমস্যা জনসমক্ষে চলে আসে। তৎকালীন নেতাদের অগোচরেই ভারত গণতন্ত্রের পথে চলতে শুরু করে।

প্রাদেশিক শাসনভারের সীমিত বিকেন্দ্রীকরণ যুদ্ধ-পূর্ব পূর্বের হতাশাব্যঞ্জক আবহের অবসান ঘটায়। সরকারি নীতি প্রণয়ন এবং কার্যকর করার ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে অংশগ্রহণ করার অধিকার দেবার ফলে ভারতীয় নেতাদের সামাজিক তথা রাজনৈতিক গুরুত্ব পায়। আপাতদৃষ্টিতে এতে ব্যক্তি রাজনীতিবিদের লাভ হলেও, প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির গুরুত্ব এবং কার্যকারিতা জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হবার অবকাশ জন্মায়। পরবর্তীকালীন রাজনীতির ধারা এই সম্ভাবনাকে আরও প্রকট করে দেয়।

৩(ক).৩.২ অসন্তোষ

মন্ট-ফোর্ড আইনে সন্তুষ্টির তুলনায় অসন্তোষের সঞ্চার বেশি হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি ভারতে যে প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল, ১৯১৯ সালের দ্বৈত শাসন প্রকল্প তার খুব অল্পই পূরণ করতে সক্ষম হয়। মন্ট-ফোর্ড আইন ছাড়াও, যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে একাধিক কারণে ক্ষোভের সঞ্চার হয় যা রাজনৈতিক হতাশাকে আরও তীব্র হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

দ্বৈতশাসনের অন্যতম ত্রুটি ছিল ভারতীয়দের হাতে তুলে দেয়া মন্ত্রকগুলির চরিত্র থেকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি মন্ত্রকগুলিতে ক্ষমতা ছিল কম কিন্তু দায়িত্ব ছিল বেশি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে ব্রিটিশ নীতির জন্য ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল। নীতির সার্বিক পরিবর্তনের প্রয়োজন থাকলেও তার জন্য

আবশ্যক অর্থ মন্ত্রকগুলির হাতে ছিল না। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক ব্রিটিশ পদাধিকারীদের হাতে ছিল, এবং ভারতীয়দের হাতে তুলে দেয়া মন্ত্রকের নেয়া যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করার অধিকার প্রাদেশিক গভর্ণর এবং ভারতের ভাইসরয়ের থাকার ফলে কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটানোয় সাংবিধানিক সমস্যাও ছিল। ফলে বহু ভারতীয়ের মনে হয়েছিল যে মন্ট-ফোর্ড আইনের মাধ্যমে শাসনের ক্ষেত্রে খুব অল্পই স্বাধিকার দেয়া হয়েছে।

এই হতাশা যুদ্ধোত্তর সামাজিক পরিস্থিতির জন্য রাজনৈতিক ভাবে আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, শিল্পক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন চাহিদার অবসানের দরুণ শিল্পক্ষেত্রে মজুরী হ্রাস এবং কর্মী ছাঁটাই, যুদ্ধফেরত সৈনিকদের পুন কর্মসংস্থানের সমস্যা— সব মিলিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব চরমে ওঠে। মন্ট-ফোর্ড আইনে ভোটাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ধরনের সমস্যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

অতএব, ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষে তীব্র রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য পরিস্থিতি অনুকূল ছিল। রাজনৈতিক এবং সামাজিক অসন্তোষের মিশ্রণের ফলে অসহিষ্ণুতা উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র একই সময়ে দেখা দেয়ায় দেশব্যাপী আন্দোলনের সম্ভাবনাও ছিল উজ্জ্বল। প্রয়োজন ছিল দেশব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা সম্পন্ন কোন নেতা বা সমষ্টিগত নেতৃত্বের। এই পটভূমিকাতেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

৩(ক).৪ গান্ধীর আবির্ভাব এবং প্রাথমিক আন্দোলনসমূহ

গান্ধীর রাজনীতিতে হাতেখড়ি দক্ষিণ আফ্রিকায়। আইনজীবী হিসাবে সেখানে গেলেও ব্যক্তিগতভাবে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়ে গান্ধী রাজনৈতিকভাবে সচেতন হন। এর পরে সেখানকার সরকার অ-শ্বেতাঙ্গদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আইন প্রয়োগ করলে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী বা কর্মরত ভারতীয়দের যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার রূপকার ছিলেন গান্ধী।

বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন গান্ধী ভারতবর্ষে ফিরে এসেই সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেননি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে গান্ধী সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি বোঝার চেষ্টা করেন। ইতোমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনের আংশিক সাফল্য রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক, কিন্তু সচেতন ভারতবাসীকে এক বিকল্প রাজনীতির সন্ধান দেয়।

গান্ধীর এই বিকল্প রাজনীতির প্রতিভূ হিসাবে আগমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার আগে অবধি ভারতীয় রাজনীতির তিনটি ধারা—অর্থাৎ কংগ্রেসের নরমপন্থী এবং চরমপন্থী ধারা তথা সশস্ত্র বিপ্লব—কোনটিই কোন প্রত্যক্ষ সাফল্য আনতে পারেনি। সেই তুলনায় গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন (যা ক্রমাগত চেষ্টায় সত্যের দ্বারা বিপক্ষকে তার অনায্য অবস্থান প্রসঙ্গে সচেতন করে দেয়) দৃশ্যতই দক্ষিণ আফ্রিকার বৈষম্যমূলক আইন পরিমার্জনে সফল হওয়ায় অনেক বেশি আশাব্যঞ্জক ছিল। এই আশায় সওয়ার হয়েই চম্পারণের পীড়িত সেখানকার কিছু ব্যক্তি কৃষকদের হয়ে গান্ধীর সাহায্য চেয়েছিলেন এবং সেই সূত্রেই গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ।

৩(ক).৪.১ চম্পারণ সত্যাগ্রহ

বিহারের চম্পারণ জেলায় কৃষক অসন্তোষ চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। রামনগর, বেতিয়া এবং মধুবন অঞ্চলের জমিদারদের থেকে ঠিকাদারী লিজ নিয়ে ইউরোপীয় নীরকর সাহেবরা ঊনবিংশ শতাব্দীতেই তিনকাঠিয়া ব্যবস্থা চালু করে, যার অনুসারে প্রতি এক বিঘা জমির অন্তত তিন কাঠাতে নীল চাষ করতে হবে, এবং তা নামমাত্র মূল্যে নীলকরদের হাতে তুলে দিতে হবে। ১৮৬০-এর দশক থেকেই এর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা যায়, কিন্তু এই অসন্তোষ চরমে ওঠে ১৯০০ সাল থেকে। ইউরোপে বস্ত্রশিল্পে ব্যবহার্য কৃত্রিম রঙ আবিষ্কারের পরে নীলের চাহিদা বহুলাংশে হ্রাস পায়। নীলচাষ তেমন লাভবান না থাকায় নীলকরেরা চাষীদের দুটি বিকল্প দেন নীলচাষ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য শারাবেশী (খাজনা বৃদ্ধি) অথবা তাওয়ান (নীলকরের ক্ষতিপূরণ বাবদ থোক অর্থ)। কৃষকেরা এই দাবি মানতে না পেয়ে আবেদন, নিবেদন এবং আদালতে বিচার প্রার্থনা করে বিরোধিতা চালাতে থাকলেও সাফল্য আসে নি।

এহেন পরিস্থিতিতে চম্পারণের এক সম্পন্ন কৃষক রাজকুমার শুক্লা ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে গান্ধীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রথমে ইতঃস্তত করলেও শুক্লার পীড়াপীড়িতে গান্ধী ১৯১৭ সালে চম্পারণে যান। গান্ধী চম্পারণ ঘুরে দেখতে থাকাকালীন তাঁকে ঘিরে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাতে নীলকর সাহেবরা আতঙ্কিত হয়ে গান্ধীকে বিরত করতে সরকারকে চাপ দেন। সরকার তাঁকে বিরত করার চেষ্টা করলে গান্ধী এর বিরোধিতা করেন। চম্পারণের কৃষক এবং বিহারের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও গান্ধীর পাশে দাঁড়ানোতে সরকার গান্ধীর যাতায়াতের থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেয় এবং গান্ধীর দাবি অনুসারে একটি কমিশন নিযুক্ত করে। কমিশনের সুপারিশ অনুসারে তিনকাঠিয়া ব্যবস্থা রদ হয়ে যায় এবং মোট দেয় খাজনা বৃদ্ধির হার ২৬% থেকে কমিয়ে ২০% করা হয়। গান্ধী খাজনাবৃদ্ধির হার কমালেও খাজনাবৃদ্ধি নীতিগতভাবে মেনে নেন কারণ নীলকর এবং কৃষকদের সহাবস্থানের জন্য সংঘাত এড়ানোই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন।

পরবর্তীযুগের সমালোচকদের মতে (যেমন সুমিত সরকার) চম্পারণে তিনকাঠিয়া ব্যবস্থার অবসান ছাড়া গান্ধী প্রকৃত কোন সাফল্য অর্জন করেননি। কিন্তু এই সামান্য সাফল্যের বিশাল একটা মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যও ছিল। ইতিপূর্বে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি বা সংগঠন সাধারণ লোকের দৈনন্দিন কেন সমস্যাকে সমাধানের কোন সরাসরি চেষ্টা করেননি। সে তুলনায় গান্ধীর প্রচেষ্টা এবং সাফল্য (তা সে যতই সীমিত হোক) দুই-ই ছিল সমান অপ্রত্যাশিত। এর ফলে রাতারাতি আঞ্চলিক একটি সমস্যা সারা দেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং গান্ধীর সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হয়।

আঞ্চলিক রাজনীতির সূত্র ধরে গান্ধীর সর্বভারতীয় রাজনীতিতে আসার জন্য যে সাংগঠনিক ভিত দরকার ছিল, তাও চম্পারণেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজকুমার শুক্লা, সন্ত রাউত, প্রভৃতি সম্পন্ন চাষী, স্থানীয় মহাজন বণিক, মোক্তার এবং পীর মহম্মদ, হরবন্স সহায়ের মত স্কুলশিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তিরা চম্পারণে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু প্রাদেশিক রাজনীতিতে গান্ধীর প্রভাব বিস্তারে আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন মফঃস্বল এবং শহরতলি অঞ্চলের পেশাজীবীরা। যেমন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, অনুগ্রহ নারায়ণ সিনহা, জ. ব. কৃপালানী প্রভৃতি। জুডিথ ব্রাউন এঁদের বলেছেন গান্ধীর রাজনীতির "সহ-ঠিকাদার (Sub-

contractor), যাদের সাহয্যে গান্ধীর আঞ্চলিক রাজনীতির সোপান বেয়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে উত্তরণ।

৩(ক).৪.২ খেড়া সত্যাগ্রহ

চম্পারণের সাফল্যের সুবাদে ১৯১৮ সালে গুজরাতের খেড়া অঞ্চলের বাসিন্দারা গান্ধীর সাহায্য প্রার্থনা করে। এক্ষেত্রে গান্ধীর সাফল্য ছিল খুবই সীমিত, কিন্তু আন্দোলন শুরু করার সুবাদেই গান্ধীর ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়।

গুজরাতের খেড়া অঞ্চলে কুনবি-পতিদার শ্রেণীর জমির স্বত্বভোগী কৃষক শ্রেণী মূলত আমেদাবাদ অঞ্চলের জন্য খাদ্যশস্য, তামাক এবং তুলা উৎপাদন করত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরা সমৃদ্ধি উপভোগ করলেও ১৯৮৮ থেকে বারংবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মহামারীর দরুন অর্থনৈতিক দুঃসময়ের সম্মুখীন হয়। ডেভিড হার্ডিমান দেখাচ্ছেন যে ছোট পতিদার শ্রেণীর পক্ষে এই সঙ্কট আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে কারণ বড় পতিদার শ্রেণীর লোকেরা বৈবাহিক পণ বা যৌতুকের সুবাদে সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় রাখলেও, কুলীন না হওয়াতে ক্ষুদ্র পতিদাররা সেই পথ অবলম্বন করতে পারেনি। ১৯১৭-১৮ সালে শস্য ভাল না হওয়ার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য যেমন কেরোসিন এবং নুনের দাম বাড়ে। তার ওপর কৃষি-শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত বাড়াইয়া জাতির লোকেরা তাদের মজুরী বাড়িয়ে নিতে সফল হওয়ায় ক্ষুদ্র পতিদারদের প্রায় নাভিঃশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়।

১৯১৭ সালে খেড়ার বাসিন্দারা গান্ধীর সাহায্য চাইলে গান্ধী প্রথমে ইতস্তত করেন, কিন্তু ১৯১৮ সালে তিনি এগিয়ে আসেন। ১৯১৮ সালে শস্য ভাল হওয়াতে খাজনা মকুবের দাবি সফল হয়নি ঠিকই কিন্তু গান্ধী কিছু ছাড় আদায় করতে পেরেছিলেন।

খেড়ার সত্যাগ্রহের ফলে বিহারের মতই বিহারেও গান্ধী কিছু অনুগামী পেয়েছিলেন। যেমন শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, ইন্দুলাল যাগ্নিক এবং মহাদেব দেশাই। যারা গান্ধীর আঞ্চলিক রাজনীতি ভিত নির্মাণ এবং জাতীয় রাজনীতিতে উত্তরণে সহায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল খেড়ায় গান্ধীর শুরু করা দীর্ঘমেয়াদী কৃষি-প্রকল্পগুলি। খেড়া অঞ্চলের বহু গ্রামীণ সংগঠন এবং গঠনমূলক কাজের সুবাদে গ্রমীণ উন্নয়নের মাধ্যমে গান্ধীয় রাজনীতির যে দূর্গ তৈরি হয়েছিল তা স্বাধীনতা সংগ্রামে জন আন্দোলনগুলির সময়ে খুব কার্যকরী সাব্যস্ত হয়েছিল।

৩(ক).৪.৩ আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ

গান্ধীর খেড়া আন্দোলনের প্রায় সমসাময়িক ছিল আমেদাবাদ শিল্পাঞ্চলে সত্যাগ্রহ। আমেদাবাদে শিল্পাঞ্চলে প্লেগের দরুন একটি বাড়তি ভাতা দেয়া হত। ১৯১৭ সালে আমেদাবাদের সুতির মিলের মালিকেরা ব্যয় সঙ্কোচনের উদ্দেশ্যে এই ভাতা বন্ধ করার চেষ্টা করে। মূল্যবৃদ্ধির সময়ে এই পদক্ষেপ শ্রমিক স্বার্থবিরোধী হবার ফলে মিল শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ভাতা বন্ধের বিনিময়ে শ্রমিকেরা মজুরিতে ৫০% বৃদ্ধি দাবি করেছিল, মালিকেরা ২০% এর বেশি দিতে রাজি ছিল না।

এমতাবস্থায় গান্ধীর গুণমুগ্ধ শিল্পপতি অম্বালাল সারাভাই গান্ধীকে মধ্যস্থতা করতে আহ্বান করেন।

গান্ধী সমাধান সূত্র হিসেবে মজুরির ৩৫% বাড়ানোর কথা বলেন, কিন্তু মালিকেরা প্রথমে তা মানতে রাজি ছিলেন না। ১৫ই মার্চ গান্ধী প্রথম অনশনে বসেন, এবং অনতিবিলম্বেই মালিক পক্ষের সম্মতি আসায় বিষয়টির মীমাংসা হয়ে যায়।

সাধারণত বলা হয় যে, ধর্মঘটী শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতেই গান্ধী অনশনে বসেন। কিন্তু জুডিথ ব্রাউন জেলা শাসকের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে গান্ধীর মালিকপক্ষের সঙ্গে নৈকট্য নিয়ে শ্রমিকদের বক্রোক্তির ফলেই গান্ধী অনশনে বসেন।

উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, গান্ধীয় রাজনীতির "সাফল্যের" ধারাকে অব্যাহত রেখেছিল আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ। মালিক-শ্রমিক সংঘাতকে গান্ধী শ্রেণী সংগ্রামের আলোকে দেখতে নারাজ ছিলেন। তাঁর মতে মালিক-শ্রমিক সহাবস্থান এবং সহযোগিতাই ছিল এঁদের সম্পর্কের মূল কথা। মধ্যস্থতামূলক এই দৃষ্টিভঙ্গী শিল্পপতি গোষ্ঠীকে গান্ধীর প্রতি আকৃষ্ট করে, এবং গান্ধীকে রাজনীতির অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসাবে দাঁড়াতে উদ্যোগী করে। অন্য ক্ষেত্রে শ্রমিক এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের চোখে গান্ধীর রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং ভাবমূর্তিকে আরও ইতিবাচক ভাবে প্রতিষ্ঠা করবে।

৩(ক).৪.৪ রাওলাট সত্যাগ্রহ

সর্বভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় গান্ধীর প্রবেশ ১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্র ধরে।

দ্বৈত শাসন প্রকল্পে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে বলে সরকারি এবং বেসরকারি শ্বেতাঙ্গ মহলে এক আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল। এই আশঙ্কা দূর করতে ভারতীয় সামাজিক তথা রাজনৈতিক অধিকারের ওপর যুদ্ধকালীন বিধিনিষেধ স্থায়ী করার সুপারিশ করে বিচারপতি রাওলাটের অধীনে রাজদ্রোহ বিষয়ক কমিটি (১৯১৮)। ওই সুপারিশ অনুসারে ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে ভারত প্রতিরক্ষা আইন (Defence of India Act) বা রাওলাট আইন পাশ করা হয়। এই আইন অনুসারে রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপের সন্দেহের ভিত্তিতেই দুবছর অবধি যে কাউকে বিনাবিচারে বন্দী রাখা যেতে পারে। রাজদ্রোহের সংজ্ঞা রাখা হয় অত্যন্ত ব্যাপক—এমনকি রাজদ্রোহমূলক বলে ঘোষিত পুস্তিকা কারও কাছে পাওয়া গেলে তা হবে রাজদ্রোহের সমান অপরাধ।

যদিও রাওলাট আইন কেবল সক্রিয় রাজনীতিবিদদের কথা ভেবেই তৈরি হয়েছিল, তাও জনমানসে এই আইন চরম ক্ষোভের উদ্রেক করে। এর কারণ ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ তাদের উগ্র, দমনমূলক পন্থার জন্য এমনিতেই কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। সেই পুলিশের হাতেই বর্ধিত ক্ষমতা দেয়ায় রাওলাট আইন সাধারণ ভারতবাসীর অবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়েই দিয়েছিল।

ভারতের রাজনৈতিক জগতের সবাই রাওলাট আইনের বিরোধিতায় মুখর হলেও দেশব্যাপী অহিংস কিন্তু সক্রিয় প্রতিবাদের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন গান্ধী। নরমপন্থীরা চাইছিলেন চিরাচরিত আবেদন নিবেদনেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে। চরমপন্থীরা ব্রিটিশ সরকারকে কর দেয়া থেকে জনগণকে বিরত রাখতে চাইছিলেন গান্ধী প্রথমে এর পরিবর্তে প্রস্তাব করেন যে, স্বেচ্ছাসেবীরা প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক পুস্তিকা বিক্রি করে গ্রেপ্তারবরণ করে রাওলাট আইনকে অকার্যকরী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। পরে,

২৩ মার্চ ১৯১৯ সালে গান্ধী ৩০শে মার্চ দেশজোড়া হরতালের ডাক দেন। পরে তিনি হরতালের দিন বদলে ৬ই এপ্রিল ধার্য করেন, যাতে সমস্ত আয়োজন ঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায়।

রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে হরতালের অভিনবত্বই রাওলাট সত্যাগ্রহকে একটা আলাদা মাত্রা এনে দেয়। একটি বিশেষ দিনে একটি বিশেষ কারণে সারাদেশের গতি স্তব্ধ করে দেয়া একাধারে ভারতীয় সংহতি এবং ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকারের সূচক ছিল। ফলে ব্যক্তিগতভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও গান্ধী বিভিন্ন জায়গা থেকে সমর্থন পান। দেশজুড়ে বিস্তৃত হোমরুল সংগঠনগুলি গান্ধীকে লোকবল এবং অর্থবল দিয়ে সহায়তা করে। কারণ ইতিপূর্বে অ্যানি বেসান্তের অন্তরীণ হবার বিরুদ্ধে হোমরুল সমর্থকদের গান্ধী সমর্থন করেছিলেন। অনুরূপভাবে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কারাবাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সুবাদে গান্ধী আনসারি এবং মৌলানা আব্দুল বারির নেতৃত্বে উত্তর ভারতের মুসলিম রাজনীতিবিদদের রাওলাট আন্দোলনের সময় পাশে পেয়েছিলেন।

রাওলাট সত্যাগ্রহকে সুসংহত রূপ দিতে গান্ধী স্বয়ং “সত্যাগ্রহ সভা” প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল প্রচারমূলক পুস্তিকা, ক্রোড়পত্র বিলি করা এবং রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে “সত্যাগ্রহ শপথে” হস্তাক্ষর সংগ্রহ করা। সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস এই আন্দোলনে যুক্ত না থাকলেও মহারাষ্ট্র এবং বাংলায় কংগ্রেস সংগঠন গান্ধীর এই উদ্যোগ সমর্থন করতে এগিয়ে আসে। ব্যক্তিগতভাবে গান্ধী সত্যাগ্রহের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতীয় বিভিন্ন শহরে মার্চ এবং এপ্রিল মাসে ঝটিকা সফরে যেতে থাকেন।

সামগ্রিকভাবে দেখলে বোঝা যায় যে সাংগঠনিক দিক থেকে রাওলাট আন্দোলন ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এই আন্দোলন সীমিত ছিল মূলত নগরাঞ্চলে এবং এর পুরোভাগে ছিল প্রধানত নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ৩০শে মার্চ এবং ৬ই এপ্রিল, দুটি দিনই প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ভবে হরতাল পালন করা হয় ভারতবর্ষে অধিকাংশ শহরেই। তবু আন্দোলনের প্রাবল্য অনুভূত হয় অমৃতসর, লাহোর, গুজরানওয়ালা প্রভৃতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে, আমেদাবাদ, দিল্লী, বম্বে এবং খানিকটা কলকাতায়।

রাওলাট সত্যাগ্রহ প্রবলতম আকার নেয় পাঞ্জাবে। যুদ্ধের আগে থেকেই অর্থনৈতিক কারণে পাঞ্জাবে উত্তেজনার পারদ চড়ছিল। ১৯১৭ সালের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের দাম মজুরীর থেকে চারগুণ বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিস্থিতি এমনিতেই ছিল অগ্নিগর্ভ। এই সময়ে আর্য সমাজের ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ এবং ইকবালের আহ্বানে মুসলিম জাগরণেরও সূত্রপাত ঘটে। ফলে গান্ধী রাওলাট সত্যাগ্রহের ডাক দেয়াতে পাঞ্জাবে ভিন্নধর্মী বহু সামাজিক তথা রাজনৈতিক ধারা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সুযোগ পায়। ৩০শে মার্চ এবং ৬ই এপ্রিলের হরতাল সর্বাত্মকভাবে সফল হওয়াতে হিন্দু-মুসলিম-শিখ ঐক্য দেখে পাঞ্জাবের শাসক ও ডায়ার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন, এবং অসন্তোষের প্রাণকেন্দ্র অমৃতসরে সামরিক শাসন জারি করেন। সামরিক শাসন বলবৎ করতে পাঠানো জেনারেল ডায়ার বৈশাখী উৎসবের দিন সমস্ত সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার কথা না জেনে জালিয়ানওয়ালাবাগে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত হলে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ডায়ার সহস্রাধিক নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। এতে সরকারী মতে ৩৭৯, বেসরকারীর মতে সহস্রাধিক লোক প্রাণ হারান।

অমৃতসরের দমনমূলক নীতি পাঞ্জাবের অন্যত্রও অনতিবিলম্বে অনুসৃত হয়। দিল্লীতে গান্ধীকে প্রবেশাধিকার না দেবার প্রতিবাদে ১০ থেকে ১৩ই এপ্রিল লাগাতার হরতাল চলতে থাকে। কিন্তু সমাজের নিম্নবর্ণের সহিংস আন্দোলনের প্রবণতা থেকে মধ্যবিত্তশ্রেণী আন্দোলন থেকে সরে আসে। গান্ধীর বিরুদ্ধে নেওয়া ব্রিটিশ পদক্ষেপের প্রতিবাদে আমেদাবাদে ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হয় যাতে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা ছিল বেশি। তুলনায় বম্বে ছিল শান্তিপূর্ণ যদিও ১০-১১ এপ্রিল ৪৮ ঘণ্টা ব্যাপী বন্ধে বম্বে কার্যত অচল হয়ে যায়। কলকাতায় উত্তরভারতীয় হিন্দু এবং মুসলিমরা হরতালে অংশগ্রহণ করলেও বাঙালী, বিশেষত যুবসমাজের অনুপস্থিতি অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়েছিল।

মুষ্টিমেয় কিছু শহর বাদ দিলে প্রায় সর্বত্রই আন্দোলন কালক্রমে হিংসার দিকে ঝুঁকছিল। বিশেষত আমেদাবাদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধী রাওলাট আন্দোলনকে “Himalayan Blunder” বলে প্রত্যাহার করে নেন। (১৮ এপ্রিল ১৯১৯)।

রাওলাট সত্যাগ্রহের সরাসরি কোন সাফল্য নজরে পড়ে না, কারণ রাওলাট আইন রদ করা হয়নি। তবু গান্ধীর রাজনৈতিক উপস্থিতি এই সত্যাগ্রহের মাধ্যমে আঞ্চলিকতার গণ্ডী কাটিয়ে উঠে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। শুরু হয় গণ আন্দোলনের যুগ।

৩(ক).৫ ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর ভূমিকা

৩(ক).৫.১ গান্ধী, সত্যাগ্রহ এবং অহিংস আন্দোলনের আদর্শ

গান্ধীবাদী রাজনীতি তৎকালীন সমস্ত রাজনৈতিক পন্থার থেকে স্বতন্ত্র ছিল। নরমপন্থী কংগ্রেসীদের মত গান্ধী দীর্ঘদিন স্বরাজের পরিবর্তে স্বশাসনের কথাই বলেছিলেন—১৯৩০ পর্যন্ত গান্ধী ভারতকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার কথাই বলেছিলেন, সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। রাজনৈতিক লক্ষ্য নরমপন্থীদের মত হলেও আবেদন নিবেদনের পরিবর্তে তিনি চরমপন্থীদের মত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পন্থা অবলম্বন করেন। নরমপন্থী উদ্দেশ্যের সঙ্গে চরমপন্থী উপায়ের সমন্বয় সাধন করেই আসে গান্ধীবাদী রাজনীতি, যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য গান্ধীর “সত্যাগ্রহ” এবং “অহিংসা”।

ব্যক্তিগতভাবে গান্ধী ছিলেন নৈরাজ্যবাদী। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না কারণ গান্ধী মনে করতেন রাষ্ট্র ব্যক্তির পূর্ণতর বিকাশকে ব্যাহত করে। লেভ তলস্তয়, জন রাস্কিন এবং হেনরি থোরোর রচনা পড়ে এবং বিলেতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে গান্ধী উপলব্ধি করেন যে বিশ্বজুড়ে যে আধুনিকতা এবং আধুনিক জীবনযাত্রার প্রসার ঘটে চলেছিল (যার দুই মূল স্তম্ভ হল আধুনিক রাষ্ট্র এবং শিল্প ব্যবস্থা) তাতে মানবিক মূল্যবোধগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছিল। আধুনিক জীবনের যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি পেতে গান্ধী অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পক্ষপাতী ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন এহেন জীবনযাত্রার সন্ধানে তিনি তলস্তয় এবং ফিনিক্স নামক দুটি আশ্রম পত্তন করেন। সেখানে গান্ধী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কিছু অনুগামী শিল্প সভ্যতাকে যথাসম্ভব বর্জন করে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করতেন। গান্ধীর মতে এই গোষ্ঠীবদ্ধ, অনাড়ম্বর জীবনের মাধ্যমেই সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। এবং সত্যের সন্ধান পাওয়াই মানবজীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সত্যের অনুসন্ধান সংক্রান্ত এই ধারণাই ছিল গান্ধীবাদী রাজনৈতিক দর্শনের মূলে। গান্ধীর মতে যাই ব্যক্তির পূর্ণতর বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে তা কার্যত সত্যের পথে অন্তরায় হবে। সেক্ষেত্রে সেই অন্তরায়কে দূর করে সত্য প্রতিষ্ঠাই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য হিংসা বা পেশীবলের আশ্রয় নেয়া যতটা অনৈতিক ততটাই অকার্যকর। উদ্দেশ্য সাধনে হিংসার আশ্রয় নিলে প্রতিপক্ষের মধ্যে যে তিক্ততা আসে তা সমস্যার সমাধান না করে আরও জটিল করে তোলে। তাছাড়া সত্যের স্বরূপ নিশ্চিতভাবে না জানা থাকায় নিজের মতামত জোর করে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া সত্যের পরিপন্থী।

গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনের মূল তত্ত্ব ছিল "সত্যাগ্রহ"। অর্থাৎ সত্যের প্রতি আগ্রহ বা নিষ্ঠা জনিত যে শক্তি। সত্যাগ্রহ বলতে গান্ধী বুঝতেন আলাপ-আলোচনা এবং প্রয়োজনে অহিংস-কিন্তু-সক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা প্রতিপক্ষের মত পরিবর্তনের নিরলস চেষ্টা। গান্ধীর জীবনদর্শনে মনে করা হত যে ব্যক্তি মূলগতভাবে কখনো অশুভ শক্তির আধার হতে পারে না। কোন ব্যক্তি সত্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তখনই, যখন সে সত্যের স্বরূপ জানে না। একজন সত্যাগ্রহীর তাই কর্তব্য প্রতিপক্ষকে সত্যের স্বরূপ জানানো এবং তাকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনা।

যে কোন কারণে প্রতিপক্ষ সত্যের স্বরূপ বুঝতে অপারগ হলে একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহী সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নীতিগতভাবে বাধ্য। কারণ সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা গেলেও কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু গান্ধীর মতে সক্রিয় প্রতিরোধ মানে সহিংস আন্দোলন নয়। মানুষ নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে স্বপক্ষ বা প্রতিপক্ষ যেই জয়ী হোক, আসলে জয়ী হয় পশু-শক্তি। পরাজিত হয় সত্য, মানবিক মূল্যবোধ। পরাজিত পক্ষ নিজের চ্যুতি-বিচ্যুতি বিষয়ে সচেতন না হয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে—এই বিদ্বেষ পরে আরও জটিল সমস্যার বীজ হয়ে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে গান্ধীর মতে প্রতিবাদ অহিংস হলে, পেশী-শক্তি বা পশুশক্তির ওপর নির্ভরশীল না হলে, প্রতিপক্ষের মনে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। সত্যাগ্রহী শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তার আদর্শে এবং বক্তব্যে অবিচল থাকলে প্রতিপক্ষের মনে তার নিজের আদর্শ এবং অবস্থান নিয়ে দ্বিধা জন্মাবে। ফলে হিংসার পরিবর্তে বাদানুবাদ সম্ভব হবে, এবং প্রতিপক্ষ শেষ অবধি সত্যের কথা অনুসরণ করতে বাধ্য হবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে গান্ধীর মতে অহিংস আন্দোলন মানে 'নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ' নয়। সত্যাগ্রহীর প্রতিরোধ সক্রিয় না হলে কার্যকর হবে না, এটা গান্ধী মানতেন। তাঁর অহিংস চেতনা কখনো দুর্বলতাপ্রসূত ছিল না। সত্যের বলে বলীয়ন সত্যাগ্রহীর প্রতিরোধ করার শ্রেষ্ঠ পন্থা ছিল প্রতিপক্ষের কর্তৃত্বের বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করা। শাসনকারীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে তার শাসনের অধিকারকে আক্রমণ করলে সচরাচর যে নৈতিক ভিত্তির ওপর শাসনের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে সেই ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। এ হেন প্রতিরোধ অহিংস হলেও সক্রিয়—গান্ধীবাদী রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার ছিল অহিংস কিন্তু সক্রিয় প্রতিরোধ।

সক্রিয় প্রতিরোধের উপায় হিসেবে গান্ধী এক অভিনব পদ্ধতি বাতলে ছিলেন। শাসকের নৈতিকতাকে চ্যালেঞ্জ করতে গান্ধী শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশেষ বিশেষ কিছু আইন অমান্য করার ওপর জোর দিতেন। স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে সত্যাগ্রহী শাসককে বুঝিয়ে দিতে যে শাসকের দেয়া শাস্তিকে সে ভয় পায় না অর্থাৎ আইন যে ভীতির ওপর নির্ভর করে কার্যকর হয়, একজন সত্যাগ্রহী সেই ভয়কে জয় করেই এগিয়ে চলে। এছাড়া, গান্ধী প্রতিপক্ষের সঙ্গে অসহযোগের কথা বলতেন। শাসকের কর্তৃত্ব কায়েম থাকতে গেলে শাসিতের তরফ থেকে সেই কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার প্রবণতা থাকতে হবে অর্থাৎ শাসকের কর্তৃত্ব শাসিতের সহযোগিতা ছাড়া কায়েম হতে পারে না। এই সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নিলে কর্তৃত্ব ভোগকারী শক্তি বাধ্য হবে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে রফায় আসতে। এই অসহযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল সরকারি নীতির বিরুদ্ধে বিপুল জনসমাবেশ এবং প্রয়োজনে হরতাল।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এই বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে গান্ধীর সত্যাগ্রহে ছিল নিরন্তর আলাপ-আলোচনা তথা আপস-মীমাংসার ওপর বিশেষ গুরুত্ব। গান্ধী সবসময়েই আপসের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিবাদের মীমাংসার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে গান্ধী শুধু আপসের স্বার্থেই আপসের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে কোন ক্ষেত্রেই সত্যাগ্রহী তাঁর মৌলিক উদ্দেশ্য নিয়ে আপস করতে পারে না। কিন্তু মৌলিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে যে কোন গৌণ বিষয় নিয়ে আপসের চেষ্টা করার প্রয়োজন হলে সেই আপস সমর্থনযোগ্য।

বলা বাহুল্য, গান্ধীর এই রাজনৈতিক দর্শন তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপকে আলাদা মাত্রা দিলেও খুব অল্প রাজনীতিবিদই এই পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। তবু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর অহিংস রাজনীতির সামগ্রিক প্রভাব অনস্বীকার্য। এই প্রভাবের মূল কারণ গান্ধীবাদী রাজনৈতিক দর্শন নয়, গান্ধীবাদী রাজনীতির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যা সেই সন্ধিক্ষণে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

৩(ক).৫.২ গান্ধীর আবেদন এবং জনপ্রিয়তা

রাজনীতিবিদ হিসাবে গান্ধী যে আবেদনের সঞ্চার করেছিলেন এবং যে জনপ্রিয়তা উপভোগ করেছিলেন, আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের সর্বত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে গান্ধী যে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তাঁর তুল্য স্বীকৃতি যৌথভাবে কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বও বোধকরি উপভোগ করেননি। এর একটা বড় কারণ গান্ধীর রাজনৈতিক ভিত প্রাদেশিক রাজনীতিতে সীমিত ছিল না। প্রথম থেকেই গান্ধীর রাজনৈতিক ভিত উপমহাদেশের প্রাদেশিক বিভাজন অতিক্রম করার প্রবণতা দেখিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীর আবেদন এবং জনপ্রিয়তার জন্য গান্ধীর রাজনীতির প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণ যখন গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।

গান্ধীর পূর্ববর্তী রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁদের নিজস্ব প্রাদেশিক রাজনীতির অঙ্গনে। তাঁদের ক্ষমতার ভিত্তি প্রাদেশিক রাজনীতিতে থাকার দরুন তাঁদের প্রভাবও মূলত একটি প্রদেশেই সীমাবদ্ধ থাকত। তাই গোখলে, তিলক, মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি নেতৃবর্গ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় স্তরে প্রভাবশালী হয়ে উঠলেও গোখলে এবং তিলকের প্রভাব মূলত মারাঠা

অঞ্চলে এবং মালব্যের প্রভাব মূলত যুক্ত প্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল। গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ভারতের কোন প্রদেশে না হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় হয়েছিল। সেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সান্নিধ্যে এসে এবং তাদের নেতৃত্ব দিয়ে গান্ধী প্রাদেশিকতার সীমা অতিক্রম করেন। তাই ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরে গুজরাতের আঞ্চলিক রাজনীতিতে যোগ না দিয়ে গান্ধী সুদূর বিহারে হস্তক্ষেপ করেন। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যোগদানের আগেই গান্ধীর নেতা হিসেবে যে পরিচিতি গড়ে উঠেছিল তা এই সমস্ত কারণেই অন্যান্য যে কোন নেতার থেকে আলাদা প্রকৃতির ছিল। ১৯১৫ সালে গান্ধী যখন সাবরমতী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ ২৫ জন অনুগামীর ১২ জনই ছিল তামিল ভাষাভাষি, অন্য কোন ভারতীয় নেতার কাছে ছিল অভাবনীয়।

প্রাদেশিক সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে থাকলেও গান্ধী ধীরে ধীরে দেশ জুড়ে তাঁর ক্ষমতার বৃত্ত প্রশস্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন, এবং এই উদ্দেশ্যে সফলও হয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রেও গান্ধী তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী নেতাদের থেকে অনেক বেশি দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। গান্ধীর পূর্ববর্তী প্রজন্মের নেতৃবর্গ যেমন নৌরজি, উমেশ ব্যানার্জী, দিনশ ওয়াচা, ফিরোজ শাহ মেহতা, গোখলে, তিলক—সাধারণত অন্যান্য সর্বভারতীয় স্তরের রাজনীতি কংগ্রেসের তিনদিনব্যাপী রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ প্রাদেশিকতার গণ্ডী অতিক্রম করার কোন তাগিদও কেউ অনুভব করেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দরুণ গান্ধী উপলব্ধি করেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রাম গড়ে তুলতে গেলে রাজনীতির পুরানো ধাঁচ বদলাতে হবে। তিনি উপলব্ধি করেন যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের রাজনীতিকে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যেতে হবে, এবং তা সম্ভব করতে গেলে আঞ্চলিক রাজনীতি সচেতন লোকেদের সঙ্গে নিতে হবে। প্রাথমিক আন্দোলনগুলির সুবাদে গান্ধী এরকম কিছু আঞ্চলিক যোগসূত্র স্থাপন করেন যেমন চম্পারণ সত্যাগ্রহের সূত্রে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, খেড়ার সূত্রে মহাদেব দেশাই, আমেদাবাদের সূত্রে বল্লভভাই প্যাটেল ইত্যাদি। এঁরা প্রাথমিকভাবে রাজনীতির লোক না হলেও গান্ধীর সান্নিধ্যে এসে প্রথমে আঞ্চলিক রাজনীতি, এবং পরে গান্ধীর ছত্রছায়ায় সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান করেন। পরবর্তী প্রায় তিন দশক ধরে যখনই গান্ধী কোন অঞ্চলে রাজনৈতিক কারণে গেছেন, তখনই তিনি এ ধরনের যোগ স্থাপনে সফল হন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জুডিথ ব্রাউনের মতে ক্ষমতার এই "সহ-ঠিকাদার"- দের (Sub-contractors of power) দৌলতে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধী নিজেকে ক্ষমতার মূল ঠিকাদার (Chief Contractor of Power) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। ক্ষমতা এবং প্রভাবের সোপান বেয়ে ওঠার ক্ষেত্রে গান্ধী এবং তাঁর এই আঞ্চলিক অনুগামীরা ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক—উভয়েরই উভয়কে সমান প্রয়োজন ছিল।

রাজনৈতিকভাবে সচেতন লোকেদের সমর্থন পাবার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাধারণ ভারতবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতার বিকাশ ঘটানো। এই ক্ষেত্রেও গান্ধী ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছিলেন। প্রাক-গান্ধী পর্বে ভারতীয় রাজনীতির গণ্ডী সীমাবদ্ধ ছিল বিভিন্ন দল ও সংগঠনের কার্যকলাপের মধ্যে। তৎকালীন রাজনীতির বিস্তৃতি ছিল মূলত নগরাঞ্চলে, সমাজের উচ্চবিত্ত তথা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একমাত্র সংগঠন ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। প্রাদেশিক এবং

জাতীয় রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক কাঠামোতে ভারতীয়দের উপস্থিতি বাড়ানো। তাই আঞ্চলিক দলগুলি এবং জাতীয় কংগ্রেস উভয়েই প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত বা মনোনীত ভারতীয় জনপ্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানান কংগ্রেস ক্রমশ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বের কথা বলছিল, আলিগড়ের নেতৃবর্গ এবং পরে মুসলীম লীগের নেতৃবর্গ প্রথমে নির্বাচনের বিরোধিতা করেন এবং পরে পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীর দাবি জানান। প্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কংগ্রেস সিভিল সার্ভিস (Indian Civil Service বা I.C.S)-এ ভারতীয়দের সাফল্যের অনুকূল ব্যবস্থার (অর্থাৎ, পরীক্ষার্থীদের বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি) দাবি জানায়, আলিগড় প্রশাসনে মুসলিম যুবকদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি জানায়। শহরের বিত্তশালী এবং পেশাজীবী শ্রেণীভুক্ত লোকেদের চাহিদা এই রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ায় ধরা পড়লেও বৃহত্তর ভারতের সামাজিক বাস্তবতার কোন ছোঁয়াই এই দাবিসমূহে ধরা পড়েনি। ফলে ভারতের সাধারণ মানুষও এই রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি।

রাজনীতির সঙ্গে জনসাধারণের যোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গান্ধী ভারতীয় রাজনীতির ব্যাকরণই পাল্টে দিয়েছিলেন। গান্ধী কোন বিমূর্ত রাজনৈতিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করতেন না। সাধারণত বিশেষ বিশেষ উত্তেজক পরিস্থিতিতে গান্ধী এমন কোন বিষয় ঘিরে আন্দোলন করতেন যার তাৎপর্য হত সহজবোধ্য। সর্বভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় গান্ধী যতবার আন্দোলনের ডাক দেন, প্রত্যেকবারই তিনি এমন একটি বিষয় বেছে নিয়েছিলেন যা সারা ভারতে সব শ্রেণীর মানুষই সহজে বুঝতে পারবে। সীমিত, শহরে কিছু শ্রেণীর অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক চাহিদা নয় গান্ধীর আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনজনিত ভারতীয় সমাজের দুর্দশা দূর করা। তাই আঞ্চলিক রাজনীতি বা সর্বভারতীয় রাজনীতি, সর্বত্রই গান্ধী বিশেষ বিশেষ সমস্যা দূর করতে সচেষ্ট ছিলেন। জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ, রাওলাট সত্যাগ্রহের সময়। গান্ধী ব্রিটিশ আইনের দমনমূলক চরিত্রের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রাওলাট আইনকে মূলত রূপক হিসাবে ব্যবহার করে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন ভারতের সবথেকে ধনী এবং সবথেকে দরিদ্র ব্যক্তি ব্রিটিশ শক্তির সামনে সমান অসহায়। তেমনি অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গান্ধী জনগণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনের স্থিতিশীলতা নির্ভর করছে ভারতীয়দের আনুগত্য এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে। সেই সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নিলে প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা ব্যাপক হ্রাস পাবে।

উদ্দেশ্যের সহজবোধ্যতার মতই গান্ধীর রাজনৈতিক পন্থাও ছিল সহজবোধ্য। সংবিধান সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করে গান্ধী রাজস্বের চড়া হার, কৃষিশিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের ওপর ব্রিটিশ শাসনের নেতিবাচক প্রভাব, শ্রমিকদের সমস্যা প্রভৃতি দৈনন্দিন বাস্তবিকতার কথা বলাই গান্ধী শ্রেয় মনে করতেন এবং এই শোষণমূলক ব্রিটিশ ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে গান্ধী তুলে ধরেন অন্য এক সমাজজীবনের চিত্র যেখানে আধুনিক সভ্যতার কুফলগুলি অনুপস্থিত। ভারতবর্ষের অশিক্ষিত, নিরক্ষর লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে গান্ধী রামরাজ্যের কথা বলতে থাকেন। রামরাজ্য বলতে গান্ধী কোন হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপনের কথা বলতেন না। রামরাজ্য বলতে তিনি এমন এক সমাজব্যবস্থার কথা বলতেন যা দাঁড়িয়ে ছিল ন্যায় ও সত্যের মত সর্বজনগ্রাহ্য মূলবোধ্যের উপর। কিবা হিন্দুধর্ম, কিবা ইসলাম, সর্বত্র আদর্শ সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদ সত্য এবং ন্যায় হওয়াতে রামরাজ্যে অ-হিন্দু ব্যক্তিদের কোন

অসুবিধার অবকাশ থাকতে পারে না। তাই গান্ধী হিন্দুদের পাশে পেতে রামরাজ্যের কথা বলার পাশাপাশি মৌলানা আব্দুল বারি, আনসারি প্রভৃতি মুসলিম ধর্মপ্রাণ নেতার সাহায্যে মুসলিম সমজের দিকে সমর্থন চেয়ে হাত বাড়ান। গান্ধী বুঝেছিলেন যে আদতে ধর্মপ্রাণ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় বঞ্চিত লক্ষাধিক 'মূর্ক' ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ধ্যানধারণা বিসর্জন দিতে হবে—মানুষকে আহবান জানাতে গেলে রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করলে চলবে না, রাজনীতির স্বার্থেই ধর্মকে আহবান করতে হবে। তবে বলা বাহুল্য, গান্ধীর কাছে ধর্মের উপযোগিতা ছিল সামাজিক মূল্যবোধের আধার, যার মূল উদ্দেশ্য মানুষের সঙ্গে মানুষকে জুড়ে দেয়া, মানুষকে মানুষের থেকে ধর্মের নামে পৃথক করা নয়। গান্ধীর রাজনীতির এই মূল্যবোধ-কেন্দ্রীকতার জন তিনি পাশে পেয়েছিলেন মৌলনা আজাদের মত বিদগ্ধ ব্যক্তি এবং ভারতবর্ষের লক্ষাধিক মানুষকে, যারা পাশ্চাত্যমুখী প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারতেন না। এঁদের কাছে গান্ধী রাজনীতির এক অন্য অর্থ বহন করে এনেছিলেন, যেখানে রাষ্ট্র এবং সমাজ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত—রাষ্ট্রনির্মাণ যেখানে সমাজকে অস্বীকার করে হতে পারে না। রাজনীতিতে 'মূল্যবোধকে এরকম প্রাধান্য দেয়াতে অগুনতি ভারতবাসীর মনে হয়েছিল যে এই সংগ্রাম আসলে তার সংগ্রাম, কারণ গান্ধী যে মূল্যবোধের কথা বলেছেন সেটি আসলে তারই মূল্যবোধ। এইভাবেই গান্ধীর ছত্রছায়ায় ভারতে শুরু হয় জনমুখী রাজনীতি।

জনমুখী রাজনীতির সুবাদেই গান্ধীর সঙ্গে ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির যোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু সেটিই একমাত্র কারণ ছিল না। একথা সত্যি যে মন্ট-ফোর্ড আইনে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা বহুলাংশে বেড়ে যাওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক দলগুলি ক্রমশ জনমুখী হবার প্রচেষ্টা করে চলেছিল। এ রকম পটভূমিকায় গান্ধীর আঞ্চলিক সাফল্য এবং রাওলাট সত্যাগ্রহের সুবাদে দেশ জোড়া পরিচিতির ফলে গান্ধীর রাজনীতির উপযোগিতা সবার কাছেই সহজবোধ্য ছিল। তাই ১৯১৯-২০ সাল থেকেই সর্বভারতীয় রাজনীতির সবথেকে প্রভাবশালী সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির উদীয়মান তারকা গান্ধীর নৈকট্য যেন অনেকটাই অনিবার্য ছিল।

তবে কংগ্রেসের গান্ধীকে প্রয়োজন ছিল, গান্দীর কংগ্রেসকে কিছু কম প্রয়োজন ছিল না। গান্ধী বুঝেছিলেন যে জনমুখী রাজনীতিকে সাংগঠনিক রূপ না দিলে সে রাজনীতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে না। ফলে ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসের সদস্য না হলেও গান্ধী কংগ্রেসের কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন করে সংগঠনটিকে জনমুখী করে তোলেন (পরের এককে দেখুন)। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় বিস্তারকে ব্যবহার করে ভারতের প্রতিটি প্রদেশে গান্ধী বকলমে উপস্থিত হতে থাকেন। গান্ধীর পরামর্শে কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে কংগ্রেস ভারতের গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যায়। ১৯২০-এর পর থেকে তাই ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধী এবং কংগ্রেস সমার্থক না হলেও ওথপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে যায় অবশ্যই। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের সাংগঠনিক উপস্থিতির মাধ্যমে গান্ধীও ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে ওঠেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হিসেবে।

জনমুখী রাজনীতির সঙ্গে কংগ্রেসের অতি সহজেই মানিয়ে নিতে পারার পিছনেও গান্ধীর বিশাল অবদান ছিল প্রাথমিকভাবে কংগ্রেস বিত্তশালী শ্রেণীভুক্ত লোকেদের সংগঠন হবার সুবাদে জনমুখী হয়ে উঠতে না পারার অন্যতম কারণ ছিল শ্রেণীস্বার্থের সংঘাত। ভূস্বামী শ্রেণীর প্রভাবের দৌলতে কংগ্রেস

প্রথম তিন দশক কৃষক স্বার্থের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেও পারেনি ফলে কংগ্রেসে প্রথম তিন দশক ধরে কৃষকশ্রেণীর কোন উপস্থিতি ছিল না। একইভাবে শিল্পপতিদের সমর্থন ধরে রাখতে শ্রমিকস্বার্থ কংগ্রেসে উপেক্ষিত হয়ে থাকত বিশ্বযুদ্ধের পর অবধি। গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনে শ্রেণী সংঘাতের পরিবর্তে শ্রেণী সহযোগীতার ওপর জোর দেয়াতে শ্রেণী-স্বার্থ সংক্রান্ত মৌলিক বিরোধটি মিটে যায়।

গান্ধীর সমাজদর্শনের কেন্দ্রে ছিল সদাশয় পিতৃবৎ এক মনোভাব এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা। গান্ধী মনে করতেন জমিদার এবং কৃষক, মালিক এবং শ্রমিক তাদের নিজ নিজ অর্থনৈতিক বলয়ে একে অপরের পরিপূরক। তাঁর মতে জমিদার এবং কৃষকের শ্রেণীগত বিরোধের থেকে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। গ্রামীণ অর্থনীতিতে জমিদারের কৃষককে যতটা প্রয়োজন, কৃষকেরও জমিদারকে ততটাই প্রয়োজন। গান্ধীর চোখে একজন জমিদার কৃষকের ভাল-মন্দের জন্য ততটাই দায়বদ্ধ যতটা এক পিতা তার সন্তানের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন। একই ভাবে শিল্পক্ষেত্রে মালিক এবং শ্রমিক পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে অর্থনীতিকে সচল রাখে, এবং মালিক শ্রমিকের অবস্থার জন্য সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। ফলে গান্ধীর দর্শনে মার্কসীয় শ্রেণী সংঘাত হল বস্তুত এক অবাঞ্ছনীয় পরিণতি। আদর্শ পরিস্থিতিতে আন্তঃশ্রেণী বিবাদ সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোক আলোচনার দ্বারা দূর হবে।

গান্ধীর রাজনীতির তত্ত্ব অনুসারে চলতে তাই বিপরীতধর্মী শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে আপস করে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে একত্রে সংগ্রাম করার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। প্রায় সর্বত্র জঙ্গী সংগ্রামের পরিবর্তে আলাপ-আলোচনা এবং নৈতিকতার ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি সমস্ত সমস্যাকে সমস্যার মর্যাদা দেয়াতে গান্ধী বিপরীত ধর্মী স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন। ফলত, পূর্বেকার রাজনীতিবিদদের মত গান্ধীর জনপ্রিয়তা কোন বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সব শ্রেণীর কাছেই গান্ধীর জনপ্রিয়তা ছিল অভূতপূর্ব। এই জনপ্রিয়তা গান্ধীর জন আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিশাল অবলম্বন সাব্যস্ত হয়েছিল।

তবু গান্ধীর আবেদন এবং জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে আলোচিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণগুলি গান্ধীর সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে যথেষ্ট নাও হতে পারত। অন্যান্য রাজনৈতিক তথা সামাজিক আন্দোলনের নেতাদের মতই গান্ধী নিছক একজন বড় মাপের ব্যক্তিত্ব হিসাবে সীমিত থাকতে পারতেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে গান্ধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তী। উপমহাদেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভারতবর্ষের নিরক্ষর, সাধারণ লোকের কাছে গান্ধীর পরিচয় ছিল একজন পরিত্রাতা হিসাবে। গান্ধীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং উপায়ের সহজবোধ্যতা এবং তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা তাঁকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ্দের তুলনায় অনেক কাছের মানুষ বলে প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করেছিল। সাধারণ লোকের সাধারণ সমস্যাগুলিকে জনসমক্ষে আনার ফলে সাধারণের মনে হতে থাকে যে গান্ধী আসলে তাদের লড়াইটাই লড়ছেন। ফলে দেশজুড়ে একটা প্রবণতা দেখা যায়, যে যেখানে উর্দ্ধতন কোন ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়ছে, তার নেতৃত্ব জনমানসে গান্ধীর ওপরে আরোপিত হচ্ছে। যেমন ১৯২১ সালে উত্তর প্রদেশের ভূমিহীন কৃষকেরা মনে করতেন গান্ধী তাদের কৃষিজমি পেতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ওই বছরই

আসামের চা বাগানের কুলীরা কাজ ছেড়ে যাবার সময় বলে যে তারা গান্ধীর আদেশ পালন করছে—যদিও এর মূল কারণ অসন্তোষজনক মজুরী এবং কাজের পরিবেশ বলেই অনুমেয়।

গোরক্ষপুরে ১৯২০-এর দশকের প্রারম্ভিক পর্ব নিয়ে শাহীদ আমীনের গবেষণা দেখাচ্ছে গান্ধীকে সাধারণ মানুষ নিজের কল্পনার রঙে কেমন ভাবে রাঙিয়ে নিয়েছিল। বহু কৃষক খাজনা দিতে অস্বীকার করে এই বলে যে গান্ধী মহারাজের আগমনের ফলে ব্রিটিশ রাজ্যের সমাপ্তি আসন্ন, তাই ব্রিটিশ সরকারকে খাজনা দেবার আর কোন প্রয়োজন নেই। এলাহাবাদ জেলার কিষাণ আন্দোলন সংক্রান্ত ১৯২১-এর এক গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয় যে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কৃষকদের ধারণা যে গান্ধী আসলে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে নন, তিনি জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এসেছেন। এরকমভাবে অধিকাংশ ভারতবাসীই তাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভ, অভিযোগ, বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে গান্ধীকে দেখতেন। অন্যান্য নেতৃবর্গ যেখানে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামরত বলে পরিচিত ছিল, গান্ধীর সেখানে পরিচয় ছিল সবরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে থাকা এক জীবনযোদ্ধার। তাই বহুক্ষেত্রে এমন হয়েছে মানুষ নিজের সাফল্যের কৃতিত্বও নির্দ্বিধায় গান্ধীকে দিয়ে দিয়েছে। প্রতাপগড়ে কৃষকদের জমি থেকে বে-আইন উচ্ছেদ রোখার আন্দোলন ১৯২১ সালে সফল হলে সেখানকার লোকেরা এর জন্য গান্ধীকে কৃতিত্ব দেয়—যদি গান্ধী বা কংগ্রেস নয়, এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বাবা রামচন্দ্র।

দেশের প্রতিবাদী সত্ত্বা হিসাবে গান্ধীর এই ভাবমূর্তি কতকটা জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কংগ্রেসের শাখা সংগঠন থাকতে জনজীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই কংগ্রেস কোন না কোন ভাবে উপস্থিত থাকতে পারে। জনশ্রুতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গান্ধীর ভাবমূর্তি কখনো সচেতনভবে কখনো অচেতনভাবে কংগ্রেস সযত্নে লালন-পালন করতে থাকে। ফলে জনশ্রুতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা ভাবমূর্তি বাস্তবতার ধাক্কাতেও ভাঙেনি। বরং বিশের দশকের শেষ লগ্নে কংগ্রেস বেতার, মাইক্রোফোন প্রভৃতি প্রযুক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে শুরু করায় ইতোপূর্বে গান্ধী যাদের কাছে অধরা ছিলেন তারাও সেই কিংবদন্তীর সান্নিধ্যে আসতে পারে। কংগ্রেসের বিশাল জনসমাবেশে সহস্রাধিক লোক যখন একযোগে গান্ধীকে দেখতে এবং শুনতে পায়, শারীরিক দূরত্ব কমলেও কিংবদন্তীর প্রাবল্য কমার পরিবর্তে বাড়তেই থাকে। তবে প্রথম দিকে জনশ্রুতিতে গান্ধীর ওপর যে দেবত্ব আরোপিত হত সেই প্রবণতা ত্রিশের দশকের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়।

গান্ধীর প্রবল রাজনৈতিক আবেদন এবং জনপ্রিয়তা ভারতের গণআন্দোলনকে এক অভিনব মাত্রা এনে দেয়। বিংশ শতাব্দীতে আসমুদ্র হিমাচল যে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং আন্দোলন দেখা দেয় তাতে গান্ধীর নেতৃত্বের যে ভূমিকাটি ছিল বিশ্বের জনমুখী রাজনীতির ইতিহাসেও তা সমান অভিনব। এর আগে কোন একজন ব্যক্তি জনপ্রিয়তার এমন শীর্ষে পৌঁছায়নি যাতে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী রাজনীতির প্রবক্তারাও তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। ১৯১৯ সালে রাওলাট সত্যাগ্রহ, ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন—সব ক্ষেত্রেই যখন গান্ধী আন্দোলন প্রত্যহারের ডাক দিয়েছেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও অন্যরা সেই ডাকে সাড়া দিয়েছে। এমন কী আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের নেতারাও আন্দোলন প্রত্যাহারের পরে তাঁদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম মুলতুবি করে দেন।

সর্বভারতীয় রাজনীতির স্তরে জাতীয় নেতা হিসাবে এরকম গ্রহণযোগ্যতা অন্য কোন নেতা লাভ করতে পারেননি। বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির বিভিন্ন ধারাকে একসূত্রে গেঁথে রেখে দশজোড়া স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত গণআন্দোলনের রূপ দেবার ক্ষেত্রে গান্ধীর নেতৃত্ব নির্ধারকের ভূমিকা নিয়েছিল।

৩(ক).৬ সারাংশ

১৯১৮ সালে মহাযুদ্ধ শেষ হলে ভারতবর্ষে ব্যাপক সামাজিক তথা রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায়। চার বছরব্যাপী যুদ্ধের পলে ভারতীয় অর্থনীতি তখন এক সংকটের মুখে। কৃষিপণ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর উর্দ্ধমুখী দামের দরুণ জনসাধারণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। বিশেষত নগরাঞ্চলে এই অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ওই একই সময়ে শাসনভার লাঘব করতে এবং ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন পেতে বহু প্রতিশ্রুত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় মন্ট-ফোর্ড আইনের মাধ্যমে। এই আইনে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার কিছু দায়িত্ব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেয়া ছাড়াও ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া হয়। এই দুটি কারণে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি সংকীর্ণ সংসদীয় রাজনীতির বদলে জনমুখী রাজনীতিতে প্রবৃত্ত হন।

প্রকৃত অর্থে ভারতে জনমুখী রাজনীতির জনক ছিলেন গান্ধী। আদতে আইনজীবী গান্ধী পেশাসূত্রে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার সরকার এবং সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণে পীড়িত হন এবং অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিকার দাবি করেন। ভারতবর্ষে ফিরে গান্ধী প্রাদেশিক রাজনীতি বা কোন রাজনৈতিক দলে যোগ না দিয়ে কয়েকটি আঞ্চলিক সমস্যা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যা সচরাচর কোন প্রতিষ্ঠিত দল করত না।

গান্ধীর রাজনৈতিক কৌশলের অভিনবত্ব এবং চম্পারন, খেড়া এবং আমেদাবাদে সত্যাগ্রহের সাফল্য আংশিক হলেও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাকে রাজনীতির আঙিনায় নিয়ে আসায় অল্প সময়েই বিভিন্ন প্রদেশে গান্ধী অনুগামী পেতে শুরু করেন। দমনমূলক রাওলাট আইন পাশ কেন্দ্র করে গান্ধী যখন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তাঁর এই প্রাদেশিক রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে সফল আন্দোলনকারীর ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—যদিও রাওলাট সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি।

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর উল্কার গতিতে উত্থানের অন্যতম বড় কারণ রাজনীতিবিদ হিসেবে গান্ধীর অভিনবত্ব। সশস্ত্র সংগ্রামের পথ এড়িয়ে গান্ধী দমন-পীড়নের নৈতিকতার মূলে আঘাত করেছিলেন। তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহের আরও বড় তাৎপর্য হল এতে সাধারণ মানুষও নিজের হাতে এক রাজনৈতিক হাতিয়ার পেয়ে যায়।

গান্ধীর আবেদনের আরেকটা বড় কারণ তাঁর কর্মসূচীর সহজবোধ্যতা। যে কোন আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য সাধারণ লোকের দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত হওয়াতে সব শ্রেণীর লোকের মনে হয় গান্ধী আসলে তাদের লড়াই-এ নেতৃত্ব দিতে এসেছেন। গান্ধীর রাজনীতির এই জনমুখীনতার সুবাদে গান্ধীকে ঘিরে বিভিন্ন অতিকথার (Myth) জন্ম হয় যা তাকে অল্প সময়েই গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা এনে দেয়।

গান্ধীর এই জনপ্রিয়তা এবং আবেদনের সুবাদেই জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে গান্ধী অবিসংবাদী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোতে ভারতীয় নেতৃবর্গ তাঁর আধিপত্য ধীরে ধীরে স্বীকার করে নেন।

৩(ক).৭ অনুশীলনী

(ক) মহাযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে জনমুখী পরিস্থিতি কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তা আলোচনা করুন।

(খ) ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশকালে গান্ধীর নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(গ) গান্ধীর অহিংস আন্দোলন তথা সত্যাগ্রহের আদর্শের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

(ঘ) রাজনীতিবিদ হিসাবে গান্ধীর বিপুল আবেদনের কারণ কী ছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন

(ক) যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষে "হোমরুল" আন্দোলনের পুরোভাগে কারা ছিলেন?

(খ) মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইনে ভারত শাসন ব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল?

(গ) তিনকাঠিয়া ব্যবস্থা কাকে বলে? গান্ধীর চম্পারন সত্যাগ্রহের সঙ্গে তিনকাঠিয়া ব্যবস্থা কীভাবে সম্পর্কিত?

(ঘ) খেড়া সত্যাগ্রহের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?

(ঙ) সর্বভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাব কোন সত্যাগ্রহের সূত্র ধরে?

৩(ক).৮ গ্রন্থপঞ্জী

১. Judith Brown — Gandhi's Rise to Power.

২. Judith Brown — Gandhi : A Prisoner of hope (OUP)

৩. অমলেশ ত্রিপাঠী — স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭ (আনন্দ পাবলিশার্স)

৪. Sumit Sarkar — Modern India 1885-1947 (Macmillan India)

একক ৩(খ) ❑ গান্ধী এবং জনমুখী রাজনীতি ১৯২১-৪২

গঠন

৩(খ).০ উদ্দেশ্য

৩(খ).১ প্রস্তাবনা

৩(খ).২ স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণ এবং জনমুখী রাজনীতি

৩(খ).৩ খিলাফত - অসহযোগ আন্দোলন ১৯২১-২২

৩(খ).৩.১ খিলাফত এবং ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়

৩(খ).৩.২ গান্ধী, খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলন

৩(খ).৩.৩ অসহযোগ আন্দোলনের ধারা এবং প্রকৃতি

৩(খ).৩.৪ আন্দোলন প্রত্যাহার

৩(খ).৪ আইন অমান্য আন্দোলন

৩(খ).৪.১ প্রেক্ষাপট-ভারতীয় রাজনীতি ১৯২২-২৮

৩(খ).৪.২ আন্দোলনের ধারা এবং প্রকৃতি

৩(খ).৪.৩ গান্ধী-আরউইন চুক্তি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক এবংপরবর্তী রাজনীতি

৩(খ).৫ নির্বাচনের রাজনীতি থেকে ভারতছাড়ো আন্দোলন

৩(খ).৫.১ ১৯3৫ ভারত শাসন আইন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার

৩(খ).৫.২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতেররাজনীতি

৩(খ).৫.৩ ভারত ছাড়োআন্দোলন

৩(খ).৬ সারাংশ

৩(খ).৭ অনুশীলনী

৩(খ).৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩(খ).০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- স্বাধীনতা সংগ্রামে জনমুখী রাজনীতির প্রকৃতি।

- অসহযোগ, আইন অমান্য এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ধারা এবং প্রকৃতি।
- আন্দোলনগুলির অন্তবর্তীকালীন রাজনীতির ধারা।

৩(খ).১ প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দীর বিশ থেকে চল্লিশের দশকে ভারতের রাজনীতিতে যে পরিবর্তনগুলি চোখে পড়ে সেগুলির প্রভাব স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতেও সমানভাবে দেখা যায়। বিশের দশকের আগে যে সংকীর্ণ সংসদীয় রাজনীতি প্রচলিত ছিল, এই সময় থেকে তার অবসান ঘটে, রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করে আম জনগণ।

এই এককে আপনি জানতে পারবেন সংকীর্ণ রাজনীতির বেড়াজাল ভেঙে কীভাবে রাজনীতিতে জনসাধারণের প্রবেশ ঘটে। ভারতীয় রাজনীতিকে এভাবে জনমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে সংসদীয় রাজনীতিতে ঘটা পরিবর্তন এবং গান্ধীর নতুন রাজনৈতিক ব্যাকরণ যৌথ প্রক্রিয়ার রূপ নেয়। তবু রাজনীতিতে জনমুখীনতা একবারে আসেনি, তা এসেছিল দফায় দখায়—মূলত নিটি উপমহাদেশব্যাপী জন আন্দোলনের মাধ্যমেঙ্গ এই এককে জন আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতির জনমুখী হয়ে ওঠার ইতিহাস আলোচিত হবে।

৩(খ).২ স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণ এবং জনমুখী রাজনীতি

ববিংশ শতাব্দীর রাজনীতিতে যে বৈশিষ্ট্য বিশ্বজুড়ে দেখা গেছে তা হল রাজনীতির আঙিনায় জনগণের প্রবেশ। শিল্প সভ্যতার যুগে আদুনিক সমাজে সাধারণ লোকের গুরুত্ব কতকটা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। রাজনীতিতে এই বর্ধিত গুরুত্বের প্রতিফলন দেখা যায় প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির তত্ত্বের মধ্যেঙ্গ উনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রতিনিধিত্বের তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটলেও সর্বসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার — নারী পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে—বিংশ শতাব্দীর আগে কোথাও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়নি।

ভারতবর্ষে রাজনীতির আঙিনায় সর্বসাধারণের প্রবেশ ঘটে বিংশ শতাব্দীতে বিশেষ দলকে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সংসদীয় সভার বা সরকারী অলিন্দের বাইরে নিয়ে এসে গান্ধী এই পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ছাড়াও প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় প্রতিবাদ করা সম্ভব—এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয় গান্ধীর নেতৃত্বে জন আন্দোলনের মাধ্যমে। অহিংস, নিয়ন্ত্রিত, বিশাল জন আন্দোলন মেন একদিকে ভারবাসীর রাজনৈতিক সচেতনাতা বাড়িয়েছিল, তেমনই ব্রিটিশ শক্তির সামনে তুলে ধরেছিল বিশাল এক চ্যালেঞ্জ। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্রিটিশ শক্তি উপলব্ধি করতে শুরু করে, যে “মূক শতসহস্র” ভারতীয়দের কল্যাণে অছিলায় তারা সাম্রাজ্যের নৈতিক অধিকার দাবি করে এসেছিল, সেই শতসহস্র মূক ভারতীয় সর্বসাধারই উঠে দাঁড়ানোতে শাসনের তৈতিক অধিকার তারা হারাতে চলেছে। ১৯২০ থেকে ১৯৪৭-এ তাই ধীরে ধীরে মূল প্রশ্ন ভারতবর্ষ স্বশাসনের অধিকার পাবে কনা তাছিল না। মূলপরশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল কত তাড়াতাড়ি কতটা অধিকার পাবে।

ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌দের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের রাজনীতিতে প্রবেশের অন্য তাৎপর্যও ছিল। ইতোপূর্বে সমাজের শিক্ষিত, প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীগুলির স্বার্থই রাজনৈতিক দাবি-দাওয়ায় ফুটে উঠত। সর্বভারতীয় যে বিষয়গুলির দিকে নজর দেয়া হত (যেমন ভারতীয় শিল্প ব্যবস্থার পতন, কৃষির দূরবস্থা, ব্রিটেনের বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক নীতি) তাতে সর্বসাধারণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও সর্বসাধারণের দৈনন্দিন সমস্যাগুলির নিরসনের কোন তাগিদ বা অভিপ্রায় সচারাচর দেখা যেত না। এমনকী অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যা আছে কিনা সে প্রসঙ্গে সচেতনাতাই ছিল দুর্লভ। যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শক্তি জড়িত ছিল না, বা বিদেশী শক্তির পাশাপাশি দেশীয় শক্তিরও সামাজিক কোন সমসায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল (যেমন কৃষকদের দুর্দশা), সে সমস্ত প্রসঙ্গ রাজনীতির আওতার বাইরে রাখাইশ্রেয় মনে করা হত, স্বাধীনতা সংগ্রামেই রাজনীতির উদ্দেশ্য সীমিত রাখার প্রবণতার কারণ ছিল স্বাধীনতা বলতে শুধু বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রমুক্তি বোঝা।

গান্ধীর সময় থেকে স্বাধীনতা বলতে ব্যাপকতর এক অর্থ বোঝা শুরু হয়। স্বাধীনাত বলতে গান্ধী বুঝতেন প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আরোপিত সমস্যার থেকে মুক্তিঙ্গ এই আরোপন বিদেশী শক্তির দ্বারা যতটা হতে পারে, ততটাই স্বদেশী শক্তির দ্বারাও হতে পারে। ভারতবর্ষ সবাধন তখনই হবে যখন এই সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে সকলের স্বার্থ সামগ্রিক ভাবে বিবেচিত হবে এবং সমস্যা দূরীকরণের সময় দুর্বল এবং সবল উভয়কেই সমান মর্যাদা দেওয়া হবে। এই পরিবর্তিত বোধের সুবাদে ভারতের সর্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত হয়। সাধারণ ভারতবাসী উপলব্ধি করেয়ে স্বাধীন ভারতে তার নিজস্ব গুরুত্ব থাকবে, ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করা একোধারে তার অধিকার এবং কর্তব্য।

রাজনৈতিক সচেতনতার এই হাতিয়ার নিয়ে গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে শুরু হয় জনমুখী রাজনীতি তথা জন আন্দোলনের যুগ। ক্ষমতার প্রান্তে অবস্থিত সর্বসাধারণ অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্রে। এইপরিবর্তনের যুগেই প্রোথিত হয় গণতান্ত্রিক ভারতের বীজ।

৩(খ).৩ খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন ১৯২১-২২

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে যে সামাজিক-রাজনৈতিক অসন্তোষ ব্রিটিশ ভারতে দেখা যায় রাওলাট সত্যাগ্রহের পরে তা প্রমানিত হবার কোন লক্ষনই দেখা যায়নি। বরং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড এবং তার পরে ব্রিটিশ সরকারের কোনরকম অনুতাপের অবাব রাজনৈতিক অসন্তোষের মাত্রা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন। প্রথম দিকে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ সত্য জানা না গেলেও ধীরে ধীরে তা প্রকাশ পেতে থাকে। ক্রমান্বয়ে ভারতীয় নেতাদের বিমূঢ়তা উষ্মায় পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে গান্ধী, মতিলাল নেহরু থেকে কেলকার সকলেই ব্রিটিশ রাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

একই সময়ে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যঢ় ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে মনোভাব ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছা আগে থেকে ভারতীয় মুসলিমরা ইসলামী দুনিয়ার খলিফা, অটোমান সুলতানের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। কারণ ইউরোপের বল্কান অঞ্চল থেকে তুরস্ক শক্তিকে ক্রমশ সরে আসতে হচ্ছিল, যাতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তুলস্ক ব্রিটিশ শক্তির বিরোধীতাকে জেহাদ আখা দেওয়ায় ভারতবর্ষের মুসলিমদের একটি বড়গোষ্ঠী ব্রিটিশ শক্তির বিরোধীতা করা শুরু করে। বিশ্ব যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের ফলে খলিফার ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে

পড়ে। বিশ্বের অন্য বহুদেশের মতই ভারতবর্ষের মুসলিমরাও খলিফার সং। মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের দাবি আন্দোলন তীব্র করার কথা ভাবতে থাকে।

১৯১৯-২০ সালে এই উত্তেজক পরিস্থিতিতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং খিলাত আন্দোলনকারীরা একে অপরে দিকে সমর্থনের হাত বাড়ান। কংগ্রেস বুঝেছিল প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির যুগে মুসলিম জনসমর্থন বারতীয় রাজনীতিকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে অপরিহার্য ছিল। খিলাফতিরা বুঝেছিল ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ বা গণআন্দোলন গড়ে তুলতে তা শুধু মুসলিমসদর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাই পারস্পরিক স্বার্থে কংগ্রেস-খিলাফতিদের বৈত্রী স্থাপন হয়, শুরু হয়য ভারতের প্রথম নিয়ন্ত্রত জনআন্দোলন।

৩(খ).৩.১ খিলাফত এবং ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়

''খিলাফত'' কথাটির অর্থ 'খলিফা সম্পর্কিত'। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিপন্ন তুর্কী শক্তি আটোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র মুসলিম আনুগত্য নিশ্চিত করতে নিখিল ইসলামী মতাদর্শের পতন ঘটায়। অটোমান সুলতান সুন্দী মুলসিমদের খলিফা বলে স্বীকৃত হওয়ায় তিনি সমস্ত মুসলিমের ধর্মীয় আনুগত্যের দাবিদার ছিলেন। নিখিল ইসলামীয়তা (Pan-Islam) তুর্কী সাম্রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে অন্যান্য দেশেও প্রভাব ফেলেছিল, ভারতীয় উপামহাদেশ ছিল এর অন্যতম নিদর্শন। আলী ভাতৃদ্বয়, মৌলানা আব্দুল বারি, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি নেতার রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটে এইনিখিল ইসলামী রাজনীতির সূত্রেই।

গেল মিনোল্টোর মত ঐতিহাসিকেরা খিলাফতি আন্দোলনের নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মিনোল্ট মনে করেন খিলাফতিদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মুসলিম সম্পাদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্যমুখী আলিগড়পন্থীদের প্রভাব ঠেকানো এবং উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রাদেশিকতা এবং সংকীর্ণ স্বার্থের উর্দ্ধে এনে সুসংহত করা। সেক্ষেত্রে এমন কোন বিষয়ের প্রয়োজন ছিল যা ধনী-দরিদ্র, প্রদেশ বা শ্রেণীর উর্দ্ধে উঠে মুসলমানের সত্তাকে সরাসরি আহ্বান করতে পারে। ইসলামীব দুনিয়ার খলিফার মর্যাদাকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে সাধারণ ধর্মনিষ্ঠ মুসলিমদের সমর্থন পাওয়া সম্ভব ছিল, কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় বঞ্চিত সাধারণ মুসলিমদের কাছে ধর্ম চিল জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক, তার আত্ম-পরিচয়ের অন্যতম অঙ্গ। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলিমদের একটি বড় সংখ্যাও আত্ম-পরিচয়ের ক্ষেত্রে ধর্মকে অপরহার্য মনে করতেন। তাই খিলাফত আন্দোলন কেন্দ্র করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যতটা সংহতি আনা সম্ভব ছিল, আলিগড়-প্রধন মুসলিম লীগের সংসদীয় রাজনীতিতে তার কণামাত্রও সম্ভব ছিল না।

খিলাফত আন্দোলনের বাহ্যিক এবং নিহিত উদ্দেশ্য পৃথক হলেও দুটি ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ রাজ। ভারতের মুসলিমদের দুর্দশার জন্য রাজের দায় স্মরণে রেখে খিলাফতিরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করতে চায়। এই সংগ্রামের সাফল্যের জন্য অ-মুসলিম জনসমর্থন ছিল আবশ্যক। খিলাফতি নেতৃবর্গ তাই শুরু থেকেইবৃহত্তর হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের কথা বলে এবং ব্যাপকতর রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হবার কথা বলে। এই প্রবণত রাওলাট সত্যাগ্রহের সময় গান্ধী-আবন্দুল বারি সমঝোতার মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়।

৩(খ).৩.২ গান্ধী, খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলন

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কিছু নেতা ব্যক্তিগতভাবে খিলাফত আন্দোলনের চেষ্টা করলেও সাময়িকভাবে কংগ্রেস খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দেয়াতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। খিলফতিরা চাইছিলেন মন্ম-ফোর্ড আইন অনুসারে গঠিত প্রাদেশিক কাউন্সিলের আসন্ন নির্বাচন বর্জন করতে। কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতাদের অধিকাংশই কাউন্সিল বর্জনে নারাজ ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু প্রমুখ চাইছিলেন প্রদেশিক কাউন্সিলে প্রবেশ করে তা অচল করে ব্রিটিশ সরকারকে ব্যাপকতর প্রশাসনিক সংস্কারে বাধ্য করা। অ্যানী বেসান্ত প্রমুখ নেতৃবর্গ মনে করেন বহুকষ্টে অর্জিত অধিকার হেলায় ত্যাগ করা অনুচিত হবে। গান্ধী স্বয়ং প্রথমে মনে করেছিলেন ব্রিটিশদের বাড়ানো হাত গ্রহণ করাই উচিত। কিন্তু উপর্যুপরি দুটি ঘটনা তাঁর মত পরিবর্তন করে। ১৪মে ১৯২০ তারিখে সেভ্রে-এর চুক্তি (Treaty of Sevres) অনুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্য থেকে আরব অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, এবং খলিফার ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। এতে ভারতীয় মুসলিমদের উষ্ণ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়। ২৮শে মে ১৯২০ তারিখে হান্টার কমিশনের রিপোর্ট ব্রিটেনের সংসদে পেশ হলে গর্ভনর ও ডায়ারকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয়, এবং জেনারেল ডায়ারকে লর্ডস সভা ধিক্কার জানাতে অস্বীকার করে।

বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির এলাহাবাদ অধিবেশনে (১-৩ জুন ১৯২০) বহু জাতীয়দাবাদী হিন্দু নেতাযোগদান করেন। গান্ধী মৌলানা বারির অসহযোগ কার্যক্রম সমর্থন করে খিলাফতিদের মধ্যেকার চরমপন্থী গোষ্ঠীর হাত শক্ত করেন। স্থির হয় ১৯১৯ সালে প্রস্তাবিত দেশ জোড়া হরতাল এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক তথা সামাজিক ক্ষেত্রে সবরকম সহযোগতিা প্রত্যাহারের মাধ্যমে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

গান্ধী মনে করেছিলেন যে হিন্দু-মুসলিম তথা সর্বভারতীয় ঐক্যসাধনের পর থেকে অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যাবেনা। খিলাফত ভারতীয় মুসলিমের আত্ম-পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাতে, সেই বিষয়ে ভারতের হিন্দুরা নিঃশর্তে তাদের পাশে দাঁড়ালে সাম্প্রদায়িক বিভেদের উর্দ্ধেল উঠে ঐক্য গড়ে তোলা যাবে। তদুপরি পাঞ্চাবে ব্রিটিশ অত্যাচারে হিন্দু-মুসলিম সমান ভাবে নীড়নের শিকার হওয়াতে ঐক্যসাধনের জন্য আবশ্যক ‘‘শত্রুপক্ষ’’ ও উপস্থিত ছিল—ব্রিটিশ সরকার। ফলে গান্ধী কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন যাতে ‘‘খিলাফত অন্যায়’’ এবং ‘‘পাঞ্জাব অন্যায়’’-এর বিরুদ্ধে খিলাফতিদের সঙ্গে কংগ্রেস হাত মিলিয়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে।

কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি এলাহাবাদে চার স্তরে অসহযোগের ডাকদেয়। ব্রিটিশ খেতাব, উপাধি, বর্জন, সরকারী সংস্থা, পুলিশ এবং সেনাবাহিনী বয়কট, অর্থনৈতিক অসহযোগ (রাজস্ব দেওয়া থেকে বিরত থাকা) এবংপ্রাদেশিক কাউন্সিল বর্জন। কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি বড় অংশ এতে ব্যাপক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল নেহেরু সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণতন বয়কট করার বিরুদ্ধে চিলেন কারণ বিকল্প ব্যবস্থা কিছু ছিলৈ না। কাউন্সিল বর্জনের প্রশ্নটিই অবশ্য সব থেকে বড় প্রতিপন্ন হয়। বম্বে এবং বাংলায় নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেসের সম্ভবনা উজ্জ্বল হওয়ায় এঁরা কাউন্সি বর্জন করতে চাননি। কিন্তু পাঞ্জাবে তেমন অবস্থা না হওয়ায় লাজপত রায় বর্জনের পক্ষে

ছিলেন। বেসান্তের বিরোধীগোষ্ঠীর সক্রিয়তায় মাদ্রাজ এবং বম্বের নেতৃত্বও ক্রমশ বেসান্তের বিরুদ্ধাচারণ করার উদ্দেশ্যে বর্জনের পক্ষে চলে যায়। সেপ্টেম্বরে উত্তর প্রদেশের পরিস্থিতি দেখে মহিলালও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়াতে ডিসেম্বরে কংগ্রেসের নাগপুরে বার্ষিক অধিবেশনে আপসের রফা স্থির হয়। গান্ধী মনে নেন যে আন্দোলনের লক্ষ্য স্বরাজ হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করা হবেনা। স্কুল,আদালত বয়কটের পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিদেশী পণ্যদ্রব্য বয়কট করতে হবে (বণিক স্বার্থ অস্বীকার করে)। বিনিময়ে দাশ কাউন্সিল বর্জন মেনে নেন। গান্ধী একবছরের মধ্যে স্বরাজ আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান।

নাগপুর অধিবেশনেই কংগ্রেসকে প্রাতিষ্ঠানিক ধাঁচ ঢেলেসাজানো হয় গান্ধীর কথানুসাীের। ন্যূনতম সদস্য চাঁদা ৪ আনা ধার্য করা হয়, গ্রাম-তালুকা-জেলা বা শহর কমিটিকে ক্রমানুসারে সাজিয়ে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশিক কমিটি গঠন করে তার অধীনে আনা হয়। প্রাদেশিক নেতৃত্বের সঙ্গে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের যোগ হিসেবে ১৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেসে কমিটি সৃষ্টি হয়, যাতে জনসংখ্যারে অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। এইসাংগঠনিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে কংগ্রেস ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে শাখা-সংগঠনের মাধ্যমে হাজির হতে সফল হয়, এবংজনমুখী রাজনীতির জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে।

৩(খ).৩.৩ অসহযোগ আন্দোলনের ধারা এবং প্রকৃতি

অসহযোগ আন্দোলন চারটি পর্যায়ে দানা বাঁধে। ডিসেম্বর ১৯২০ থেকে মার্চ ১৯২১ অবধি চলে প্রথম পর্যায়। এই পর্বে ভারতীয়রা বিভিন্ন ব্রিটিশ পরিচালিতে সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান বর্জন করে,যেমন আদালতে, সরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়, এছাড়া ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের দেয়া খেতাব, উপাধি ইত্যাদি বর্জন করতেশুরু করেন। মার্চ-জুলাই ১৯২১ ছিল আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব—এ পর্যায়ে কংগ্রেসে এক কোটি সদস্যভুক্তি এবং তিলক স্বরাজ তহবিলে এক কোটি টাকা তোলার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী প্রচেষ্টা চলে। জুলাই থেকে অশেবর ১৯২১—অর্থাৎ আন্দোলনের তৃতীয় পর্বে আন্দোলন ক্রমশ কট্টপন্থার দিকে ঝুঁকতে থাকে। শুরু হয় বিলিতি দ্রব্য বর্জন। নভেম্বর ১৯২১ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯২২ অর্থাৎ শেষ পর্বে রাজশক্তির দমনমূলক নীতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আন্দোলন করমশ সহিংস হবার প্রবণতা দেখাতে থাকে,অর্থাৎ গান্ধীর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্বে সরকারি প্রতিষ্ঠান বর্জনের উদ্যোগ সর্বক্ষেত্রে সমান সাফল্য পায়নি। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গেযুক্ত প্রতিষ্ঠিত আইনজীবি—যেমন চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল নেহরুর মত ব্যক্তিরা আদালত বর্জন করতে থাকেন, বিকল্প বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতে সকলে তাঁদের অনুসরণ করতে সাহস পাননি। তুলনায় সাময়িকভাবে অনেক বেশি সফল হয়েছিল ছাত্র আন্দোলন। সরকারের অনুগ্রহলব্ধ আলিগড় মহাবিদ্যালয়ে গান্ধী চাত্র অসহযোগের যে থারা শুরু করেন তাতে কালক্রমে লাহোরের ইসলামী মহাবিদ্যালয়, কলকাতা মাদ্রাসা প্রভৃতি সরকারি বা সরকার সমর্থিত প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে। এঁদের জন্য বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২৯ অক্টোবর ১৯২০ তারিখে প্রতিষ্ঠা হয় স্বাধীন

মুসলিম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (পরবর্তীকালের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া)। কলকাতায় মৌলানা আজাদ স্থাপন করেন মাদ্রাসা-ই-ইসলামিয়া। হিন্দু প্রধান মেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটকারী ছাত্রীদের নিয়ে ফেব্রুয়ারী ১৯২১-এ স্থাপিত হয় স্বদেশী প্রতিষ্ঠান কাশী সংস্কৃত বিশবিদ্যালয়। আমেদাবোদ গান্ধী স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করেন গুজরাত মহাবিদ্যালয়। এই কার্যবিধির মাধ্যমে কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের যে যোগ স্থাপিত হয় তা পরবর্তী আন্দোলনগুলির সময়েও বিশাল ভূমিকা নিয়েছিল।

মূলত যুব সম্প্রদায়কে ঘিরে স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলন গড়ে ওঠে এইসময়। শিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে যৌথ উদ্দেশ্য এবং অসহযোগ কার্যক্রম নিয়ে রাজনৈতিক সচেতনাতা বাড়ার অন্যতম কারণ এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। মূলত এদেরই উদ্যোগে ছাত্র- আন্দোলন এত ব্যাপক হয়ে ওঠে, কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা শতগুণ বেড়ে যায় এবং তিলক স্বরাজ্য তহবিলে আন্দোলন চালু রাখার মত অর্থ তোলা সম্ভব হয়।আন্দোলনের তৃতীয় পর্বে, ব্রিটিশ রাজকুমার, প্রিন্স অফ ওয়েলেন ভারত ভ্রমণে এলে সর্বত্র প্রতিবাদ সভা করার এবং পরে অর্থনৈতিক বয়কটের সময়ে ক্রেতাদের বিলিতি পণ্য কেনা থেকে বিরত করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকরা অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষের সর্বত্র সমান সাড়া ফেলেনি। আন্দোলনের সামাজিক চরিত্র এবং তীবতা বিভিন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম ছিল। অসহযোগ আন্দোলন মূলত নগরাঞ্চলে তীব্রতম আকার নিয়েছিল, কারণ যুক্তপ্রদেশ (বর্তমান উত্তর প্রদেশ)বাদ দিলে কোথাও কৃষক আন্দোলন এই সময়ে প্রবল আকার ধারণ করেনি। সবথেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ আন্দোলন দেখা গিয়েছিল গুজরাত এবং বিহারে। যেখানে আন্দোলন অত্যন্ত সচেতনভাবে গান্ধীর অহিংস পন্থা অবলম্বন করেছিল। মহারাষ্ট্রে তিলকের অনুগামীদের সংখ্যাধিক্যেরতরুণ অসহযোগ আন্দোলন তেমন প্রবল নাহওে বম্বে শহরে হিন্দু-মসিলিম শ্রমিক ঐক্য অর্থনৈতিক বয়কটের পর্যায়ে ব্রিটিশ রাজের অর্থনীতিকে প্রায় পঙ্গু করে দেয়। প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণকে কেন্দ্র করে বম্বেতে রাজনৈতিক বিরোধীতা এক নতুন মাত্রা পায়। এই পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯২১ মাঝামাঝি সময় থেকে অর্থনৈতিক বয়কট শুরু হওয়াতে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বণিক শ্রেণী ব্রিটিশদ্রব্য বয়কটের বিপক্ষে থাকলে পাউন্ডের বিনিময় মূল্য হ্রাস হবার ফলে পূর্ববৎ শতানুসারে আমদানী লাভজনক সাব্যস্ত হয়নি। বিনিময় মূল্য পরিবর্তনে ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা নারাজ হওয়াতে ভারতের আমদানীকারী গোষ্ঠী অসহযোগী আন্দোলনে যোগ দেয়াতে স্বদেশী শিল্প ব্যাপক লাভবান হয়। দক্ষিণ ভারতে একমাত্র কর্ণাটক অঞ্চল বাদ দিলে প্রায় সর্বত্রই অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক সফল হয়েছিল, কিন্তু এ প্রান্তে গান্ধীর অহিংসার সাফল্য সত্ত্বেও তার প্রকাশ ঘটে মূলত জাত-পাত ভিত্তিক আন্দোলনের (যেমন নাদর আন্দোলন, মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি) মাধ্যমে, পাঞ্জাবে শিখ ধর্মের পীঠস্তাগুলি ব্রিটিশ অনুগ্রহপ্রাপ্ত মহন্তদের হাত থেকে কেড়ে নেবীর উদ্দেশ্যে আকালি আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্য এনেদেয়। যুক্তপ্রদেশে নগরাঞ্চলে কংগ্রেস-খিলাফত যৌথ সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেস কর্মীরা যুক্তপ্রদেশের কিষাণ সভা আন্দোলনে যোগদান করলে ১৯২১-এর শেস লগ্নে যুক্তপ্রদেশে অসহযোগ আন্দোলন ক্রমে হিংসার দিকে এগোতে থাকে।

বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন প্রথম পর্বের পরে তীব্র আকার নেয় তৃতীয় পর্বের সময়। প্রিন্স অফ ওয়েলসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ডাকা ১৭ই নভেম্বর হরতাল সর্বাত্মক সাড়া পায়। কংগ্রেস

খিলাফতিদের ঐক্যের ফলে পাট এবং নীলচাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষকেরা ব্রিটিশ খামারে চাষ করতে অস্বীকার করে। গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থা়ে পরিচালনাকারী ইউনিয়ন বোর্ড নতুন করে চাপালে ১৯২১ সালে ইউনিয়ন বোর্ড বয়কটের সূত্রপাত হয়। এইআন্দোলন তীব্রতম অকার ধারণ করে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায়। এই অঞ্চলে ক্রমশ সরকারকে দেয় রাজস্বের পাশাপাশি জমিদারকে দেয় খাজনার বিরুদ্ধেও সচেতনাতা বাড়তে থাকে। সাঁওতাল প্রধান অঞ্চলগুলিতে এবং রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে আদিবাসী তথা কৃষক সম্প্রদায় বিদ্রোহের পথে এগোতে থাকে। যেমনটা একই সময়ে অন্ধ্র অঞ্চলেও দেকা যাচ্ছিল। বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল। ১৯২১ সালে একলক্ষ সাতাশি হাজারের বেশী শ্রমিক ১৩৭টি ভিন্ন ধর্মঘটে যোগ দেয়।

৩(খ).৩.৪ আন্দোলন প্রত্যাহার

অসহযোগ আন্দোলন দেশজোড়া যে আবেগের জোয়ার এনেছিল,গান্ধর তার সবদিক সমর্থন করতে পারেননি। কৃষক এবং শ্রমিক অসন্তোষক্রমশ তাঁর মধ্যে হতাশা জাগিয়ে তুলছিল। মালাবার অঞ্চলে হিন্দু জেনমি ভূস্বামী এবং মহাজনদের বিরুদ্ধে মুসলিম মোপলাদের সংগ্রাম যখননৃশংস হত্যা এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরের রূপ নেয়, গান্ধী তখনইশঙ্কিত হন। বাংবার বিভিন্নঅঞ্চলে হিংসার প্রকোপ দেখে গান্ধী অন্তত দুবার বারদৌলি অঞ্চলে সত্যাগ্রহ পিছিয়ে দেন।বারদৌলি সত্যাগ্র ছিল মূলত গ্রামীণ সমাজে আইনঅমান্য আন্দোলনের প্রকল্প। অর্থাৎ ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে নিয়ন্ত্রিত জনআন্দোলন নিয়ে যাবার প্রথম ধাপ। কিন্তু গান্ধী ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে উঠছিলেন যে গ্রামীন ভারতবর্ষে অহিংস সত্যাগ্রহের পরিস্থিতি রয়েছে কিনা।

এমন পরিস্থিতিতে শোনা গেল ৬ইফেব্রুয়ারী ১৯২২ তারিখে গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরায় জনতা ২২ জনপুলিশকে থানায় জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। যদিও ব্রিটিশ দমননীতির উচ্চাঙ্গে যাবার ধারা অব্যাহত রেখে চৌরিচৌরায় জনতার প্রতিযথেষ্ট প্ররোচনামূলক আচরণ পুলিশ করেছিল, তবু গান্ধী জনতার দোষ স্খলনের চেষ্টা না করে বারদৌলিতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনডেকেআন্দোলনের যবনিকা টেনে দিলেন। গণ সতাগ্রহের পরিবর্তে গঠনমূলক কার্যকলাপে সঙ্কল্পনেয় কংগ্রেস।

কংগ্রেসএবং খিলাফতিদের শীর্ষ নেতারা প্রায় সকলেই ব্রিটিশ দমননীতির শিকার হয়ে কারারুদ্ধ। কারান্তরাল থেকেই চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, আলি ভাতৃদ্বয়—সকলেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। সুভাষ এবং জওহরলাল মনে করেছিলেন আন্দোলন যখন তীব্র হয়ে উঠছে তখন প্রত্যাহার করে নেয়া সমীচিন হয়নি। একই মত পেষণ করেছিলেন কট্টপন্থী খিলাফতিরা। চিত্তরঞ্জন এবং মতিলালের আপত্তির কারণ ছিল অন্য। তাঁরা চেয়েছিলেন প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের আগমন উপলক্ষ্যে বড়লাট রিডিং যখন আন্দোলন স্থগিত রেখেশাসন সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখনই তা মেনে নিন। গান্ধী তখন এইদাবি নস্যাৎ করে দেন। তার তিন মাসবাদে গান্ধী যখন আন্দোলন প্রত্যাহার করেন তখন রিডিং-এর প্রস্তাব আর বিবেচ্য ছিল না।

গান্ধীর যুক্তি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনিদেখতে পাচ্ছিলেন যে আন্দোলনের অহিংস চরিত্র ক্রমশ বদলে যাচ্ছিল। বিশেষত,উত্তেজক বক্তব্য রাখার দরুণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপন্ন হবার আশঙ্কায়

১৯২১ সালে তিনি মৌলানা মহম্মদ আলিকে ক্ষমা চাইতে জোর দেয়ায় তাঁর সঙ্গে খিলাফতিদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন যে খিলাফতিরা প্রয়োজনে সহিংস আন্দোলন করতেও প্রস্তুত। এর ওপরে কৃষক এবং শ্রমিক আন্দোলন হিংসার পথে নামলে গণআন্দোলকে অহিংস রাখা যাবে না। সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ দমননীতি নৈতিক বৈধতা পেয়ে যাবে, এবং জন আন্দোলনকে মেশীবলে চূর্ণ করা সম্ভব হবে। এ সমস্ত কারণে গান্ধী ১৯২২ সালে অসেহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

৩(খ).৪ আইন অমান্য আন্দোলন

ভারতে জনমুখী রাজনীতি তথা জন-আন্দোলনের যুগের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পর্যায় ছিল ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলন রাজনৈতিক দিক তেকে অসহযোগ আন্দোলনের স্বাভাবিক পরিণতি। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটশ ীরাজের থেকে সহযোগিতার হাত সরিয়ে নিয়ে রাজের দুর্বলতা এবং প্রজাতের ওপর নির্ভরশীলতা বুঝিয়ে দেয়া। আইন অমান্য আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক অধিকারকে অস্বীকার করে ভারতীয়দের স্বায়ত্বশাসননের দাবি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়েছিল। এর মূল বক্তব্য ছিল ব্রিটিশ রাজের ভারত শাসনরে কোন নৈতিক অধিকার না থাকায় ব্রিটিশ আইন না মানাই প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য।

৩(খ).৪.১ প্রেক্ষাপট ঃ ভারতীয় রাজনীতি ১৯২২-২৯

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর কংগ্রেস ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। কারারুদ্ধ হবার আগে গান্ধী কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে গঠনমূলক কাজে লিপ্ত হতে বলেন, তাঁর এই মত সমর্থন করেন রাজাগোপালাচারী, প্যাটেল প্রমুখ নির্বাচন-বিরোধী (No-changer) নেতারা, অব্যদিকে চিত্তরঞ্জন, মতিলাল এবং হাকিম অজমল খাঁ প্রমুখ নির্বাচন পন্থীরা (Pro-changer) চাইছিলেন কংগ্রেস পরবর্তী প্রাদেশিক কাউন্সিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এগুলি অচল করে দিক যাতে সরকার সংস্কারে বাধ্য হয়। গয়ায় ১৯২২ সালের বার্ষিক অধিবেশনে নির্বাচনপন্থীরা পরাজিত হলে সভাপতি চিত্তরঞ্জন পদত্যাগ করে ১৯২৩ সালের ১লা জানুয়ারী মতিলালের সঙ্গে স্বরাজ্য পার্টি স্থাপন করেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গান্ধী চিত্তরঞ্জনের অবস্থানকে মর্যাদা দিয়ে নির্বাচন-বিরোধী এবং নির্বাচন-পন্থী—উভয় নীতিকে কংগ্রেসের কার্যক্রমের অঙ্গ বলাতে কংগ্রেস বড় বিভাজন এড়াতে পারে।

১৯২৩-২৬ সালে স্বরাজ্য পার্টি বাংলা এবং যুক্তপ্রদেশে ভাল ফল করে কাউন্সি ভেতর থেকে অকেজো করার যে পরিকল্পনা নিয়েছিল তাতে আংশিক সাফল্য আসে। সাফল্য আংশিক চিল কারণ স্বরাজ্য পার্টির ধারণা ছিল কাউন্সি অচল হলে সরকার আপসের কথা বলবে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ায় ব্রিটিশ রাজের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ইচ্ছা ক্রমশ দূরীভূত হয়। ফলে ধীরে ধীরে শক্তিক্ষয়ের পর ১৯২৬ সালে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে স্বরাজ্য পার্টি আবার কংগ্রেসি মূলস্রোতে ফিরে আসে।

ওই সময়েই গান্ধর ও তাঁর অনুগামী কংগ্রেসিরা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গঠনমূলক কাজে মগ্ন হন। প্রাকৃতিক দুর্যোগাক্রান্ত অঞ্চলে ত্রাণ পৌঁছানো থেকে আরম্ভ করে গ্রামে গ্রামে শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য-বিষয়ক

সহায়তা ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক জাক করে কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভিত মজবুত হ্হয়। রাজনীতিতে জনগণের গুরুত্ব সকলের অগোচরে রাজনীতির ব্যাকারণে ঢুকিয়ে গান্ধীর কংগ্রেস হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থে জনমুখী এবং জনপ্রিয়।

ইতোমধ্যে তুরস্কে তুর্কী শাসক দ্বারা খলিফা পদের অবসান ঘটানো হলে ভারতে খিলাফত আন্দোলন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। বিশের দশকের মাঝামাঝি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির দরুণ হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে অবনতি হয়। ১৯২৪ সালে উত্তর-পশ্চি সীমান্ত প্রদেশে এক দাঙ্গায় ১৫৫ জন নিহত হয়। ১৯২৬ সালে কলকাতায় তিনটি দাঙ্গায় ১৩৮ জনের মৃত্যু হয়। ঢাকা, পাটনা, রাওয়ালপিণ্ডি এবং যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ -এর মধ্যে শতাধিকা দাঙ্গা হয়। এর কারণ মূলত আর্য-সমাজের "শুদ্ধি" এবং "সংগঠন" নামক দুটি প্ররোচনামূলক আন্দোলন। ঘোর বদলা হিসেবে মুসলিম মৌলবৌদী শুরু করে "তনজিম" এবং 'তবলিখ" আন্দোলন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু-মেলবাদী এবং হিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ (যেমন লাজটপত রায়, মালব্য, যুঞ্জে) কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে কংগ্রেসের প্রতি মুসলিম বিরাগ বাড়তে তাকে।

মন্ট-পোর্ড আইনে প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা কতটা সফল তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিশনের নিযুক্ত মন্ট-ফোর্ড আইননেই বলা ছিল। ১৯২৭ সালে সেই অনুসারে সাইমন কমিশন পাঠানো হয় ভারতবর্ষে। ব্রিটিশ সরকারের অনুমান ছিল সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে দীর্ণ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যর অভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর বা বিকেন্দ্রীকরণ কোনটাই আদায় করে নেবার মত অবস্থায় ভারতীয়রা নেই—ফলে কমিশনের সব সদস্যই শেতাঙ্গ হলে তা নিয়ে বিরোধীতা তারা আশা করেনি।

কিন্তু ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে পর্যালোচানর ভারপ্রাপ্ত কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকা ভারতের রাজনীতিবিদ্‌দের কাছে চরম অপমান বলে মনে হয়। দেশজুড়ে সাইমন কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্তে সব রাজনৈতিক দল ঐক্যমত হয় (ব্যতিক্রম পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টি এবং মাদ্রাজে জাস্টিস পাটি)। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এবং তেনবাহাদুর সাপ্রুর অধীনে লিবারেল কনফেডারেশন কংগ্রেসের সঙ্গে একজোট হয়ে সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করে। জিন্না মুসলিম লীগের কট্টরপন্থী মুসলিমদের জন্য সর্বভারতীয় আইনসভায় ১/৩ আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং সিন্ধু, বালুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পৃথক রাজন্য হিসাবে গঠিত হবে। দিল্লীতে সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রথম বৈঠকে (ফেব্রুয়ারী ১৯২৮) এই শর্ত স্বীকৃত লে পূর্ণ উদ্যমে ভারতয়য রাজনীতিবিদরা (মূলত মতিলাল নেহরু এবং সাপ্রু) স্বায়ত্ব শাসিত ভারতের সংবিধান প্রণয়নের চেষ্টা করতে থাকেন। এই সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারকে দেখিয়ে দেওয়া যে ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে পারে। কিন্তু আগস্ট মাসে সর্বদলীয় সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে হিন্দুত্ববাদী কেলকার, মালব্য প্রভৃতির চাপে নেহরু যে রিপোট পেশ করা হয় তাতে জিন্নার দাবীসমূহের প্রায় কিছুই স্বীকৃতি পায়নি। ফলে পরবর্তীকালে জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ ইচন্ন করে লীগে আত্মনিয়োগ করেন।

সাইমন কমিশনের ভারতসফর জনিত উত্তেজনা এবং নেহরু রিপোর্ট জনিত উৎসাহ ছাড়াও

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে গতিসঞ্চারের অন্য কারণ ছিল। বিশ্বজনীন যে অর্থনৈতিক মন্দা ১৯২৯-এ প্রকট হয়েছিল, ১৯২৮ সাল থেকেই তার পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছিল। কৃষিপণ্যের মূল্যহ্রাসের ফলে কৃষক শ্রেণী চরম দুর্দশার শিকার হতে থাকে ১৯২৬ সালের শেষ থেকে। ওই সময় থেকেই শ্রমিক অসন্তোষও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২৬) এবং অন্যান্য বামপন্থী শক্তি শ্রমিক অসন্তোসের সৃষ্টি করতে থাকে। তাদের চরমপন্থী দাবির প্রতিফল হিসাবে সমাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে যোগ ছিন্ন করার দাবি ওঠে। সমগ্র উত্তর ভারতে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী সংগঠন দেখা দেয় (যেমন হিন্দুস্তান রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন, যার পরে নাম হয় হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মি—যার অন্যতম নেতা ভগৎ সিং)। ১৯২৮ সালের কলকাতা অধিবেশনে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের সমর্থনে কংগ্রেসের যুব নেতৃবর্গ (যেমন সুভাষ এবং জওহরলাল) কংগ্রেসের অভীষ্ট পরিবর্তনের দাবি জানান। তাঁদের দাবি ছিল নিছক স্বায়ত্বশাসনের (Dominion Status) পরিবর্তে কংগ্রেস পূর্ণস্বরাজের লক্ষ্যে পরিচালিত হোক। কংগ্রেসের রক্ষণশীল গোষ্ঠী এতে নারাজ হওয়াতে গান্ধী সমঝোতা সূত্র আনেন। তিনি বলেন, পরবর্তী এক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে স্বায়ত্বশাসন না দিলে কংগ্রেস পূর্ণস্বরাজকে তাদের অভীষ্ট বলে স্থির করবে।

ওদিকে ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন লেবার সরকার সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের তীব্রতা দেখে ঘোষণা করে যে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করাই লন্ডনের উদ্দেশ্য, এবং তা সাইমন কমিশনের রিপোর্ট এলেই বিবেচিত হতে পারে। সরকার একটি গোলটেবিল বৈঠকেরও প্রস্তাব দেয় ১৯২৯ সালে। গান্ধী, মতিলাল এবং মালব্য এই প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে মেনে নিয়ে শর্ত রাখেন যে কংগ্রেসকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মর্যাদা দিতে হবে, এবং আলোচনা হতে পারে স্বায়ত্বশাসন কবে কীভাবে দেয়া হবে সেই নিয়ে, দেখা হবে কিনা তা নিয়ে নয়। বড়লাট আরউইন এই শর্ত মানতে অস্বীকার করায় ডিসেম্বর ১৯২৯-এ আলোচনা ভেস্তে যায়। ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে সভাপতি জওহরলাল তাই দৃপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করেন কংগ্রেসের পরিবর্তিত লক্ষ্য—পূর্ণ স্বরাজ।

৩(খ).৪.২ আন্দোলনের ধারা এবং প্রকৃতি

লাহোর অধিবেশনের পরের দু-মাস ভারতবাসী গান্ধীর দিকে তাকিয়ে ছিল, কখন কীভবে গণআন্দোলনের পরের ধাপ শুরু হবে সে সম্বন্ধিত ইঙ্গিতের আশায়। ২৬শে জানুয়ারি ১৯৩০ কংগ্রেসের উদ্যোগে সর্বত্র স্বাধীনতার শপথ নিয়ে বলা হয় ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক দুর্গতির জন্য দায়ী ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। দেশ জুড়ে বিদেশী সরকার প্রণীত আইন অমান্য করা এমন কী খাজনা দেয়া থেকে বিরত থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আহ্বান জানানো হয়। ৬ই জানুয়ারী কংগ্রেসী মন্ত্রীদের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। ৩১শে জানুয়ারী গান্ধী বড়লাট আরউইনকে ১১-দফা দাবি পেশ করেন। এর মধ্যে কিছু দাবি সাধারণ হলেও (যেমন সামরিক খরচ এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতনে ৫০% হ্রাস; রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি ইত্যাদি) তিনটি দাবি ছিল মন্ত্রাক্রান্ত বুর্জোয়া স্বার্থ স্মরণে রেখে (টাকা-পাউন্ডের বিনিময় মূল্য পরিবর্তন, ভারতীয় সুতিশিল্পকে সরকারি সুরক্ষা এবং উপকূলবর্তী নৌচলাচলে ভারতীয় উদ্যোগকে নিরাপত্ত)। এছাড়া

দুটি মূলত কৃষক-সম্পর্কিত দাবিও (ভূমি রাজস্বে ৫০% হ্রাস এবং সরকারের লবন কেনা বেচায় একচেটিয়া অধিকার তথা লবন কর বাতিল করা) রাখা হয়। এই দাবিগুলি পত্রপাঠ নস্যাৎ করে দেয়াতে গান্ধী লবন সত্যাগ্রহের ডাক দেন।

১৯৩০-এর অর্থনৈতিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি ছিল ঠিকই, কিন্তু এমন কোন একটা বিষয় ছিল না যা কেন্দ্র করে সারা দেশে সমান সাড়া পাওয়া যেতে পারত। গান্ধী যখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে বলন-আইন ভাঙতে চান তখন অনেকে এর তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। লবন আইন অনুসারে সরকারের অনুমতি ছাড়া এবং সরকারের কর নিয়ে নুন প্রস্তু করা আইন বিরুদ্ধ ছিল। গান্ধী এই আইনকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীকে বোজাতে চান নুনের মত প্রাত্যহিক ব্যবহারের সামান্যতম দ্রব্য থেকে অর্থনীতির প্রতি স্তরে ব্রিটিশ শাসকেরা বারতবর্ষকে শোষণ করে চলেছে। লবন আইন ভঙ্গ করে গান্ধী ভারতের ব্রিটিশ শাসনের এই সর্বগ্রাসী শাসনযন্ত্রের শাসনের নৈতিক অধিকারকেই অস্বীকার করতে চান। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি সাবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডী অভিমুখে যাত্রা করেন (১২ মার্চ—৬ এপ্রিল, ১৯৩০) এবং ডান্ডীতে লবন আইন ভেঙে কারাবরণ করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে অহিংসভাবে সবরকম আইন অমান্য করার অহ্বান দেওয়াতে এই আন্দোলন শুরু থেকেই তীব্রতা লাভ করেছিল।

গান্ধীর শান্তিপূর্ণভাবে সবরকম আইন অমান্যের আহ্বানের কারণ ছিল উপকূলবর্তী অঞ্চল ছাড়া লবন আইন অপ্রাসঙ্গিক ছিল। তাই গান্ধীর এই আহ্বানের মূল উদ্দেশ্য চিল আঞ্চলিক সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে আঞ্চলিক প্রতিবাদগুলিকে সুসংহত সর্বভারতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দেয়া। তাই এই আন্দোলনের আঞ্চলিক তথা গোষ্ঠীস্বার্থ অনেক বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল।

গান্ধীর রাজনীতির দুর্গ বিহৗর এবং গুজরাতে অঅইন অমান্য আন্দোলন বরাবরের মতই নিয়ন্ত্রিত ছিল। কংগ্রেসি ভূস্বামী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে সরকারকে রাজস্ব দেয়া বন্ধ করা হলেও জমিদারদের দেয় খাজনার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন দেখা যাডয়নি। মম্বে এবং গুজরাতের বণিক এবং শিল্পপতিরা সীরকারি আর্থিক তথা শিল্পনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে এঁরা একজোট হয়ে কংগ্রেসের অর্থনৈতিক প্রকল্পে সমর্থন যোগন—বিলিতি পণ্য বর্জন করে, বহ্ন্যুৎসবে যোগ দিয়ে এঁরা এঁদের অনমনীয়তার পরিচয় দেন।

শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যের মাধ্যমে কারাবরণ করে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রকে নিস্ক্রিয় করে দেবার গান্ধীবাদী প্রকল্প বম্বে এবং গুজরাত বাদ দিলে সবথেকে বেশি সফল হয় বাংলায়। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে এর থেকে বেশি কিছু সাফল্য বাংলার নগরাঞ্ছচলে দেখা যায়নি।

কর্ণাটক এবং মধ্যপ্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল আকার নেয় মূলত আদিবাসী এলাকায় জঙ্গল সংক্রান্ত আইন ঘিরে। শুধু বেরার অঞ্চলেই ১০৬টি সত্যাগ্রহ হয়েছিল জঙ্গল সংক্রান্ত আইন নিয়ে। তামিলনাড়ু এবং মালাবার অঞ্চলে সত্যাগ্রহ তুঙ্গে ওঠে মাদক বর্জন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, যার সুবাদে অজস্র মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করা হয়।

যুক্তপ্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন দুটি ভাগে ভাঙা যায়। আওয়াধের তালুকদারের ব্রিটিশরাজের প্রতি অনুগত থাকতে সেখানে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কিষাণ সভা আন্দোলনে সরকারকে রাজস্ব এবং

জমিদারকে খাজনা দেয়া থেকে কৃষককে বিরত করা হয় নেহরুর নেতৃত্বে। কিন্তু আগ্রা অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী ভূস্বামীদের দেয় খাজনা থেকে সেখানকার কৃষকেরা অব্যাহতি পায়নি।

অসহযোগ আন্দোলনের থেকে আইন অমান্য আন্দোলন অনেক বেশি ব্যাপ্ত এবং তীব্র হয়েছিল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আব্দুল গফফর খানের নেতৃত্বে পেশওার থেকে আরম্ভ করে বাংলা এবং যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব থেকে তামিলনাড়ু সর্বত্রই আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল গতিলাভ করেছিল। তদুপরি, কৃষিপণ্যেণ মন্দাজনিত মূল্য-হ্রারে ফলে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে যে দুর্গতি দেখা দিয়েছিল তার ফলস্বরূপ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভারতের কৃষকমাজ বিপুল উৎসাহে যোগদান করে। উপজাতীয় এবং আদিবাসী সমাজও বৈম্যমূলক বৃটিশ নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

কিন্তু নগরাঞ্চলে সাময়িকভাবে পুঁজিপতিদের যোগদান বাদ দিলে নগরবাসী এই আন্দোলনে তেমন যেগদান করেননি। তেমনিই বিশের দশকের রাজনৈতিক তিক্ততার দৌলতে মুসলিম সমাজ এই আন্দোলনে গোষ্ঠীগত ভাবে যোগদানে বিরত থাকে।

তবু জনআনোদলনের নিরীখে আইন আমন্য আন্দোলন দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এই আন্দোলনে প্রথমবার ভারতীয় নারী প্রকাশ্য রাজনীতিতে প্রবেশ করে, এবং আইন অমান্য করে বিপুল ংখ্যায় কারাবরণ করে। দ্বিতীয়ত, ভারতের কৃষক শ্রেণীকে রাজনীতির কেন্দ্রীয় বৃত্তের নিয়ে এসে জনমুখী রাজনীতিতেও এক নতুন দিগন্ত এনে দেয়। এর পরে কৃষক স্বার্থ ভারতীয় রাজনীতির এক অপরিহার্য দিক হিসাবে গণ্য হতে থাকে।

৩(খ).৪.৩ গান্ধী-আরউইন চুক্তি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক এবং পরবর্তী রাজনীতি

১৯৩০ সালে মাঝামাঝি সময় থেকে ব্রিটিশ দমননীতি আইন আমান্য আনোলনের বিষয়ে গান্ধীকে সন্দিহান করে তোলে। রাজস্ব দিতে অসম্মত হলে কৃষি জমি বিক্রী করে দেবার দরুণ আন্দোলনের তীব্রতা কমার সংকেত পাওয়া যাচ্ছিল। পাশাপাশি, শিল্পপতি এবং পুঁজিপতিরা সরকারের থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়ে গান্ধীকে চাপ দিতে থাকেন আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার জন্য।

ইতোমধ্যে লন্ডনে প্রথম গোলটেবিল বেঠকে কংগ্রেস বাদে ভারতের সব রাজনৈতিক দল যোগ দিলেও কোন সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। ১৯৩০ সালে সাইমন কমিশন রিপোর্টে স্বায়ত্ব শাসনের উল্লেখ না করলেও প্রাদেশিক কসরকার ভারতীয়দের হাতে তুলে দেবার কথা বললে সব দলই তাতে সম্মত হয়। সেই ক্ষেত্রে কংগ্রেস আইদপত্যের আশঙ্কায় ভারতের ছোট ছোট স্বাধীন রাজন্যগুলি একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় যুক্রাজ্য ব্যবস্থার প্রস্তাব দিলে, ব্রিটিশ সরকার এতে সম্মত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের অনুপস্থিতিসেত কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হবে না বুঝে তারা কংগ্রেসকে আলোচনায় আনতে চায়। কেন্দ্রে দুর্বিল হলেও দায়বদ্ধ সরকারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে নরমপন্থী নেতারা গান্ধীকে আন্দোলন স্থগিত রেখে আসন্ন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে পীড়াপেড়ি করেন।

ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৩০-এ গান্ধী এবং আরউইন ব্রিটিশ ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী সিমলাতে আলোচনায় বসেন। মার্চ মাসে গান্ধী আরউইন চুক্তিতে গান্ধীর কয়েকটি দাবি আরউইন মেনে নেননি—

যেমন সত্যাগ্রীহীদের অধিগৃহীত সম্পত্তি ফেরত দেয়া। কিন্তু ভূমি রাজস্বের হার কমাতে এবং লবন কর শিথিল করতে আরউইন সম্মতি জানান। কংগ্রেসের যুবাকর্মীদর কাছে আরও পীড়াদয়ক ছিল পূর্ণস্বরাজ থেকে গান্ধীর পিছু হটা। আরউইন স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন যে যুক্তরাজ্যের শাসন কাঠামোতে নির্বাদিত ভারতীয় মন্ত্রীদের ক্ষমতা উর্দ্ধতন ব্রিটিশ শাসকদের ক্ষমতার দ্বারা সীমিত থাকে। তা সত্ত্বেও গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানে সম্মত হওয়ায় পূর্ণস্বরাজপন্থীরা হতাশ হয়েছিলেন। তারা চেয়েছিলেন গান্ধর আন্দোলন চালু রাখুন।

গান্ধী দুটি কারণে আরউইন চুক্তি মেনে নেন। প্রথমত, অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সংস্কার-বিষয়ক আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পরে তিন শূন্য হাত ফিরেছিলেন। ১৯৩০-৩১-এ একদিকে কৃষক আন্দোলনে হিংসার প্রবণতা এবং অন্যদিকে পুঁজিপতিদের চাপের মুখে আন্দোলনের য়িনন্ত্রণ হারাবার সম্ভবনা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার শূন্যহাতে ফেরার অভিলাষ তাঁর ছিল না। দ্বিতীয়ত, আরউইন তাঁর সে। ব্যক্তিগত আলোচনায় বসে কার্যত কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের মুখপাত্রের মর্যাদা দিচ্ছিল।

গান্ধর এর সদ্বব্যবহার করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই ১৯৩২-এ করাচি অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে মুলতুমি করতে গান্ধীকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে সবতেখে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা। ১৯৩১- সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ধরে চলা এই বৈঠকে মুসলিম, শিক, ভারতীয় খ্রীশ্চান, ইউরোপীয় অধিবাসী এবং নিম্নবর্ণের প্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী দাবি করতে থাকে। কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধী দাবি করেন যে কংগ্রেস জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীর প্রতিনিইদ এবং কংগ্রেস পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চায় না। ফলত ১লা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড তিনটি কমিটি নিয়োক গরেন, যাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধেয ঐক্যমতের অভাবে ব্রিটিশ একতরফা ভাবে ভারতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

খালি হাতে ভারতে ফিরে গান্ধী দেখেন ব্রিটিশ দমননীতি আরউইনের পরে আসা বড়লাট উইলিংডনের হাতে অঅরও তীব্র হয়ে উঠেছে। নেহরুর এবং আব্দুল গফফর খান কারারুদ্ধ। গান্ধী পুনরায় আইন আমান্য ান্দোলনের ডাক দিলে চরম নৃশংতার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার দমননীতি প্রয়োগ করে। ফলে তিন মাসের মধ্যেই যাবতীয় উদ্দীপনা প্রশমিত হয়ে যায়। মার্চ ১৯৩৩-এর মধ্যে ১২০,০০০ সত্যাগ্রী কারারুদ্ধ হয়। ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার অবাধে লঙিঘত হয়।

১৯৩২ সালের অগাস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী ম্যাগডোনাল্ড সাম্পরদায়িক বাটোয়ারার কথা ঘোষণা করেন। এতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা দয়ো ছাড়াও ভারতের অস্পৃশ্যদেরও একই অধিকার দেয়া হল। গান্ধী এর বিরুদ্ধে ানশনে বসে হিন্দু সমাজে বিভাজন এড়াতে চাইলেন। ফলে ১৯৩২ সালে পুনা চুক্তি অনুারে আম্বেকার পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী ত্যাগ করে সংরক্ষিত আসন নিয়ে সন্তুষ্ঠ থাকেন। সমাজের দলিত শ্রেণীর মধ্যে সচেতনাতা এবং গংগ্রেসের প্রভাব বিস্তার করতে গান্ধীর শুরু করেন তাঁর হরিজন প্রকল্প।

৩(খ).৫ নির্বাচনের রাজনীতি থেকে ভারতছাড়ো আন্দোলন

১৯৩৫ থেকে ১৯৪২ সাল ভারতের রাজনীতির জনমুখী চরিত্রকে গণতান্ত্রিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার পথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই পর্বে রাজনৈতিক চেতনায় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ক্রমশ স্বাভাবিক চিন্তাধারায় পরিণত হয়। ১৯৩৭-এ প্রাদেকিশক নির্বাচনে কংগ্রেসের এবং অন্যান্য দলের সাফল্যের অন্যতম কারণ নীতির জনমুখীনতা। সীমিত ক্ষেত্রে কার্যরত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি জনমুখী রাজনীতি নিজ নিজ রাজনৈতিক মতানুসারে করতে থাকায় গণতান্ত্রিক ভারতের পূর্বচিত্র সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে এই বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থার স্বাভাবিক বিবর্তন ব্যাহত করে। যুদ্ধে একতরফা ভাবে ভারতবর্ষকে জড়িয়ে দেবার প্রতিবাদে কংগ্রেস মুখর হলেও কংগ্রেসী অসহযোগীতার সুযোগে অন্যান্য রাজনৈতিক দল সরকাররের সান্দিধ্য কামনা করে। ফলে ১৯৪২ সালে যখন কংগ্রেস স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে ক্রীপসের দৌত্য অস্বীকার করে, রাজনীতির আঙিনায় কংগ্রেস তখন নিঃসঙ্গ। এহেন পরিস্থিতিতে জনমানসে তথা রাজের দৃষ্টিতে কংগ্রেসের কর্তৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে শুরু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলন কংগ্রেসের অজান্তেই হয়ে ওঠে প্রকৃত জন-আন্দোলন। নিয়ন্তরণের রাশ কংগ্রেসের হাতে না থাকায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন হয়ে ওঠে ভারতের ইতিহাসের প্রবলতম জন আন্দোলন।

৩(খ).৫.১ ১৯৩৫ ভারত শাসন আইন এবং প্রদেশিক কংগ্রেস সরকার

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ঘোষণা করে। ১৯৩২-এর পরে একতরফা ব্রিটিশ পদাধিকারীদের মস্তিষ্ক প্রসূত এই আইন ভারতের সব রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দ্বারা সমালোচিত হয়।

এই আইনে ইতিবাচক দিক বলতে ছিল প্রাদেশিক স্তরে দ্বৈতশাসনের অবসান। প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা সম্পূর্ণত নির্বাচিত আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, যদিও গর্ভনরের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে যাতে নির্বাচিত আইনসভাকে প্রয়োজনে উপেক্ষা করে কাজ চালানো যায়। প্রাদেশিক নির্বাচনমণ্ডলীতে ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা ৬৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি করা হয়।

কেন্দ্রীয় যুক্তরাজ্যের কাঠামোতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রভূত ক্ষমতা রাখা হয়। কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের বেশ কিছু বিষয় নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে তুলে দেবার কথা হয় (দিও বিদেশ নীতি, রেলপথ, প্রতিরক্ষা, ইত্যাদি ইংরেজ পদাধিকারীদের হাতেই থাকে)। ভারতের আর্থিক স্বাধীনতা প্রায় স্বীকৃত হলেও বড়লাটকে প্রায় সর্বময় কর্তৃত্বে বহাল রাখাতে ব্রিটিশ প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকে। কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষের ২৭৬ আসনের মধ্যে ১০৪ এবং নিম্নকক্ষের ৩৭৫ আসনের মধ্যে ১২৫টি আসন থাকবে ভারতীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা মনোনীত প্রার্থীর জন্য। তবে এই যুক্তরাজ্য সংক্রান্ত ধারা রাজন্যবর্গের ৫০ এর সম্মতি সাপেক্ষ ছিল—এবং এই সম্মতি জ্ঞাপন না করাতে এই অংশটি কোনও দিনই প্রযুক্ত হয়নি।

ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে কংগ্রেসের রাজনীতিতে জনমুখীনতা আরও বাড়ে। গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাজের সুফল তো

বটেই, যুক্তপ্রদেশে কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে কৃষি সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়—বিশেষত লক্ষ্ণৌ এবং ফয়েজকুর অধিবেশনে নেহরু সমাজতন্ত্রের দিকে আকর্ষণ অনেককেই আশান্বিত করে।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাদেশিক আইনসভাগুলির মোট ১৫৮৫ আসনের ৭১১টা কংগ্রেস দখল করে। ১১টি রাজ্যের মধ্যে পাঁচটিতে (মাদ্রাজ, বিহার, ওড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ) সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং বম্বেতে বৃহত্তম দল হবার সুবাদে কংগ্রেস সরকার গঠনের অবস্থায় আসে। এই বিপুল জয়ের অন্যতম বড় কারণ অবশ্যই গান্ধীবাদী জনসংযোগ প্রকল্প এবং ফয়জাবাদের কৃষি কর্মসূচী। কিন্তু এই বিপুল জয় কিছু সমস্যারও উদ্রেক করে। কংগ্রেস এর আগে নীতিগতভাবে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় গভর্নরের বিশেষ অধিকার মানতে অস্বীকার করেছিলঙ্গ নির্বাচন সাফল্যের পরে সরকার গঠনের কথা উঠলে সেই নীতিগত অবস্থানের পরিবর্তনের পক্ষে দক্ষিণপন্থীদের চাপ আসতে থাকে। জুলাই ১৯৩৭ ছটি রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন হয়, কয়েকমাসের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং পরের বছর আসামে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। অর্থাৎ বাংলা, সিন্ধু এবং পাঞ্জাব বাদ দিলে দেশের প্রায় সর্বত্তরই কংগ্রেসের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

১৯৩৮-৩৯ সালে কংগ্রেসের জনসংযোগ বাড়ানোর প্রক্রিয়া ব্যাপক আকার ধারণ করে। যুক্তপ্রদেশে ভূমি সংস্কারের পক্ষে সওয়াল করে কংগ্রেস কিষাণ সভার নেতৃত্ব ধরে রাখলেও বিহার এবং বাংলায় কংগ্রেস ভূমিসংস্কারের পক্ষে ছিল না। প্রায় সব কংগ্রেস শাসিত রাজ্যেই বামপন্থী রাজনীতি কড়া হাতে দমন করার প্রবণতা দেখা যায়। এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক সমস্যার ক্ষেত্রে অবদান। কংগ্রেস ওয়ার্ধার শিক্ষা সম্মেলনে (১৯৩৭) মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কিত যে কার্যাবলী গ্রহণ করেছিল, ক্ষমতাসীন হয়ে রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস তা বলবৎ করার চেষ্টা করে। এতে নাগরী হরফে হিন্দী চর্চায় জোর দেবার ফলে এবং অজান্তেই হিন্দু মতাদর্শের প্রচারের রূপ দেয়াতে উর্দুভাষী মুসলিম সত্তা বিপন্ন বোধ করে। তার ওপর হিন্দু কৃষকদের স্বার্থে মুসলিম ভূস্বামীর জমি অধিগ্রহণের কথা যুক্ত প্রদেশে বলে, বাংলায় মুসলিম কৃষকের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভূমি সংস্কারের বিরোধিতা করাতে কংগ্রেস প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক আখ্যা পায়। মুসলিম লীগের তীব্র আক্রমনের মুখে কংগ্রেস সদিচ্ছা ব্যক্ত করা ছাড়া বিশেষ কিছু করতে ব্যর্থ হয় কারণ ওই সময়ে গান্ধী-সুভাষ বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছয়।

৩(খ).৫.২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতীয় রাজনীতি

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৩রা সেপ্টেম্বর ভারতের বড়লাট ভারত সরকারের তরফে ব্রিটেনের হয়ে যোগদানের কথা ঘোষণঅ করেন। ভারত জড়িয়ে পড়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।

১৯৩৮ সথকেই এই সংকটের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠী মনে করেছিল ইউরোপে ব্রিটিশ ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে ভারতে গণ-আন্দোলন, প্রয়োজনে গণঅভ্যুত্থান গড়ে তুলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর এটি আদর্শ সময়—এই মতামতের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। অন্যদিকে ত্রিশের দশকে ইউরোপ ভ্রমণের সুবাদে নেহরু ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে সম্যক ভাবে পরিচিত থাকায় তীব্র

ফ্যাসিবাদী ছিলেন। তিনি চাইছিলেন বিশ্বজোড়া ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে ভারত ব্রিটেনের পাশে থাকুক। কংগ্রেস নেহরুর মতই কতকটা মেনে নেয়।

ব্রিটেনের হয়ে ভারতের যুদ্ধরত হওয়াতে কংগ্রেসের বিশেষ আপত্তি না থাকলেও ভারতীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে একতরফাভাবে ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া কংগ্রেসের সঙ্গত বলে মনে করেনি। তবু কংগ্রেস যুদ্ধে পূর্ণ সহযোগিতা করতে রাজী ছিলেন দুটি শর্তে—অবিলম্বে প্রকৃত দায়িত্বশীল নির্বাচিত কেন্দ্রী সরকারের গঠন করতে হবে; এবং যুদ্ধোত্তর ভারতের সংবিধান সভা গঠনের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

বড়লাট লিনলিয়গো কংগ্রেসকে বিন্দুমাত্র জমি ছাড়তে নারাজ ছিলেন। ১৯৩৯ সালে এশিয় মহাদেশে যুদ্ধের সম্যক সম্ভবনা ক্ষীণ হওয়ায়, এবং ভাতের আইনের সংশোধনী অনুসারে ১৯৩৯ সালে বড়লাটের প্রভূত ক্ষমতাবৃদ্ধি হওয়াতে, লিননিয়গোর অনমনীয়তা বেড়ে যায়। অক্টোবর মাসে বড়লাট অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে ভারতকে স্বায়ত্বশাসন দেবার অঙ্গীকার করলে অসন্তুষ্ট কংগ্রেস ২২শে দিসেম্বর ১৯৩৯ সমস্ত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে আসে। লিনলিযগো স্বায়ত্বশাসন সংক্রান্ত ভাষণে ভারতের বিভিন্ন সম্পদায়ের সম্মতির ওপর ভবিষ্যত কাঠানোর রূপ নির্ভরশীল বলে দেয়াতে, মুসলিম লীগ এবং আম্বেদকারের ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি কংগ্রেসি মন্ত্রীসভার পদত্যাগকে 'মুক্তি দিবস'' বলে ঘোষণা করে।

১৯৪০-এ ব্রিটেন যখন জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত, তখন ভাতের পূর্ণ সমর্থন পেতে স্বয়ং নিলিযগো আপসে রাজি হলেও প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তার বিরোধীতা করেন। ফলে ''আগস্ট প্রস্তাব'' (১৯৪০)-এ শুধুমাত্র বড়লাটের শাসনবিভাগ এবং যুদ্ধ উপদেষ্টা কমিটিতে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া নতুন কোন প্রস্তাব ছিল না।

অগাস্ট প্রস্তাবের পরে রামগড় কংগ্রেসে (১৯৪০) গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী গান্ধী মুষ্টিমেয় নেতাদের ব্যক্তিগত সত্যাগ্র প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। তবু ১৯৪১-৪২ সালে কংগ্রেসের বামপন্থীরা বাদে সবাই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমঝোতা চাইছিল। ১৯৪২ পূর্ব এশিয়া জাপানের বিস্ময়কর সাফল্য এবং উপর্যুপরি ব্রিটিশ পশ্চাদপসরেণর (সিঙ্গাপুর, বর্মা, আন্দামন) পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। মার্কিন সরকার এবং জাতীয় সরকারের লেবার সদস্যদের চাপে পড়ে চার্চিল বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি উচ্চপদস্থ প্রতিধিদল পাঠাতে রাজী হন। সরকারের লেবার সদস্য স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের নেতৃত্বে এই দলের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতা লাভের অদূর ভবিষ্যতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এমনকি হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা করা।

ক্রীপস ক্যাবিনেটের যে ঘোষণা পত্র সম্বল করে ভারতে এসেছিল তাতে বলা হয় যুদ্ধোত্তর পর্বে অনতিবিলম্বেই স্বায়ত্বশাসন, এমনকী পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার দেয়া হব। প্রাদেশিক আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত একটি সংবিধান সভা গঠন করা হবে, তবে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে সংবিধানসভায় যোগদানে বিরত থাকতে পারে। ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাঁদের প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার পাবেন। এবং অনতিবিলম্বেই ভারত সরকারের অন্তবর্তীকালীন শাসনবিভাগে ভারতীয় রাজনীতিবিদদের যোগদানের

ব্যবস্থা করা হবে, যদিও যুদ্ধ-পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা বড়লাটের হাতে থাকবে।

কংগ্রেস প্রাথমিকভাবে ক্রীপসের দৌত্য মেনে নেয়। সংবিধান সভায় যোগদান থেকে বিরত থাকতে পারার আশ্বাস পাওয়ায় লীগও আলোচনায় প্রস্তুত ছিল। অন্তবর্তী সরকারের যোগদানের ব্যাপারে ঐক্যমত্য হলেও প্রতিরক্ষা বিষয়ক আলোচনায় ক্রীপস ভারতীয়দের হাতে বেশী ক্ষমতা দিতে প্রথমে রাজী থাকলেও লিনলিযগো এবং চার্চিলের আপত্তিতে তা বানচাল হয়ে যায়। সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব ব্রিটিশদের হাতেই ন্যস্ত থাকবে বলাতে কংগ্রেস আলোচনা ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

ক্রীপস মিশন (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪০) ব্যর্থ হলে পরে কংগ্রেসের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। গান্ধী একে "Post-dated cheque on a crashing bank" আখ্যা দেন। ক্রীপস প্রস্তাব যে আশা জাগিয়েছিল, তার ব্যর্থতা ততটাই হতাশার জন্ম দেয়। তার ওপর যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক তৎপরতার বিষয়ে অসহিষ্ণুতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা—সব মিলে যে আবহ তৈরি হয়েছিল তারই সূত্র ধরে গান্ধী ভাতর ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেন।

৩(খ).৫.৩ ভারত ছাড়ো আন্দোলন

১৯৪২-এর গ্রীষ্মে গান্ধী অস্বাভাবিক অনমনীয় হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩৯ সাল থেকেই ব্রিটিশ দমননীতি তীব্র হয়ে উঠেছিল কারণ ব্রিটিশ শাসকেরা কংগ্রেসকে আন্দোলনে প্ররোচিত করে যুদ্ধকালীন বিশেষ অধিকার বলে কংগ্রেসকে চূর্ণ করে দিতে চাইছিল। ১৯৪২-এর শুরু থেকেই জাপানী আক্রমনের সম্ভবনা প্রবল হতে থাকেঙ্গ পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কর্মরত ভারতীয়দের পরিত্যাগ করে ব্রিটিশরা যেভাবে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করে তাতে ব্রিটিশদের প্রতি ব্যাপক ক্ষোভ জন্মায়। পূর্ব এশিয়া থেকে ফিরে আসা ভারতীয়রা ক্ষোভের সঙ্গে অন্য একটি উপলব্ধিও নিয়ে এসেছিল—প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবারে ভাঙনের মুখে। এর পাশাপাশি যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতীয় অর্থনীতি চরম মূল্যবৃদ্ধি সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সরকারে অজান্তেই বাড়িয়ে চলেছিলেন। এসবেরই প্রকাশ ঘটেছিল গান্ধীর অনমনীয়তায়।

গান্ধী মনে করতেন জাপান ভারত আক্রমন করতে পারে যদি ভারতে ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত থাকে। তাই ৮ আগষ্ট ১৯৪২ বম্বেতে কংগ্রেসের অধিবেশনে ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত ছাড়তে বলেন। গান্ধী তাঁর অনমনীয়ভাবের পরিচয় দিয়ে আন্দোলনকে শুধু অহিংস পথে চলার আহ্বান করেই বিরত থাকেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব কারারুদ্ধ হলে প্রতিটি স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী যেন নিজেকে অসিংস পথে পরিচালিত করে। "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" মন্ত্রের মধ্যেও এই অনমনীয়তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

৯ই আগষ্ট ভোররাতেই লিনলিযগো কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় প্রায় সব নেতাকেই কারারুদ্ধ করেন, এবং এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেসি নেতৃত্বও কারারুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে, কংগ্রেসি জনআন্দোলনের সাধারণত যে নিয়ন্ত্রিত হবার প্রবণতা থাকত তা ১৯৪২-এর আন্দোলনে অনুপস্থিত।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নগরাঞ্চলে প্রবল অস্থিরতা দেখা দেয়। বম্বে ৯-১৪ অগাষ্ট লাগাতার হরতালে নিশ্চল হয়ে পড়ে। কলকাতায়

১০-১৭ অগাস্ট লাগাতার বনধ্ চলতে থাকে। দিল্লীতে পুলিশ এবং জনতার খণ্ডযুদ্ধে বহু ব্যক্তি হতাহত হয়। পাটনা দুদিনের জন্য ব্রিটিশ শাসকদের হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্যান্য শহরেও শ্রমিক ধর্মঘটে নগরজীবন বাহত হয়।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অসন্তোষ শহর ছেড়ে শহরতলী এবং মফস্বলের দিকে এগোতে থাকে। ১৯৩০ সালে আন্দোলন থেকে দূরে থাকা শহরে মধ্যবিত্ত ছাত্র এবং বৃহত্তর যুব সমাজ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। রেললাইন উৎখাত, থানা বা অন্যান্য সহকারী কার্যালয় আক্রমণের সংখ্যা দেশজুড়ে রাতারাতি বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ রাজের সংযোগ ব্যবস্থা বহুক্ষেত্রে বিপন্ন হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে ব্যাপক কৃষক যোগদানের ফলে উপমহাদেশের একটা বড় অংশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। বিহার, যুক্তপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র এবং কর্নাটকে কৃষক অসন্তোষ ব্যাপক অভূত্থানের আকার নেয়। বিহারে এই আন্দোলনের পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল অ-কংগ্রেসি কিষাণ সভার। আন্দোলন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিংসার আশ্রয় নেয়, এবং অল্প সময়ের জন্য হলেও রামমনোহর লোহিয়া এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের মত বামপন্থর কংগ্রেসিদের নেতৃত্বে প্রতি সরকার গঠিত হয়।

মেদিনীপুরে কৃষক জাগরণের ফলে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন সতীশ সরকার প্রমুখ নেতা। এই প্রতি-সরকার সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ সাল অবধি।

উড়িষ্যার বালাসোরে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কৃষক অব্যুত্থানের যে সূত্রপাত হয় তা স্বরাজ পঞ্চায়েতের গঠনে সাহায্য করে। দৃষ্টান্ত উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বরাজ পঞ্চায়েতের ধারণা ক্রমশ উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নুরূপভাবে মহারাষ্ট্রে সাতারা এবং খান্দেশ অঞ্চলে কৃষক অভ্যুত্থানের ব্রিটিশ রাজশক্তি পিছু হটতে বাধ্য হয়। আপ্পা সাহেবের নেতৃত্বে সাতারার জাতীয় সরকার এই কৃষক অভ্যুত্থানের সুবাদে বেশ কিছু দিন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রবল হলেও সর্বব্যাপী হয়নি। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের সুবাদে সমৃদ্ধ কৃষকরা যে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল—যেমন পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল, গুজরাত, তামিলনাড়ুর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল—যেসব অঞ্চলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আদৌ তীব্রতা লাভ করেনি। তার ওপর মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষ অবলম্বন করায় মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশও আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকে। ফলে পূর্ববঙ্গ এবং মুসলিম প্রধনা অঞ্চল মোটের ওপর শান্ত ছিল।

তাতেও আন্দোলনের প্রাবল্য নিয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। দলগতভাবে কমিউনিষ্টরা ব্রিটিশ শাসনে পক্ষে থাকলেও তৃণমূল স্তরে কমিউনিষ্ট এবং কংগ্রেস কর্মীরা কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে ১৯৪২-এর গণআন্দোলনকে অহিংস জনআন্দোলনের গন্ডী পার করে এক অভ্যুত্থানের রূপ দিত সাহায্য করেছিল।

১৯৪২-এর মধ্যেই তীব্র দমননীতির দৌলতে উত্তাল ভারতবর্ষকে ব্রিটেন নিয়ন্তরণে আনতে সফল হয়। ১৯৪৩ সালে প্রায় এক লক্ষ লোক কারারুদ্ধ হল। মোট ২০৮টি পুলিশ চৌকি, ৩৩২টি রেল স্টেশন, ৯৪৫টি পোস্ট অফিস আক্রান্ত হয়েছিল। সাড়ে ছ'শোর বেশি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল সারা দেশ জুড়ে। গণজাগরণের

এই রূপ দেখে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে যে যুদ্ধকালে চরম দমননীতি নিয়ে এই আন্দোলন স্তব্ধ করা গেলেও, যুদ্ধোত্তর ভারতে তা সম্ভব হবে না। পেশীবলে ভারতকে সাম্রাজ্যে ধরে রাখা সম্ভব হবে না বুঝেই নবনিযুক্ত বড়লাট কংগ্রেসি নেতৃবর্গকে মুক্তি দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়াস শুরু করেন ১৯৪৩-৪৪ সালে। শুরু হয় স্বাধীনতার প্রহর গোনা।

৩(খ).৬ সারাংশ

১৯৪২-৪২ ছিল ভারতীয় রাজনীতির জনমুখী হওে ওঠার কাল। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক অবধি ভারতীয় রাজনীতি মূলত সংসদীয় অলিন্দে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের রাজনীতি গান্ধীর প্রবেশের পরেই রাজনীতিতে ক্রমশ জনগণের উপস্থিতি এবং গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

১৯২০-২২ সাল খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন ছিল ভারতের ইতিহাসের পতরথম সর্বভারতীয় নিয়ন্তিরত জন আন্দোলন। তুরস্কের সুলতান ইসলামী দুনিয়ার খলিফার প্রতি অমর্যাদাপূর্ণ আচরণে ক্ষুব্ধ ভারতীয় মুসলিম সমাজ তখন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমস্ত রকম অসহযোগিতার কথা ভাবছিল। হিন্দুদের সাহায্য ছাড়া অসহযোগ ব্যর্থ হতে পারে এই আশঙ্কায় তারা হিন্দু-প্রধান কংগ্রেসের সাহায্য চায়। মন্ট-ফোর্ড আইনের হতাশাব্যাঞ্জক ক্ষমতার আংশিক বিকেন্দ্রীকরণের পরে জালিয়াওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড কেন্দ্র করে ব্রিটিশ শাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা তখন তলানীতে এসে ঠেকেছে। দেশব্যাপী উত্তেজনার মধ্যে গান্ধী উপলব্ধি করেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়ে ব্রিটিশ বিরোধীতার এর থেকে ভাল অবকাশ আর আসবে না। তাই কংগ্রেসের একাংশের আপত্তি সত্ত্বেও গান্ধী ১৯১৯ সালে ঘোষিত কাউন্সিল নির্বাচন থেকে কংগ্রেসকে দূরে সরিয়ে রেখে জন আন্দোলন শুরু করেন।

১৯২১-২২-এর খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন ছিল মূলত শহরে সীমাবদ্ধ ছিল। যুদ্ধোত্তর ভারতে অসন্তোষ নগরবাসীর মধ্যে প্রবল হওয়ায় এবং কংগ্রেসী জনসংযোগ গ্রামাঞ্চলে তেমন ব্যাপ্ত না হওয়াতেই এই সীমাবদ্ধতা তাছাড়া কংগ্রেসের তখনও তেমন নির্দিষ্ট কোন কৃষিকর্মসূচীও ছিল না। তবু বহু জায়গায় গান্ধীর নাম-মাহাত্ম্যকে অবলম্বর করেই কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়ায় আন্দোলনের নিয়ন্ত্রিত অহিংস চরিত্র বিপন্ন হচ্ছিল। ১৯২২ সালে চৌরিচৌরা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

১৯২০-এর দশক তিনটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম, কংগ্রেসের নির্বাচনপন্থী গোষ্ঠী স্বরাজ্য পাটি নামে দ্বৈতশাসন যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে দ্বৈত শাসনরে অসারতা প্রমাণ করলেও শাসন সংস্কার আনতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ত মুসলিম তিক্ততা বাড়ার সুযোগ নিয়ে ভারতের স্বশাসনের অক্ষমতা প্রমাণ করতে সাইমন কমিশন পাঠানো হয়। এই কমিশনে কোন ভারতীয় না থাকাতে ভারতবাসী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, এবং সর্বদলীয় এক সম্মেলনে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের রূপরেখা ঠিক করা হয়। কংগ্রেসের যুবাগোষ্ঠী পূর্ণস্বরাজের লক্ষ্যে এগোতে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ওই সময়েই বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক মন্দার পূর্বাভাস ভারতে দেকা যায়। রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক অসন্তোষের প্রতিফলন ঘটে আইন অমান্য আন্দোলনে। এক্ষেত্রে বিশের দশকের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—গান্ধীর গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার সুবাদে কংগ্রেসের গ্রামে গ্রামে উপস্থিতি—জন আন্দোলনকে ব্যাপকতর বিস্তৃতি পেতে সাহায্য করে।

আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় ডান্ডীতে লবন সত্যাগ্রহ দিয়ে। পরে তা অহিংস মতে সবরকম আইন অমান্যের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক অধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এই আন্দোলনের প্রভাব নগরাঞ্চলে সীমিত থাকলেও গ্রামাঞ্চলে প্রাবল্য লাভ কর। ক্ষেত্রবিশেষে আন্দোলন অহিংসার সীমারেখাও লঙঘন করে যায়। এমতবস্থায় বড়লাট আরউইন গান্ধীকে আন্দোলন থামিয়ে বারতের ভবিষ্যত শাসনসংস্কার নিয়ে আলোচনা করতে লন্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠকে আহ্বান করেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে বড়লাট গান্ধীর অল্প কিছু দাবি মেনে নেন, বিনিময়ে গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যান।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে খালি হাতে ফিরে ১৯৩০-এর দশকে গান্ধী জনসংযোগ বাড়াতে থাকেন। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে প্রদেশিক শাসনরে ভার ভারতীয়দের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেয়া ঠিক হয়। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসি জনসংযোগ এবং কৃষি-বিষয়ক রাজনৈতিক কর্মসূচীর সুবাদে কংগ্রেস ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক নির্বাচনে সাফল্য লাভ করে এবং সব মিলে আটটি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস অবিলম্বে স্বায়ত্ব শাসনের দাবি জানায়। বড়লাট সেই দাবি মানায় কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করে। প্রত্যক্ষ সহায়তার বিনিময়ে স্বশাসনর দাবিতে অনড় কংগ্রেস ক্রীপস্ প্রস্তাবের সময় আশান্বিত হয়, কিন্তু তা ব্যর্থ হওয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্রিটিশ বিরোধী জনমত এবং জাপানী আক্রমনের সম্ভবনার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকারকে ভারত ছাড়তে গণ আন্দোলনের সূচনা করে।

১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কংগ্রেসি শীর্ষ নেতৃত্ব কারারুদ্ধ হয়। ফলে ইতোপূর্বের জন আন্দোলনে দলের যে নিয়ন্ত্রণ ছিল ১৯৪২-এ তা দেখা যায়নি। রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং ক্ষুব্ধ ভারতবাসী ১৯৪২-এ প্রায় অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফেলে। চরম দমননীতি নিয়ে সেই জনজাগরণ প্রশমিত করলেও ১৯৪২-এ ব্রিটিশ রাজ বুঝে যায় তদের অন্তিম লগ্ন আসন্ন প্রায়।

৩(খ).৭ অনুশীলনী

ক) খিলাফত আন্দোলন কেন অনুষ্ঠিত হয়? এতে কংগ্রেসের অংশগ্রহণের কারণ কী ছিল?

খ) অসহযোগ আন্দোলনের থারা এবং প্রকৃতি আলোচনা করুন।

গ) আইন অমান্য আন্দোলনের ধারা এবং প্রকৃতি আলোচনা করুন।

ঘ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিষয়ে আলোচনা করুন।

ঙ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ধারা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

ক) খিলাফত কথাটির অর্থ কী? ১৯২০-এর দশকে ভারতবর্ষে খিলাফত আন্দোলন কেন সংঘটিত হয়েছিল?

খ) অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির কোন নেতা উত্থাপন করেন?

গ) অসহযোগ আন্দোলনের সূত্র ধরে প্রতিষ্ঠিত যে কোন দুটি স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠনের নাম বলুন।

ঘ) বিশের দশকে কংগ্রেসের যে কোন দুজন নির্বাচনপন্থী (Pro-changer) এবং নির্বাচন বিরোধী (No-changer) নেতার নাম উল্লেখ করুন।

ঙ) সাইমন কমিশনের ঘোষিত উদ্দেশ্য কী ছিল?

চ) ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরে কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠনে সফল হয়?

ছ) ১৯৩৯ সালে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি থেকে কংগ্রেসের সরে আসার কারণ কী ছিল?

জ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূত্রপাতের সময় কোন ব্রিটিশ বড়লাট এক তীব্র দমননীতির আশ্রয় নেন?

৩(খ).৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) অমলেশ ত্রিপাঠী — স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস — ১৮৮৫-১৯৪৭ (কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৩৭)

২) Sumit Sarkar — Modern India 1885-1947 (Madras, Macmillan India, 1983)

৩) Judith Brown — Gandhi-A Prisoner of Hope (Oxford University Press)

একক ৪ ❑ কংগ্রেসে বামপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ নেতাজি সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা

৪.৩ নেতাজি সুভাষ ও আজাদ হিন্দের কার্যকলাপ

৪.৪ শ্রমিক আন্দোলন

৪.৫ সারাংশ

৪.৬ অনুশীলনী

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের বিভিন্ন গতিধারাকে উপলব্ধি করার জন্য বামপন্থীদের কার্যকলাপ ও পরবর্তী পর্যায়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কার্যাবলীকে অনুধাবন করা আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যই এই রচনা।

৪.১ প্রস্তাবনা

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯১৭ রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৪৮ সালে মার্কস-নব উত্থিত শিল্পনির্ভর ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রয়োগ ১৯১৭ রাশিয়ায় লেনিন করতে সক্ষম হন। জার সাম্রাজ্যের পতন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে রাষ্ট্র গঠন সারা বিশ্বের শোষিত মানুষের মধ্যে একধরনের আশার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। বিশেষত উপনিবেশবাসীদের মধ্যে একধরনের বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদ তথা ধনতন্ত্রই একমাত্র ঐতিহাসিক সত্য নয়। তবে ১৯১৭র পর থেকেই যে ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ জনপ্রিয় হয়েছিল তা নয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা, বিশেষত রাজশক্তি বিরোধীতায় রাশিয়ায় খবর সংগ্রহ সহজ ছিল না। ফলত ভারতের কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্টতর মধ্যে মার্কস ও অন্যান্য বৈপ্লবিক তত্ত্ব সম্পর্কে একধরনের ওপর ওপর ধারণা গড়ে উঠেছিল। তার চেয়েও বড় কথা ২০ দশকের গেড়ার দিকে গান্ধীর নেতৃত্বে গণ আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন তাৎপর্য এনেছিল ফলত এই পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের বিস্তার বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করেনি। কিন্তু ভারতের শিক্ষিত এলিটদের মধ্যে মার্ক্সবাদ যদিও একটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে কোনো সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নির্যাস পাওয়া যায় না। যদিও মার্ক্স, কেশব সেন ও

নৌরজীর সময়কার, লেনিন, গোখলে ও তিলকের সমসায়িক ছিলেনঙ্গ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই সামগ্রিকভাবে ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে সমাজবাদের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এঁরা জাতীয়তাবাদী ভাবনায় উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীর যান্ত্রি কারিগরী বিদ্যার বিলোপ, ধনতন্ত্রের সমালোচনাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিতে পারেনি। এর সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় সমাজতন্ত্রের বিকাশ, ব্রিটিশ শাসকের দমননীতি, অর্থনৈকি সংকট, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশেষত কমিনটনের নির্দেশ এই বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল।

বলশেভিক বিপ্লব যে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেই সময়ের লেখা বিভিন্ন রচনায়। S. A. Darge 'Gandhi and Lenin', Muzaffar Ahmed-এর ‘নবযুগ’ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯২০র অক্টোবরে মানবেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে তাসকন্দে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২০র পর থেকে ভারতে বেশ কতকগুলো বামপন্থী গোষ্ঠীর ভারতের উদ্ভব হয। পেশোয়ার, কানপুরে বামপন্থী ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যার ফলশ্রুতি পেশেয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা।

কমিউনিস্ট পার্টির্র কার্যাবলীর সর্বব্যাপী বিস্তারের উদ্দেশ্য তৃতীয় কমিনটনে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় ঠিক হয় কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের বৃহত্তর প্ল্যাটফর্মের মধ্যে থেকে নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখবে। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের সহযোগতায় জনগণের কাছে পৌঁছনোটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নিজস্বতা বজায় রেখে বৈপ্লবিক পার্টি গড়ে তোলাও প্রয়োজনীয় এই দুই উদ্দেশ্য কংগ্রেসের মধ্যে থেকে বামপন্থী আন্দোলন পরিচালনার মধ্যেই সফলতা লাভ করবে বলে কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করেছিল।

কমিউনিস্টদের এই উদ্দেশ্য ১৯২৮ দশকে W.P.P. (Workers Preasent Party)র কার্যাবলীর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বোস, ইয়ুথ লিগ ও অন্যান্য বামপন্থী পার্টির সঙ্গে একত্রিত হয়ে W.P.P. জাতীয় আন্দোলনকে দৃঢ়তা দান করেছিল। এই পর্যায়ে সিপিআই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে থেকে শ্রমিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইভাবেই তারা বিশ্বাস করে Dictatorship of proletariat প্রতিষ্ঠিত হবে। W.P.P. তাই বলা যায় শুধুই কমিউনিস্ট পার্টির 'Sub-party' ছিল না। কংগ্রেসের মধ্যে যে বামপন্থীর ছিলো তাদের একটা প্রভাব স্পষ্ট ছিলো কিন্তু W.P.P. এর সদস্যরা যেহেতু একই সঙ্গে কংগ্রেসেরও সদস্য তাই এই বিভাজনটা স্পষ্ট ছিলো না। W.P.P কংগ্রেসের সঙ্গে অভ্যন্তরে ও বাইরে নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রেখে কংগ্রেসের মধ্যে একটা বামপন্থী চরিত্তর গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ না হলেও অনেকাংশেই সক্ষম হয়েছিল। কংগ্রেসের বম্বের মতো প্রাদেশিক খাশায় W.P.P.-র বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। ১৯২৮ পর্যন্ত কংগ্রেসের মধ্যেঔ W.P.P. কার্যাবলী গ্রহণ করার মতো এক ধরনের উদারতা দেখা দিয়েছিলে।

কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দমননীতিও বৃদ্ধি পেতে থাকে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা তার অন্যতম উদাহরণ। ১৯২৯-এ ৩ জন কমিউনিস্ট গ্রেপ্তার হন। এদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হন নেহেরু, আনসারি মতো ব্যক্তিত্বরা।

১৯২৮-এর পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছন্নতার কারণ হয়ে

দাঁড়ায় কমিউনিস্টদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা। তারা কংগ্রেসকে একটা Class Party বা শ্রেণী পার্টি হিসেবে উপলব্ধি করত কংগ্রেস যে একটা বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম তা তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। বাস্তবকে না দেখে তারা তত্ত্বের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। প্রকৃপক্ষে অর্থনৈতিক দিক থেকে যতই শ্রেণীভাগ থাকুক না কেন বিদেশী শকিতর কাছে পদানত হবার অসম্মান সমস্ত শ্রেণীর কাছে এক সুতরাং বুর্জুয়া জাতীয়তাবাদীরা যে প্রকৃতই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী—এই উপলব্ধি তাদের হয়নি। আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা মনে করত অর্থনৈতিক অবস্থান আলাদা হলে আদর্শগত অবস্থান আলাদা হতে বাধ্য। তাই যে কোনো গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে শ্রেণীচরিত্র খোঁজার প্রয়াস কমিউনিস্টদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। কংগ্রেসকে মধ্যবিত্ত বুর্জুয়া ও ভূস্বামীর প্রতিধিত্বের কেন্দ্র হিসেবে সমালোচনা করলেও বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ কংগ্রেসেই কেন বৃহত সংখ্যক কৃষক শ্রেণী অংশ দিয়েছিল এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারেনি উপরন্তু বিভিন্ন সময়ে তাদের কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়েছিল।

কমিউনিস্টদের আভ্যন্তরীণ সমস্যার পরিবর্তন ঘটে সপ্তম কমিনটনে এর পর থেকে যেখানে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী শিবির গড়ে তোলার কথা বলে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিকে একত্রিত করা হয়। এক্ষেত্রে উপনিবেশে জাতীয়তাবাদী বুর্জুয়া শক্তির সঙ্গে বামপন্থীদের আপোষের ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়। ফলে এই পর্যায় থেকে কংগ্রেসকেও অন্যভাবে দেখা শুরু হয়। কংগ্রেসে এমন এক গোষ্ঠী যোগদান করে যাদের শিল্পপতি বা ধনতন্ত্রের দুনিয়া থেকে আলাদা করে দেখা হয়।

১৯৩৪-এ সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করলে কংগ্রেসের আভ্যন্তরে কাজ করাটা আরো প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ১৯৩৬-এ Bradley থিসিসে বলেই দেওয়া হয় কংগ্রেসের মধ্যে শ্রেণী চরিত্র খেঁজার প্রয়োজন নেই। কাণ কংগ্রেস হল — 'United front of people' সপ্তম কমিনটনেও ভারতের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টিকে কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করার কথা বলা হয়। কারণ এসময়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা অপেক্ষা ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। যার ফলশ্রুতি কিষাণ সভা, ট্রেড ইউনিয়ন, কেরালা, অন্ধ্র পাঞ্জাব বাংলায় কৃষক আন্দোলন।

যদিও এক্ষেত্রেও তাত্ত্বিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল বামপন্থী আদর্শের ব্যক্তিগর্গ। প্রথমত তারা মনে করত হিংসাত্মক বিপ্লব ছাড়া পরিবর্তন সম্ভব নয়। তিবীয়ত কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করলেও কমিউনিস্ট পাটি তখনই একটা শ্রেণী পার্টি হিসেবে গঠিত হবে যখন তা শ্রমিক শ্রেণীর মুখপাত্র হবে এবং এটা তখনই সম্ভব যখন কংগ্রেসের প্রতি তাদের মোহগ্রস্ততার অবসান ঘটবে।

কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় কমিনটনের পর থেকেই কংগ্রেসের একটা প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েচিল যা নেহেরুর সময়েই সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। ১৯২৭-এর পর থেকে নেহেরুর নেতৃত্বে যব সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই একধরনের চরমপন্থী সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষপাতিত্ব দেকা যায়। এমনকি চন্দ্রশেখর, আজাদ, ভগৎ সিং-এর মত সন্ত্রাসবাদীরাও সমাজবাদী হয়ে ওঠে।

নেহেরু ছাত্রাবস্থায় বিদেশে থাকাকালীন মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহী হন। তাঁর সাম্যবাদ প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয় আন্দোলনক আর্থ-সামাজিক সাম্যের দিকে ধাবিত করেছিল। আউধে কৃষক বিদ্রোহেই তার প্রমাণ ১৯২৮-এ তিনি সুভাষের সঙ্গে Independence for India League গড়ে তোলেন ও ১৯২৯

এ লাহোরে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করলে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নেহেরু ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে এক করে League of Independence-এর মাধ্যমে দুটো আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যেকোনো শক্তিই যে ধনতন্ত্রের বিরোধী এই উপলব্ধি নেহেরুর বক্তব্যের মাধ্যমেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যা মানবেন্দ্র রায় পারেননি। নেহেরু ও সুভাষের নেতৃত্বেই কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী ধারার কার্যাবলী জনমানসে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। নেহেরু কংগ্রেসকে 'multi-class organization;-পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এই সময় কংগ্রেস গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করতে সক্ষম হয়। নেহেরু সমাজতান্ত্রিক মডেলের পক্ষপাতী হলেও তাকে কমিউনিস্ট বলা যায় না এবং এখানেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের আভ্যন্তরের বামপন্থী আন্দোলনের পার্থক্যকে উপলব্ধি করা যায়। নেহেরু গান্ধীর মতো শ্রেণীদ্বন্দ্বকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু একসঙ্গে তিনি 'dictatorship of proletariat' এর কথাও বলেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্য ছাড়াও স্বাধীনতা সম্ভব যদিও কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে দিসেয়ছিলেন এর ফলে যে স্বাধীন ভারত গড়ে উঠবে তা হবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র। প্রকতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে ভারতীয় পরিস্থিতির উপযোগী করে ব্যবহারের মধ্যেই নেহেতু তথা তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রোসের আভ্যন্তরীণ বামপন্থী আন্দোলনের সার্থকতা নিহিত ছিলো।

১৯৩৯-এ Congress Socialist Party-র উত্থান হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩০-৩৪-এর মধ্যে কংগ্রেসের যুবক সম্প্রদায় গান্ধীয়ান রাজনীতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। নাসিকের জেলে থাকাকালীন মার্কসবাদ ও সমাজবাদের এরা নতুন পার্টি গঠনে উদ্বুদ্ধ হয় যা C.S.P. [Congress Socialist Party] নামে খ্যাত। এই পার্টির গোষ্ঠীরা CPI এর সঙ্গে যেমন একমত হতে পারছিলেন না তেমনি জাতীয় আন্দোলনকে সর্বস্তরে উপনীত করতে চেয়েছিল। বম্বেতে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে এই পাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পার্টির সদস্য নরেন্দ্রদেব সরাসরি ঘোষণা করেন কংগ্রেস ছাড়া এগোনো যাবে না। ফলে C.S.P., AITUC একযোগ কাজ করতে আগ্রহী হয়।

CSP উদ্দেশ্যই ছিলো কংগ্রেসের মধ্যে সমাজবাদ জনপ্রিয় করা ও কংগ্রেসকে দৃঢ়তা দেওয়া হয়। কংগ্রেসের মধ্যে দুবার বামপন্থী নেতৃত্ব বিজিত হয়। ১৯৩৯-এ ত্রিপুরীতে ও ১৯৪০-এ রামগড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাম ও ডান পন্থার ভিত্তিতে যখন কংগ্রেসের বিভাজনের সময় আসে CSP কখনই গান্ধীকে অস্বীকার করেননি। CSP নেতারা জনগণের ওপর গান্ধীর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন — “We solialist do not want to create factions in the congress nor do we desire to displace the old leadership of Congress and to establish revial leadership” —যদিও গান্ধী ১৯৩৯-এ CSP-র সঙ্গে শ্রেণীদ্বন্দ্বে হিংসা প্রভৃতি বিষয়ে মতপার্থক্য প্রকাশ করেনি। তিনি গংগ্রেসের মধ্যে CSP কৃষিসংস্কার বিষয়ে কংগ্রেসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৪২-এর আন্দোলনে কমিউনিস্টারা সরে এলেও CSP তাতে যুক্ত হয়। CSP কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছিল কারণ CPI এর মতো তার কংগ্রেসের বাইরে কোন অস্তিত্ব ছিলো না ফলে অভ্যন্তরে ও বাইরের আদর্শগত সংঘাতের মুখোমুখি CSP কে হতে হয়নি। এটা চিল কংগ্রেসের আভ্যন্তরের একটা গোষ্ঠী কংগ্রেস এর কার্যাবলী থেকে নিজেকে পৃথক অস্তিত্ব রাখার প্রয়োজনও ছিলো না।

৪.২ নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা

সুভাষচন্দ্র প্রথম ও শেষপযন্ত ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী তাই তিনি জাতীয়তাবাদী আদর্শের কোনোরকম সমালোচনা বিরোধী ছিলেন। তাত্ত্বিক জায়গা থেকে জাতীয়তাবাদরে দুধরনের সমালোচনার উল্লেখ করেন তিনি। প্রথম সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরটি আন্তর্জাতিক কমিনিসমের দষ্টিকোণ থেকে। এই দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদ ক্ষুদ্র স্বার্থপর একটা গণ্ডিরেখা। কিন্তু সুভাষের মতে ভারতবাসীর মুক্তি একমাত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে — জাতীয়তাবাদ ছাড়া স্বাধীন চেতনা বিকাশের অন্য কোনো মাধ্যমের কথা তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন আদর্শের সমন্বয়ে। তিনি একইসঙ্গে কমিউনিস্ট ও ফ্যাসিস্ট বা National Socialism জাতীয়তাবোধকে ভিত্তি করে গড়ে ঠেঠেছে, আর কমিউনিস্ট আন্দোলন আন্তর্জাতিকতাবাদ ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সুভাষ এই দুই আদর্শ গ্রহণে উৎসাহী হয়ে একদিকে জার্বানীর জাতীয়দাবাদী ভাবধারার শরিক হতে চেয়েছিলেন তেমনই সোভিয়েত অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

সুভাষচন্দ্র যখন রাজনীতিতে যোগ দেন তখন ভারতীয় রাজনীতি বা কংগ্রেস রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছিল গান্ধীর নেতৃত্বে। গান্ধী সত্যাগ্রহ ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন উদ্ভাবন করেন। সুভাষচন্দ্র অহিংসার আদর্শে পুরোপুরি বিশ্বাসী না হয়েও গান্ধীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিছিলেন। যেমন নিয়েছিলেন জহরলালও। সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন আপোষহীরন সংগ্রামে। সুভাষের রাজনৈতিক দর্শনের মূল লক্ষ ছিল দেশবাসীর আর্থ-সামাজিক জীবনের উন্নতি তিনি সমগ্র মানবসভ্যতার জন্য কোন সার্বজনীন সমাধান সূত্রের উত্থাপন করতে পারেননি। উপরন্তু তিনি ভারতবর্ষে পরিস্থিতি উপযোগী তত্ত্বও তথ্যের মিশ্রণে স্বাধীন ভারতের আদর্শ চিত্র গড়ে তোলেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর লেখা 'Fundamental Problems of India' ইওরোপীয়রা ভারতবর্ষকে সাধু, রাজা, ঋষির দেশ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন ভারতবর্ষকে এভাবে দেখার কারণ ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এখনও জীবিত। গ্রীস, ব্যাবিলন, মিশরের মত ভারতের প্রাচনী সংস্কৃতি মৃত নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় ভারতে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ হয়নি বরঞ্চ বলা যায়—ভারতবের্ষ প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারা সমান্তরলাভাবে প্রবাহিত। তিনি স্বীকার করেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই ভারতবর্ষে উদারতন্ত্র, সংবিধানতন্ত্র ও গণতন্ত্রের আদর্শ বিকাশ সম্ভব হয়েছে। বিপ্লবী মতাদর্শও ভারতবর্ষে পশ্চিম থেকেই এসেছে মাৎসিনী গ্যারিবল্ডির জীবনী থেকে ভারতবাসী বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ভারতবাসীর মননকে এই সমস্ত ওপর প্রভাবিত করেনি বরঞ্চ ভারতবাসী পশ্চিমের যুক্তিবাদী রাজনৈতিক ভাবধারা আত্মস্থ করেছে।

তিনি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি সমাজবাদের সমর্থক ছিলেন এবং শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রকে রাষ্ট্রয়করণ ও ব্যক্তিগত সম্পদের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা বজায় রাখার পক্ষপাতী চিলেন। একই সঙ্গে তিনি বলশেভিকদের অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না ও ভারতবর্ষের পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাজবাদের প্রয়োগকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এটাও

উল্লেখ করেন সোভিয়েত রাশিয়ার একটা পরীক্ষামূলক অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সুতরাং সোভিয়েত রাশিয়াকে প্রগতি ও সাম্যের মূর্ত আদর্শ মনে করাটা উচিত হবে না। তিনি পৃথক কমিউনিস্ট পার্টিরও কোন প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদী পার্টি যদি দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে মনোযাগী হয় তবে পৃথক কমিউনিস্ট পার্টির কোন প্রয়োজন নেই। আর যে দেশের ৯০% মানুষ শ্রমজীবি সে দেশের জাতীয়তাবাদী পার্টি অবশ্যই শ্রমিক, কৃষকের আর্থ-সামাজিক স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুভাষের নিজস্ব রচনা পড়লে এটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন—তিনি সাম্রাজ্যবাদের অধীনে স্বায়ত্ত শাসন চাননি। তাঁর মতে ভারতবর্ষ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে স্বতন্ত্র—ভারতবাসী ও ব্রিটিশদের মধ্যে কোনো মিল নেই। সুতরাং ব্রিটিশদের কোনো অধিকার নেই ভারতবর্ষ শাসন করার। তিনি কেনইবা পূর্ণ স্বারাজের পক্ষে সে বিষয়ে তাও তিনি বনে। তিনি মনে করেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার বা শিল্পায়ন সম্ভব নয়—অথচ এই তিন ক্ষেত্রের বিশেষ প্রয়োজন ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে। নানাজাতির দেশ বলে ভারতবর্ষ বিদেশীদের অধীনে থাকবে নিজেদের স্বাধীন সত্তা বিকাশ করতে সক্ষম হবে তা তিনি মানতে রাজী ছিলেন না। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার উদাহরণ দেখিয়ে বলেন যে ভিন্নজাতির সমাবেশ সত্তেবও রাষ্ট্র গঠন সম্ভব। তাছাড়া তাঁর মদে ধর্মের ভিত্তিতে যে বিচ্ছন্নতাবাদের কথা ব্রিটিশ সরকার প্রচার করছে তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সমর্থন নেই বরঞ্চ তারা কংগ্রেসে নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনকেই সমর্থন করছে। ভারতীয়দের মধ্যেও একটা ধারণা হয়েছে যে ব্রিটিশরা চলে গেলে ভারতবর্ষ তার প্রতিরক্ষা করতে অক্ষম হবে কিন্তু সুভাষের মতে আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্যের সঙ্গে কূটনৈতিক চুক্তির সংগঠন ভারতের স্বাধীনতা রক্ষায় তৎপর হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে কংগ্রেসের বয়জ্যেষ্ঠ সেদ্যেদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ মতপার্থক্য ছিল। তিনি পূর্ণ স্বরাজের পক্ষে ছিলেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকার Dominian Status কখনই দেবে না। এক্ষেত্রে ছমাসের জন্য আন্দোলন ব্যাহত রাখার কোন যুক্তি তিনি পাননি। সুভাষের মতে কংগ্রেসের মধ্যে একটা বামগোষ্ঠী বিকশিত হয়েছে এবং এই বাম গোষ্ঠীর দায়িত্ব আন্দোলনের গতি নির্দেশ করা। কংগ্রেসের গান্ধী আন্দোলনের প্রতি যথার্থ সম্মান রেখে তিনি বলেন ২০ দশকে গান্ধীর আন্দোলন যথার্থ বৈপ্লবিক ছিল কিন্তু ৩০ দশকে এই আন্দোলন তার তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে এবং যুব সম্প্রয়ায়ের নেতৃত্বে নতুন বামপন্থী আন্দোলনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য পূর্ণ স্বরাজ। তিনি আরো বলেন তাঁর প্রজন্ম ও আগের প্রজন্মের মধ্যে দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে পার্থক্য রয়েছে। পূর্ব প্রজন্মের মধ্যে আধুনিক শিল্প ও আধুনিক সামরিক বাহিনীর সাহায্যে দেশ গঠনের প্রতি অনীহা লক্ষনীয়। কিন্তু যুবসম্প্রদায়ের এই দুটোই আধুনিক যুগের দাবি বলে মনে করে তিনি একইসঙ্গে মনে করেন যুবসম্প্রদায় ও প্রবীণদের মধ্যে এই মতপার্থক্য আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় বরঞ্চ এর ফলে আন্দোলনের শক্তি বর্ধিত হবে। তিনি কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে মানসিক রক্ষণশীলতা থেকে বেরিয়ে আসতে বলেন। কংগ্রেসের কর্মসূচীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন অপেক্ষা আপোষের প্রবণতা খুব বেশি বলে তিনি তার সমালোচনা করেন।

তিনি আরও বলেন ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে খাদি শিল্পের বিকাশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, এর ফলে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। তিনি জনগণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা মাচনকে আরো গুরুত্ব দেবার কথা বলেন নয়তো জনগণ আন্দোলনকে উৎসাহ হারাবে। তবে তিনি শুধুমাত্র নঞর্থক সমালোচনায় ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি সুস্পষ্ট কর্মসূচীও নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সমকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে আদর্শ প্রেক্ষাপটের স্বরূপ ব্রিটেনের সাম্রাজ্য ছিল বিশেষ সংকটপূর্ণ অবস্থায়। সুদূর প্রাচ্যে জাপানের উত্থান, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইটালির শক্তিবৃদ্ধি ব্রিটেনের পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। তাছাড়া সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থান যেকোনো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বযুদ্ধ যে আসন্ন তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং বিশ্বযুদ্ধ যে ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতির ওপর বিশেষ চাপ ফেলবে তাও পষ্ট ছিল। ব্রিটেনের নৌশক্তির জায়গায় সামরিক ক্ষেত্রে বিমান শক্তির উত্থান ব্রিটেনের নৌশক্তিকে গুরুত্বহীন করে তুলেছিল।

সুভাষ এই পরিস্থিতিকে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের জন্য কাজে লাগাতে আগ্রহী ছিলেন। 'Democracy of India' তে তিনি লিখেছিলেন এই সময়ের প্রধান কাজ সাইমন কমিশনের বিরোধিতা করা এবং সমস্ত পার্টি একত্রিত হয়ে একটা সংবিধান রচনা করা যা ইংরেজ সরকারকে পুরোপুরি মেনে নিতে হবে। একইসঙ্গে অর্থনৈতিক বয়কটের মাধ্যমে আন্দোলন চালু রাখতে হবে। দুর্বল ও নিরস্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র বিদেশী পণ্যের বর্জন। কুড়ি বছর আগে স্বদেশী যুগে এই আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে যথেষ্ট সঙ্কটে ফেলেছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন। তিনি কংগ্রেস ও গান্ধীর সমালোচনা করলেও তিনি কংগ্রেসের গুরুত্ব ও গান্ধীর আন্দোলনের পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা বিষয় দ্বিধাহীন ছিলেন। তিনি বামপন্থীদের মনে করিয়ে দেন যে কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধানতম গণসংগঠন এর বাইরে বেরিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করা সম্ভব নয়। তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে Passive resistence মনে করতেন না, তাঁর প্রকৃতপক্ষে হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক কোন প্রকার গণ আন্দোলনেই আপত্তি ছিলো না কিন্তু তাঁর আপত্তি ছিলো আন্দোলন চলাকালীন মাঝে মাঝে বিরতিতে। তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। তাঁর স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল ভারতবাসীর জীবনের মান উন্নয়ন ও আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্যের প্রতিষ্ঠা। তিনি কোন বিশেষ মতাদর্শ বা দরিদ্র ও পরাধীনতা মোচনের ক্ষেত্রে কোন তাত্ত্বিক সমাধান অপেক্ষা ব্যবহারিক সমাধানে আগ্রহী ছিলেন এবং রাজনৈতিক দর্শনের উপরে ছিল তাঁর দেশপ্রেম।

৪.৩ নেতাজি ও আজাদহিন্দের কার্যকলাপ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য সুভাষচন্দ্র জার্মানী গিয়ে জার্মানির হাতে বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে তিনি একটি সেনাদল গঠন করে ব্রিটিশের বিরুদেধ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। এটাই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম পরিকল্পনা। জার্বানীর ভারতীয়রা সুভাষচন্দ্রকে নেতাজি উপাধি দেয় এবং জয়হিন্ত বলে পারস্পরিক অভ্যর্থনার রীতি চালু করে।

ইতিমধ্যে জাপান, ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১। এই সময়

ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানে ছিলেন। জাপান দ্রুতগতিতে সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ, মালয় দখল করে নিলে রাসবিহারী বসু দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের নিয়ে সৈন্যদল তৈরি করে ভারত স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বার্থ বিপন্ন করে। ভটনাচক্রে ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুরে আজাদহিন্দ ফৌজ গঠনের সূত্রপাত হয়। রাসবিহারী বসু ও ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধবন্দী উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী মোহন সিং ১৯৪২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আজাদহিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। ব্যাংককে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ রাসবিহারীকে প্রস্তাব দেয় যে সুভাষচন্দ্রকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতা করা উচিত। ১৯৪৩এর ৮ই ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র জার্মানি ছেড়ে জাপানে আসেন। কিন্তু তিনি যখন জাপানে আসেন তখন জাপানের নৌ ও বিমান বহর বিপর্যস্ত।

ইতিমধ্যে আজাদহিন্দ বাহিনীর ও নেতাজির যুদ্ধ প্রস্তুতি সকল খবরই ভারতে গোপনে পাচার হচ্ছিল। নেহেরু সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন সুভাষ বসু ভারতে এলে তিনি তার বিরোধিতা করবেন। কারণ তার মতে সুভাষের বাহিনী জাপনীদের হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়।

সুভাষচন্দ্র বলতেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তিনি সব সময়েই অনুভব করতেন যে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য ভারত সবদিক থেকে তৈরি, শুধু তার নেই একটি মুক্তি বাহিনী। ১৯৪২ সালে আগস্ট মাসের মধ্যে ৪০ হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দী আজাদ বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালের ২২শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বা স্বাধীন ভারতের যুদ্ধকালীন সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। ২৩শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্র ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি নিজে এই সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন। অর্থমন্ত্রী হন এ সি চট্টোপাধ্যায়। প্রচার বিভাগ ও মহিলা বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় যথাক্রমে এস. এ. আয়ার ও লক্ষ্মী স্বামীনাথনের হাতে। উপদেষ্টা ও সচিব হন যথাক্রমে রাসবিহারী বসু ও এম. এ. সহায়।

১৯৪২-এর নভেম্বর জাপানী প্রধানমন্ত্রী তোজো আজাদ হিন্দ সরকারকে জাপানী বাহিনী দ্বারা ইতিমধ্যে অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ছেড়ে দেবার জাপান সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৪৪-এ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ বাহিনীর সুবাষ ব্রিগেড বাহিনীর প্রথম ব্যাটেলিয়ন রেঙ্গুন থেকে প্রোম অভিমুখে যাত্রা করে। ১৯৪৪-এ মার্চ মাসে এই ব্যাটেলিয়ানের গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ বিজয়লাভ ঘটে ব্রিটিশ বাহিনীর পশ্চিম আফ্রিকা সেনাদলের বিরুদ্ধে। ১৯শে মার্চ ১৯৪৪এ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। ভারতের জাতীয় বাহিনী মৌডক অধিকার করে ১৯৪৪ সালর মে মাসে। ইতিমধ্যে এপ্রিলের ৮ তারিখ আজাদ হিন্দ বাহিনী কোহিমা অবরোধ করে। এরপর বর্ষা শুরু হলে স্থির হয় বর্ষার পর আজাদ হিন্দ বাহিনী আসামের ভিতর দিয়ে বাংলায় আক্রমণ চালাবে।

ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিমান বাহিনীর দ্বারা প্রচন্ডভাবে আক্রমণ চালিয়ে জাপানকে কোনঠাসা করে ফেললে জাপান ব্রহ্ম সীমান্ত থেকে তাঁর বিমান বাহিনী যুদ্ধরত এলাকায় সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এদিকে বর্ষা শুরু হওয়ায় যোগাযোগ ও খাদ্য সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়। খাদ্যাভাব, রোগ, শীত, ম্যালেরিয়া ও পার্বত্য অঞ্চলের বিষাক্ত পোকার কামড়ে হাজার হাজার জাপানী ও

আজাদ হিন্দ সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। সুভাষ ব্রিগেডের সেনাপতি কর্ণেল শাহনওয়াজ খান দাবি করেছেন ‘‘নানা অসুবিধা সত্ত্বেও এই অভিযানে আমরা ভারতের অভ্যন্তরে ১৫০ মাইল অগ্রসর হয়েছিলাম। কোন রণক্ষেত্রেই আমরা পরাজিত হইনি। এই অভিযানে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রায় ৪০০০ সৈন্য মৃত্যু বরণ করেছিলেন।’’ ১৯৪৪-এ জানুয়ারি মাসে রেঙ্গুনে প্রধান সামরিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৪-এ মে মাসে মৌডক দখল করার পর যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। জুন মাসে স্বদেশ রক্ষার্থে জাপানী সনাবাহিনী বর্মা পরিত্যাগ করে ও প্রায় একই সময়ে আধুনিক অস্ত্রের সজ্জিত বিশাল মার্কিন বাহিনী ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদহীন ও প্রায় অনাহারে থাকা আজাদহিন্দ বাহিনীকে প্রবল বিক্রমে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। ১৯৪৪-এ সেপ্টম্বরে ব্রিটিশ বহিনী মৌডক পুর্নদখল করে। ইতিপূর্বে ১৯৪৪ সালেই কোহিমা ইম্ফল রণাঙ্গনে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সম্মিলিত জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান পর্যুদস্ত হয়। ১৯৪৬-এ ৬ই আগস্ট হিরোসিমাতে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়। কয়েকদিন পর নাগাসাকিতে এই বোমা ফেলার ঘটনা ঘটে। জাপান শান্তি চুক্তির প্রার্থনা জানায় ১৬ই আগস্ট। জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় বাহিনীর মুক্তি সংগ্রামে সকল আশা লোপ পায়।

সুভাষচন্দ্র ভারত ছেড়ে জার্মানীতে হিটালারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মুহূর্ত থেকে ভারতের ব্রিটিশ শাসক ও ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি একত্রে তাঁকে শত্রুপক্ষের দালাল ও ফ্যাসিস্ট বলে ঘোষণা করে। কংগ্রেসও সুভাষচন্দ্রের এহেন কা প্রীতির চোখে দেখেনি। এই তিন পক্ষের মনোভাবের সঙ্গে জনগণের মনোভাবের সমতা ছিল না। যে মুহূর্তে জনগণ জেনে গেল সুভাষচন্দ্রের অপরিসীম আত্মত্যাগের কাহিনী, সেই মুহূতে জনগণের কাছে তিনি হয়ে গেলে নেতাজি। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে নয়। কারণ জার্মানীর হাতে ব্রিটেন মার খাচ্ছে বা জাপানের হাতে ব্রিটেন মার খাচ্ছে — এই ব্যাপারটা মানুষ উৎফুল্লভাবে নিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র ১৯৪১-এ ২০ এপ্রিল বার্লিন তেকে এক গোপন বেতার ভাষণে বলেন তিনি অক্ষ শক্তির উমেদার নন। জার্মানীতে তাঁর আসার একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা। তাঁর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ‘‘আমার দেশবাসীর কাছে আমার পরিচিতির কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমার সমগ্র জীবন একটা দীর্ঘ নাছোড়বান্দা এবং আপোষহীন সংগ্রাম ও এটাই দেশবাসীর প্রতি আমার বিশ্বস্ততা।’’

জাপানের আত্মসমর্পনের দুদিন আগেই সুভাষচন্দ্র তা জানতে পারেন। সেরামবান থেকে ১৩ই আগস্ট নেতাজী সিঙ্গাপুর পৌঁছান। আজাদ হিন্দ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাঁকে অবিলম্বে অন্য কোথাও আত্মগোপন করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। ১৭ই আগস্ট তিনি সায়গন আসেন। দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট একটি জাপানী বোমারু বিমানে অন্যান্য জাপানী অফিসারদের সঙ্গে নেতাজি ও কর্ণেল হবিবুর রহমান ফরথোসার তাইহোকু বিমান বন্দরে পৌঁছান ১৮ই আগস্ট বেলা দুটোয়। এরপর হঠাৎই আগুন ধরে যাওয়ায় বিমান বিধ্বস্ত হয়। নেতাজি আহত হন পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। যদিও নেতাজির মৃত্যু সংবাদ ব্রিটেন ও আমেরিকার গোয়েন্দা দপ্তর বিশ্বাস করেনি। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ২১শে আগস্টের পূর্বে

ভারতে প্রচারিত হয়নি। ক্রমশ ভারতে আজাদ হিন্দ ফৌজের কৃতিত্বের সংবাদ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৪৬-এ মে থেকে অক্টোবরে ২০ হাজার হাজাদ হিন্দ সৈন্য রেঙ্গুন থেকে ভারতে ফিরে আসে। মালয় আর ব্যাংককে ৭ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। সেনাপতিদের মধ্যে ক্যাপ্টেন সায়গল, ক্যাপ্টেন ধিঁরো ও ক্যাপ্টেন সাহনওয়াজের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৪৬-এ লালকেল্লায় বিচার শুরু হয়। আসামী পক্ষে দাঁড়ায় ভুলাভাই দেশাই, তেজবাহাদুর সপ্রু, জওহরলাল। এই বিচার নিয়ে দেশের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। আজদ হিন্দ ফৌজের উদ্দীপনা ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেও সংক্রমিত হয়। ফলে ব্রিটিশ শক্তি বিচলিত হয়ে পড়ে। সেনাপতিদের বিচারে মৃত্যুর আদেশ দিয়ে শেষপর্যন্ত তাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ১৯৪৬-এর ২১-২৩ নভেম্বর কলকাতায় এক গণবিস্ফোরণ ঘটে যায়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ছাত্রা মিছিল করে। ২২ ও ২৩ তারিখ সারা শহরে গণ্ডগোল ছড়িয়ে যায়। ট্রাম ও ট্যাক্সি ধর্মঘট পালন করে। জনতা ট্রেনও অবরোধ করে। তাদের ওপর গুলিও চালানো হয়।

সর্বোপরি বলা যায় সামরিক ক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের সাফল্য সীমিত হলেও বারতীয় কংগ্রেস তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে আজাদ হিন্দকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। যদিও আজাদ হিন্দ বাহিনীর ব্রিটেনকে যুদ্ধে পরাজিত করার ও স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যথার্থতা লাভ করেনি।

হিউয়ে তাঁর গ্রন্থে বলেছেন একদা অনুভূতিশীল নেতাজি নির্দয় ডিক্টেকারে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর মতের বিরুদ্ধতা করলে কারোর ক্ষমা ছিল না। যদিও অন্য কোনো সূত্রে এক বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্য ও স্টাফ অফিসারদের মধ্যে অনেকেই বাহিনী ত্যাগ করে পালিয়ে গেছেন বা ব্রিটিশ বাহিনীতে ফিরে গেছেন এমন নজির পাওয়া যায়। ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় ১৩ই মার্চ ১৯৪৬ সালে প্রচলিত নেতাজির বক্তব্য থেকে। এতে তিনি অভিযোগ করেছেন যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দ্বিতীয় ডিভিশানের পাঁচজন অফিসার বাহিনী ত্যাগ করেছেন। এই ঘটনা বহিনীর যুদ্ধবৃত্তিকে দুর্বল করে তোলে।

২৮শে এপ্রিল ১৯৪৫-এ বর্মা ত্যাগের সময় বাহিনীর সেনাদের মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের সাহসিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে বহুবিধ প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু নেতাজি তাঁর বাহিনীর সেনাদের বলেছিলেন ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের সম্মুখীন হয়ে জয়হিন্দ বলে চীৎকার করলেই ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনারা আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের ওপর গুলি না চালিয়ে তাদের স্বাগত করবে। এই ধারণা যদিও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

চতুর্থত উপযুক্ত সামরিক শিা ও শঁঙ্খলার অভাব ছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের। এর কারণ অবশ্যই ছিল সময়ে স্বল্পতা। বাহিনীতে অজস্রর স্থানীয় সিভিলিয়ন যোগ দিয়েছিলেন যাদের পর্যাপ্ত সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়নি।

পঞ্চমত, আজাদ হিন্দ বাহিনী অস্ত্র-গুলি, পোষাক থেকে শুরু করে খাবারদাবার সমস্ত কিছুর জন্য জাপানের মুখাপেক্ষী চিল। যুদ্ধের শেষের দিকে মিত্রশক্তির প্রবল আক্রমনে বিধ্বস্ত জাপান এই সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি।

ষষ্ঠত, মিত্রপক্ষ আমেরিকার বিপুল সাহায্যে বলীয়ান হয়ে উঠতে থাকলেও, জাপানকে সাহায্য করার কেউ ছিলো না। সর্বোপরি বলা যায় নেতাজি ও আজাদহিন্দ বাহিনীর পক্ষে সময় ছিল প্রতিপূল। যখন আজাদ হিন্দ যুদ্ধ শুরু করল, তখন জাপানের সামরিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। সামরিক শক্তির বিচারে তারতম্য এতটাই বেশি ছিল যে পেশাদার সামরিক বাহিনী এই ঝুঁকি নিত কি না সন্দেহ।

৪.৪ শ্রমিক আন্দোলন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃত্বি হল শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সুসংগঠিত করা। কংগ্রেসের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের সম্পকে উৎসাহী এবং তাঁদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে শ্রমিকদের সম্পর্কে তেমন উৎসাহ ছিল না। গান্ধীজি প্রথমদিকে শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও পরে শ্রমিক আন্দোলনে উৎসাহ দেখাননি। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে শ্রমিকদের সঙ্গে গান্ধীজির কোন সম্পর্ক ছিলো না।

মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিউনিস্ট পার্টির দুটো রূপ রাখতে চেয়েছিলেন, একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বামপন্থী হিসেবে কাজ করবে, অপরটি সীমাবদ্ধ থাকবে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে। প্রকাশ পার্টির নাম হবে ওয়ার্কাস এ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি। এইভাবে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের সঙ্গে গভীর যোগসূত্র স্থাপন করে। পার্টির আদর্শ ও ভাবধারায় শ্রমিকশ্রেণী অনুপ্রাণিত হয়। ১৯২৭-এ ফেব্রুয়ারী ও সেপ্টেম্বর মাসে খড়্গপুরে রেলওয়ে কর্মীরা যে ধর্মঘট করেন তাতে কমিউনিস্টদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এই ধর্মঘট প্রমাণ করে যে শ্রমিকরা ভি. ভি. গিরি ও এ্যান্ড্রুজের মত নরমপন্থী শ্রমিক নেতার নেতৃত্বে সন্তুষ্ট নয়। যখন এ্যান্ড্রুজ ধর্মঘটকে লিলুয়া ওয়ার্কসপে ছড়িয়ে দেওয়ার কমিউনিস্ট প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেন তখন ডাঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড সমালোচনা করেন।

১৯২৬-এ বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৯২৮-এ কমিউনিস্ট প্রভাবিত ওয়ার্কস এ্যান্ড পেজেন্টস পাটির নেতৃত্বে কলকাতা কর্পোরেশন ও চেঙাইল ও বাউড়িয়ার চটকলে ধর্মঘট হয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হয় বোম্বাইয়ে ১৯২৮-এ। বেতন হ্রাসের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট হয়। কমিউনিস্ট পরিচালিত গিরনি কামগার ইউনিয়ন এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেয়। এই ধর্মঘট যে অত্যন্ত সফল হয়েছিল তা ভারত সবিচের কাছে লিখিত বোম্বাইয়ের গভর্নরের এক পত্রেই প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে, যথেষ্ট পুলিশ দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও একজন শ্রমিকও কাজে যোগ দেয়নি। এই ধর্মঘটের অবসান ঘটে, যখন মিল মালিকরা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নতুন হারে বেতন দিতে সম্মত হন। কমিউনিস্ট প্রভাবিত গিরনি-কামগার ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার যেখানে এন. এম. যোশী পরিচালিত ইউনিয়নের সদস্য ছিল ৯৮০০। ১৯২৮-এর পর থেকে বোম্বাইয়ে রেলওয়ে কর্মী ও তেল ডিপোর কর্মচারীদের ওপর কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়তে থাকে।

সুতরাং শ্রমিক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে সরকার পাবলিক সেফটি বিল ও ট্রেডস্ ডিসপিউটস্ এ্যাক্ট পাশ করালেন ১৯২৯-এ। আশ্চর্যের কথা এই যে কংগ্রেস এই দুটি বিলের বিরোধিতা করলেও বিতর্কের সময় এক বিরাট সংখ্যক কংগ্রেস অনুপস্থিত ছিলেন। ঐ বছরই ব্রিটিশ সরকার ২০শে মার্চ ভারতের ৩২জন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অইবযোগে। এই ঘটনাকে বলা হয় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাঙজ প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মুজাফফর আহমেদ, এস. এড. ডাঙ্গে প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। এঁদের সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা বেঞ্জামিন ব্র্যাডলি ও ফিলিপ স্প্র্যাট। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই মামলা বলে বিচারে প্রায় সকলেই দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক এই ঘটনাকে নিন্দে করেন।

১৯৩১-এ কমিউনিস্টদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেওয়াথ এ.আই.টি.ইউ.সি-তে ভাঙ্গন দেখা দেয়। কিছু কমিউনিস্ট Red Trade Union Cogress প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩৪-এ শ্রমিক আন্দোলন আবার নতুন শক্তি সঞ্চয় করে। কিন্তু ঐ বছরই জুলাইয়ে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়।

৪.৫ সারাংশ

মার্ক্সের নব উত্থিত শিল্পনির্ভর সমাজব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞাভিত্তিক সমাজব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের আদর্শে কংগ্রেসেও বামপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত। যা কিনা কমিউটানের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপন গতিধারার নির্ধারণে তৎপর হয়ঙগ নেহেরুর কর্মতৎপরতা এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই আন্দোলনের আদর্শ ধরে আন্তর্জাতিক কমিউনিসমের ভাবদারায় সুভাষচন্দ্র তাঁর জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলন সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় ও আজাদহিন্দ বাহিনীর গঠনের মধ্যে দিয়ে আপন গতিময়তায় ফিরে যায়।

৪.৬ অনুশীলনী

১। বামপন্থী আন্দোলনের বিস্তার ও কংগ্রেসের বামপন্থর আন্দোলনের উত্থান ও কার্যাবলী সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক পূবন্ধ লিখুন।

২। কংগ্রেসের মধ্যস্থিত বামপন্থী আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে নেহেরুর কার্যাবলর আলোচনা কর — নেহেরুর তথা বামপন্থী আন্দোলনের কি কোনো সীমাবদ্ধতা ছিলো বলে তুমি মনে কর, যদি থাকে তবে তা কেন বলুন।

৩। বামপন্থী আন্দোলনে সি.এস.পি.-র ভূমিকা পর্যালোচনা করে সি.পি.আই-এর সঙ্গে তার পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৪। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শবোধ, ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা ও তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা সবিস্তারে আলোচনা করুন।

৫। নেতাজির রাজনৈতিক আদর্শবোধের প্রতিফলনই কি আজাদ হিন্দু বাহিনীর গঠনের ঘটনায় রা পড়ে—তোমার মতামত যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

৬। নেতাজির অবদান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচলানর ক্ষেত্রে বর্তমান উল্লেখযোগ্য তা আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপ বর্ণনার মাধ্যমে বোঝান। এই বাহিনী ব্যর্থ কেন হলো?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। W.P.P.-এর পুরো নাম কী?

২। ডাঙ্গে ও মুজাফফার আমমেদের রচনার নাম করুন।

৩। সপ্তম কমিনটনে কী বলা হয়েছিল?

৪। ১৯২৮-এ নেহেরু কার সঙ্গে কী গঠন করেন?

৫। কংগ্রেস স্যোসালিস্ট পার্টির উত্থান করে হয়।

৬। আজাদ হিন্দ বাহিনীর জন্ম কোন সালে হয়েচিল?

৭। নারীদের দ্বারা গঠিত বাহিনীর নাম কী? এই সংগঠনের একজন নেত্রীর নাম লিখুন।

৮। ১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর স্মরণীয় কেন?

৯। ১৯৪৪ সাল আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্ষেত্রে স্মরণীয় কেন?

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। অমলেশ ত্রিপাঠী — স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

২। Sumit Sarkar — Modern India

৩। Bipin Chandra — India's Strugle for Freedom

৪। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় — আধুনিক ভারত

৫। Leonard A Gordon — Brothers Against the Raj

৬। Tarachand — History of the Freedom Movement

একক ৫ ❑ পাকিস্তান দাবি

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ ক্ষমতা হস্তান্তর

৫.৩ ক্ষমতা হস্তান্তর পরবর্তী পরিস্থিতি

৫.৪ সারাংশ

৫.৫ অনুশীলনী

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৫.০ উদ্দেশ্য

ইংরেজ সরকারের বিভেদ নীত, হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বুঝতে গেলে পাকিস্তান আন্দোলন, স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতবর্ষকে অনুধাবন করা আবশ্যক। সাম্প্রদায়িক সমস্যা যা আজও ভারতবর্ষের অন্যতম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার উৎসকে সন্ধান করা একান্তই প্রয়োজন যাতে করে তার সমাধান করা সম্ভব হয়।

৫.১ প্রস্তাবনা

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়, ইংরেজ সরকারের সার্থক বিভেদ নীতি মুসলমান সম্প্রদায়কে তা থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলঙ্গ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন মুসলমান মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী ইংরেজ সরকারের এই টোপ মুসলমানরা সহজেই গ্রহণ করেছিলঙ্গ তাদের অধিকাংশজনই বিশ্বাস করত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হিন্দুদের আন্দোলন এবং তা থেকে মুসলমানদের দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়ঙ্গ যে আন্দোলন ছিল গোটা দেশের পক্ষে ম;লজনক তা হয়ে দাঁড়াল মুসলমানদের চোখে কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে মঙ্গলজনক। ধর্মনিরেপক্ষ যুক্ত আন্দোলনের প্রথম সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছিল সৈয়দ আহমেদের হিন্দু-মুসলমানে স্বার্থ এক নয়—এ হেন ঘোষণা। সৈয়দ আহমেদের এই মতবাদ যেন পাকিস্তান দাবির প্রথম ইঙ্গিত বহন করেছিল। উত্তর ভাগের কোন কোন অঞ্চলের চাকুরী। শিক্ষা ও স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার নির্বাচন পদ্ধতিটির ভিতর দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব পূর্বভারতের মুসলমান দৃষ্টিভঙ্গীকে পৃথক মাত্রা দিয়েছিল। আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মুসলমান সমাজ সহজেই সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে পড়ে। বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করাই কার্জনের লক্ষ্য ছিলো। ১৯০৬ এ ভারত সরকার ভারতবাসীকে কিছু শাসনতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা চিন্তা করছিল ঠিক এই সময়ে চরমপন্থী হিন্দুত্ব ঘেঁষা

আন্দোলনকারীদের হিন্দুদের দেবীর কাছে শপথ নেওয়ার যে পন্থা গ্রহণ করেছিল মুসমানদের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তারা হিন্দু আন্দোলনকারীদের থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিল। বিসার-উল-মুল্ক সহ কয়েকজন মুসলমান নেতা মুসলমাদনের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করে। এই সংস্থার নীতি ছিল (১) সরকারের কাছে মুসলমান জনগণের মনোভাব পেশ করা (২) ইংরেজ রাজত্ব স্থায়ী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ও কংগ্রেসি আন্দোলন থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে সরিয়ে রাখা।

১৯০৬-এ ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম সীগের প্রতিষ্ঠা হয়। লীগের প্রধান প্রচার ছিল দেশের বৃহত্তম ও মহত্তম স্বার্থও যদি মুসলমাদের স্বার্থ বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন করে তবে মুসলিম স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ১৮৮৫ সালের পর থেকে সৈযদ আহমেদের নেতৃত্বে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের লক্ষ্য সফল করার যে প্রয়াস চলছিল ১৯০৬-এ তা পূর্ণ হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদ রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মুসলিম লীগ শুধুমাত্র মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। আলিগড় আন্দোলনের আদর্শ ও লক্ষ্যকে ভিত্তি করে লীগের আদর্শ গড়ে ওঠে।

মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করার জন্য ১৯০৯-এ মার্লি মিন্টো সংস্কারের মুসলমান সম্প্রদায়ক আইন সভায় পৃথক সদস্য নির্বাচনের (Seperate electorate) অধিকার দেওয়া হয়। এইভাবে ভারতের রাজনীতি দ্বিজাতিতত্ত্বের (Two-nation theory) প্রবেশ ঘটে। যদি মুসলমানদের এত আমল দেওয়া কিছুতেই উচিত হয়নি বলে ১৯০৯ সালের ১১ই নভেম্বর মর্লির কাছে মিন্টো স্বীকার করেছন কিন্তু দুজনেই অন্য কিছু করার ব্যাপারে প্রয়োজন অনুভব করেননি। তবে ১৯১১-য় মুসলিম লীগের সোচ্চার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে না গিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় ও জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সকল শক্তি ব্যয় করেছে। জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে মুসলিম লীগের এই সীমাবদ্ধতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মৌলানা মহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান, হাসান ইমান প্রমুখ নেতাদের মধ্যে মুসলিম লীগের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। তারা সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেওয়ার প্রচার অভিযান শুরু করেন। এই ধরনের জাতীয়তাবাদী চেতনা দেওবন্দ নামেক একটি স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমাদের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল—আবুল কালাম আজাদ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই বুঝতে পারেননি দেশপ্রেম ধর্মবিরোধী নয়। সাম্প্রদায়কিতা, পাকিস্তান দাবি, ভারত বিভাগ ইত্যাদি যে কোন বিষয় আলোচনা করতে হলে জিন্না সম্পর্কে বিস্তৃত জানা আবশ্যক।

একদা কংগ্রেস সদস্য জাতীয়তাবাদী জিন্না পরবর্তীকালে সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের দাবি করেন। Time and Tide নামক পত্রিকায় ১৯৪০-এর জানুয়ারী মাসে তিনি প্রথম দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রসঙ্গ সমর্থন করে প্রবন্ধ লেখেন। ঐ বছরেই মার্চে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মলেন, "একটা জিনিস এমন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমরা আর সংখ্যালঘু নই, আমরা নিজেরাই একটি পৃথক ও বিশিষ্ট জাতি, আমাদের

ভবিষ্যৎ আমাদের নিজেদের।”

জিন্না রাজনীতি শুরু করেন দাদাভাই নওরোজীর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে। ঐ সময় তিনি সৈয়দ আহমেদের মতো হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯১৬ সালে জিন্না লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পানদে প্রভূত সাহায্য করেন। ১৯১৩ সালে মহম্মদ আলির প্ররোচনায় তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিলেও এই শর্তে যোগ দিয়েছিলেন যে লীগের লক্ষ্য কংগ্রেসের লক্ষ্য থেকে খুব বেশি আলাদা হবে না। এই সময়ে অনেকেই জিন্নাকে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের দূত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যদিও লক্ষ্ণৌ চুক্তির ভিত্ততে কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন মণ্ডলী মেনে নেয় ও এর ফলে মুসলমানেরা নিজেদের আলা আইডেনটিটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

১৯৩০ সালে মহম্মদ আলির মৃত্যুর পর জিন্না মুসলিম লীগের নেতা হন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর বিভিন্ন প্রদেশের করেকার গঠন করে কংগ্রেস। মুসলিম লীগ সরকারের বাইরেই তেকে যায়। নির্বাচনে বিহার, ওড়িশ্যা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। বোম্বেতে ১৭৫টি আসনের মধ্যে ৮৬টি লাভ করে বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী কার্যকলাপ জিন্নাকে ক্রমশ হতাশ করে। তিনি উপলব্ধি করতে থাকেন সংখ্যাগুরু মানেই কংগ্রেসী শাসন। আর কংগ্রেসী শাসন মানেই হিন্দুদের শাসন। মুসলিমদের জন্য ভারতে এক পৃথক রাষ্ট্র যা সৈয়দ আহমেদের পরবর্তী রচনার মধ্যে নিহিত ছিল, যা রহমৎ আলি একদা প্রচার করেছিল যা ১৯৩০ এর পর থেকে ইকবালের রচনায় ক্রমবর্ধমান রূপে দেখা যচ্ছিল, তা ক্রমেই জিন্নাকে আকৃষ্ট করেছিল। এতদ্‌সত্তেবও বলা যায় বহু মুসলিম ব্যক্তিত্বই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি সমর্থন করেননি।

১৯৩০ এর কেমবব্রিজ থেকে আসা কিছু ছাত্র যখন পাকিস্তানের দাবি পেল তখন তাদের কাছে জিন্না বলেন, “আমার নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমার কতরমেই মনে হচ্ছে যে তোমাদের কথাই ঠিক।” এই বক্তব্যের পেছনে নিঃসদেহে যে শক্তি বিশেষভাবে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা ছিল ব্রিটিশ সরকার। গান্ধীর ভূমিকাকেও গুরুত্বহীন করে তোলা যায় না। গান্ধী চেয়েছিলেন সারা ভারতের নেতারা তাঁরই অনুগত বাধ্য (docile) হবেন। এখানেই সদস্যদের মধ্যে বিরোধের সূচনা হয়। জিন্নার সঙ্গে গান্ধীর বিরোধ জিন্নার আধিপত্য স্থাপনের কাজে ব্রিটিশ প্রশাসন তার কূটনীতির সর্বোত্তম প্রক্রিয়া কাজে লাগায়।

কলকলতা কংগ্রেসের প্রাক্কালে ১৯২৮ সালের ২৮ থেকে ৩১ আগস্ট লক্ষ্ণৌ সর্বদলীয় সম্মেলনে জিন্নার সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাখান করে কংগ্রেসের কোন কোন নেতা প্রশ্ন তোলেন, মুসলমানদের হয়ে কথা বলার অধিকার জিন্নার আছে কি? প্রকৃতপক্ষে জিন্না সঙ্গে বোঝাপড়ার পথে অনতিক্রম্য বাধা তৈরি করেন কংগ্রেসের ওপরতলার অদূরদর্শী কংগ্রেস নেতারা।

মৌলানা আজাদ আফসোস করে লিখেছেন নেহেরুর অনমনীয় আপত্তির জন্য কংগ্রেস ও লীগের মিলনের সম্ভবনা ব্যর্থ হয়। উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রীসভায় আজাদ বলেছেন, দুজন মন্ত্রী নেবার সূত্রে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নেহেরুর আপত্তির ফলে তা কমিয়ে একজন করাহয় ফলে আলোচনা ভেঙে যায়। চৌধুরী খালিকুজ্জমান অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেস চেয়েছিল লীগের অবলুপ্তি। গান্ধীর ব্যক্তিগত সচিব পেয়ারেলাল কৌশলগত দিক থেকে একে গুরুতর ভুল বলে স্বীকার করেছেন — “a tactical error

of the first mangitude"। পেণ্ডেলের মুন বলেছেন একে অশান্তির মূল উৎস তার তা থেকেই ভারত বিভাজনের সূত্রপাত। কিন্তু মুনের বক্তব্য ঐতিহাসিকদের দ্বারা সামলোচিত কারণ ভারত বিভাজন এত তুচ্ছ করণে ঘটেনি।

পাকিস্তান আন্দোলন, মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বারত বিভাগ একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রথম দুটি যত শক্তিশালী হয়েছে বারত বিভাগ ততোই অনিবার্য হয়ে উঠেছে। খিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধী প্রভাবশালী মৌলভিদের সাহায্য নিয়েছিলেন, যারা কোরানের আয়াত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা ও কাফের হত্যার আহ্বান জানায়। মৌলানা আজাদ লিখিছেন প্যানইসলাম মতবাদ 'শত্রুর শত্রু মিত্র' এই কৌটিল্য নীতি অনুযায়ী কংগ্রেসের মিত্র হতে পারে কিন্তু তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মুসলিম বিচ্ছন্নতাবাদ। মুসলিম চাষী, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত সকলেই ঔপনিবেশিক শাসনের শিকার হওয়া সত্ত্বেও পদের মধ্যে সেই চেতনা জাগানোর চেষ্টা করা হয়নি।

১৯৪০ সালে লাহোর মুসলিম লীগ অধিবেশনে প্রথম পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। জিন্না দাবি করেন যে তিনি একাকী মাত্র একজন সচিব ও একটি টাইপরাইটারের সাহায্যে পাকিস্তান ছিনিয়ে এনেছেন মুসলমানদের জন্য। জিন্না মুসলমানদের কাছে নিজেকে রাজনৈতিক মুক্তিদাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন।

পাকিস্তান দাবি, পাকিস্তানের ডিচন্তা ও জিন্নার রাজনীতি ভারতীয় জারনীতি ও সমাজের ওপর ভয়াবহ প্রতিক্রিরর সৃষ্টি করে। মুসলমানদের মধ্যে চরমপন্থী রাজনীতির উদ্ভব ঘটে।

নেহেরু মনে করতেন জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধানই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এই দুই শক্তি নেহেরুর মতে ভারতীয় রাজনীতিতে বিদ্যমান। কিন্তু জিন্নার মতে এই দুই শক্তির সঙ্গে অপর একটি শক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেই শক্তি মুসলমান শক্তি। জিন্নার মতে লীগও দেশের স্বাধীনতা চায় কিন্তু হিন্দু মুসলিম সংহতির পূর্ব শর্ত সংখ্যালঘু প্রশ্নের সমাধান। তাছাড়া কংগ্রেস মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে না।

১৯৩৫-এ দেখা যায় মুসলিম লীগ মোটেই জনসমর্থন আদায় করতে পারেনি। জিন্না এক্ষেত্রে ইসলাম বিপন্ন—এই জিগির পেলেন। পরিস্থিতি এতটাই মারাত্মক হয়ে ওঠে যে ১৯৭৩ -এ জুনের মধ্যেই পাঞ্জাব ও বোম্বেতে দাঙ্গা দেখা যায়।

১৯৪০-এ লাহোরে লীগের প্রস্তাবে পাকিসকতান শব্দটি ছিলো না। দেশভাগের কথাও এক্ষেত্রে বলা হয়নি। ১৯৪৬ পর্যন্ত লীগ এই অস্পষ্ট প্রস্তাবের কোনো ব্যাখ্যাও দেয়নি। জাপানের পার্ল হারবার আক্রমনের পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট চার্চিল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে ভারতকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের মর্যাদা দেওয়ার জন্য। ক্রিপস মিশন ভারতে পাঠানো হল যদিও ভারতে তাতেও কোনো সুবিধা হয়নি। হৈ পরিস্থিতিতে রাজা গোপালাচারী ও কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানি প্রস্তাব সমর্থন করে বসে। অবশেষে গান্ধীও বাধ্য হলেন—"Let it be a partition between two brothers, if a division there must be" — বলতে।

১৯৪০-এ পাকিস্তান ভাবান মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে যায়। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট পাকিস্তান নেওয়ার মন্ত্র নিয়ে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূচনা হল।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ১৯০৬ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার পথ বিস্তৃত হয়। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরই ময়মনসিংহে বিলাতি পণ্য বর্জন কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বীভৎস প্রকাশ ঘটে। পূর্ববঙ্গ নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠনের অর্থই বেশি চাকরির সুযোগ এই ব্রিটিশ প্রচার সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনত সক্ষম হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার দায় এই শ্রেণীর ওপর অনেক ক্ষেত্রে চাপানো হয়। কারণ তারা নিজেদের স্বার্থে যেমন মোল্লা মৌলবিদের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর কাজে লাগিয়েছেন। ফলে ১৯০৬ মে মাসে ময়মনসিং জেলার ঈশ্বরগঞ্জে, মার্চ মাসে ১৯০৭-এ কুমিল্লায়, এপ্রিলে মেতে ১৯০৭-এ জামানপুর ময়মনসিংহের দেওয়ানগঞ্জ, বক্সিগঞ্জে ব্যাপক হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়।

এইসব ঘটনার পরিণতিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু মহাসভা। ইসলামে ধর্মান্তরিত মালকানা রাজপুত, গুজর, বানিয়াদের হিন্দু ধর্মে ফেরানোর সংকল্প নিয়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধ আন্দোলন শুরু করেন ১৯২৩-এ। ১৯২৬-এ নাগপুরে হিন্দু আত্মরক্ষা বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হোল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নামে। হিন্দুসমাজের যাবতীয় বিষয়েই শুধুমাত্র এই সংঘ আলোকপাতে উদ্যত হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের পক্ষ থেকেই প্রচারিত হয় হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি যরা একত্রে বসবাস করতে পাবে না।

এই সবের পরিণাম ব্রিটিশ শাসকের পক্ষেই সহায়ক হয়েছিল। দুই সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকবাদীরা অশিক্ষিত গরীব মানুষদের সহজেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়ে দিতে পেরেছে। একবার সামান্য কিছু শুরু হলেই তাতে অসামাজিক অপরাধপ্রবণ মানুষরা অংশনিয়ে ঘটনা জটিল করে তোলে। নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দলগুলির নতৃত্ব গোপনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গসায় নানাভাবে সাহায্য করে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা যেমন জিন্নার সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেননি, তেমনি উদারপন্থী নির্মল চ্যাটার্জী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সাম্প্রদায়িকদের প্রতিরোধ করতে পারেননি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভারত বিভাগের আন্দোলনও ফলে ধীরে ধীরে তীব্র হয়ে উঠে।

৫.২ ক্ষমতা হস্তান্তর

১৯৪৭ সালে মাউন্টব্যাটেন বড়লাট নিযুক্ত হয়ে আসেন। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে সময় অবচয় করা ঠিক হবে না। তিনি রিপোর্ট লিখলেন। 'তড়িঘড়ি কাজ না করলে আমাকে গৃহযুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে হবে।' তবে মাউন্টব্যাটনকে ভারত বিভাজনের প্রধান উদ্যোক্তা মনে করা অসমীচীন। যেসব ভাষ্যকাররা মাউন্টব্যাটনের একক ব্যক্তিগত উদ্যোগকে অতিরঞ্জিত

করে দেখিয়েচিলেন তাঁরা হলেন—হাডসন, ক্যাম্বেল, জনসন প্রমুখ। মন্ত্রী কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে অখণ্ড ভারত মেনে নেওয়ার জন্য তিনি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করেন। তবে কোন সহমত না হওয়াতে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ডোমিনিয়ন গঠনের প্রস্তাবন দেন। জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারত বিভাগের সাম্পাদায়িক দাঙ্গা থেকে দেশকে রক্ষা করতে শেষ অবধি ভারত বিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। তবে তাঁরা দুই-জাতিতত্ত্বের নীতি গ্রহণ সম্মত হননি। ভারতের মুসলিম লীগ প্রভাবিত অঞ্চলগুলোতেই একমাত্র ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক করতে রাজি হন ও যেসব অঞ্চলে মুসলিম লীগের প্রভাব ছিল, শুধুমাত্র সেইঅঞ্চলগুলি ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা করতে তাঁরা রাজি হন, এবং যেসব অঞ্চলে মুসলিম লীগের প্রভাব সম্বন্ধে সন্দহ ছিল, সেই অঞ্চলে গণভো গ্রহনের দাবি জানান। যেমন—উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা প্রভৃতিতে একবাক্যে জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারত বিভাগে রাজি হলেন ঠিকই কিন্তু তা ধর্মের ভিত্তিতে নয়। তারা রাজি হলেন সাম্প্রদায়কি বিভূষিকা নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রমোদিত হয়েই এমত অবস্থাতে ভারত বিভাগে সম্মত হওয়া ছাড়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের অন্য কোন উপায় ছিলো না। মাউন্টব্যাটন ৩রা জুন সুস্পষ্টভাবেই ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮-এর আগেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। বাধ্য হয়েই কংগ্রেস 'অখণ্ড ভারত' পরিত্যাগ করে। 'পাকিস্তান' দাবি স্বীকৃত হওয়াতে মুসলিম লীগ সন্তোষ প্রকাশ করে।

৫.৩ ক্ষমতা হস্তান্তর পরবর্তী পরিস্থিতি

হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা নামক সমস্যা মোকাবিলা করতে হয় সর্বপ্রথম নেহরু সরকারকে। হাজার হাজার মানুষ পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসতে থাকেন। অসংখ্য উদ্বাস্তুর আগমনের ফলে ভারতে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে আর্থ-সামাজিক সমস্যা ঘনীভূত হয়ে থাকে। উভয় দেশেই চলে রক্তারক্তি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। নেহেরু সরকার তখন একদিকে যেমন হাঙ্গামা দমনে কঠোরনীতি গ্রহণ করে তেমনি অপরদিকে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যেই এক শান্তি সভায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মহাত্মা গান্ধী। নেহেরু সরকার এটাকে একটা বিপর্যয় বলে গণ্য করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তারা এই সংকট কাটিয়ে ওঠে।

স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিও ছিল নেহেরু সরকারের। প্রায় সকল দেশের সঙ্গে ভারত স্বাধীনতার পর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। যে সকল দেশ তখন স্বাধীন হয়েচিল সেগুলিকে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করেনি। যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতা আন্দোলন কাটিয়ে তারা ভারতকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন জানায়। নেহরু সরকার রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে।

৫.৪ সারাংশ

১৯০৬-এর ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে হিন্দু সম্প্রদায়ের আন্দোলনে পরিণত করে মুসলিম সম্প্রদায়ের পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান আন্দোলনে পথ তরান্বিত করে। ১৯০৬-এ মুসলিম লীগ এই

পৃথকীকরণের পরিণাম। পরবর্তী পর্যায়ে জোরদার হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের সূত্র। জিন্নার তৎপরতা পরিস্থিতি আরো জটিল করে হিন্দু ও মুসলিম সংঘর্ষকে আবশ্যিক করে তোলে যার প্রভাব ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর পড়ে।

৫.৫ অনুশীলনী

১। পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সম্পর্ক কোথায়?

২। ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে জিন্নার দায়িত্ব কতটা ছিলো তা যুক্তিসহকারে বর্ণনা করুন।

৩। পাকিস্তান আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রসঙ্গ কে কোথায় কবে উত্থাপন করেন?

২। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা কবে হয়?

৩। লক্ষ্ণৌ চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়?

৪। পাঞ্জাব ও বম্বেতে কোন সময় দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে?

৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

1) Ayesha Jalal — The sole spokesman.

2) Uma Kaur — Muslims and Pakistan.

3) Bipan Chandra — India after Independence.

4) Maulana A. K. Azad — India wins freedom.

পর্যায়—৪

একক ১ ❑ গণপরিষদ ও ভারতের সংবিধান রচনা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ গণপরিষদ সৃষ্টির ইতিহাস

১.৩.১ গণপরিষদের প্রয়োজন বা গুরুত্ব

১.৩.২ ভারতীয় ভাবনা ঃ ১৯০৬ সালের জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব

১.৩.৩ হোমরুল আন্দোলন

১.৩.৪ অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধীজির স্বরাজ ভাবনা

১.৩.৫ সর্বদলীয় বৈঠক ও সংবিধান কমিটি

১.৩.৬ জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন সম্মেলনে গণপরিষদের দাবি

১.৪ গণপরিষদ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ও নীতি

১.৪.১ ১৯০৯ সালের বারত-শাসন আইন

১.৪.২ ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন অআইন

১.৪.৩ সাইমন কমিশন

১.৪.৪ গোল-টেবিল বৈঠক

১.৪.৫ সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ে শ্বেতপত্র

১.৪.৬ যৌথ সংসদীয় কমিটি ও ১৯৩৫ সালের বারত-শাসন আইন

১.৪.৭ ক্রিপস্ মিশন

১.৪.৮ ওয়াভেল পরিকল্পনা

১.৪.৯ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা

১.৪.১০ গণপরিষদের নির্বাচন

১.৪.১১ দেশবিভাগ, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও গণপরিষদ

১.৪.১২ ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ও গণপরিষদ

১.৫ গণপরিষদ সম্পর্কে মুসলিম লিগের দৃষ্টিভঙ্গি

১.৬ গরপরিষদে দেশীয় রাজ্যের অশগ্রহণের প্রশ্ন

১.৭ গণপরিষদের গঠনপ্রণালী

১.৭.১ গণপরিষদে প্রতিধিত্ব, আসন বণ্টনের নীতি ও গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা

১.৭.২ গণপরিষদের নেতৃত্ব

১.৭.৩ অধিবেশন ও কর্মপদ্ধতি

১.৭.৪ কমিটি

১.৮ গণপরিষদের কার্যাবলী

১.৮.১ জনমঞ্চ ও আলোচনা সভা হিসাবে গণপরিষদ

১.৮.২ আইনসভা হিসাবে দায়িত্ব পালন

১.৮.৩ সংবিধান রচনার কাজ ঃ প্রস্তাবিত সংবিধান ও তার বৈশিষ্ট্য

১.৯ গণপরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন

১.৯.১ সারাংশ

১.৯.২ অনুশীলনী

১.৯.৩ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন

- আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়—স্বাধীন বারতের সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপক্ষ ও প্রস্তুতিপর্ব;

- সংবিধান সভা হিসাবে গণপরিষদ সম্পর্কে কংগ্রেস সহ দেশীয় রাজনৈতিক দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব;
- গণপরিষদের গঠনপ্রালী ও কার্যপদ্ধতি;
- গণপরিষদের বিভিন্ন কাজ, বিশেষত সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা;
- ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিচারে গণপরিষদের স্থান ও প্রভাব।

১.২ প্রস্তাবনা

ইতিপূর্বে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানা পর্যায় ও পর্বের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ঘটেছে। এবারে আমরা আলোচনা করব আধুনিক ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব নিয়ে। স্বাধীন ও নতুন ভারত গঠনের প্রথম ও প্রধান উদ্যোগ হল দেশ শাসন ও পরিচালনার উৎকৃষ্ট বিধিব্যবস্থা গড়ে তোলার ইচ্ছা, এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এই ইচ্ছা বাস্তবায়িত হল একটি সংবিধান সভা বা গণপরিষদ (Constituent Assembly) সৃষ্টি ও সংবিধান রচনার মাধ্যমে। গণপরিষদ সৃষ্টি ইতিহাস দিয়ই আমরা শুরু করব বর্তমান এককের আলোচনা। গণপরিষদের প্রয়োজন কেন এ সম্পর্কে দু-চার কথা জানার পর এক্ষেত্রে ভারতীয় ভাবনা কি ছিল সে বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। প্রসঙ্গত জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনের প্রস্তাবে এ বিষয়ে কী কী দাবি ছিল বা জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব এ নিয়ে কি ভেবেছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। গণপরিষদ সম্পর্কে মুসলিম লিগের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল সেটি আমাদের বিচার্য। গণপষিদে দেশীয় রাজ্যের অংশগ্রহণের প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। গণপরিষদ সম্পর্কে বর্তমান এককের আলোচনার একটি বিশেষ অংশ জুড়ে থাকবে এক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসকের মনোভাব কি ছিল তার বিবরণ। এর পর একে একে আলোচনায় আসবে গণপরিষদের গঠনপ্রণালী, কার্যপদ্ধতি ও ভূমিকা। যেহেতু সংবিধান রচনাই ছিল গণপরিষদের মুখ্য কাজ বা দায়িত্ব, তাই এই বিষয়টি বর্তমান আলোচনায় অতিরিক্ত গুরুত্ব পাবে। গণপরিষদ রচিত সংবিধানের রূপরেখাটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনাদের সামনে তুলে ধরা হবে। বর্তমান এককের শেষ অংশে সংবিধান বিশেষজ্ঞ, রাজনীতি ও ইতিহাসের গবেষকদের বিচার-বিশ্লেষণকে সামনে রেখে গণপরিষদের কাজের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

১.৩ গণপরিষদ সৃষ্টির ইতিহাস

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি দীর্ঘ সময় কেটে গেছে স্বাধীনতা ও স্বরাজের ভাবনাকে কিভাবে কার্যকর করা যাবে তা নিয়ে মতবিরোধ ও বিতর্ক করে। জাতীয় আন্দোলনের কংগ্রেস নেতৃবর্গ, মুসলিম লিগ,

ব্রিটিশ সরকার সকলেই ছিলেন এই বিতর্কের শরিক। ব্রিটিশ প্রবর্তিত ভারত-শাসন আইন বা সংস্কারের নীতির সাহায্যে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়, স্বরাজই স্বীনতার মূল শর্ত—ধীরে ধীরে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে এই ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের এই স্বরাজ ভাবনারমধ্যেই ছিল গণপরিষদ সৃষ্টির মূল উপকরণ। জাতীয় আন্দোলনের সংগঠিত মঞ্চ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে এক্ষেত্রে কি উদ্যোগ বা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েচিল তার কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

১.৩.১ গণপরিষদের প্রয়োজন

সাধাণ অর্থে গণপরিষদ হল সংবিধান রচনার উদ্দেশ্য মিলিত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এক সভা। ব্যাপক অর্থে গণপরিষদ হল সেই দায়িত্বশীল সংস্থা যার কাজ একটি স্বাধীন জাতির চিন্তা-বাবনা ও আশা-আকাঙক্ষাকে রূপদান করা। গণপরিষদ রচিত সংবিধানের মাধ্যমেই স্বাধীন জাতি যাত্রা শুরু করে এবং এগিয়ে চলে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। সংবিধান স্ব-শাসন ও সুশাসনের হাতিয়ার, নিয়ন্ত্রিত ও দায়িত্বশীল শাসনের সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতি। এর মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয় সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নাগরিক অধিকার এবং সরকার ও নাগরিকের সম্পর্ক। গণপরিষদ রচিত সংবিধান কেবলমাত্র একটি আইনগত দলিল বা আদালতগ্রাহ্য কিছু নিয়মাবলীর সমষ্টি নয়। সংবিধান জনৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, সমাজ-সংহতির দর্পণ। সংবিধান দেশ গঠন এবং সমাজ নির্মাণের প্রত্যয়; আবেগ আর কিছু তত্ত্বকথা দিয়ে সংবিধান রচনার কাজ চলে না। আবার ইতিহাসের অন্ধ অনুসরণ করে বা বাইরে থেকে গ্রহণ বা অনুকরণ করে সংবিধান রচনার কাজে সাফল্য পাওয়া যায় না। সংবিধান রচনার কাজে প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম আর ব্যাপক প্রস্তুতি। স্বাধীন দেশের জন্য সংবিধান রচনার এই গুরুদায়িত্ব বহন করে গণপরিষদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংবিধানিক কনভেনশন (Constitutional Convention) বা ফ্রান্সের জাতীয় কনভেনশন (National Convention) সংবিধান রচনার উদ্দেশ্য নিয়েই গঠিত হয়েছিল। উভয় দেশেই জাতীয় স্বাধীনতা, গণসংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য নিয়ে এই সংস্থা দুটি সংবিধান রচনার কাজে উদ্যোগী হয়। পাশ্চাত্যের এই গণতান্ত্রিক দেশগুলির মতোই ভারতেও স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা আর দেশ পরিচালনার নতুন ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে সংবিদান রচনার প্রস্তুতি নেন গণপরিষদের সদস্যরা। স্বরাজ ও স্বশাসনের আন্দোলন ও দাবির সূত্র ধরেই উঠে আসে গণপরিষদ সৃষ্টি আর সংবিধান রচনার উৎসাহ। শেষ পর্যন্ত নানা ঐতিহাসিক ঘটনা, বিতর্ক, প্রতিক্রিয়া আর প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হল গণপরিষদ। পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৬। ১৯৪৬—থেকে ১৯৪৯ দীর্ঘ তিন বছরে কঠোর পরিশ্রম আর প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে রচিত হল স্বাধীন ভারতের সংবিধান।

১.৩.২ ভারতীয় ভাবনা ঃ ১৯০৬ সালের জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব

১৯০৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress) দাদাভাই নওরোজীর (Dadabhai Naoroji) সভাপতিত্বে যে চারদফা কর্মসূচীর (Four-point Programme) কথা ঘোষণা করে তার প্রথমটি ছিল স্বরাজ (অন্য তিনটি কর্মসূচী ছিল স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা)। সন্দেহ নেই, এই স্বরাজ কথাটির মধ্যেই ছিল স্বাধীনতার মাধ্যমে স্ব-শাসনের অধিকার অর্জন এবং নিজের মত ও পথ অনুসারে সংবিধান রচনার এক প্রবল ইচ্ছা। ১৮৯৫ সালেই বালগঙ্গাধর তিলক (Balgangadhar Tilak) 'স্বরাজ বিল' নামে একটি বিল এনে স্বশাসন সম্পর্কে ভারতবাসীর চেতনাতা ও প্রত্যাশাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেনঙ্গ ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনে (Indian Concils Act, 1892) পরিষদের কাজকর্মে ভারতীয়করণ (Indianization) বা গণতন্ত্রীকরণ (Democratization) কোনটিরই তেমন কোন ছাপ ছিল না, আইনসভার কাজকর্মেও দায়িত্বশীলতার প্রকাশ ঘটেনি। ব্রিটিশ সাংবিধানিক শাসন আর সংস্কার প্রস্তাব দিয়ে যে ভারতের জাতীয় আন্দেলনের গতিকে রুদ্ধ করা সম্ভব নয়—তিলকের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের একটি গোষ্ঠী এই ভাবনাকে লালন করেছে। এই ভাবনারই স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে ১৮৯৫ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে। তিলক স্বরাজের পক্ষে দাবি তুললেন। ব্রিটিশ সরকারের স্বাস্থ্য ও জন-নিরাপত্তা নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তিলকের নেতৃত্বে বিপ্লবী যুবকর্মীরা সংগঠিত আন্দোলন শুরু করেন। বম্বে প্রেসিডেন্সীতে হিংসাত্মক বিক্ষোভের মুখে ব্রটিশ প্রশাসন রীতিমত চাপে পড়ে যায়। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসারকে রুদ্ধ করতেই ঔপনিবেশিক শাসপ প্রয়োগ করলেন ষড়যন্ত্র ও নিপীড়নের কঠোর আইন। বিনা বিচারে ১৮ মাস কারারুদ্ধ হলেন তিলক।

> প্রান্তলিপি ঃ কেশরী (Keshari) পত্রিকায় তিলকের ঘোষণা 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার' ('Swaraj is my birth right') এবং ১৮৯৫ সালের স্বরাজ বিল এক অর্থে মানবিক অধিকার সংক্রান্ত প্রথম দাবি। ব্রিটিশ সাংবিধানিক পন্থা বা ব্যবস্থা মেনে ভারতবাসীর আর চলতে চায় না; একথাই এই দাবিতে প্রতিষ্ঠিত।

তিলকের নেতৃত্বে পুনা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্যেই ছিল ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ব্রিটিশ সাংবিধানিক পদ্ধতির উগ্র বিরোধিতা। জীয় কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থা ও চরমপন্থার মতভেদ আর বিভাজন রেখাটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তরুন, জাতীয়তাবাদী সক্রিয় কর্মীদের কাছে স্বরাজই হল এক এবং অন্তিম লক্ষ্য। তিলক ছাড়াও এই গোষ্ঠীতে ছিলেন লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতা। অন্যদিকে গোপাল কৃষ্ণ গোখলের নেতৃত্বে কংগ্রোসের সরকারি গোষ্ঠী স্বরাজ ও প্রতিরোধ আন্দোলনকে দূরের লক্ষ্য (distant goal) বলে চিহ্নিত করলেন এবং সাংবিধানিক পথেই চলতে চাইলেন। কংগ্রেস সংগঠনের এই বিতর্ক ও বিবাদের পরিস্থিতিতেই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের আগেই বেনারাস অধিবেশনে (১৯০৫) ব্রিটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তিলকের নেতৃত্বে সরকারের

বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের (Passive Resistance) প্রস্তাব গৃহীত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়ঙ্গ গোখলে তাঁর সভাপতির ভাষণে ব্রিটিশ স্বশাসিত উপনিবেশগুলির মতো ভারতের জন্যও স্বশাসনের দাবি করেন। ইংলন্ডের যুবরাজের (Price of Hales) ভারত আগমনের পরিস্থিতিতে বেনারস কংগ্রেসে প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচী শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে সরকার অটুট থাকাতে কংগ্রেসের পক্ষে অবশ্য আন্দোলনের কর্মসূচী থেকে কোনবাবেই সরে আসার সম্ভবনা ছিল না। নরমপন্থা ও চরমপন্থার প্রবল মতভেদের পরিস্থিতিতে দলের অবশ্যম্ভাবী বিভাজন রোধ করতেই কলকাতা অধিবেশনে নরমপন্থী নেতৃত্বকে স্বশাসন তথা স্বরাজের দূরের লক্ষ্যকেই মেনে নিতে হয়।

কলকাতা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নয়, চরমপন্থীদের চাপে পড়েই যে দলকে আপোষ নীতি হিসাবে স্বদেশী, স্বরাজ আর বয়কটের প্রস্তাব নিতে হয়েছে তা বোঝা গেল কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের (১৯০৭) মঞ্চে। সাংবিধানিক পদ্ধতি ও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মধ্যস্থতার পথে চলার সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত চরমপন্থী নতৃত্ব মেনে নিতে পারেনি। বিশৃঙ্খলা ও প্রবল মতভেদের বাতাবরণে দলের বিভাজন সম্পন্ন হল। দলীয় নেতৃত্বের ক্ষোভ আর ব্রিটিশ সরকারের কোপে পড়ে চরমপন্থী সাংগঠনিক ভাবনা কর্মকাণ্ড কিছুকালের জন্য স্তব্ধ হল বটে কিন্তু স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি এক দশক পরেই ফিরে এসেছে আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের অনযতম সাংগঠনিক নীতি হিসাবে।

১.৩.৩ হোমরুল আন্দোলন

ব্রিটিশ শাসক ভারতবাসীর মনস্তত্ব ও সংগ্রামী চেতনার গতিটিকে বুঝতে যে ভুল করেছে অল্পকাল পরেই তা বোঝা গেল। দমনপীড়ন আইন (The Newspaper (Incitement to offence) Act, 1908 এবং Criminal Procedure Code (Amendment) Act, 1908) বা বিভাজন ও অনুগ্রহের নীতি গ্রহণ করেই যে ভারত-শাসন সম্ভব নয় পরবর্তীকালের ঘটনাবলী থেকে তা একে একে প্রমাণিত হল। ১৯০৯ সালের ভারত-শাসন আইন (যা মর্লে-মিন্টো সংস্কার নামে পরিচিত) যে ভারতবাসীর জন্য কিছু সুবিধা (Concessions) ছাড়া কিছু নয়, এর মাধ্যমে যে এদেশে দায়িত্বশীল শাসন বা স্বশাসনের কোন সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়, লর্ড মর্লে নিজেই একথা স্বীকার করেন। ব্রিটশ সরকার এই আইনের মাধ্যমে ভারতকে আরও দক্ষভাবে শাসন করার কথা ভেবেছিল মাত্র। এদেশের জন্য পার্লামেন্টীয় শাসনের কোন প্রতিশ্রুতি এতে ছিল না। ভারবাসীর জন্য স্বায়ত্তশাসন নয়, এই আইন স্বায়ত্তশাসনকে বিলম্বিত করার এক সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা মাত্র বা ব্রিটিশ শাসনকে স্থায়ত্বি দেবার এক কৌশল, জাতীয়দাবাদী নেতারা একথা ভেবেছেন।

তবে এই পর্বেও স্বদেশী আন্দোলন অব্যাহত থেকেছে, বয়কট প্রত্যাহার করা হয়নি, জনসভা ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে প্রতিরোধ সংগ্রাম চলেছে। ব্রিটিশ সংস্কার নীতির একটি ইতিবাচক ফল অবশ্য বঙ্গভঙ্গ রদ। তবে স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসনের ভাবনা রদ হয়নি। স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে নবরূপে ফিরিয়ে আনলেন অ্যানি

বেসান্ত (Annie Besant)। বেসান্তের কৃতিত্ব হল কংগ্রেসের বিরোধী দুই গোষ্ঠীকে একত্রে এই আন্দোলনে সামিল করা এবং আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারায় ভারতবাসীকে স্বাদেশিকতা ও স্বশাসনের (Home Rule) ভাবনায় জাগ্রত করা। সন্দেহ নেই স্বাধীন ভারতবর্ষে আগামী দিনের ভারতবর্ষে শাসনের রূপরেখা কি হবে তার এক আভাষ হোমরুল আন্দোলনে ছিল। বেসান্তের হোমরুল আন্দোলনে তিলকের হোমরুল বিলের মানবিক অধিকারের দাবি যে নতুন করে উঠে এসেছে। হোমরুল সংক্রান্ত প্রসাতব অবশ্য কংগ্রেসের দলীয় মঞ্চে তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। তিলক ছাড়া অন্য কারোর কাছ থেকে এ প্রশ্নে তেমন উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া আসে নি। ভারতে দায়িত্বশীল শাসন ও সাংবিধানিক সংস্কার নিয়ে লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের কাছে আইনসভার ১৯জন ভারতীয় সদস্যের দাবিপত্র (Memorandum) বা স্বাধীনতা ও সংস্কার বিষয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের চুক্তি (Lucknow pact, 1916) ছাড়া ওই পর্বের স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ছিল না।

১.৩.৪ অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধীজির স্বরাজভাবনা

শুধুমাত্র সাংবিধানিক সংস্কার আর প্রচলিত আপোষ ও অনুগরহের নীতি যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যে পথ নয়—পরবর্তী কালের ঘটনাবলী থেকে তার পরিচয় মেলে। ব্রিটিশ শাসননীতি ও কূটকৌশলের জবাব দিতে গড়ে উঠেছে বিপ্লববাদ, সন্ত্রাসবাদ ও গুপ্ত সংগ্রামী সংগঠন। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই চরমপন্থার গতিকে রুদ্ধ করতেই ব্রিটিশ সরকার নানা নিপীড়নমূলক আইন (এদের মধ্যে রাওলাট অআইন, ১৯১৯ অন্যতম) প্রণয়ন করে। এই পর্বেই ভারতীয় রাজনীতিতে গণ-আন্দোলনের জোয়ার নিয়ে এলেন মহাত্মা গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে এদেশে প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষক, শ্রমিকের দাবি আদায়ের আন্দোলনেও নিজেকে যুক্ত করলেন। গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের সাংগঠনিক পুনরুজ্জীবন ঘটল, স্বাধীনতা ও স্বরাজের দাবি নতুন গতি পেল। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা বা নিপীড়মূলক, আইনের বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে সামাল দিতে মণ্টফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে (মন্টাগু ও চেমন্‌ফোর্ড রিপোর্টকে একত্রে মন্টফোর্ড, রিপোর্ট বলা হয়) ব্রিটিশ সরকার ভারত-শাসন আইন, ১৯১৯ প্রবর্তন করে। এই আইনে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গড়ন ও স্বায়ত্তশাসন নিয়ে কিছু গঠনমূলক প্রস্তাবের সুপারিশ ছিল। তবে দ্বৈতশাসন (Dyarchy) ও দায়িত্বশীল শাসনের কথা বলা হলেও কার্যক্ষেত্রে এই আইন স্থিতাবস্থার পরিবর্তন আনে নি। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি মেনে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় নি, প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা (Delegated powers) মাত্র। ভারত সচিবের (Secretary of State for India) অবাধ নিয়ন্ত্রণ দায়িত্বশীল শাসনের পরিপন্থী ছিল।

> প্রান্তলিপি ঃ বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে দেশের মধ্যে যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি এবং দেশের বাইরে লালা হরদয়ালের গদ্দর পার্টি (Goddar Party) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। বাঘাযতিন, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকি, সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়, অরবিন্দ ঘোষ, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ এই বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ফসল।

এই পরিস্থিতিতেই গান্ধীজির স্বরাজভাবনা একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই স্বরাজের আদর্শ ও বাণীতে উৎসাহিত হয়েই প্রায় দুঁদশক পরে একটি দেশজ সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে গণপরিষদ। গান্ধীজি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারত-শাসন আইন অপর্যাপ্ত, অসন্তোষজনক এবং হতাশাজনক। তবুও সত্যাদর্শী গান্ধীজি ধৈর্য হারায় নি। যতশীঘ্র সম্ভব একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্কারের পথেই কাজ করে যেতে হবে—এই ছিল তাঁর আহ্বান। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের রক্ত তখনও শুকোয়নি, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ সহযোগিতার (Responsive Cooperation) পথেইতিনি চলতে চেয়েছেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের দায় গ্রহণ না করে যখন ব্রিটিশ সরকার ঘটনাটিকে ‘an error of judgement’ বলে উপেক্ষা করল, হত্যাকাণ্ডের ঘাতকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধা করল, এমনকি এই নারকীয় ঘটনায় মৃতদের পরিবারগুলিকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতেও আপত্তি করল, তখন গান্ধীজি আর স্থির থাকতে পারেন নি। ইতিমধ্যে তিলকের মৃত্যু ঘটেছে, কংগ্রেস সংগঠনে গান্ধীজির অপ্রতিহত প্রভাব কায়েম হয়েছে, পন্থা কিছুটা ভিন্ন হলেও তিলকের স্বরাজ ভাবনাই ফিরে এল গান্ধীজির হাত ধরে।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব ও কর্মসূচী গৃহীত হল। লালা লজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় কংগ্রেস তার পূর্বেকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে স্বশানের লক্ষ্য ছেড়ে অহিংস অসহযোগিতার পথে স্বরাজ অর্জনের ডাক দিল। কংগ্রেসের নাগপুর বার্ষিক অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯২০) গান্ধীজির অসহযোগের পথে স্বরাজের ডাক ব্যাপক সমর্থন পেল। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে স্বরাজ অর্জনের সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন না তুললেও প্রয়োজনে ব্রিটিশ শাসনাধীনে না থেকেও অর্থাৎ বাইরে থেকেও স্বরাজ অর্জন যে অসম্ভব নয় গান্ধীজি এই সত্য উপলবিঢধ করতে পেরেছেন। ১৯২২ সালে *Young India* পত্রিকায় স্বরাজ সম্পর্কে তিনি যে ভাবনা প্রচার করেছেন, তা ওই উপলব্ধিরই বলিষ্ঠ প্রকাশ। স্বরাজের লক্ষ্যেই ব্রিটিশরাজের সরকারি পদ, সম্মান, নির্বাচন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, আদালত ইত্যাদি বয়কট করার সিদ্ধান্ত হল, আর্থিক, সাংস্কৃতি ও সর্বক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেওয়া হল। এক বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জনের সময়সীমা নির্ধারিত হল, এক ব্যাপক গণ আন্দোলনের সৃষ্টি হল। নানা নিপীড়ন, সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করেও আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করা যায় নি। এক অবাঞ্ছিত ঘটনা (চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক ঘটনা) এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটালেও এই গণ-আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলন ও অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্ন, স্বরাজ্য পার্টির উত্থান, ১৯১৯ সালের আইনের সংস্কার ও পর্যালোচনার জন্য অনুসন্ধান কমিটি (Reform Enquiry Committee) গঠন, ডমিনিয়ন মর্যাদার প্রশ্ন, সর্বদলীয় বৈঠক, মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় কমিটি ও সংবিধান রচনার প্রস্তাব সবকিছুই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশক।

১৯২২ সাল ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপট হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ। গান্ধীজির অবর্তমানে কংগ্রেসের একটি অংশ এই সময় আইনসভায় যোগদানের কথা, নির্বাচনে অংশ নেবার কথা ভাবছে। গয়া অধিবেশনে নির্বাচনে অংশ নেবার সিদ্ধান্ত পরাস্ত হলে কংগ্রেসে আবার ভাঙন দেকা দিল। এই পর্বেই চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস ছেড়ে স্বরাজ্য পার্টি গড়লেন। ১৯২২ সালে *Young India* পত্রিকায় গান্ধীজির উপলব্ধি ঃ ভারতবাসীকেই নিতে হবে তার আপন ভাগ্য নির্বাচনের দায়িত্ব। গান্ধীজি বললেন ঃ

স্বারাজ বা স্বাধীনতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দান হিসাবে আসবে না, ভারতের নিজস্ব সত্তার পূর্ণ বিকাশ ও ঘোষণা রূপেই স্বাধীনতার আবির্ভাব ঘটবে। ("Swaraj will not be a free gift of the British Parliament; it will be a declaration of India's full self-expression.....")

গান্ধীজি যা বলতে চেয়েছেন তা হল স্বরাজের অর্থ কেবলমাত্র ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি নয়। স্বরাজ হল জাতীয় ও ব্যক্তি গত (প্রতিটি ভারতবাসীর) আত্মোপলব্ধি ভারতবাসীর ইচ্ছার প্রকাশ ঘটবে তাদের স্বাধীন পছন্দের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। গান্ধীজির বিশ্বাস, বিদেশী জীবনধারা ও বিদেশী শাসন—স্বরাজ উভয়ের হাত থেকেই মুক্তি চায়। ভারতবাসীরা নিজেরাই হবে তাদের আত্মিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। গান্ধীজির ভাবনা থেকে যে কথা উঠে এল তা হল ভারতবাসীর চাই একান্ত নিজস্ব প্রতিনধিসভা ও সংবিধান।

১.৩.৫ সর্বদলীয় বৈঠক ও সংবিধান কমিটি

গণপরিষদ সৃষ্টির মূলে গান্ধীজির স্বরাজভাবনা প্রাথমিক প্রেরণা হলেও সমসাময়কি অন্যান্য কিছু ঘটনা বা প্রচেষ্টা থেকেও গণপরিষদের ধারণা উৎসারিত হয়েছে। ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনে আইনটি চালু হবার ১০ বছর পরে সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য বিধিবদ্ধ কমিশন (Statutory Commission) গঠন করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালে আইনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এতটাই প্রবল ও ব্যাপক আকর নেয় যে ব্রিটিশ সরকার দুবছর আগেই কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ্য পার্টির দাবি, মুডিম্যান কমিটির (Muddiman Committee) ভারতীয় সদস্য তেজ বাহাদুর সপ্রু (Tej Bahadum Sapru), মহম্মদ আলি জিন্না (M. A. Jihhah) প্রমুখের অভিমত এবং উদ্ভুত রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখেই সরকার সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য তথ্যানুসন্ধানের প্রয়াস নেয়। তবে ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব না থাকাতে এই কমিশনের প্রতি প্রথম থেকেই জাতীয়তাবাদী নেতারা অনাস্থা প্রকাশ করেন। কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করে বারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড (Lord Birdenhead) জানান

> প্রান্তলিপি ঃ ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য পার্টির নেতা মতিলাল নেহরু কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, সংবিধান রচনায় নিজেদের হাত না থাকলে কোন দেশের সংবিধান আছে এ কথা বলা যায় না।
>
> কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে স্যার মুডিম্যানের (Muddiman) সভাপতিত্বে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিটিতে তেজ বাহাদুর সপ্রু, প্রমুখ সংখ্যালঘিষ্ঠেরা যে মতামত দেন তাতে দ্বৈতশাসন লোপ করার কথা ছিল।

ভারতবাসীর পক্ষে সর্বসম্মতভাবে সংবিধান তৈরি সম্ভব নয়, সুতরাং সরকারকেই এক্ষেত্রে দায়িত্ব নিতে হবে। স্যার জন সাইমনকে (Sir John Simon) সভাপতি করে সাত সদস্যের এক কমিশনের হাতে সংবিধান পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হল। ইতিপূর্বে তিলক, অ্যানি বেসান্ত স্বরাজ বিলের প্রস্তাব দিয়েও ব্যথ হয়েছেন। লর্ড বার্কেনহেডের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবার ভারতবাসীর পক্ষ থেকে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন (All Party Conference) আহ্বান করা হল নিজেদের উদ্যোগে সংবিদান রচনার লক্ষ্য নিয়ে। ২৯টি সংগঠনের এই সম্মেলনে ডমিনিয়ন মর্যাদার ভিত্তিতে একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হল। ডমিনিয়ন মর্যাদাকেই স্বাধীনতার দ্যোতক ভাবা হল, একটি কমিট গড়ে অধিকার বিল (Bill of Rights) ও অন্যান্য কি সাংবিধানিক ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবা হল। ফেব্রুয়ারি সম্মেলনের বিতর্ক ও জটিলতা দূর করতে আবার মে মাসে সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকা হল। এই সম্মেলনে মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হল এবং এই কমিটিকে সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হল। মতিলাল নেহরু কমিটি ভারতবাসীর জন্য একটি খসড়া সংবিধান পেশ করে। ব্রিটিশ ভারত ও রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রে ও রাজ্যে দায়িত্বশীল প্রতিনিধিমূলক শাসনের সুপারিশ করে এই কমিটি। কেন্দ্র দ্বিপরিষদ সম্পন্ন আইনসভা, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, ভাষায় ভিত্তিতে রাজ্যের পুনর্গঠন, অধিকার বিল, সংখ্যালঘুর সংরক্ষণ ইত্যাদিরও সুপারিশ করে কমিটি এই সংবিধানে। ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে নেহরু সংবিধান অনুমোদন পায় এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংবিধান বিষয়ে পৃথকভাবে ভাবনাচিন্তা করে।

১.৩.৬ জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন সম্মেলনে গণপরিষদের দাবি

বিগত শতকের (বিংশ শতকের) তিরিশের দঐক থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক নীতি ও প্রধান দাবি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে গণপরিষদের ধারণা। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি (Congress Working Committee) মতিলাল নেহরু কমিটির রিপোর্ট অনুমোদন করলে কংগ্রেস সংগঠনে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। জওহরলাল নেহরু প্রতিবাদে কংগ্রেসের সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। জওহরলাল নেহরুর মতে, কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির এই সিদ্ধান্ত ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের মাদ্রাজ বার্ষিক অধিবেশনের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা (স্বরাজের) দাবি করে। ডমিনিয়ন মর্যাদা (Dominion Status) চেয়ে সংবিধানের যে খসড়া মতিলাল হেরু কমিটি পেশ করেছে তা সম্পূর্ণভাবেই পূর্ণ স্বরাজের দাবি থেকে বিচ্যুতি। কংগ্রেসের ডিসেম্বর অধিবেশনে নেহরু রিপোর্ট অনুমোদিত হলে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এটাই প্রতিপন্ন হল যে, ভারতের সাংবিধানিক পথ ও পন্থা হল ডমিনিয়ন মর্যাদা। ব্রিটিশ শ্রমিকদলের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের (Ramsay MacDonald) ডাকে দেশে ফিরে লর্ড আরউইন (Lord Irwin) এরকম অভিমতই পেশ করেন। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও আরউইনের অভিমতের

ভিত্তিতে সরকার সিদ্ধান্ত নিল ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে মতামত যাচাই করতে ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে গোল-টেবিল বৈঠক হবে। কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির অধিকাংশ সদস্য এ বিষয়য ইতিবাচর সাড়া দিলেও জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নেই অটল রইলেন। মতিলাল নেহরু রিপোর্ট মেনে নেবার জন্য কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের কাছে যে সময়সীমা দিয়েছিল (ডিসেম্বর ৩১, ১৯২৯) সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হল। গান্ধীজি ও জিন্নার উপস্থিতিতে ভাইসরয়ের সঙ্গে যে বৈঠক (ডিসেম্বর ২৩, ১৯২৯), সেই বৈঠক থেকে কোন স্পষ্ট প্রস্তাবও এল না। ভারতীয় নেতারা হতাশ হলেন। সংবিধান রচনার প্রয়াস বাধা পেল।

পরবর্তীকালের ঘটনাগুলি ভারতের সংবিধানতন্ত্রের ইতিহাসে স্মরণীয়। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস লাহোরে অধিবেশন ডেকে জওহরলাল নেহরুকে সভাপতি রে যে সিদ্ধান্ত নিল তা অভিনব। মতিলাল নেহরু রিপোর্টের সমগ্র প্রস্তাব বর্জন করা হল। কংগ্রেস সংবিধানের ১ ধারায় বর্ণিত 'স্বরাজ' বলতে যে পূর্ণ স্বাধীনতাই বোঝাবে একথা বলা হল। কংগ্রেস কর্মীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানানো হ। আইনসভা বা আইনসভার কমিটি থেকে কংগ্রেস সদস্যদের পদত্যাগ করতে বলা হল। সর্ববারতীয় কংগ্রেস কমিটিকে লাহোর কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী নেবার অধিকার দিল। ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে গণ্য করার প্রস্তাব নেওয়া হল এবং পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল কংগ্রেসকর্মীরা।

উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক সংকটের জটিল আবর্তে সারা ভারত উত্তাল হল। বল্লভভাই প্যাটল গুজরাটের সুরাটে কৃষকদের নিয়ে সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছেন। কমিউনিস্টরা কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়েছেন। সরকার কমিউনিষ্টদের মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করেছে। কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতন্ত্রী ভাবনার প্রসার ঘটেছে। সর্বভারতীয় শ্রমিক সংঘ কংগ্রেসের (All India Trade Union Congress) সভাপতি হিসাবে জওহরলাল নেহরু ভারতে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠার ডাক দিলেন। গান্ধীজি তাঁর পূর্ববর্তী দ্বিধা কাটিয়ে উঠে সারা ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন। কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি গান্ধীজিকে আইন আমান্য আন্দোলনের পূর্ণ কর্তৃত্ব দিলেন। ভাইসরয়ের কাছে উদ্ভূত পরিস্থিতির অবসান ঘটানে আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হলে গান্ধীজি একরকম বাধ্য হয়েই লবণ আইন অমান্য শুরু করলেন। শুরু হল গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযান ও সত্যাগ্রহ। সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনে অংশ নিল। সরকার ব্যাপক দমন পীড়ন নীতি প্রয়োগ করেও এই আন্দোলন দমাতে পারে নি। কংগ্রেসের নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার হলেন, কংগ্রেসের কমিটি ও শাখা সংগঠনগুলি নিষিদ্ধ হল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার আবার গোলটেবিল বৈঠক ডেকে ভারতে ঔপনিবেশিক মর্যাদা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। উপনিবেশের মর্যাদা দিয়ে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে অগ্রসর হবেন বলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড জানালেন।

আরউইনের সঙ্গে চুক্তি করে গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। বিনিময়ে কংগ্রেসের ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠল। সুভাষচন্দ্র বা জওহরলাল নেহরু এই চুক্তি না মানলেও, করাচি কংগ্রেসে (১৯৩১ মার্চ) গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদিত হল। তবে কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রস্তাবকে গুরুত্ব না দিয়ে ব্রিটিশ সরকার সাংবিধানিক সংস্কারের পথেই অগ্রসর হলেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও কংগ্রেসের দাবি অস্বীকৃত হল। গান্ধীজি খালি হাতে ফিরে এলেন। কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব নিল। এই পর্বে সরকারি তরফে ব্যাপক দমন পীড়ন চলেছে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal Award) মাধ্যমে ভারতবর্ষে বিভেদের রাজনীতি কার্যকর করার চেষ্টা চলেছে, আবার শাসন-সংস্কার আইন (Reform Act) আর সংস্কারের শ্বেতপত্র (White Paper on Reforms) দিয়ে জাতীয় নেতাদের তুষ্ট করার চেষ্টাও হয়েছে।

গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা, ব্রিটিশ সরকারের দীর্ঘসূত্রিতা, গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের যুবশক্তি, বিশেষত জওহরলাল নেহরু ও সুভাষ বসুকে জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতার প্রশ্নে নতুনভাবে ভাবতে প্ররোচিত করেছে। এই পর্বেই গণপরিষদ ও সংবিধান সম্পর্কে কংগ্রেসের ভাবনা তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯—এই পাঁচ বছরে গণপরিষদ সম্পর্কে কংগ্রেস তার সুস্পষ্ট ভাবনা প্রকাশ করে।

১৯৩৪ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিক নীতি হিসাবে গণপরিষদের দাবি করে। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ১৯৩৪ সালের মে মাসে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং পার্লামেন্টীয় বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রদেশগুলিতে দল অভাবনীয় সাফল্য পায়। নির্বাচনে সাফল্যের সুযোগেই কংগ্রেস গণপরিষদ গঠনের ঐতিহাসিক দাবি রাখে। সাংবিধানিক ও সরকারি প্রস্তাবের শ্বেতপত্র প্রত্যাখান করে কংগ্রেস র্কাকরী সমিতি জানায় শ্বেতপত্রের একমাত্র বিকল্প হল সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণপরিষদের দ্বারা রচিত একটি সংবিদান ("The only satisfactory alternative to the white paper is a constitution drawn up by a Constituesnt Assembly elected on the basis of adult franchise,.....")। গোলটেবিল বৈঠক ব্যথ হবার পর জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন ভারতে জনগণই ভারতের ভবিষ্যৎ-নিয়ন্তা। সুতরাং তাদের হাতেই ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষমতা থাকা উচিত। ১৯৩৬ সালে ফৈজপুর সর্ম্মেনে গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস বলে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণপরিষদ ভারতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। ফৈজপুর অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নেহরু স্পষ্টভাষায় জানান যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে কংগ্রেস নির্বাচনে লড়ছে না বা প্রাদেশিক সরকারে যোগদানের জন্যও নয়। সংবিধানতন্ত্র বা সংস্কারবাদের পথে চলার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের প্রস্তাবের বিরোধিতাই আমাদের

লক্ষ্য। ১৯৩৭ সালের ১ মার্চ কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির প্রস্তাবে বলা হল, পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। অঅইনসভায় নতুন সংবিধানের জন্য সংগ্রাম করা, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রস্তাবটির প্রতিরোধ করা এবং গণপরিষদের জন্য জাতির দাবিকে প্রতিষ্ঠা করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। ১৯৩৭ সালে ২০ মার্চ কংগ্রেস জনপ্রতিনিধিদের সর্বভারতীয় জাতীয় কনে্‌ভেনশনে প্রায় একই অনুভূতির কথা শোনা যায়। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের স্বার্থেই ভারতের জনগণকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। গণপরিষদর মাধ্যমে ভারতের জনগণই এই ধরনের রাষ্ট্রভ্যস্থাকে রূপ দেবে। নির্বাচনে জয়লাভের পর ৬টি রাজ্যে মন্ত্রিসভা গড়ে কংগ্রেস যে সব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় তার মধ্যে অন্যতম হল স্বাধীন ভারতের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রের ব্রিটিশ আইনের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে ভারতবাসী নিজেদের বিষয় সংগঠিত ভাবে, দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে সমর্থ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি বা মুসলিম লিগের সঙ্গে বিচ্ছেদ কংগ্রেসের রাজনৈতিক দাবি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করার পথে সাময়িক বাধা সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই। তবে গণপরিষদের দৃঢ় দাবি থেকে কংগ্রেস সরে আসে নি। ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে সাধারণ ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ থেকে সম্ভব না হলেও, কংগ্রেস লড়াই চালিয়েছে নিজের সাংগঠনিক স্তরেই। এই পর্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও স্বাধীনতার স্বার্থেই ব্রিটিশ সরকারকে তার যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করেছে কংগ্রেস। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর মাসে কার্যকরী কমিটি আবার ভারতের স্বাধীনতা ও গণপরিষদের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেওঁগ ২৩ নভেম্বর কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানায়, যুদ্ধ চলছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে, দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা বা অন্যান্য সমস্যার সমাধানের সবচেয়ে উপযোগী পথ হল গণপরিষদ। চারদিন আগে হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে একই দাবি করেছেন। News Chronicle-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে গান্ধীজি বলেছেন গণপরিষদই একমাত্র ও কার্যকর সমাধান। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারে পাশে দাঁড়াতে কংগ্রেস রাজী হয়েছে এই শর্তে যে ভারতের স্বায়ত্তশাসনরে অধিকার যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সরকার মেনে নেবে এবং কেন্দ্রে একটি অন্তর্বতীকালীন সরকার গঠন করবে (কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির প্রস্তাব, পুনা, জুলাই ৭, ১৯৪০)। গণপরিষদই যে একমাত্র পথ, নেহরুও কংগ্রেসের পক্ষে এই কথা বার বার ঘোষণা করেছেন। ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেসে পূর্ব স্বরাজ এবং গণপরিষদ গঠনের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ১৯৪৬ সালে গণপরিষদ সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্তও কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রস্তাবে ও বার্ষিক সম্মেলনে গণপরিষদের পক্ষে দৃঢ় দাবি ছিল। ১৯৪২ সালেও সরকারের দরফে যখন কোন সমাধান সূত্র এল না বা ব্রিটিশ সরকার ডোমিনিয়ন মর্যাদার অধিক কোন দাবিতে সম্মত হল না তখন কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার রাস্তা থেকে সরে এল। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে

হবে। জুলাই প্রস্তাবটিই অনুমোদিত হল বোম্বাইয়ে আগস্ট মাসের ৮ দারিখে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভায়। শুরু হল ভারত ছাড় আন্দোলন। গান্ধীজি ডাক দিলে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ('Do or Die')। আপোষ, মধ্যস্ততার চেষ্টা হল কোন কোন নেতার তরফে। গান্ধীজি অনশনে বসলেন (ইতিমধ্যে তিনি গ্রেপ্তারও হয়েছেন)। অবশেষে ব্রিটিশের দরখ থেকেই এল মিমাংসা সূত্র। গণপরিষদ গঠিত হল বটে, তবে বাধাবিঘ্ন আর বিভাজনের চিহ্ন নিয়েই জন্ম নিল গণপরিষদ।

১.৪ গণপরিষদ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ও নীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে গণপরিষদ সম্পর্কে ভারতীয় মন একরকম প্রস্তুতই হয়ে গেছে বলা চলে। যুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতি এই মানসিকতা সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করলেও, জাতীয়তাবাদী চেতনা ও জাতীয় মর্যাদা রক্ষায় ভারতবাসীর সংগঠিত প্রয়াস বা উদ্যোগকটি এই সময় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি গতিলাভ করেছে দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দুর্বলতাও প্রকট হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যৎ ভারত রাষ্ট্রের রূপরেখা কি হবে তা নিয়ে নবনিযুক্ত শ্রমিক দলের সরকার ও ভারতের জাতীয় নেতাদের দরাদরি ও শলা-পরামর্শ শুরু হয়ে গেল। জাতীয় নতাদের তরফে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধান কি হবে তা নিয়ে নানা বিতর্ক ও আলোচনা হল। তেজবাহাদুর সাপ্রু, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী (Chakrabarti Raja Gopalachari), হিন্দু মহাসভা ও আকালীদের প্রতিনিধিগণ, মহম্মদ আলী জিন্না প্রমুখের উপস্থিতিতে সর্বদলীয় সম্মেনে উদ্ভূত রাজনৈকি সংকট ও সাংবিধানিক প্রনের সমাধান সূত্র স্থির করার চেষ্ট হয়। ব্রিটিশ সরকারের তরফেও যতশীঘ্র সম্ভব স্বশাসনর অধিকার দেবার উদ্যোগ নেওয়া হল। ক্রীপ্স্ মিশন সাফল্য না পেলেও স্বশাসনের প্রতিশ্রুতি জাগিয়ে রেখেছিল। ওয়াভেন পরিকল্পনা, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গণপরিষদের ধারণাকে বাস্তবায়িত করে, গণপরিষদ আইনগতভাবে সৃষ্টি হল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে (The Indian Independence Act) গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি আসে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের এক ঘোষণা অনুসারে। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪৬ সালে গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, ২৯৬ সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর গণপরিষদের প্রথম সভা বসে। তবে মুসলিম লীগ এই সভায় অংশ নেয় নি। এই পর্বে কংগ্রেসের নেতৃত্বেই গণপরিষদের কাজকর্ম শুরু করলেও, পরিষদরে আইনগত মর্যাদা নির্ধারিত হয় নি। সার্বভৌম সংস্থা হিসাবেও এর অবস্থান দিয়ে প্রশ্ন ছিল। কংগ্রেস ও মুসমি লিগের মতপার্থক্য, ভারত-বিভাজন ইত্যাদির কারণে অবিভক্ত গণপরিষদের ধারণা শেষ পর্যন্ত কাজ করে নি। মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব অনুসারে ও ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে জন্ম নিল নতুন ভারত রাষ্ট্র। নতুন ভারত রাষ্ট্রের হয়ে সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে হাজির হল গণপরিষদ।

এবার আসুন আমরা গণপরিষদ সৃষ্টির পেছনে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব বা উদ্যোগ কি ছিল সেই অতীত ঘটনার দৃশ্য (Flash-back) দেখি। ১৯০৯ সালের ভারত-শাসন আইন আর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীন আইন-এর মাঝের বচরগুলি সরকারি সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলিই আমরা এখানে দেখাবার চেষ্টা করবো। এই সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যেই গণপরিষদের দাবি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারি অনুমোদ পেয়েছে বলা যেতে পারে।

১.৪.১ ১৯০৯ সালের ভারতশাসন আইন

গণপরিষদের ধারণা প্রচার না পেলেও, বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই স্বরাজ অর স্বদেশীর ভাবান ছড়িয়ে পড়ে ভারতের জাতীয়বাদী আন্দোলনে। স্বরাজের ডাকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠিত হল। শুধুমাত্র শাসন আর দমনের সাহায্যে এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব নয় একথা ভেবেই ব্রিটিশ শাসকের পক্ষ থেকে একটি শাসন-সংস্কারের সুপারিশ করা হল। ১৯০৯ সালের এই শাসন-সংস্কারে (যা মর্লে-মিন্টো সংস্কার নামে পরিচিত) ভারতবাসীকে কিছু রাজনৈতিক সুবিধা বা অনুগ্রহ দেবার চেষ্টা হলেও ভারতবর্ষে কোন দায়িত্বশীল সরকার স্থাপন বা স্বশাসনের কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিরাপদ করতে ইংল্যান্ড থেকেই ভারতের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা প্রয়োজন, ভারতে কোন কর্তৃপক্ষের াতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়, নতুন আইনে এটাই সুনিশ্চিত হল। লন্ডনের হোয়াইট হল থেকেই ভারত-সচিবের মাধ্যমে ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনার কাজ চলবে—নতুন আইনে এটাই স্থির হল। জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ শাসন নিয়ে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, নতুন এই আইনি সংস্কারে উপশম করতে চাইল নামমাত্র কিছু ব্যবস্থাপত্র দিয়ে। এগুলি হল ঃ আইন-পরিষদের আয়তন বাড়িয়ে ভারতীয়দের সেখানে সদস্যপদ দেওয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর প্রতিধিত্বের ব্যবস্থা। গণপরিষদের মাধ্যমে সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা গেছে, ১৯০৯ সালের সংস্কার আইনে তার এক ক্ষীণ আভাস ছিল, অনেকে এই মত ব্যক্ত করেন। আইনসভার সম্প্রসারণ, নির্বাচন, প্রতিনিধিত্ব—এইসব ধারণা ও ভাবনার সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় ঘটল, পরিষদীয় শাসন সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা হল, স্বরাজ, স্বাধীনতা ও পণপরিষদের পক্ষে আগামী দিনে ভারতবাসীর দাবি জোরদার হল। ব্রিটিশ শাসক অবশ্য পদ্ধতিগত জটিলতা, বিভেদমূলক নির্বাচনী ব্যবস্থা, আনুষ্ঠানিক নিয়মনীতির জালে স্বায়ত্তশাসনের মূল দাবিকে বন্দী করে রেখেছে।

১.৪.২ ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইন

মর্লে-মিন্টো শাসন-সংস্কারের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও পরিষদীয় ব্যবস্থাকে প্রসারিত করার চেষ্টা হলেও, স্বশাসন বা স্বায়ত্তশাসনের কোন ভাবনা এই সংস্কারে প্রশ্রয় পায় নি। স্বরাজ ও স্বদেশীর দাবিতে ভারতবাসী অটল থেকেছে এবং সেইসঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনেও সোচ্চার ও সক্রিয় হয়েছে। একসময় স্বদেশী ও হোমরু আন্দোলনের সীমানা অতিক্রম করে জাতীয় আন্দোলন সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লববাদের পথে ঝুঁকেছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরশাসনের উচ্ছেদ ঘাটতে বিপ্লবী সংগঠনের সৃষ্টি ও প্রসার এবং ব্রিটিশ সরকারের পুলিশী ও নিপীড়ন ব্যবস্থা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজির প্রবেশ ও নেতৃত্ব গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নতুন পর্বের সূচনা করেছে। অহিংস-অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকার সামরিক আইননের পরিবর্তে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রয়োজনীয় সংস্কার আইন গ্রহণের কথা ভাবতে থাকে। ১৯১৭ সালে ভারতসচিব এডউইন মন্টেগু (Edwin Montagu) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে ভারতে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের কথা বলেন। এর কিছুদিন পরেই লর্ড চেমসফোর্ড (Lord Chemsford) ভারতে উদারনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষে বলেন। তৎকালীন ভারতসচিব অস্টেন চেম্বরলেনও (Austen Chamberlain) এদেশে দায়িত্বশীলন শাসনের প্রস্তাব পেশ করেন। বলা যেতে পারে মন্টেগু ও চেমস্‌পোর্ডের ভাবনায় প্রভাবিত হয়েই ব্রিটিশ সরকার ভারতে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে যে আইন কার্যকর করে সেটিই ভারতশাসন আইন, ১৯১৯ (মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড আইন বা সংক্ষেপে মন্টফোর্ড আইন) নামে পরিচিত। কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজন, আইনসভার স্বাধীনতা, পার্লামেন্টীয় পদ্ধতি, নির্বাতন—এই শাসন সংস্কারের কতকগুলি ইতিবাচক দিক ছিল সন্দেহ নেই। ভারতসচিবের একাধিপত্য বা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কর্যকরী হলেও এই আইন ভারতে পরিষদীয় শাসনের ভিত্তি প্রতুত করেছে ও স্ব-শাসন সম্পর্কে ভারতবাসীকে উৎসাহিত করেছে। আইনসভা, প্রতিনিধিত্ব ও সংবিধানকে সামনে রেখে এদেশে স্বায়ত্তশাসন ও দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব—১৯১৯ সালের আইনের পটভূমিতে সে আশা ব্যক্ত হল। পরবর্তীকালে স্বরাজ অর্জন ও মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে সূচনা হল এক নতুন ও বলিষ্ঠ অধ্যায়।

১.৪.৩ সাইমন কমিশন

১৯১৯ সালের আইনে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও অসচ্ছ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাড়িত এই আইন শেষ পর্যন্ত ভারতবাসীকে হতাশ করেছে। ভারতবাসীর এই হতাশা ও অসন্তোষ প্রকাশ পেল কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে, অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে। স্বরাজের দাবিতে সোচ্চার হল গোটা ভারতবর্ষের মানুষ। গান্ধীজির নেতৃত্বে শুরু হল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন। এক বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জিত হবে বলে গান্ধীজি ঘোষণা করলেন। সাংবিধানিক আন্দোলনের সীমা ছাড়িয়ে দেশী ও স্বরাজের আন্দোলন গণ-আন্দোলনে প্রসারিত হল। গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করলেও, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও ডোমিনিয়ন মর্যাদার দাবিতে মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দল (Swarajya Party) আন্দোলন ও স্বরাজ সংগঠনের কাজ চালিয়ে গেছে। বামপন্থীদের নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিকের আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে দ্বৈতশাসনের অবসানের পক্ষে জোর সওয়াল শুরু করেন স্যার মুডিম্যানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি। তেজবাহাদুর সপ্রু, মহম্মদ আলি জিন্না, এস. এস. আয়ার

(S. S. Ire), আর. পি. পরাঞ্জাপে (R. P. Paranjpe) প্রমুখ বিশিষ্ট জাতীয় নেতৃবর্গ দ্বৈতশাসনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করেন। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম নেতারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য যৌথ নির্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাব করেন। এই পরিস্থিতিতেই ব্রিটিশ সরকার সাংবিধানিক সংস্কার নিয়ে নতুনভাবে তথ্যানুসন্ধানের জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। সাময়িকভাবে কমিশন বিরুদ্ধতা ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হলেও, কমিশনের রিপোর্টে সাংবিধানিক সংস্কারের কিছু প্রস্তাব ছিল। কমিশনের প্রস্তাবে দ্বৈতশাসনর অবসান ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ ছিল। ডোমিনিয়ন মর্যাদার ভিত্তিতে এদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার কথা অবশ্য কমিশনের সুপারিশে ছিল না।

ভারতীয়দের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে এদেশের জন্য সংবিধান রচনা করা সম্ভব নয়, ভারতসচিব বার্কেনহেডের এই চ্যালেঞ্জ ভারতবাসীর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এরই ফলশ্রুতি মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সম্মেলন এবং এই সম্মেলনে গঠিত সংবিদান কমিটি। ভারতে গণপরিষদ ও সংবিধান রচনার প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটিতে।

নেহরু কমিটির রিপোর্টকে প্রত্যাখ্যান করে জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ এক বিকল্প প্রস্তাব উপস্থিত করে। ইতিমধ্যে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস লাহোরে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করে। গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতিও শুরু হয় প্রায় একই সঙ্গে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির প্রেক্ষাপটে যে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তারই ফলে ইংরেজ সরকার গোলটেবিল বৈঠকের আপসমূলক উদ্যোগ নেয়।

১.৪.৪ গোলটেবিল বৈঠক

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক (১২ নভেম্বর, ১৯৩০) ইংরেজ সরকারের আশ্বাস ছিল ডোমিনিয়ন মর্যাদাসহ ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠন। গান্ধীজি-আরউইন চুক্তির শর্ত মেনে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাবের পক্ষে উদ্যোগ নেওয়া হলেও, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। আপস-মীমাংসায় ভারতীয়দের প্রাপ্তি ছিল শূন্য। গান্ধীজি ভারতে ফিরে এলেন। নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন (Willingdon) শাসন-সংস্কারের প্রশ্নে উদাসীন ছিলেন। গান্ধী-আরউইন যুক্তি কার্যকর হল না। ভারতের জাতীয়তাবাদী আবেগ মূল্য না পাওয়াতে আইন অমান্য আন্দোলন আবার শুরু হল। ব্রিটিশ সরকার দমলমূলক নীতি গ্রহণ করে পরিস্থিতিকে আরও অস্থির ও জটিল করে তুললেন। এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকারের নতুন নীতি হল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (Communal Award), তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ও সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ে শ্বেতপত্র (White Papers on Constitutional Reforms) প্রকাশ।

১.৪.৫ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও অন্যান্য শাসন-সংস্কার

আইন-অমান্য আন্দোলন চলাকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড আইনসভার সদস্য বণ্টনের এক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনক্ষেত্র ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হল। তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখেও ব্রিটিশ সরকার তার সিদ্ধান্তে অটল ছিল। পুনা চুক্তি (Puna Pact) অনুসারে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য অধিক আসন সংরক্ষণের ও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে অবস্থা সাময়িকভাবে সামাল দেওয়া হলেও অচিরেই সরকারকে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী গড়ার এক উদ্যোগ নিতে হল। বৈঠকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হল। স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে না হলেও শ্বেতপত্র ভারতে শাসনতান্ত্রিক অন্তগতির ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। যুক্তরাষ্ট্র, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে শ্বেতপত্র বিস্তারিতভাবে বলা হয়। শ্বেতপত্র নিয়ে তথ্যানুসন্ধানের জন্য গঠিত হল লর্ড লিনলিথগোর (Lord Linlithgow) নেতৃত্বে যৌথ পার্লামেন্টীয় কমিটি (১৯৩৪)। এই কমিটিই ভারতে নতুন ধরনের শাসন-সংস্কারের সবুজ সংকেত দেয়। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের রূপরেখা প্রস্তুত হল। স্বশাসন না দিলেও নতুন আইনে স্বশাসন ও সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ছিল। ইংরেজ সরকারের উদারনীতি ও ইতিবাচক সংস্কারের সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়েই স্বশাসনের ক্ষেত্রে সরব হলেন জাতীয় নেতৃবর্গ।

১.৪.৬ ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে একাধারে সংসদীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ভারতশাসনের নীতি গ্রহণ করা হলেও, প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন বা স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব ছিল না। ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীল নেতারা প্রস্তাবিত ব্রিটিশ শাসন-সংস্কারে আস্থা না দেখালেও এটা বুঝেছিলেন যে গণতন্ত্রের প্রত্যাশা পূরণ না হলেও, স্বশাসনের উপযোগী না হলেও সংসদীয় ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার কিছু উপাদান এই আইনে ছিল। এই আইন অনুসারেই কংগ্রেস প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশ নেয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, প্রদেশে সরকার গঠন করে, প্রশাসনিক ও পার্লামেন্টীয় শাসনে অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই আইনকে সামনে রেখেই সীমিতভাবে হলেও সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মে কংগ্রেসসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন সাম্রাজ্য শাসনের স্বার্থে ব্যবহৃত হলেও স্বশাসনের সাময়িক ও আংশিক সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম মেনে প্রদেশগুলির শাসন সম্ভব ছিল না ঠিকই, ক্ষমতা বণ্টন পদ্ধতি বা মন্ত্রিদের দায়িত্ব কোন ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের নীতিপূর্ণ প্রতিফলিত হয় নি একথাও সত্য, তবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে যে সুযোগ ছিল সেটিই ভবিষ্যৎ ভারতের স্ব-শাসনের আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে। ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কারের পরবর্তী বছরের ঘটনাক্রম প্রমাণ করে যে ভারতে সাংবিধানিক ও সংসদীয় শাসনের ইতিবাচক সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে চলেছে। সংস্কারের প্রশ্নে মতবিরোধ, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি,

সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দায়িত্বশীল সাংবিধানিক শাসনের পথে বাধা হলেও গণতান্ত্রিক সংস্কার ও স্বশাসনের চাপের কাছে ব্রিটিশ শাসককে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়েছে। ক্রীপস মিশন, ওয়াভেল পরিকল্পনা ও ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গণপরিষদ ও স্বাধীন সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে এক-একটি পদক্ষেপ হিসাবেই চিহ্নিত।

১.৪.৭ ক্রিপ্স্ মিশন

গণপরিষদের দাবিকে প্রস্তাবাকারে রূপ দেবার সরকারি প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা গেল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিলের ক্যাবিনেট মন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের শাসনসংস্কার সংক্রান্ত একদফা প্রস্তাবে। যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অচলাবস্থার পটভূমিতে ১৯৪০ সালের ২৯ মার্চ ক্রিপস যে প্রস্তাব পেশ করেন শাসন-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই পালাবদলের এক সূচনা বলা যেতে পারে। সংবিধান ও গণপরিষদ সম্পর্কে এতটা স্পষ্টভাবে সরকারের তরফ থেকে বক্তব্য ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নি। ক্রিপস জানালেন—

১। যুদ্ধ শেষ হবার পরেই ভারতকে শাসনাধিকার দেওয়া হবে, এক নির্বাচিত সংস্থার মাধ্যমে ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। সংবিধানে ভারত ডোমিনিয়ন মর্যাদা পাবে।

২। নব নির্বাচিত প্রাদেশিক আইন পরিষদ গণপরিষদ নির্বাচিত করবে।

৩। গণপরিষদে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য উভয়ের প্রতিনিধি থাকবে।

৪। ব্রিটিশ ভারতের যে-কোন অংশ এই ব্যবস্থার বাইরে থাকতে পারে বা পরে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৫। যেসব প্রদেশ সংবিধান গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক তারা তাদের নিজস্ব সংবিধান প্রণয়ন ও গ্রহণ করতে পারে।

ক্রিপস প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে ঐক্যমত হয়নি। মুসলিম লিগ স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পৃথক গণপরিষদের দাবি করে। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি না থাকাতে কংগ্রেসও প্রস্তাব সম্পর্কে সন্তুষ্ট ছিল না। গান্ধীজি প্রস্তাবটিকে ফেল পড়া ব্যাংকের আগাম চেক (A post-dated cheque on a crashing bank) বলে মনে করেছেন। আম্বেদকার প্রস্তাবটির মধ্যে বর্ণ হিন্দুদের আধিপত্যের সম্ভাবনা দেখেছেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদের ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মতান্তর ক্রিপস প্রস্তাব ও দৌত্যকে শেষ পর্যন্ত সফল হতে দেয়নি। সরকার বিষয়টির সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য লর্ড ওয়াভেলকে (Lord Wavell) ভাইসরয় করে পাঠালেন। হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজির 'ভারত ছাড়' (Quit India) পরিকল্পনা ব্যক্ত করে গান্ধীজি ইতিমধ্যেই এদেশে ব্রিটিশ শাসনের উপযোগিতা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপস্থিতি যে জাপানী আগমনের কারণ হবে, ভারতের স্বার্থেই যে ব্রিটেনের ভারত ত্যাগ বাঞ্ছনীয় গান্ধীজি সে কথা জানালেন। কংগ্রেস কার্যকরী কমিটিতেও গ্রহণ করা হল ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তাব ও শেষ লড়াইয়ের বলিষ্ঠ

অঙ্গীকার। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঠেকাতেই ব্রিটিশ সরকার এক রকম বাধ্য হল ওয়াভেল পরিকল্পনার মাধ্যমে নতুন রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব পেশ করতে।

১.৪.৮ ওয়াভেল পরিকল্পনা

ওয়াভেল পরিকল্পনায় (১৪ জুন, ১৯৪৫) শাসন-সংস্কারের প্রশ্নে আগেকার দীর্ঘসূত্রিতার অবসন ঘটানোর চেষ্টা হল। বলা হল নতুন সংবিধান রচনা না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবর্গকে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (Interim Government) গঠিত হবে। কাউন্সিল তথা পরিষদে বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি ছাড়া সবাই হবেন ভারতীয় প্রতিনিধি। হিন্দু ও মুসলমানদের সমপ্রতিনিধিত্ব থাকবে। কাউন্সিল চলবে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন অআইন মেনেই। এই সব পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য ঐক্যমতে আসার জন্য সিমলায় একটি বৈঠক আহ্বান করা হলেও, প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে ঐক্য হল না। ওয়াভেল দেশে ফিরে গিয়ে জানালেন (১৯ সেপ্টেম্বর) আগামী শীতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন হবে। যতশীঘ্র সম্ভব সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠিত হবে। গণপরিষদের গঠন বিষয়ে আলোচনা ও বিকল্প প্রস্তাব থাকলে তার ওপর আলোচনা হবে। ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য শাসন পরিষদ গঠিত হবে।

ওয়াভেল প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও আরও সংকটজনক হয়ে ওঠে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সমর্থনে বিক্ষোভ, নৌবিদ্রোহ, বায়ুসেনার অসন্তোষ এবং শ্রমিক ধর্মঘট রাজনৈতিক অস্থিরতাকে ঘনীভূত করে। ১৯৪৫ সালে ক্ষমতায় এসে শ্রমিক দলের সরদার শাসন-সংস্কার ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জ্য তিন সদস্যের ক্যাবিনেট মিশন ভারতে পাঠায়। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় (১৬ মে, ১৯৪৬) গণপরিষদ সম্পর্কে একটি স্থির প্রস্তাব পেশ করা হল।

১.৪.৯ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা

গণবিক্ষোভ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ১৯৪৫ সালের নির্বাচন, নির্বাচনী রাজনীতিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের সাফল্য, গণপরিষদ সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মত পাথক্য—সমস্ত বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ক্যাবিনেট মিশন যে পরিকল্পনা পেশ করে তার মূল সুপারিশগুলি ছিল ঃ

> প্রান্তলিপি ঃ তিন সদস্যের ক্যাবিনেট মিশনে ছিলেন লর্ড পেথিক লরেন্স (Lord Pethick Lawrence), সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ (Sir Stafford Cripps) ও এ. ভি. আলেকজান্ডার (A. V. Alexander)। কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও অন্যান্য দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতেই ক্যাবিনেট মিশন গণপরিষদ সম্পর্কে পরিকল্পনা পেশ করে।

১। গণপরিষদের মাধ্যমেই এদেশের সংবিধান রচিত হবে;

২। গণপরিষদের সদস্যরা প্রাদেশিক বিধানসভায় নিজ নিজ স্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত হবেন;

৩। প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি হল একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব;

৪। চিফ কমিশনারের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় আইনসভায় দিল্লীর প্রতিনিধি, আজমীঢ় মারওয়াড়ের প্রতিনিধি ও কুর্গ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রতিনিধি থাকবেন;

৫। গণপরিষদে রাজন্য ভারতের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকবে (সংখ্যা অনধিক ৯৩)। আলোচনার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি স্থির হবে;

৬। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যতশীঘ্র সম্ভব নয়াদিল্লিতে মিলিত হবেন;

৭। রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে একটি আলোচনা কমিটি প্রথমে কাজ করবে;

৮। প্রাথমিক অধিবেশনে সাধারণ কার্যবিধি স্থির হবে;

৯। আদিবাসী ও বহির্ভূত অঞ্চলগুলি সম্পর্কে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে;

১০। প্রদেশের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে (ক, খ, গ) বিভাগের অন্তর্গত প্রদেশের সংবিধান রচনার কাজ শুরু করবেন। বিভাগের অন্তর্গত প্রদেশগুলি হল :

(ক) মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা;

(খ) পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত সিন্ধু;

(গ) বাংলা, আসাম।

ইউনিয়ন সংবিধান রচনার কাজে বিভিন্ন বিভাগের প্রদেশগুলি ও রাজন্য ভারতের প্রতিনিধিরা আবার মিলিত হবেন।

১১। সংবিধান চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে যে বিভাগে তার স্থান হয়েছে সেই বিভাগ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

১২। আশু ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে এক 'অন্তর্বর্তী সরকার' (Interim Government) গঠিত হবে। এই সরকার ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা পাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সব দপ্তর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তরিত হবে।

১.৪.১০ গণপরিষদের নির্বাচন

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবমতই গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। প্রদেশগুলির ২৯২ জন ও চীফ কমিশনার শাসিত ৪টি প্রদেশের (দিল্লী, আজমীঢ়, মাড়ওয়াড়, কুর্গ, ব্রিটিশ বালুচিস্থান) ২ জন প্রতিনিধির জন্য নির্বাচন হল। দিল্লি ও আজমীঢ়-মাড়ওয়াড় থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় যে দুজন প্রতিনিধি ছিলেন তাঁরা গণপরিষদে ঐ অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে গৃহীত হন। প্রদেশগুলির ২৯২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৮, মুসলিম লিগ ৭৩ ও এন্যান্য দল বাকি ১১টি আসন লাভ করে।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনামত গণপরিষদের নির্বাচন হলেও নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি চরম রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করে। ক্যাবিনেট মিশন পরিক্লপনামত সংবিধান রচনার ব্যাপারে পরিষদের প্রথম সভা ডাকা হল। মুসলিম লিগের নির্বাচিত সদস্যরা সভা বয়কট করলেন, গ্রুপ বা বিভাগ গঠনের প্রস্তাবে কংগ্রেস অসন্তুষ্ট ছিল। দ্বিধা সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেবার ব্যাপারে মুসলিম লিগ রাজী হয়। কংগ্রেস প্রাথমিকভাবে অন্তবর্তী সরকারে যোগ দেবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। গণপরিষদে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারলে কংগ্রেস পরিষদ ত্যাগ করবে—নেহেরুর এই বিবৃতি কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের পুরনো বিতর্ক ও কলহে নতুন মাত্রা যোগ করে। মুসলিম লিগ নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীর সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে। ওয়াভেলের অনুরোধ উপেক্ষা করে মুসলিম লিগ ১৬ আগস্ট প্রতিবাদ দিবস পালন করে। লিগ-কংগ্রেস কলহ, মিটিং-মিছিল। দাঙ্গা মিলিহেয় রাজনৈতিক অচলাবস্থা চরমে ওঠে। ভারত ভাগ, পাকিস্থান রাষ্ট্রের দাবি, পৃথক গণপরিষদ গঠন, প্রায় প্রতিটি প্রশ্নে লিগের অবস্থান নিয়ে কংগ্রেস অসন্তুষ্ট ছিল। প্রতিবাদ দিবস পালন ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কৌশল কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে বিভেদ রেখা আরও স্পষ্ট করে দেয়। এসব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অয়াবেলের আহ্বানে মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। সরকারের যোগ দেবার পর দপ্তর বন্টন, বাজেটে কর ধার্যের প্রস্তাব (অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী এই প্রস্তাব আনেন) এসব নিয়ে কংগ্রেস ও লিগের বিরোধী অবস্থান আরও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল। হরতাল, সভা,মিছিল, দাঙ্গা (কলকাতা ও নোয়াখালি ট্যাজেডি) নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিক্ষুব্ধ ছিল। মুসলিম লিগের পাকিস্থান দাবি ও প্ররোচনামূলক কার্যপলাপে (পাঞ্জাব, লাহোর, মুলতান, গুজরাট, জলন্ধন—সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছেছে) কংগ্রেস বিবতর হয়েছে এবং গণপরিষদে মুসলিম লিগের অংশগ্রহণের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই পর্যায়ে ওয়াভেল যখন দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, বিকল্পের সন্ধান করছেন, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার সঠিক রূপ দেবার কথা ভাবছেন, ঠিক তখনই তাঁকে ফিরে যেতে হল। ওয়াভেলের জায়াগয় ভারতে বড়লাট হিসাবে এলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন (Lord Mountbatten)ঙ্গ ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ মাঠন্টব্যাটেন ভারতে এলেন এবং এর কয়েকদিন পরেই তাঁর হাতে পৌঁছল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির (Attlee) ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের খসড়া ঘোষণা।

১.৪.১১ দেশবিভাগ, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও গণপরিষদ

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সংসদে অ্যাটলি ঘোষরা করলেন—

১। কোনরকম বিলম্ব না করে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

২। ইতিমধ্যে যদি দেকা যায় ক্যবিনেট মিশন পরিকল্পনামত প্রতিনিধিমূলক গণপরিষদ রচিত সংবিধান সর্বসমমতভাবে গৃহীত হচ্ছে না, তবে ব্রিটিশ সরকার স্থির করবে নির্দিষ্ট সময়ে কার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

৩। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর রাজশক্তির সর্বময় ক্ষমতার অবসান হবে।

৪। ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে উদ্ভুত বিষয় নিয়ে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন দলগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করবে।

৫। ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হবে না।

২৪ মার্চ, ১৯৪৭ বড়লাট কার্যভার গ্রহণ করেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের প্রবল মতপার্থক্য, গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, পাকিস্তান দাবি নিয়ে মুসলিম লিগের অনমনীয় অবস্থান—সবকিছু লক্ষ্য করে ভাতরবিভাজন, ক্ষমতা হস্তান্তর ও গণপরিষদ সম্পর্কে লর্ড মাউন্টব্যাটেন একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা পেশ করলেন। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নানা বাধার মধ্যে পেশ হল ও ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন পেল ২ জুন, ১৯৪৭। ৩ জুন, ১৯৪৭ প্রস্তাবটি ব্রিটিশ সংসদে ঘোষিত হল। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে ঃ (১) ভারত ও পাকিস্তান পৃথক ডোমিনিয়নের মর্যাদা পেল। (২) উভয় দেশের জন্য পৃথক গণপরিষদের অধিকার স্বীকৃতি পেল। গণপরিষদ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় বলা হল ঃ

(ক) যেসব অঞ্চল বর্তমান গণপরিষদে যোগ দিতে অনিচ্ছুক তাদের ওপর গণপরিষদ রচিত সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

(খ) বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমান-প্রধান ও অমুসলমানপ্রধন জেলাগুলি পৃথকভাবে বৈঠকে বসবে এবং সাধারণ ভোটে স্থির করবে প্রদেশের বিভাজন হবে কিনা। বিভাজনের প্রস্তাব হলে প্রত্যেক অশই ঠিক করবে তারা বর্তমান গণপরিষদে থাকবে বা নতুন গণপরিষদ গঠন করবে ও তাতে যোগ দেবে।

(গ) বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধরারণ করবে দুটি পৃথক সীমানা কমিশন।

(ঘ) সিন্ধু প্রদেশের আইনসভা স্থির করবে এই প্রদেশ বর্তমান বা নবগঠিত গণপরিষদে যোগ দেবে।

(ঙ) আসামের মুসলমান-প্রধান শ্রীহট্ট জেলা গণভোটের মাধ্যমে স্থির করবে ওই জেলা আসামের সঙ্গে থাকবে না পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্থান) সঙ্গে যুক্ত হবে।

(চ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গণভোটের মাধ্যমে স্থির করবে বারত অথবা পাকিস্তান কার সঙ্গে যুক্ত হবে।

(ছ) বালুচিস্তান নিজেই স্রি করবে ভারতের সঙ্গে থাকবে কিনা।

(জ) দেশীয় রাজ্যগুলির ডোমিনিয়নে যোগ দেবার অধিকার থাকবে।

এই প্রস্তাবগুলিকে কার্যকর করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যতশীঘ্র সম্ভব আইন প্রণয়ন করবে।

১.৪.১২ ভারতের স্বাধীনতা আইন ও গণপরিষদ

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে আইনে রূপদান করা হল অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলি স্বাধীনতা বিল (Indian Independence Bill) কমন্স সভায় পেশ করলেন।

১৮ জুলাই রাজা ষষ্ঠ জর্জের স্বাক্ষর পাবার পর বিলটি আইনে পরিণত হল। ভারতে এই আইন রূপ পেল ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে। ১৫ আগস্ট এই আইন কার্যকর হল (The Indian Independence Act, 1947)। এই আনিবলে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালের পর নবগঠিত ডোমিনিয়নের ওপর রাজশক্তির আর কোন ক্ষমতা থাকবে না। লর্ড অ্যাটলির ভাষায় সম্পন্ন হল ব্রিটেনের দৌত্য। লর্ড স্যামুয়েলের কথায় রচিত হল ‘a unique event in history—a treaty of peace without war’। ১৯ জুলাই ভারত ও পাকিস্তানের অস্থায়ী সরকার ঘোষিত হল। পার্টিশন কাউন্সিল, কাউন্সিলের স্টিয়ারিং কমিটি, সালিশী ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদির তদারকিতে বিভাজন সম্পন্ন হল। সংবিধান রচনার কাজে স্বতন্ত্রভাবে অগ্রসর হল দুটি পৃথক গণপরিষদ। ডোমিনিয়ন ভারতে ভারতীয় জনগণের পক্ষে নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব নেয় ভারতের গণপরিষদ। গণপরিষদের হাতে ডোমিনিয়নের আইনসভার দায়িত্ব অর্পণ করা হল। ভারত ব্যবচ্ছেদ হলেও স্বাধীন ভারতের সংবিধানগত ও রাজনৈতিক পুর্গঠনের কাজ শুরু হল গণপরিষদের নেতৃত্বে।

১.৫ গণপরিষদের প্রশ্নে মুসলিম লিগ

গণপরিষদ সম্পর্কে মুসলিম লিগের প্রাথমিক অবস্থান ছিল দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব জড়িত। ক্রমশ এ বিষয়ে লিগের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়। নির্বাচনে অংশ নেওয়া, নির্বাচনী ফলাফল, যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রায় সব প্রশ্নে কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। গণপরিষদে কংগ্রেস আধিপত্য নিয়ে লিগ কখনই সন্তুষ্ট ছিল না। হিন্দু সংগঠনে ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংবিধানে মুসলিমদের অধিকার ন্যায্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে—এ বিশ্বাস জিন্নার নেতত্বে মুসলিম লিগের ছিল না। সুতরাং ক্রিপস মিশন, ক্যামিনেট মিশন বা ওয়াভেল পরিকল্পনায় মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নে বা অন্যান্য প্রশ্নে মুসলিম লিগ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়েই অগ্রসর হয়েছে, মুসলিম লিগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন (১৯৩৭) থেকেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দৃষ্টি নিয়ে মুসলিম লিগ পরিচালিত হয়েছে। কংগ্রেসের পূর্ণস্বরাজ তত্ত্ব বা স্বশানের গণতান্ত্রিক ভাবনায় তাদের আস্থা ছিল না। ১৯৩৭-৩৯ বছরগুলিতে লিগ সন্দেহ নিয়েই কংগ্রেসের সঙ্গে একই মঞ্চে অগ্রসর হলেও ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রয়োজনের কতা বলে পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজিত করেছে। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে মুসলিম স্বার্থরক্ষার বিষয়ে মুসলিম লিগের দাবি আরও জোরদার হয়েছে, গণপরিষদ সম্পর্কে কংগ্রেসের উৎসাহ ও আবেগ বা ঐক্যবদ্ধ ভারত রাষ্ট্রের সংবিধান বিষয়ে গংগ্রোসের ভাবনাকে মুসলিম সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছে। ত্রিপুরী কংগ্রোসের (১৯৩৯) পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব ও গান্ধীজীর রাজনৈতিক নিষ্পত্তির ভাবনার প্রতিবাদই ধ্বনিত হয় জিন্নার লাহোর দাবি ও পাকিস্তার রাষ্ট্রের দাবির মধ্যে। কংগ্রেসের দাবির প্রতিবাদ হিসাবেই মুসলিম লিগের প্রচার ছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের। এই মাতৃভূমিতে এমন সংবিধান হবে যেকানে দুটি সম্প্রদায়ের শাসনাধিকারের দাবি স্বীকৃত হবে, এটাই ছিল মুসলিম লিগের দৃঢ়বিশ্বাস। ওয়াভেলের প্রস্তাবে ভারত বিঝারনজের কথা না থাকলেও ক্যাবিনেট মিশন, বা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা মুসলিম লিগের দাবিমতই বারতবিভাজন ও

স্বতন্ত্র গণপরিষদ গঠনের দাবিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। গণপরিষদের নির্বাচনে প্রত্যাশিত সাফল্য পেয়েও মুসলিম লিগের নির্বাচিত সদস্যরা গণপরিষদের প্রথম সভা বয়কট করেছে। সম্ভবত গণপরিষদে কংগ্রেস আধিপত্য এবং মুসলিম প্রতিনিধিত্বের ও অধিকারের প্রশ্নেই লিগের এই সিদ্ধান্ত। পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র ও পৃথক গণপরিষদেই তাদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকবে এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তারা গণপরিষদের সভা বয়কট করেছে। গণপরিষদে গ্রুপ নিয়ে কংগ্রেসের দাবি বা গণপরিষদের শর্ত নিয়ে কংগ্রেসের ভাবনা লিগের কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য হয়নি।স প্রতিনিধিমূলক দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রশ্নে কংগ্রেসের সঙ্গে লিগের সম্পর্ক ছিল সংঘাতমূলক এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আপোষমূলক।

১.৬ গণপরিষদে দেশীয় রাজ্যের অংশগ্রহণের প্রশ্ন

গণপরিষদে দেশীয় রাজ্যের অবস্থান স্পর্কে ক্রীপস্ প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গণপরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকবে। রাজন্যবর্গের সঙ্গে গণপরিষদে যোগদানের ব্যাপারে আলোচনার জন্য লর্ড ওয়াভেল প্রস্তাব দেন। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য উভয়েই সমস্ত ভারতের ইউনিয়নের অংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ইউনিয়নের আইনসভা ও শাসন পরিষদে রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিত্বের কথাও ক্যাবিনেট মিশন বলেছে। রাজন্যবর্গের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব, সংবিধান রচনায় তাদের পরামর্শ গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তর হলেও রাজ্যবর্গের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে না। অ্যাটলির ঘোষনায় ওই কথা স্পষ্টভাবেই ছিল। মাউন্টব্যাটেন ঘোষণায় দেশীয় রাজ্যগুলিকে গণপরিষদে যোগ দেবার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য (কাশ্মীর, জুনাগড়, হাদ্রাবাদ ছাড়া) ভারেতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বশ)াসনর অধিকারও পায়। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রস্তাবে দেশীয় রাজাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হবে না—ব্রিটিশ আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবগুলিতে সে কথা স্বীকার করা হয়েছে। দেশীয় রাজাদের স্থানীয় অবস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও কংগ্রেস, মুসলিম লিগ বা অন্যান্য দল ওদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হবে না বলেই মেনে নিয়েছে। তবে ১৫ আগস্টের পর রাজন্যবর্গের পৃথক আন্তর্জাতিক অবস্থান থাকতে পারে বলে ভারতের স্বাধীনতা আইনে বলা হয়েছে। রাজন্যবর্গকে ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ও গণপরিষদে ওদের সুষ্ঠু প্রতিনিধিত্বের জন্য গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন থেকে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে।

১.৭ গণপরিষদের গঠনপ্রণালী

গণপরিষদের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মূল ধারণাগুলিই প্রযোজ্য হয়েঝে। ক্যবিনেট মিশন পরিকল্পনায় গণপরিষদ কিভাবে নির্বাচিত হবে, গণপরিষদের নির্বাচনের পদ্ধতি কী, প্রতিনিধিত্বের

ভিত্তি কী, অধিবেশন, উপদেষ্টা কমিটি, প্রদেশের প্রতিনিধিত্বের বিভাগ কেমন হবে এসম বিষয়ে প্রস্তাব আছে (ক্যাবিনে মিশন পরিকল্পনার সুপারিশগুলি দ্রষ্টব্য)। বর্তমান আলোচনায় আমরাগণপরিষদের সদস্যসংখ্যা, সদস্যবন্টনের পদ্ধতি, গণপরিষদের নেতৃত্ব, প্রনিধিত্বের ও আসনবন্টনের নীতি, অধিবেশন, কমিটি ব্যবস্থা এইসব বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর আলোকপাত করবো।

১.৭.১ গণপরিষদের প্রতিনিধিত্ব ও আসন বন্টনের নীতি ও সদস্যসংখ্যা

গণপরিষদের প্রতিনিধিত্ব ও আসন বন্টনের নীতি স্থির হয়েছিল ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায়। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুসারে ঃ

১। ব্রিটশ শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি জনসংখ্যার অনুপাতে গণপরিষদে আসন পাবে। প্রত্যেক প্রদেশ থেকে প্রতি দশলক্ষ জনসংখ্যার জন্য একজন করে প্রনিধি গণপরিষদে স্থান পাবেন।

২। গণপরিষদের সব আসন সাধারণ, মুসলমান ও শিখ—এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টিত হবে।

৩। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বান করবেন।

৪। দেশীয় রাজ্যগুলির প্রনিধি মনোনয়নের পদ্ধতি স্থির হবে ঐ রাজ্যগুলির শাসনদের সঙ্গে গণপরিষদের আলোচনার ভিত্তিতে। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির হয় ৯৩।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবমত অবিভক্ত ভারেতের গণপরিষদের প্রতিনিধিসংখ্যা ছিল এইরকম ঃ

মোট সদস্য — ৩৮৯		
প্রদেশগুলির সদস্য—		
	(ক) সাধারণ	২১০
	(খ) মুসলিম	৭৮
	(গ) শিখ	৪
চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলির সদস্য		৪
দেশীয় রাজ্যগুলির সদস্য		৯৩

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে প্রদেশগুলির ২৯২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৮, মুসলিম লিক ৭৩ ও অন্যান্যদল ১১টি আসন পায়। চিফ কমিশনার শাসিত ৪টি

প্রদেশের মধ্যে ২টি প্রদেশের প্রতিনিইদর জন্য নির্বাচন হয়। দিল্লি ও আজমীর মাড়ওয়ার থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভার যে ২ জন প্রতিনিধি চিলেন তাঁরাই গণপরিষদের জন্য মনোনীত হন।

দেশবিভাগের পর স্বতন্ত্র ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যসংখ্যা সর্বমোট ২৯৯। এঁদের মধ্যে ২২৯ জন প্রদেশগুলি থেকে এবং ৭০ জন দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে গণপরিষদে স্থান পান। অবিভক্ত ভারতে গণপরিষদে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ছিল শতকরা ৬৯ জন। ভারত বিভাগের পর এই অনুপাত দাঁড়ায় শতকরা ৮২ জন। বারত বিভাগের পর মুসলিম লিগের ২৯ জন প্রতিনিধি এদেশে ছিলেন।

১.৭.২ গণপরিষদের নেতৃত্ব

গণপরিষদের সদস্য ও নেতৃবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিলেন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ (সভাপতি), জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটে, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, জগজীবন রম, জে. বি. কৃপালনী, পট্টভি সিতারামাইয়া, সি. রাজাগোপালচারী, মৌলানা আজাদের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এঁদের অধিকাংশই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও পদাধিকারী। গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে শুধু কংগ্রেসের প্রভাবশালী নতোরাই ছিলেন না, ছিলেন ড. বি. আর. আম্বেদকরের মতো আইনজ্ঞ ও হরিজন সদস্য, শাহদুল্লাহর মতো বিশিষ্ট মুসলমি নেতা, কে. আইয়ার, এন. জি. আয়েঙ্গার, এইচ. এন কুঞ্জরুর মতো অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ ও সংবিধান উপদেষ্টা এবং রাজকুমারী অমৃতা কাউর ও সরোজিনী নাইডু-র মতো মহিলা ব্যক্তিত্ব। রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, লেখক, আইনসভার সদস্য, শিল্পপতি, প্রশাসন, সমাজসেবী—নানা বিশিষ্ট পেশা ও বৃত্তির মানুষের ভীড়ে গণপরিষদ ছিল এক জমজমাট সভা। গণপরিষদের নেতৃত্বের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল কংগ্রেসের একাধিপত্য। এমনও দেকা গেছে কংগ্রেসের সরকারি দলের নেতা, কংগ্রেস দলের নেতা এবং গণপরিষদের নেতা—এই তিনের মধ্যে কোন প্রভেদরেখা নেই। একই ব্যক্তি কংগ্রেস দল, সরকার আর গণপরিষদের মধ্যমণি হিসাবে বিরাজ করছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাই গণপরিষদের অধিকাংশ ও গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতি। আবার একই ব্যক্তি একাধিক কমিটিরও সদস্য। গণপরিষদের নেতৃত্ব বিষয়ে আরেকটি কৌতুহলপ্রদ দিক হল বিশিষ্ট ইনজ্ঞরাই পরিষদের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মকে প্রভাবিত করেছেন। অভিজ্ঞা আইনজ্ঞরাই পরিষদের বিতর্ক, নীতিনির্ধারণ এবং সিদ্ধান্তগ্রহনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছেন। গণপরিষদের নেতৃত্ব প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, এখানে কোন কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী বা সাধারণ মানুষের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। প্রতিনিধিদের সামাজিক প্রেক্ষাপট বা ভিত্তি সম্পর্কে বলা যায়, ওঁরা অধিকাংশই সমাজের উচ্চবর্গের মানুষ, বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিল্প বা পুঁজির স্বার্থ বা রক্ষণশীল স্বার্থের প্রতিনিধি। নেতৃত্বের বিচারে গণপরিষদকে গণসংস্থা বলা যাবে না। গান্ধীজির মতো জননেতার গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ছিল।

১.৭.৩ গণপরিষদের অধিবেশন ও কর্মপদ্ধতি

গণপরিষদ গঠননের পর প্রায় চারমাস পরেও এর কোন অধিবেশন বসে নি। সম্ভবত কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মতো মতানৈক্যের কারণেই সভা বসতে বিলম্ব হয়েছে। ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর দিল্লির কনস্টিটিউশন হলে শেষ পর্যন্ত গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসল। ২০৭ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভা শুরু হল। মুসলিম লিগ সদস্যরা সভা বয়কট মরলেন। কংগ্রেসের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সচ্চিদানন্দ সিংহকে অস্থায়ী সভাপতি করেসবার কাজ শুরু হল। ১১ ডিসেম্বর ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১২ ডিসেম্বর কার্যবিধি সংক্রান্ত কমিটি (Committee of Rules of Procedure) গঠিত হল। প্রথম অধিবেশনে কমিটি গঠনরে কাজই হয়েছে, সংবিধান সম্পর্কে কোন বিতর্ক বা প্রসাতব ছিল না। অবিভক্ত ভারতে মোট চারটি অধিবেশনে গণপরিষদ বসেছে। এইসময় পরিষদের কাজে তেমন গতি ছিল না। গণপরিষদের পঞ্চম অধিবেশনই ছিল ঐতিহাসিক। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে এই অধিবেশনে স্বাধীন ভারতের গণপরিষদ বসে। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও ভারতের স্বাধীনতা আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের গণপরিষদ সার্বভৌমিক ক্ষমতা পায়। পঞ্চম অধিবেশন থেকেই গণপরিষদের প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস ও সংবিধান রচনায় উদ্যাগ লক্ষ্য করা যায়। সংবিধান খসড়া কমিটি ড. আম্বেদকরের নেতৃত্বে সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ২ সপ্তাহের বেশি চলে নি। কিছু প্রাথমিক কাজকর্ম ছাড়া অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এই অধিবেশনে ওঠেনি। এমনকি সংবিধানের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রসাতব (Objective Resolution) এই অধিবেশনে আলোচিত হয় নি। ১৯৪৭ সালে জানুয়ারি মাসের ২০-২৩ তারিখে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। এম. আর. জয়কার (M. R. Jaykar) প্রস্তাবটি পেশের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু নেহরুর দৃপ্ত ভাষণ শেষ পর্যন্ত সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেয়। নেহরুর বক্তব্য ছিল ‘পরিষদের প্রথম কাজ হল একটি নতুন সংবিধান এনে ভারতকে স্বাধীন করা, ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা এবং তারপর নিজের মতো করে প্রতিটি ভারতবাসীকে গড়ে উঠতে সাহায্য করা.....।’ দ্বিতীয় অধিবেশনে গণপরিষদ কমিটি গঠনের কাজেই ব্যস্ত ছিল। তৃতীয় অধিবেশনে অবষ্য ভবিষ্যৎ সংবিধানের একটি রূপরেকা উপস্থিত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন পেশ করা হয়েছে এবং ১৯৪৭ সালের ১০ এপ্রিসের মধ্যে এইসব প্রশ্নের উত্তর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য এবং গণপরিষদের সদস্যদের কাছে চাওয়া হয়েছে। দেশীয় রাজ্যের গণপরিষদে আসন বন্টনের প্রশ্নটিও এই পর্বে এসেছে। বিভিন্ন কমিটির বিরপোর্ট পেশ ছাড়া কোন আলোচনা এই পর্বে হয়নি। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে চতুর্থ অধিবেশনে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে গণপরিষদের কাজকর্মে মানসিকতা পরিবর্তনের প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সংবিধান কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও সভা ৩১ জুলাই মুলতুবি হয়ে যায়। সন্দেহ নেই অবিভক্ত গণপরিষদে নয়, ভারতয় গণপরিষদেই সংবিধান রচনার প্রকৃত তোড়জোড় শুরু হয়। স্বাধীন ভারতের প্রতি সেবা ও কর্তব্যের প্রতিজ্ঞা নিয়ে শুরু হয় পঞ্চম

ঐতিহাসিক অধিবেশন। মাউন্টব্যাটের পর্ভনর জেনারেল হিসাবে এবং নেহরুর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতের যাত্রা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আইনসভা ও সংবিধান সভা হিসাবে গণপরিষদের কাজ শুরু হয়। গণপরিষদের কাজ নিয়ে রিপোর্ট দেবার জন্য কমিটিও গঠিত হয়। ২৯ আগস্ট খসড়া সংবিধান কমিটি গঠন ও এর কাজকর্ম সম্পর্কে প্রস্তাব নেওয়া হয়।

১.৭.৪ গণপরিষদের কমিটি

গণপরিষদের কাজকর্ম প্রধানত পরিচালিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে। কনো সন্দেহ নেই ভারতের মতো এক বিরাট দেশে সংবিধান রচনার কাজ অত সহজে সম্পন্ন হবার নয়। সম্ভবত এই কারণেই সংবিধান খসড়া কমিটি সহ বিভিন্ন কমিটি গড়ে, কমিটির জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে সংবিধান রচনার কাজ শুরু হয়েছে। গণপরিষদের সচিবালয়ের (Secretariat) এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা চিল। তথ্য সংগ্রহ, নথিপত্র পেশ, নধিপত্র করীক্ষা, ফাইল তৈরি ইত্যাদি কাজে সচিবালয়ের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। কমিটিগলির মধ্যে বিভিন্ন কাজ বন্টন করে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সংবিধান রচনার কাজে আরও বিশেষীকরণ ও সূক্ষ্মতা আনা, কাজে সমন্বয় সৃষ্টি করা এবং কাজে আরও গতি আনা। গণপরিষদের কমিটিগুলির একটি সামগ্রিক পরিচিতি এখানে দেওয়া হল ঃ

কমিটি	সদস্যসংখ্যা	সভাপতি
কার্যবিধি সংক্রান্ত কমিটি (Committee on the Rules of Procedure)	১৬	ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ
পরিচালনা কমিটি (Steering Committee)	১৪	ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ
জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত অস্থায়ী কমিটি (Committee on National Flag)	১৩	ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ
অর্থ ও কর্মীবিষয়ক কমিটি (Finance and Staff Committee)	১৪	ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ
কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি (Union Constitution Committee)	১৫	জওহরলাল নেহরু
প্রদেশ কমিটি (States Committee)	৬	জওহরলাল নেহরু

কমিটি	সদস্যসংখ্যা	সভাপতি
কেন্দ্রয় সংবিধান কমিটির অর্থ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কমিটি* (Expert Committee on the Financial Provisions of the Union Constitution Committee)	৩	এন. আর. সরকার *
সুপ্রীম কোর্ট বিষয়ে অস্থায়ী কমিটি (Adhoc Committee on Supreme Court)	৭	এস. ভরদাচারি *
ভাষাতত্ত্ব প্রদেশ কমিশন * (Linguistic Provinces Committee)	৩	এম. কে. ধর *
পরিচয় সংক্রান্ত কমিটি (Credentials Committee)	৭	আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার
সভা কমিটি (House Committee)	১৭	বি. পট্টভী সিতারামাইয়া
চিফ কমিশনারের প্রদেশ সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Chief Commissioners' Provinces)	৭	বি. পট্টভী সিতারামাইয়া
কার্যক্রম নির্দেশ-বিষয়ক কমিটি (Order of the Business Committee)	৩	কে. এম. মুন্সী
গণপরিষদের কার্য-সংক্রান্ত কমিটি (Committee on the Functions of the Constituent Assembly)	৭	জি. ভি. মালালাঙ্কান
সংখ্যালঘু ও উপজাতির মৌলিক অধিকার এবং বহিরাগত অঞ্চল বিষয়ক পরামর্শদান কমিটি (Advisory Committee on Fundamental Rights of Minorities, Tribal and Excluded areas)	৭৯	বল্লভভাই প্যাটেল
প্রাদেশিক সংবিধান কমিটি (Provincial Constitution Committee)	২৫	বল্লভভাই প্যাটেল
সংবিধান খসড়া কমিটি (Drafting Committee)	৯	ডি. বি. আর. আম্বেদকর

উপসমিতিগুলির মধ্যে জে. বি. কৃপলনীর নেতৃত্বে মৌলিক অধিকর সংক্রান্ত কমিটি (১২), গোপীনাথ বলদোলুইয়ের নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, আসাম এবং বহিরাগত ও আংশিক বহিরাগত অঞ্চল কমিটি (৫)*, এ. ভি. ঠাকুরের নেতৃত্বে বহিরাগত ও আংশিক বহিরাগত (আসাম বাদে) অঞ্চল কমিটি, (৭) এবং এইচ. সি. মুখার্জীর নেতৃত্বে সংখ্যালঘু কমিটি (৩৫)* বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রসঙ্গত সংবিধানের খসড়া কমিটি (Drafting Committee) সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। ড. আম্বেদকরের নেতৃত্বে ওই কমিটির সদস্যরা চিলেন আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, কে. এম. মুন্সী, মহম্মদ শাহদুল্লা, বি. এল. মিটার ও ডি. পি. খৈতান। পরবর্তীকালে বি. এল. মিটারের স্থলাভিষিক্ত হল এন. মাধব রাও এবং প্রয়াত ডি. পি. খৈতানের শূন্যস্থান পূরণ করেন টি. টি. কৃষ্ণমাচারী। গণপরিষদের সিদ্ধান্তমত সংবিধানের খসড়া প্রস্তাব পরীক্ষা ও সংবিধানকে রূপদান করাই ছিল খসড়া কমিটির কাজ। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের কাজেও এর ভূমিকা ছিল।

১.৮. গণপরিষদের কার্যাবলী

গণপরিষদের গঠন ও কার্যপদ্ধতির উপর বিস্তৃত আলোচনার পর আসুন আমরা দেখি গণপরিষদের কাজ বা ভূমিকাটি কী! একটি আইনসভা যেভাবে কাজকর্ম করে বা কাজকর্মের যে পদ্ধতি অনুসরণ করে গণপরিষদে সেই সব পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি নির্বাচন দিয়ে শুরু কের, সবা পরিচালনার নিয়মনীতি, নির্ধারণ করে, বিভিন্ন কমিটি গঠনক রেএকটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গণপরিষদের কাজকর্ম চলেছে। গণপরিষদ প্রাথমিকভাবে তার কাজ শুরু করেছে আলোচনার বা বিতর্কের এক মঞ্চ হিসাবে। পরবর্তী সমসয় এই কাজটিই আইনসভার কাজ হিসাবে রূপ নেয়। এই অর্থে গণপরিষদ হল সংবিধান সভাঙ্গ ভারতের সবিধান রূপ লাভ করেছে গণপরিষদেরই উদ্যোগ ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের মূল্যে।

১.৮.১ আলোচনা বঞ্চ হিসাবে গণপরিষদ

আলোচনার ও বিতর্কের মঞ্চ (Public Forum) হিসাবে গণপরিষদের প্রধান ভূমিকা ছিল সংবিধান রচনার প্রশ্নে বির্তক করা এবং সংবিধান রচনার কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। গণপরিষদের ভিতরে ও বাইরে সংবিধান রচনার কাজ কিভাবে চলবে, এক্ষেত্রে কাদের নেতৃত্বে থাকবে, পরিষদের এক্তিয়ার কি হবে নানা প্রশ্নেই কংগ্রেস ও মুসলিম িগের মধ্যে আলোচনা ও দর কষাকষি চলেছে। অবিভক্ত ভারতে গণপরিষদের প্রথম চারটি অধিবেশনে সংবিধান রচনার প্রশ্ন ততটা গুরুত্ব পায়নি যতটা পেয়েছে গণপরিষদের কাজকর্ম পরিচালনা, বিভিন্ন স্তরে সমন্বয় ও ভারসাম্য রক্ষা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব বন্টন ইত্যাদি প্রশ্ন। বিভিন্ন কমিটি নির্বাচন করে, এই কমিটিগুলির হাতে বিভিন্ন সমস্যা বিচারের দায়িত্ব দিয়েই প্রাথমিকভাবে কাজ চলেছে

* তারকা চিহ্ন কমিটিগুলির সভাপতি বা সদস্যরা গণপরিষদের সদস্য নন। গণপরিষদের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে এঁরা মনোনীত হয়েছিলো।

গণপরিষদের। কার্যনির্বাহী কমিটি, পরিচয় সংক্রান্ত কমিটি, কর্ম নির্দেশক কমিটি ও কতকগুলি স্থায়ী কমিটি গঠন করেই প্রথম দিকে গণপরিষদ অগ্রসর হয়েছে। কমিটিগুলির প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সংবিধান রচনার প্রসঙ্গ গুরুত্ব পেয়েছে বারত বিভজনের পর ও ভারতের জন্য পৃথক গণপরিষদ সৃষ্টির পর। সংবিধান রচনার প্রস্তুতি কর্ম প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় ১৯৪৭ সালের পরবর্তীকালে পঞ্চম অধিবেশনের সময়।

প্রাথমিকভাবে জনমঞ্চ হিসাবে গণপরিষদ উদ্দেশ্যসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব (Objective Resolution) পেশ করে ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৬। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয় ২২ ডিসেম্বর ১৯৪৬। ১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারি ঘোষিত এ প্রস্তাবে বলা হয় ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র হিসাবে গড়ে উঠবে। এর পরিচালানার জন্য একটি সংবিধান থাকবে। ভারতীয় ইউনিয়ন গড়ে উঠবে দেশীয় রাজ্য, ব্রিটিশ শাসিদ প্রদেশ এবং অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে যারা এই স্বাধনী সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের অংশ হতে চায়। ভারত রাষ্ট্রের জনগণই হবে সব ক্ষমতার উৎস। এখানে সকলের সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হবে। সকলের জন্য ন্যায়, মর্যাদা, সুযোগ ও আইনের দৃষ্টিতে সমতা থাকবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলের স্বাধীনতা থাকবে। সংখ্যালঘুর স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। ভারতভূমির সম্মান অর্জনে এবং শান্তি ও মানবতার কল্যাণে দেশ সচেষ্ট হবে।

বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের সঙ্গে যেমন একটি প্রস্তাবনা (creamble) সংযুক্ত আছে, গণপরিষদের গৃহীত উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রসাতবটি সেইরূপ প্রস্তাবনার কাজ করেছে। নেহরু এই প্রস্তাবকে নিছক প্রস্তাব নয়, একটি ঘোষণা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সংকল্প, অঙ্গীকার, বলে বিবেচনা করেছেন। উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব গণপরিষদের সদস্যদের আদর্শ ভাবনা ও দর্শন প্রচার করেছে ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্রের লক্ষ্য, কর্মসূচী উদ্দেশ্যসংক্রান্ত প্রস্তাবে প্রতিফলিত হয়েছে। জনমঞ্চ হিসাবে গণপরিষদের কাজকর্মে ভারতীয় নেতৃবর্গের বিচিত্র ভাবনা সমন্বিত হয়েছে। এই ভাবনায় একদিকে যেমন অছে নেহেরুর গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ভাবনা ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদারবাদী ভাবনা, অন্যদিকে আছে প্যাটেলের রক্ষণশীল চিন্তা ও আম্বেদকরের নিপীড়িতের দর্শন। নেহরুর মানবিক প্রত্যয়ের সঙ্গে মিলেছে আজাদের অনুধাবন ও বিবেচনাবোধ। আইনি ও বাস্তবধর্মী চিন্তার সঙ্গে মধ্যপন্থার আদর্শ ও স্থান পেয়েছে গণপরিষদে।

১.৮.২ আইনসভা হিসাবে গণপরিষদ

ভারত বিভাজনের পর গণপরিষদ একটি আইনসভার মতোই ভূমিক পালন করতে থাকে। ডোমিনিয়ন ভারতের সংসদীয় শাসনে গণপরিষদ পরিচিত হল সার্বভৌম সভা হিসাবেঙ্গ নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হলেন গভর্নর জেনারেল, ভারত সচিবের পদ বিলুপ্ত হল। কেন্দ্রীয় আইনসভার বিলোপ ঘটল। সাময়িকবাবে গণপরিষদই হল আইনসভা। সংবিধান রচনার কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদ আইনসভার ভূমিকা পালন করবে। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন মেনেই এই সভা চলবে বলে ঠিক হল। দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভার (নেহরু মন্ত্রীসভা) পরামর্শ নিয়ে চলবেন গভর্নর জেনারেল (অনেকটা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতির মতো)। আইনসভা

হিসাবে গণপরিষদের কাছে মন্ত্রীসভা দায়িত্বশীল। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির ওপর আইনক্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হল গণপরিষদকে। আইনসভা হিসাবে গণপরিষদকে চালনা করার দায়িত্ব পেলেন জি. ডি. মাভলঙ্কার (G. V. Mavlankar)। তিনি হলেন কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসাবে গণপরিষদের প্রথম অধ্যক্ষ (Speaker)। আইনসবা হিসাবে গণপরিষদের দায়িত্ব পালনের জন্য গঠিত হল গণপরিষদের বিশেষ কমিটি (Committee of Functions of the Constituent Assembly)। ৭ সদস্যর এই কমিটির সভাপতি হলেন অথ্যক্ষ মাভলাঙ্কান। সাধারণ আইনবিষয়ক কার্য পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে গণপরিষদর সদস্যরা মিলিত হতে। এক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের শর্ত মেনেই চলত অঅইনসভা হিসাবে গণপরিষদের কাজ। ১৯৩৫ সালের বারতশাসন আইনজের বিধি ৯৯ (Section 99) অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা হিসাবে সভা সমস্ত ভারতে আইন প্রণয়নের দায়িত্বে থাকবে এবং প্রথম তালিকার (List I) অন্তর্ভুক্ত বিষয় সমবন্ধে আইন প্রণয়ন করবে। আইনসভা হিসাবে গণপরিষদ প্রাথমিকভাবে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনামত পরিষদে প্রদেশগুলির অন্তভুলক্তি ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে রাজ্য কমিটির মাধ্যমে আলোচনা করেছে। বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটি, কার্যনিবহী কমিটি, কার্যনির্দেশক কমিটিগুলি গণপরিষদে সক্রিয় ছিল।সাংবিধানিক প্রশ্ন থেকে প্রথম পর্যায়ে গণপরিষদে রাজনৈতিক প্রশ্ন বা দেশের ঐক্য নিয়েই বিতর্ক হয়েছে বেশি।

১.৮.৩ গণপরিষদে সংবিধান রচনার কাজ

বিতর্ক সভা, আইনি কার্যাবলীর মধ্যে গণপরিষদের কাজ সীমিত ছিল না। গণপরিষদের মূল ভূমিকা ছিল সংবিধান সভা হিসাবে সংবিধান রচনা করা। গণপরিষদ যখন সংবিধান সভা হিসাবে তার ভূমিকা পালন করেছে, তখন এর কার্য পরিচালনার নেতৃত্বে ছিলেন সভাপতি। স্বাধীনতার পূর্বে গণপরিষদের যে চারটি অধিবেশন বসেছে তারঅধিকাংশ সময় ব্যয় হয়েছে কমিটি গঠনে। কমিটিগুলির কাজকর্মও তেমনবাবে শুরু হতে পারেনি। তৃতীয় অধিবেশনের পূর্বে সাংবিধানিক উপদেষ্টা বি. এন: রাও ভবিষ্যৎ সংবিদানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভার সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ, বিচার বিভাগ, সংবিধান সংগঠন নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল এই প্রশ্নমালায়। গণপরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে (২৮ এপ্রিল, ১৯৪৭-এ শুরু এই অধিবেশন ৫ দিন চলেছিল) মৌলিক অধিকারের ওপর উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কমিটিও এই অধিবেশনে তার সুপারিশ পেশ করে। এই অধিবেশনে গণপরিষদ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংবিদান কমিটি গঠনক রা ও পরবর্তী অধিবেশনের আগে এই কমিটির সুপারিশ পেশ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি দ্বারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া অনুমোদ করে। তবে এ ব্যাপারে গণপরিষদের কাজ তেমন এগোয়নি।

গণপরিষদের পঞ্চম তথা ১৪ আগস্টের (১৯৪৭) অধিবেশনটিই ছিল ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মধ্যরাত্রে শুরু এই অধিবেশনেই গণপরিষদের সদস্যরা দেশের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত করার শপথ নিলেন। হেরু স্বাধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন। ইতিপূর্বে গণপরিষদ সার্বভৌম সভা হিসাবে ক্ষমতা পেয়েছে। ২৯ আগস্ট সংবিধান খসড়া কমিটি গঠিত হল। আম্বেদকারের নেতৃত্বে গঠি এই কমিটি সংবিধারেন খসড়া রচনার দায়িত্ব নিল। কমিটিকে সাংবিধানিক উপদেষ্টাদের রচিত সংবিধানের খসড়াপ্রস্তাব পরীক্ষা করে ও অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখে সভায় প্রস্তাবটি পেশ করার অনুমতি দেওয়া হল।

পরবর্তীকালের ইতিহাস সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে খসড়া কমিটির তৎপরতা ও গভীর অধ্যবসায়ের ইতিহাস। সংবিধানের পদ্ধতিগত নিয়ম স্থির করার জন্য কিছুটা সময় নেবার পর কমিটি আর তেকে থাকে নি। গণপরিষদের সচিবালয় তেকে খসড়া রচনার কাজ আগস্ট, ১৯৪৭ সালেই সম্পন্ন হলেও সাংবিধানিক উপদেষ্টারা খসড়াটিকে প্রস্তুত করলেন অেশাবর মাসে। ২৪৩টি অনুচ্ছেদ ও ১৩টি তফশীল সহ সংবিধান রচিত হল। ২৭ অেশাবর খসড়া কমিটি বসলো সংবিধান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খসড়া কমিটি সংবিধানের যে নতুন খসড়া উপস্থিত করলো তা আকালে আরো বৃহৎ হল। খসড়া কমিটি রচিত সংবিধানে ৩১৫টি অনুচ্ছেদ ও ৮টি তফশীল ছিল।

এর পর খসড়া সংবিধানটি প্রচার করা হল এবং এবিষয়ে গণপরিষদের সদস্য, বারত সরকারের মন্ত্রী, রাজ্য সরকার ও আইনসভার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও হাইকোর্টের কাছে সংবিদানের খসড়া সম্পর্কে মন্তব্য চাওয়া হল। মার্চ মাসের ২২ থেকে ২৪ সংবিদান খসড়াকমিটিতে এইসব মতামত ও মন্তব্য নিয়ে আলোচনা হল। এরপর বিষয়টি পাঠানো হল কেন্দ্রীয় সংবিদান কমিটি, কেন্ত্রীয় ক্ষমতা কমিটি ও রাজ্য সংবিধান সদস্যদের নিয়ে গঠিত এক বিশেষ কমিটির কাছে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ঐকযমতের জন্য। এপ্রিলের ১০ ও ১১ তারিখে বিশেষ কমিটিতে আলোচনা হল। ইতিমধ্যে পরামর্শ ও সংশোধন সহ নানা সুপারিশ মতামত সংগৃহীত হয়েছে। বিশেষ কমিটির সদস্য ও বিশেষজ্ঞের মূল্যবান মতামত সামনে রেখেই ১৯৪৮ সালের ১৮-২০ অেশাবর খসড়া কমিটি সংবিধানের একটি রূপরেখা তৈরী করে। ১৯৪৮ সালে প্রস্তুত খসড়া সংবিধানের সঙ্গে খসড়া কমিটির সদস্যদের প্রস্তাবিত সংশোধন সংযোজন করে সংবিধানের রূপরেখাটি গণপরিষদে পেশ করা হল। ১৯৪৮ সালের ৪ নভেম্বর। এর পর শুরু হল পণপরিষদে খসড়া সংবিদানকে আইনি রূপ দেবার উদ্যোগ।

প্রথম স্তরে প্রায় পাঁচদিন সংবিধানের নীতির ওপর গণপরিষদে আলোচনা চলেছে। নভেম্বরের ১৫ তারিখে শুরু হল দ্বিতীয় পাঠের (Second Reading) পর্যায়। ১৯৪৯ সালের ১৭ অেশাবর এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে। তবে এই পর্যায়ে জানুয়ারি ৮ থেকে মে ১৫, জুন ১৭ তেকে জুলাই ২০, সেপ্টম্বর ১৯ থেকে অেশাবর ৫—এই তিনটি বিরতি ছিল। দ্বিতীয় পাঠ পর্যায়ে ধরে ধরে, প্রতিটি ধারা ও উপধারার ক্ষপর আলোচনা চলেছে, বহু সংশোধনী (amendments) এসেছে, প্রতিটি ধারা বিচার-বিবেচনা করেই গ্রহণ করা হয়েছে।

বেশ কিছুদিন মুলতুবি থাকার পর গণপরিষদ আবার বসে। এই পর্যায়ে খসড়া কমিটি খসড়া সংবিধানের আরও কিছু পরিবর্তন এনে নভেম্বর মাসের ৩ তরাখি খসড়াটি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করে। ১৯৪৯ সালে ১৪ নভেম্বর খসড়া সংবিধানের ওপর তৃতীয় পাঠ (Third Reading) শুরু হয়। ইতিমধ্যে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ববঙ্গ (সিলেট সহ) এবং বালুচিস্তানের প্রতিনিধিরা ভারতীয় গণপরিষদ ত্যাগ করে পাকিস্তারেন গণপরিষদে যোগ দেন। ভারতীয় গণপষিদে অবশ্য হাদ্রাবাদের সদস্যরা ছাড়া অন্য রাজ্যের (রাজন্য শাসিত) প্রতিনিধিরা যোগ দেন। এই রাজ্যগুলির মধ্যে আনস বন্টনের কজও ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। তৃতীয় পাঠ পর্যায়ে খসড়া সংবিধানের ওপর আরও কিছু সংশোধনী আনা হয়। ১৪-১৬ নভেম্বর এই সংশোধনীগুলি গ্রহণ করা নিয়ে ভোটাভুটি হয়। ১৭ নভেম্বর খসড়া কমিটির সভাপতি খসড়া সংবিধান

গণপরিষদে গ্রহণ করার জন্য বলেন। ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত ওই প্রস্তাবের ওপর আলোচনার পর সংবিধান গ্রহণের জন্য ভোট হয়। এর পর গণপরিষদে উচ্চ কণ্ঠে সাধুবাদ ও জয়ধ্বনির মধ্যে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে সংবিধান গৃহীত হয়।

২৬ নভেম্বর থেকেই সংবিধান কার্যকর হয়েছে। সম্পূর্ণ সংবিধানটি অবশ্য কার্যকর হয়েছে ২৬ জরুয়ারি ১৯৫০ থেকে। তিন বছরের দীর্ঘ সময়কাল ধরে কাজ করে, ১১টি অধিবেশনে ১৬৫ দিন খরচ করে এবং ওর মধ্যে ১১৪ দিন খসড়া সংবিধানের ওপর আলোচনা কর, প্রায় ৭,৬৩৫টি সংশোধনী সহ (তার মধ্যে ২,৪৭৩টি শেস পর্যন্ত উত্থাপিত হয়) ৩৯৫টি ধারা ও ৮টি তপসিল যুক্ত করে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান রচিত হল। সংবিধান রচনার জন্য ব্যয় হয়েছে ৬৪ লক্ষ টাকার বেশী। খসড়া সংবিদান কমিটির সদস্যদের বিপুল উৎসাহ ও পরিশ্রম, সতর্কতা এবং বিচার-বিবেচনাকে মূলধন করে, সভাপতি আম্বেদকরের আইনী ব্যাখ্যা ও যুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেই পেশ হল ভারতীয় সংবিধান। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা আম্বেদকরকেই সম্মান জানালেন ভারতীয় সংবিধানের জনক (Father of the Indian Constitution) আখ্যা দিয়ে।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) প্রকাশিত হল সংবিধানের মূল বাণী। ভারতীয় জনগণের নামেই সংবিধান প্রচারিত হল। প্রতিজ্ঞা করা হল সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান প্রতিষ্ঠার। বহু পরে সংশোধনী এনে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র কথা দুটি যোগ করা হয়েচে। প্রস্তাবনায় এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী ও ন্যায়বিচারের নীতি।

মূল সংবিধানে নাগরিকতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, মৌলিক অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি, আইনসভা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ, নির্বাচন, রাষ্ট্রগঠন ও প্রদেশের অন্তর্ভুক্তি, সরকারি ভাষা, সংখ্যালঘুর অধিকার এবং আরও নানা বিষয় সংযোজিত হয়েছে। স্বাধীন দেশের সাবধীন সংবিদান রচনার মধ্য দিয়েই পূর্ণ স্বরাজের প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত পরিপূরণ হল।

সব শেষে গণপরিষদের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনার অবকাশ থেকেই যায়।

১.৯ গণপরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন

গণপরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেকেই অনেক প্রশ্ন তুলেছেন। (১) গণপরিষদ প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক সংস্থা ছিল না। পরোক্ষ নির্বাচন এর ভিত্তি। গণভোটের মাধ্যমে এই সংস্থার উদ্ভব ঘটেনি বা এর পেছনে জনসাধারণের কোন অনুমোদন ছিল না। (২) গণপরিষদ রচিত সংবিধানের কোন মতাদর্শগত স্পষ্টতা বা স্বচ্ছতা ছিল না। (৩) গণপরিষদের রচিত সংবিধানের মৌলিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংবিধানিক নীতির সামঞ্জস্য ঘটিয়ে এমন এক বিশাল সংবিধান সৃষ্টির পেছনে কোন মোনসিকতা কাজ করেছে—এ প্রশ্ন পরায় সব গবেষকই করে থাকেন। ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণ, রাজন্য স্বার্থ সংরক্ষণ করে জনস্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। ভারতশাসন আইনের (১৯৩৫) বাইরে অতিরিক্ত কিছুই সংবিধানে নেই। (৪) আইনজ্ঞ রচিত ভারতের সংবিধান আইনী জাল ও জটিলতা অতিক্রম করতে পারে নি। খসড়া সংবিধান

কমিটির সদস্যরা এতটাই নমনীয়তা দেখিয়েছেন যে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কোন লক্ষ্যে ওই সংবিধান গঠিত? নমনীয়তার ধারায় পরিচালিত সংবিধান খসড়া কমিটি (Drafting Committee) শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্যহীন এক কমিটি (Drifting Committee)। (৫) অনেক ক্ষেত্রে াম্বেদকরের নেতৃত্বে খসড়া কমিটিকে মনে হয়েছে আইনের এক শ্রেণীকক্ষ যেকনে ড. আম্বেদকর হলেন গুরুগম্ভীর শিক্ষক যিনি আশা করেন সবাই তাঁর অনুগত ও মনোযাগী ছাত্র। সংবিধানের বিশালত্ব, আইনী মারপ্যাঁচ, পদ্ধতিগত দুর্বলতা নিয়ে কোন প্রশ্নই এই শিক্ষকের পছন্দ নয়। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সৃষ্টিকর্তা গণপরিষদের উপর খসড়া কমিটির প্রভাব যেন অনেকটা সৃষ্ট জীবের সৃষ্টিকর্তার ওপর প্রভুত্বের মতো। গণপরিষদের গতিময় শক্তি হিসাবে নেহেরু, প্রসাদ বা প্যাটেলকে ভাবা হলেও, প্রবাব বা আধিপত্যের ক্ষেত্রে আম্বেদকর, কে. মে. মুন্সী, আয়েঙ্গার, আইয়ার ইত্যাদিরাই যেন গুরুত্ব পেয়েছেন বেশি। নেহরুর আবেগের চেয়ে আম্বেদকরের আইনী ব্যাখ্যা বা মতামতই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি।

তবে শুধুমাত্র সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা চিহ্নিত করে বা গণপরিষদের কাজকর্মে ধারণাগত ফাঁক বা বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই সমালোচকেরা তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। গণপরিষদ রচিত সংবিধানে প্রত্যাশিত জনপ্রতিনিধিত্ব ছিল না বা ঔপনিবেশিক প্রাপ্তির (colonial legacy) অধিক বা অতিরিক্ত কিছু সংবিধানে পাওয়া যায় নি একথা মেনে নিয়েও বলা যায় সংবিধান রচনার এমন বিরাট ব্যাপক এবং দুঃসাহসিক উদ্যোগ ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা যায়নি। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গণপরিষদ তথা খসড়া কমিটি বিশ্বের এক বৃহত্তম সংবিধান আমাদের উপহার দিয়েছে। গণপরিষদের কার্যবিবরীণীর দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে একটি অতি বৃহৎ দেশের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার জন্য কতটা গণতন্ত্রসম্মত অনুশীলন ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়েছে। যে সহিষ্ণু মনোবাব দিয়ে পরিষদের কার্যক্রম চলেছে, প্রতিটি প্রশ্নে বিতর্ক বা আলোচনার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যে ধৈর্য নিয়ে প্রতিটি সমালোচনাকে গ্রহণ করা হয়েছে—পৃথিবীর খুব কম দেশেই সংবিদান রচনার এমন প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। দ্রুততা ও হঠকারিতার পথে সংবিধান জনগরে ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগ গণপরিষদের কূট-সমালোচকও করবেন না। নেহরুর দূরদর্শিতা, আম্বেদকরের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান বা আইনজ্ঞগণের সংগঠিত আইনি ধারণা যে কোন দেশের সংবিধান রচয়িতার কাছে এক অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হতে পারে। গ্র্যানভিল অস্টিন (Granville Austin) বলেছেন, গণপরিষদের লক্ষ্য চিল সমাজ বিপ্লবের এক লক্ষ্যকে পূর্ণ করা। জোহারি বলেছেন, গণপরিষদ যে সংবিধান রচনা করেছে, তা জনসম্মতির ভিত্তিতে বিপ্লবের জয়কে সূচিত করেছে। গণপরিষদ রচিত সংবিদান জনগণের প্রতি কর্তব্যের এক অঙ্গীকার, জনকল্যাণের লক্ষ্যে এক সমাজ বিন্যাসকে রূপ দেবার ও সুরক্ষিত করার এক অসাধারণ নির্দেশিকা। সংবিদানের প্রস্তাবনায় সংবিধান যে জনগণের জন্যই নিবেদিত সেই বাণীই উচ্চারিত।

একথা সত্য কোন সংবিদানই চরম পূর্ণতা বা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না। গণপরিষদের রচিত ভারতের সংবিধানও এক্ষেত্রে ব্যতিক্র নয়। এম. ভি. পাইলি (M. V. Pylee) যথার্থই বলেছেন এটি একটি কার্যসাধনার দলিল (A workable document), আদর্শ ও বাস্তবতার সমন্বয় ঘটেছে এর মধ্যে (It is a

blend of idealism and realism)। এরকম একটি সংবিধানকে রূপ দিতে গণতন্ত্রসম্মত ভাবে যা করা প্রয়োজন, যে গভীর বিশ্লেষণ, যুক্তি-তর্ক, অনুসন্ধানী উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটানো দরকার, সেটাই ঘটেছে। ভারতের সংবিধান সনাতন বা প্রচলতি দেশীয় ভাবধারাকে যেমন গরহণ করেছে, তেমনি পরিবর্তনশীল বা গতিশীল সমাজের চাহিদা বা প্রয়োজনকেও সমানভাবে মূল্য দিয়েছে। উপসংহারে বলা যায় স্বাধীন ভারতের জন্য যে সংবিধান পাওয়া গেল তা একান্তভাবে তাৎপর্যপূর্ণ প্রথানত তিনটি কারণে ঃ (১) সার্বিক ঐক্যমদের (consensus) সুরে বাঁধার প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া ছিল সংবিধান রচনার উদ্যোগটি। সংবিধানকে ভারতীয় ঐক্যের একটি ঘোষণা (a charter of Indian unity) বললে অত্যুক্তি হয় না। (২) গণতন্ত্র ও মানবিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এক দৃঢ় প্রত্যয় উচ্চারিত হয়েছে ভারতীয় সংবিধানে। গণতান্ত্রিক ও মানবিক সংবিধানের পরিচয় পত্র (Indentity Card) হিসাবেই উত্থাপিত হচ্ছে সংবিধানের প্রস্তাবনা। (৩) সংবিধানের মর্যাদা এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্য নির্ধারিত হয় অবশ্যই এর প্রজাতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রে। ব্রিটিশ ভারতের সাংবিধানিক সংস্কার ও প্রস্তাবগুলি থেকে গণপরিষদ রচিত সংবিধান চরিত্রে ও লক্ষ্যে অবশ্যই স্বতন্ত্র। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং সরকারের তদারকি ও নির্দেশের অবসান হল। অস্থায়ী আইনসভা হিসাবে দায়িত্ব নিল গণপরিষদ। স্বাধীন ভারতের স্বাধী সরকারের দায়িত্বে জনগণের নামে নতুন সংবিধান নিয়ে এক স্বাধীন জাতির শুভযাত্রার সূচনা হল।

১.১০ সারাংশ

দেশ শাসন ও পরিচালনার এক উৎকৃষ্ট বিধিব্যবস্থা হল সংবিধান। বর্তমান এককের আলোচনা থেকে আপনারা জানলেন সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যেই স্বাধীনতার আগেই সৃষ্টি হয়েছে গণপরিষদ। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন মঞ্চে, গান্ধীজি, নেহরু ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবর্গের দাবিতে গণপরিষদ সৃষ্টির যে বীজ বপন করা হয়েছিল সেটাই অঙ্কুরিত হল ব্রিটিশ সরকার প্রস্তাবিত বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে। জাতীয় কংগ্রেসের স্বরাজ ভাবনা, হোমরুল আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে গান্ধীজির স্বরাজ ও বাধীনতার দাবি, সর্বদলীয় বৈঠকে সংবিধান কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত, মতিলাল নেহরু কমিটির ডোমিনিয়ন মর্যাদা দাবি, জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের দাবি, আগস্ট আন্দোলন, সুভাষের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান, ৪৫-৪৬ এর বৈপ্লবিক গণবিক্ষোভ, নৌ-বিদ্রোহ, মুসলিম লিগের লাহোর প্রস্তাব (পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি) সবকিছুর মধ্যেই ছিল গণপরিষদ সৃষ্টির বাস্তব উপাদান।

জাতীয় আন্দোলনের এই প্রবল পরিস্থিতি ও চাপের মুখে পড়েই ব্রিটিশ সরকার সাংবিধানিক সংস্কারের কিছু প্রস্তাব নেয়। ১৯০৯, ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের যে আভাস চিল, সাইমন কমিশন, বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকে প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা, সাংবিধানিক সংস্কার বিষয়ে শ্বেতপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে প্রসারিত করার প্রত্যাশা ব্রিটিশ সরকারের তরফে ভারতবাসীর কাছে পেশ হয়েছে মাত্র। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনেও স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব ছিল না; তবে এই আইন দায়িত্বশীল সাংবিধানিক শাসন ও সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে ভারতবাসীর মনে আশা জাগিয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের

তরফে গণপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রেও ভারতবাসীকে শাসনাধিকার দেবার প্রশ্নে ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব (১৯৪০), ওয়াভেল পরিকল্পনা (১৯৪৫), ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা (১৯৪৬) অবশ্যই গঠনমূলক প্রস্তাব। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় গণপরিষদ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব ছির্ল। এই প্রস্তাব মেনেই ভারতে গণপরিষদের নির্বাচন হয়েছে এবং গণপরিষদ গঠিত হয়েছে। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় (১৯৪৭) গণপরিষদ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবিভাজন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনাও কার্যকর হল এবং এই পরিকলকল্পনা মতই গণপরিষদেরও বিভাজন ঘটলো। ভারতের স্বাধীনতা আইনে (জুন, ১৯৪৭) ভারতবিভাজন, ক্ষমতা হস্তান্তর ও গণপরিষদের ধারণা আইনি রূপ পেল।

গণপরিষদ সম্পর্কে মুসলিম লিগের অবস্থান তেমন স্পষ্ট ছিল না। কংগ্রেস আধিপত্য মেনে গণপষিদে অংশ নেবার ইচ্ছা না থাকাতে শেষ পর্যন্ত মুসলিম লিগের নেতৃত্বে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাদের নিজস্ব গণপরিএষদ গঠিত হয়। গণপরিষদে অংশ নেবার ব্যাপারে দেশীয় রাজন্যবর্গের ওপর কনে চাপ না থাকলেও রাজন্যবর্গ তাদের পছন্দমত গণপরিষদকেই বেছে নিয়েছেন।

১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর অবিভক্ত ভারতের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। গণপরিষদের গঠনপদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এর বিশাল সদস্যসংখা। নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে অবিভক্ত ভারতে পরিষদের সদস্য ছিল ৩৮৯। দেশবিভাগের পর স্বতন্ত্র ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য দাঁড়াল ২৯৯। পরিষদের অন্যান্য গঠনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হল কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য, কমিটির মাধ্যমে সভার কাজ পরিচালানা এবং পরিষদীয় পদ্ধতি মেনে বৈঠক ও বিতর্ক পরিচালনা। আইনসভা হিসাবে পরিষদের কার্যপরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জি. ভি. মভলঙ্কর। গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রী ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটি, সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটি, সংখ্যালঘু বিষয়ক কমিটি, ড. কে. মে. মুন্সীর নেতৃত্বে কার্যনির্বাহ কমিটি, সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে প্রাদেশিক সংবিধান কমিটি, নেহরুর নেতঁত্বে কেন্দ্রী সংবিদান কমিটি, রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে কার্যবিধি সংক্রান্ত কমিটি ও পরিচালনা কমিটি এবং ড. বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে সংবিধান খসড়া কমিটি, বিভিন্ন অধিবেশনে (অবিভক্ত ভারতে চারটি অধিবেশন) মিলিত হয়ে গণপরিষদের কাজকর্ম চলত। গণপরিষদের অধিবেশনের মধ্যে ঐতিহাসকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পঞ্চম অধিবেশন (২৪ আগস্ট, ১৯৪৭ মধ্য রাত্রে এই অধিবেশন বসে) এবং এই অধিবেশনেই স্বীন ভারতের জনগণের নামে ও গংগ্রেস দলের নেতৃত্বে গণপরিষদরে পুনর্বিন্যাস হয় ও সংবিধান রচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই অধিবেশনেই সংবিধান খসড়া কমিটি গঠন করে এই কমিটির হাতে সবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হল। গণপরিষদের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে নানা বৃত্তি ও পেশার ও সম্প্রদায়ের মানুষ ওই সভার প্রতিনিধি হিসাবে হাজির ছিলেন।

গণপরিষদের কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিতর্কসভা হিসাবে নানা প্রশ্ন নিয়েও সমস্যা নিয়ে সদস্যরা আলোচনা করেন। উদ্দেশ্য ও আদর্শ সংক্রান্ত প্রস্তাবের মধ্যেই চিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্মসূচী। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে গণপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে এবং অস্থায়ী আইনসভা হিসাবে তার দায়িত্ব পালনৈ করে। তবে সংবিদান রচনাই ছিল গণপরিষদের মূল দায়িত্ব। নানা যত্ন ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে,

ব্যাখ্যা ও বিতর্কের নানা স্তর পেরিয়ে গণতন্ত্রসম্মত ভাবে দীর্ঘ সময় নিয়ে সংবিধান রচনার কাজ কলে। প্রস্তাব, অভিষিক্ত প্রসাত সংশোধন, সংযোজন করেই আইন বিশেষজ্ঞরা ভারতের সংবিধানকে রূপ দিয়েছেন। একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের সকল বৈশিষ্ট্যই ভারতের সংবিধানে ছিল।

১.১১ অনুশীলনী

১। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(ক) গণপরিষদ সৃষ্টির ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন।

(খ) জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন মঞ্চে গণপরিষদ স্পর্কে যে দাবি উঠেচিল সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

(গ) গণপরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে লিখুন।

(ঘ) সংক্ষেপে গণপরিষদ সম্পর্কে একটি টীকা রচনা করুন।

(ঙ) সংবিধান রচনার কাজে গণপরিষদের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) গণপরিষদ সৃষ্টির পেছনে ভারতীয় ভাবনা কী ছিল?

(খ) গণপরিষদ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোবাব ও নীতি ব্যাখ্যা করুন।

(গ) ওয়াভেল পরিকল্পনা ও ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় গণপরিষদ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

(ঘ) গণপরিষদের প্রশ্নে মুসলিম লিগের মনোভাব কী ছিল?

(ঙ) গণরিষদের গঠনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

৩। টীকা লিখুন ঃ

(ক) গণপরিষদের বিভিন্ন কমিটি।

(খ) সংবিধান খসড়া কমিটি।

(গ) গণপরিষদ ও দেশীয় রাজ্য।

(ঘ) আইনসভা হিসাবে গণপরিষদের কাজকর্ম।

(ঙ) গণপরিষদের নেতৃত্ব।

১.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১। Durga Das Basu, *Introduction to the Constitution of India* (1999).

২। Granville Austin, *The Indian Constitution Cornerstone of a Nation* (1985).

৩। J. C. Johri, *Indina Government and Politics,* Vol. I, 1996.

৪। D. N Sen, *From Raj to Swaraj* (1954).

৫। M. M. Singh, *From Raj to Republic : A Retrospect* (1972)

৬। R. C. Agarwal, *Indian Political System* (2002)

৭। M. V. Pylee, *India's Constitution* (2002)

৮। Bipan Chandra, Mridula Mukherjee and Aditya Mukherjee, *India After Independence* (1999).

একক ২ ❑ স্বাধীনত্তোর যুগের ইতিহাস : নেহেরু

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা ঃ ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে উত্তেজনার সূত্রগুলি

২.৩ প্রস্তাবনা

২.৪ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার

২.৫ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য

২.৬ সংহতির পথে ভারত ঃ রাজন্যশ)াসিত অঞ্চলগুলির অন্তর্ভুক্তি

২.৬.১ জুনাগড়

২.৬.২ কাশ্মীর

২.৬.৩ হায়দ্রাবাদ

২.৭ সংহতির পথে ভারত ঃ পণ্ডিচেরী ও গোয়া

২.৮ সংহতির পথে ভারত ঃ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি

২.৯ সংহতির পথে ভারত ঃ সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংকট

২.১০ সংহতির পথে ভারত ঃ উপজাতীয় নীতি ও উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ

২.১১ গণতন্ত্রের পথে ভারত

২.১১.১ গণতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে

২.১১.২ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি

২.১১.৩ নির্বাচনী পদ্ধতির সূচনা

২.১২ উপসংহার

২.১৩ অনুশীলনী

২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

স্বাধীনোত্তার ভারতের যে অধ্যায় পরিচালনার গুরুভার জওহরলাল নেহরুর ওপর অর্পিত হয়েছিল, তাকে আমরা দুটি পর্বে ভাগ কবরে পাঠ করব। প্রথম পর্ব, ১৯৪৭—১৯৫২ ছিল গঠনমূলক অধ্যায়—আত্ম অন্বেষণ ও পারস্পরিক মূল্যায়নের অধ্যায়। এই পর্বের আশু কর্তব্য ছিল, W. H. Morris-Jones-এর ভাষায়, সমস্ত সম্পদ অর্থাৎ (মানব সম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ) দৃঢ়ভাবে একত্রিত করা, অস্তিত্ব (রাষ্ট্রের) সুনিশ্চিত করা, (স্বাধীনতার) উন্মুক্ত সমুদ্রে (রাষ্ট্র) জাহাজকে ভাসমান রাখা। ("The task, is to hold things together, to ensure survival, to get accustomed to the feel of the open sea, to see to it that the vassels keep afloat.") অর্থাৎ, এই পর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্র-নায়কদের প্রধনা কর্তব্য ছিল সদ্যজাত রাষ্ট্রটির ঐক্য ও সংহতি সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রক্ষা করা। স্বাধীনতার এই পরীক্ষার কালে যে সমস্যাগুলি দেশের সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছিল সেগুলি হল— দেশীয় রাজন্যগুলির অন্তর্ভুক্তির সমস্যা, ভাষাভিত্তিক রাজ্য-পুনর্গঠনের দাবী, সরকারী ভাষা সংক্রান্ত সমস্যা ও উপজাতি জনসমূহের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। সবগুলি সমস্যার নিষ্পত্তি যে এই পর্বের মধ্যেই সম্ভব হয়েছিল তা নয়। কিন্তু এই পর্বে রাষ্ট্রনায়কদের সব থেকে বড় কৃতিত্ব ছিল সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও ঐক্য সুরক্ষিত করা। নেহরুর গুরুত্ব অনুযায়ী কর্তব্য নির্ধারণের নীতি এই কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্বে, অর্থাৎ ১৯৫২ পরবর্তী সময় ক্রিয়াশীলতার দ্বারা চিহ্নিত। এই পর্বে রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটি সুনির্দিষ্ট অবয়বপ্রাপ্ত হয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণ করে। এই সমসয় একাধারে পূর্বোক্ত সমস্যাগুলির যুক্তিগ্রাহ্য সমাধা হয়েছিল, এবং ভারতীয় রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২.২ ভূমিকা ঃ ভারতীয় সমান ও রাজনীতিতে উত্তেজনার সূত্রগুলি

ভারতবের্ষর ভাষাগত, ধর্মীয়, জাতিগত ও সাংস্কৃতি বৈত্রি প্রাবাদপ্রতিক। অনুরূপভাবে সহিংস সংঘাত ও বিরোধ ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতির চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে জাতিগত বা সংস্কৃতিগত বৈরিতা কিন্তু বৈচিত্র থেকে স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত হয়নি। সংঘাতের সূত্রগুলি

খুঁজতে হবে অন্যত্র। ১৯৭১-এর আদমসুমারী ৩৩টি ভাষা তালিকাভুক্ত করেছে, যার মধ্যে ১৫টি রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৮১-র আদমসুমারী শতাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত প্রায় এক কোটিরও অধিক উপজাতি জনসমূহের অস্তিত্ব নথিভুক্ত করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত উপজাতি জনগোষ্ঠীরগুলি বারবার রাজনৈতিক সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে, যার মধ্যে বেশ কিছু সহিংস বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে। এই আন্দোলনগুলি কখনো অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠী, কখনো সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকার, কখনো বা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে। চরিত্রগত দিক থেকে, উপজাতি জনসমূহ কখনো মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সমর্থনপুষ্ট হয়ে অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিবাদে শ্রেণী সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে, আবার কখনো উপজাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বে নিছক রাজনৈতিক দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ করেছে। অপরদিকে এমনও অনেক উপজাতি সম্প্রদায় আছে যারা অদৌ বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায়নি। জাতি ও জাতিগত বৈরিতাও ভারতীয় সমাজকে বহু অংশে খণ্ডিত করেছে। আবার, এক অঞ্চল থেকে অপর একটি অঞ্চলে অভিপ্রয়াণ, বিশেষ করে, অসমের মত স্বল্প জন-ঘনত্ব বিশিষ্ট আদিবাসীর এলাকায় অথবা দিল্লী, মুম্বাইয়ের মত মহানগরীতে স্থানান্তর অনেক ক্ষেত্রে অধিবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত করে।

ভারতীয় রাজনীতিতে জাতিগত ও সাংস্কৃতিগত আন্দোলনগুলির উৎস বিশ্লেষণ করতে গেলে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় যে ঔপনিবেশিক তথা উত্তর ঔপনিবেশিককালে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইংরেজ সরকার পূর্ব ভারতে অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছিল এবং উত্তর ভারতে হিন্দির বদলে উর্দুর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে তারা মুসলিম ও শিখদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন করেছিল এবং ধর্মের ভিত্তিতে অন্যান্য বিশেষ সুযোগ সুবিধাও প্রদান করেছিল। তৃতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের তাগিদে সরকার মধ্যভারতে সমতলভূমির বাসিন্দাদের আদিবাসী এলকায় প্রচরণ করতে উৎসাহ দিয়েছিল। কিন্তু একই স্বার্থের বশবর্তী হয়ে তারা পূর্বভারতে অনুরূপ স্থানান্তরে বাধা দিয়েছিল। উপরন্তু, দক্ষিণ ভারতে যেহেতু জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেহেতু ইংরেজ সরকার সেখানে ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলনে মদত দিয়েছিল।

স্বাধীনোত্তর যুগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বীকৃতির ভারসাম্য পরিবর্তন করতে প্রয়াসী হয়। উর্দর স্থলে হিন্দী ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা পায়। অসমে বাংলাভাষী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসমিয়া একমাত্র সরকারি ভাষার মর্যাদা পায়। মুসলিম ও শিখদের জন্য পৃথক নির্বাচনকেন্দ্র নীতিগতভাবে বর্জন করা হয় কিন্তু সংসদে, প্রশাসনে ও শিক্ষাকেন্দ্রে তফশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য াসন সংরক্ষিত করার নীতি গ্রহণ করা হয়। সমাজে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির প্রভাব বিপরীত ধর্মী। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বীকৃত গোষ্ঠীগুলি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ছত্রছায়ায় নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। অপরদিকে

অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি দুর্বলতর হয়ে পড়েছে। আবার ক্ষেত্রে বিশেষে মর্যাদা থেকে বঞ্চিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রতিশোধমূলক অন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। অস্বীকৃত কিন্তু ''পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়''গুলির তফশিলী জাতি ও উপজাতিদের প্রদত্ত সমান সুযোগ সুবিধার দাবিতে অসংখ্য আন্দোলন এই পর্যায়ভুক্ত।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অনুসৃত নীতি ও রাজনৈতিক কৌশল জাতিগত ও সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্বে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নেহরুর যুগে প্রধান ভাষা ও সংস্কৃতিগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বহুত্ববাদী নীতি (Pluralist Policy) অনুসরণ করে প্রধান ভাষা গোষ্ঠীগুলির ভাষাভিত্তিক রাজ্যের দাবিকে মর্যাদা দিয়েছিল। একই সঙ্গে কিন্তু আঞ্চলিক স্তরে জাতপাত বা ভাষাভাষীর দ্বন্দেব কেন্দ্রীয় সরকার সচেতনভাবে উভয় পক্ষ থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখেছিল। আবার রাজ্যগুলি যখন ভাষাগত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে, তখনও কেন্দ্র হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে।

ভারতীয় সমাজে টানা পোড়েনের অপর একটি উৎস বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর প্রগতির অসম হার। এর ফলে চাকুরি, শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। অধিবাসী ও বহিরাগতদের মধ্যে কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র তৃতীয় বিশ্বে জাতি দাঙ্গার আকার ধারণ করেছে।

২.৩ প্রস্তাবনা

রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস সময় ও দেশ বিশেষে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। কোথাও দীর্ঘ সময় ধরে এই সম্পর্ক বিবর্তিত হয়, আবার কোথাও কোন বড় মাপের বৈপ্লবিক পরিবর্তন রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে দেয়। দ্বিতীয় পরিস্থিতি, অর্থাৎ, সরকার পরিবর্তন তিনভাবে উদ্ভূত হতে পারে— অভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থান, বৈদেশিক শাসন স্থাপন অথবা তার অবসান। আধুনিক ভারত রাষ্ট্র তৃতীয় শ্রেণীর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এরূপ রাষ্ট্রের উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মুখ্য। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ক্ষমতার হস্তান্তর ভারতবাসীর ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের অবসান ঘটিয়ে সদ্যজাত রাষ্ট্রটির আথ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতির সূচনা করে। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ (যাঁরা স্বাধী ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছিলেন) জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যার লক্ষ্য হবে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার, অর্থাৎ সেই সমস্ত আদর্শ বা লক্ষ্য যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা হিসাবে তাঁরা তুলে ধরেছিলেন। কাজটি কিন্তু আদৌ সহজ ছিল না। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব অচিরেই স্বাধীনতার উদ্দীপনাকে

ম্লান করে দিয়েছিল। ১৪ই আগস্ট প্রদত্ত একটি ভাষণে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, “যে কীর্তি আজ আমরা উদ্‌যাপন করছি তা একটি পদক্ষেপমাত্র, বৃহত্তর সাফল্য ও কৃতিত্ব অর্জনের চাবিকাঠি......আগামী দিগুলি স্বস্তির বা আরামের নয় বরং বিরামহীন পরিশ্রমের যাতে আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করতে পারি।” (“The Achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity, to the greater triumph and achievements........That future is not one of ease and resting but of incessant striving so that we may fulfil the pledges we have so often taken.') স্বাধীন ভারতে তাৎক্ষণিক সমাধানের দাবী করেছিল রাজ্যনশাসিত অঞ্চলগুলির সংহতির সমস্য, দেশব্যাপী সাম্প্রদায়কি দাঙ্গা, ৬০ লক্ষ পাকিস্তানী উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ও তেলেঙ্গানার কমিউনিষ্ট আন্দোলন। ঘটনাবলীর আকস্মিক সমাবেশের ফলে নতুন রাষ্ট্রের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ বর্তায় জওহরলাল নেহরু পরিচালিত একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর হাতে যাদের প্রাথমিক কর্তব্যই ছিল দৃঢ়ভাবে আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক স্থিতবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। মাঝারি মাপের সমস্যাগুলি ছিল সংবিধান প্রস্তুত করা, প্রতিনিইদত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কেন্দ্রে ও রাষ্ট্রগুলিতে প্রতিনিধিত্বমূলক ও দায়িত্বশীল সরকার স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা, এবং সামগ্রিক ভূমি সংস্কারের বাধ্যমে আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার অবসান ঘটান। দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাগুলি ছিল জাতীয় সংহতি সাধন, জাতি গঠন, দ্রুতলয়ে অর্থনৈকি উন্নয়ন সাধন, দেশব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণ, এবং যোজনা পদ্ধতির রূপায়ণ। পাহাড় প্রমাণ সমস্যার মধ্যে দিয়ে জাতি গঠনের পথে স্বাধীন ভারত যখন তার যাত্রা শুরু করেছিল, তার পুঁজি ছিল জওহরলাল নেহরুর যোগ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি একদিকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সি. রাজাগোপালাচারীর মত তীক্ষ্ণধী নেতৃবৃন্দ, এবং অপরদিকে রাজ্যস্তরে উত্তরপ্রদেশের গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, পশ্চিম বাংলার ড. বিধানচন্দ্র রায়, বোম্বের বি. জি. খের ও মোরারজী দেশাই-এর মাপের রাজনীতিবিদ, আধুনিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিচালনায় যাঁদের যোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি ছিলেন সমাজবাদী মতাদর্শী আচার্য নরেন্দ্র দেব ও জয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং দলিত নেতা ড. বি আর আম্বেদকর। রাষ্ট্রের দু'টি মুখ্য উদ্দশ্য ছিল ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন এবং সমাজের মৌলিক পরিবর্তন। ১৯৪৭-এর ভারত রাষ্ট্র ছিল দু'টি পরস্পর বিরোধী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক; ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঐতিহ্য।

২.৪ ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার

একাধিক দিক থেকে স্বাধীন ভারতের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উত্তরলব্ধি। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সরকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনমানসে সচেতনতা। এই সচেতনতার অভাবই

সাধাররত নতুন রাষ্ট্রগুলির সামনে সব থেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ ভারত হয়ত ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল না। কারণ সংখ্যাগত দিক থেকে সরকার ছিল ক্ষুদ্র এবং সব থেকে বিবেকবান জেলাশাকও সম্ভবত তাঁর এলাকাভুক্ত কিছু গ্রা অপরিদর্শিত রেখে দিতেন সময়ের অভাবে। কিন্তু প্রতিটি গ্রামেই মোড়ল ও পাটোয়ারস্থানীয় লোকেরা গ্রামীণ স্তরে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেনঙ্গ সরকারের অস্তিত্ব ছিল সুদূর, তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব গ্রামীণ মানুষের কাছে ছিল বিস্ময়জনক এবং তার সর্বময় অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা ছিল অতিমাত্রায় সচেতন। তাদের চোখে সরকারের ভূমিকা ছিল বৈপরীত্যে ভরা—সে একাধারে দাতা ও গ্রহীতা, রক্ষক ও ভক্ষক (কর-গ্রংগ্রাহক)। সবথেকে লক্ষ্যনীয় বিষয় ছিল এই যে সরকার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনোভাব ছিল শ্রদ্ধাসূচক এবং শক্তিশালী সরকারের অস্তিত্ব তাদের কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল। এই সচেতনতা সেয শুধুমাত্র গ্রামের অশিক্ষিত কৃষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, শহুরে জনতার কাছে সরকার ছিল অনেক বেশি বাস্তব, অনেক বেশি দৃশ্যমান অস্তিত্ব, অতএব অনেক বেশি সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু সরকারের গুরুত্ব সম্বন্ধে তারাও ছিল সমধিক সচেতন। শহুরে বুদ্ধিজীবীদের চোখে সরকার ছিল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার দিকে তাঁরা তাকিয়ে থাকতেন তাঁদের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক প্রত্যাশা পূরণের জন্য। শাসনতন্ত্রের এই গ্রহণযোগ্যতা থেকেই একটি নূতন রাষ্ট্র তার জয়যাত্রা শুরু করতে পারে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনেতারা ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুধু যে শাসনতন্ত্রের গহণযোগ্য মানসিকতাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তাই নয়, আরো সুনিদিষ্টরূপে পেয়েছিলেন প্রশাসন যন্ত্র ও উপকরণসমূহ। এই উপকরণগুলি ছিল প্রথমত, সাংগঠনিক, কাঠামো ও পদ্ধতিগত, এবং দ্বিতীয়ত, কর্মী বিষয়ক।

আধুনিক ভারতে সংবিধানকে যদি সুস্টষ্ট ঐকিক লক্ষণযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বলে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে ১৯৪৭-এ ঔপনিবেশিক ুগের উত্তরাধিকারস্বরূপ যে সংবিধান সে লাভ করেছিল তা ছিল গুরুত্বপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রয় বৈশিষ্ট্য সমন্বিত ঐকিক ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের মত যুক্তরাষ্ট্রীয়, ব্যবস্থাও ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে। ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন অতি সামান্য পরিমানে হলেও জনপ্রতিনিধিত্ব পীতি প্রবর্তন করেছিল। ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার ও ভারতীয় পরিষদ আইন এবং ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেম্‌সফোর্ড রিপোট ও ভারত শাসন আইন এই প্রবণতাকে আরো অগ্রসর করেছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রতিনিধিত্বমূলক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার এই বিবর্তনের উপান্ত এবং ১৯৫০-এর স্বাধীন ভারতের সংবিধান এই ধারায় চূড়ান্ত পরিণতি। উল্লিখিত প্রতিটি সাংবিধানিক সংস্কারই কেন্দ্রীয় এবং আইন পরিষদে এবং নির্বাহিক পরিষদে ভারতীয়দের বৃহত্তর অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছিল এবং জনসংখ্যার ক্রমবর্থমান অংশকে ভোটাধিকার অর্পণ করেছিল।

ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্তা ছিল জেলাকেন্দ্রিক। একাধিক জেলার সমন্বয়ে গড়ে উঠত একটি প্রশাসনিক বিভাগ, এবং একাধিক প্রশাসনিক বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত হত একটি প্রদেশ। আবার, প্রতিটি জেলাই একাধিক

উপবিভাগে বিভক্ত হত, এবং উপবিভাগগুলির ক্ষুদ্রতর একক ছিল তেহসিল বা তালুক যা আবার একাধিক গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত। নিজস্ব পৌর প্রশাসন আছে এমন বড় শহর ব্যতীত সব্র দেশেই এই কাঠামোর ভিত্তিতে গ্রশাসন গড়ে উঠেছিল। স্বাধীন ভারত এই জেলাভিত্তিক শাসন কাঠামো গ্রহ করেছিল। এ হেন প্রশাসনের তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, বিভাগীড মহাধ্যক্ষ, সমাহর্তা অথবা জেলা-প্রশাসক অথবা উপ-মহাধ্যক্ষ, উপবিভাগীয় আধিকারিক। তেহসিলদার বা মমলতদার জাতীয় থানীয় সার্বিক কতৃত্ব ও দায়িত্বসম্পন্ন একজন পদাধিকারী আমলার উপস্থিতি এবং পাশাপাশি জেলা আবক্ষাধ্যক বা মুখ্য যন্ত্রবিদের মত একজন বিশেষজ্ঞ আধিকারিকের উপস্থিতি যিনি প্রাদেশিক স্তরে সরকারের উপযুক্ত বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন। সরকারের অগ্রগণ্য কর্তব্য ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি এবং প্রশাসনের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব সংগ্র। এর সঙ্গে খনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল বিচার-বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে কতলব্যের দৃঢ় পৃথকীকরণের অভাব। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার একটা প্রবণতা ছিল একই আধিকারিকের মধ্যে দুই ধরনের ক্ষমতার কিয়দংশে সমাবেশ ঘটানো। সুতরাং জেলাশাসক ছিলেন একাধারে সমাহর্তা, বিচারক এবং প্রশাসন। কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের পাশাপাশি লর্ড রিপনের সংস্কারকামীতা এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১৮৮২-র পর থেকে জেলাও তন্নিম্নস্তরের বেসরকারী সদস্যদের একটি পরিষদ সৃষ্টি করেছিল যার সদস্যরা প্রথমে মনোনীত এবং পরবর্তীকালে নির্বাচিত হতেন। সুতরাং দেকা যায় যে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা চিল পদমর্যাদা অনুযায়ী নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে স্তর সমন্বিত একটি সংগঠন। উত্তরাধিকারস্বরূপ স্বাধীন ভারত এই জেলাভিত্তিক শাসন কাঠামো লাভ করেছিল কিন্তু এই সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি জেলাগুলিকে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিরও একক হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

ইংরেজ সরকারের কর্মীবৃন্দের প্রতি নজর দিলে দেখা যাবে যে সব থেকে মৌলিক, অগ্রগণ্য ও উৎকৃষ্ট পদ ছিল ভারতীয় (অসামরিক) প্রশাসনিক কৃত্যক (Indian Civil Service)। যে দেশে সরকারী চাকরির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে যথাযোগ্য সম্মান, সেখানে সর্বোচ্চ বিভাগের সদস্যপদ মানুকে সমাজের উচ্চতম স্তরে উন্নীত করত। এই পদ ছিল প্রশাসনিক ক্ষমতার একচেটিয়া আধার। আমলাদের এই স্তর থেকে শুধুমাত্র জেলা, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় স্তরের শীর্ষস্থানীয় আধিকারকরাই মনোনীত হতেন না, অধিকাংশ প্রাদেশিক শাসনকর্তা, প্রাদেশিক নির্বাহিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ, বড়লাটের নির্বাহিক পরিষদের অধিকাং সদস্য এবং ভারত সচিবের ভারত পরিষদের কিছু সদস্যও কৃত্যক পদ থেকে মনোনীত হতেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এই শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক পদে নিযুক্তি হত। এই পদের ভারতীয় সদস্যদের, যাঁদের বলা হত ব্রিটিশ রাজের ''ইস্পাত কাঠামো'' স্বাধীনতা উত্তর কালেও বজায় রাখা হয়েছিল এবং এরই আদলে প্রচলিত হয়েছিল ভারতীয় জনপালন কৃত্যক (Indian Administrative Service) নামক একটি নূতন পদ। দলের অভ্যন্তরে নেহরু যতই নীতিগত বিরোধে কোণ ঠাসা হয়ে পড়তে থাকলেন, ততই তিনি এই শ্রেণীর আমলাদের উপর

নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। এই নির্ভরশীলতা সদামঙ্গলময় ছিল না কারণ আমলাতন্ত্রে ভারতীয়করণ ঘটলেও, দায়িত্বজ্ঞান ও সংবেদনশীলতার অভাব ব্রিটিশ আমলের মতই স্বাধীন ভারতের আমলাদেরও বৈশিষ্ট্য ছিল।

স্বাধীন ভারতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন ব্রিটিশ আইন ব্যবস্থার অবিচ্ছিন্ন ধারা। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে স্বাধীন ভারত আরও লাভ করেছিল রাজনৈতিক দিক থেকে নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী একটি সামরিক সংগঠন। নীতিগতভাবে ইংরেজ শাসনকরা এমন এক সামরিক সংগঠনের পক্ষপাতী ছিলেন যা চূড়ান্তভাবে পেশাদারী, রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রানাধীন। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র নেতারা এই ঐতিহ্য সাদরে গ্রহণ করেছিলেন ও লালন করেছিলেন। ঠিক এই কারণেই, প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের মত ভারতবর্ষে সামরিক শাসন কোনদিন গণতন্ত্রকে অবদমিত করতে পারেনি।

জেলাভিত্তিক সর্বভারতীয় শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র, সর্বভারতীয় প্রশাসনিক কৃতযক (Indian Civil Service) এবং সর্বভারতীয় আইন ব্যবস্থার মাধ্যমে ইংরেজ শাসন একদিকে যেমন ভারতবর্ষের ঐক্য সাধন করেছিল এবং সর্বভারতীয় চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল, অপরদিকে তারাই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। আধুনিক ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা অনেকাংশে সাম্রাজ্যবী ভেদনীতির বিষফল; সব শ্রেণীর ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সম্ভবনায় ভীত সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা শুধু সাম্প্রদায়িক সমস্যাতেই ইন্ধন দেয়নি, বর্ণহিন্তু ও নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের সংঘাতে প্রেরণা যুগিয়েছে এবং জাতীয়তাবাদী আদর্শের বিরুদ্ধে রাজন্যবর্গকে সমর্থন করেছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই হস্তান্তরিত হয়েছিল এই দ্বিধাবিভক্ত সমাজ।

২.৫ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য

স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ তার অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো যদি প্রাক্ ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগ থেকে গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সে তার নিজস্ব স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে গ্রহণ করেছিল সেই সমস্ত মূল্যবোধ, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী যা ছিল জাতি গঠনের প্রয়াে তার মূল প্রেরণা। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীন ভারতের উনয়ন ছিল নেহরুর ভাষায় ‘‘এক ধারাবাহিক বিপ্লব’’ যার দুই অধ্যায়ের যুগসূত্র ছিল এই আদর্শগুলি। শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদীরা বুঝেছিলেন যে জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় ভারত নবাগত। তাঁদের ভাষায় ভারত তখনও ছিল একটি ‘‘উদীয়মান জাতি’’। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাঁরা এই প্রক্রিয়াকে পূর্ণতা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। অতএব প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সর্বভারতীয় চেতনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

সাম্প্রদায়কি ভিত্তিতে দেশের বিভাজন জাতীয়তাবাদী নেতলবৃন্দ অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু অন্তর থেকে গ্রহণ করেননি। অতএব স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ ধ্যান ধারণা ও লক্ষ্যগুলির মধ্যে অগ্রাধিকার পেয়েছিল জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য নেহরু ও তাঁর সমসাময়িক নেতারা সর্বপ্রকার জাতপাতগত, ধর্মীয়, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেছিলেন; যে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে অবৈধ বলে গণ্য করা এবং প্রয়োজন বলপ্রয়োগে দমন করা; ধর্মের ভিত্তিতে কোন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দাবীকে স্বীকৃতি দান তেকে বিরত থাকা।

ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্বের ইতিহাসে সম্ভবত বৃহত্তম গণ আন্দোলনের নজির। গান্ধীজীর দেতৃত্বে এই আন্দোলন সত্যাগ্রহ নীতি অবলম্বন করেছিল, যার দ্বৈত স্তম্ভ ছিল জনগণের একাংশের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিষ্ক্রিয় অংশের সহানুভূতি ও সমর্থন। এই অহিংস বিপ্লবে জনগণের অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতাই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তথা সার্বভৌম ভারতীয় গণরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাদের জনসাধারনের রাজনৈতিক চেতনার ওপর আস্থা রাখতে সাহায্য করেছিল এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদানে উৎসাহ দিয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং জনসাধারনের নাগরিক অধিকার ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। গোড়া থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রয়াসী ছিল এবং সর্বজনীন নির্বাচনের ভিত্তিতে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রবর্তনের জন্য সংগ্রাম করেছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে জাতীয়তাবাদীরা সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোধিকারের দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের মূল সংগঠন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, জন্মলগ্ন থেকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত। প্রতিটি স্তরেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর। দলের অভ্যন্তরে বিরোধী মতাবলম্বীদের মত প্রকাশের পূর্ন স্বাধীনতা ছিল। বাস্তবে তর্ক-বিতর্ক কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। গরতান্ত্রিক-কর্মপদ্ধতি কিন্তু শুধুমাত্রই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন যথা, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন ও কিযানসভা, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও নারী সংগঠনগুলিও একই কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতারা নাগরিক অধিকারসমূহের প্রতি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বস্ত ছিলেন। লোকমান্য তিলক একদা দাবী করেছিলেন, "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাক্-স্বাধীনতা একটি জাতিকে সৃষ্টি করে ও তাকে পুষ্ট করে।" ১৯২২-এ গান্ধীজী ও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৩৯-এ তিনি বলেন, "অহিংসার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাগরিক স্বাধীনতা স্বরাজের প্রথম পদক্ষেপ।" ১৯৩৬-এ নেহরু লিখেছিলেন, "নাগরিক স্বাধীনতা অবদমিত হলে একটি জাতি তার প্রাণবত্তা হারায় এবং বলিষ্ঠ কোন ভূমিকা পালনে

হয়ে পড়ে।" নাগরিক অধিকারসমূহের সুরক্ষা শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠী বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত দিক থেকে বিরোধী গোষ্ঠীগুলিও একে অপরের নাগরিক অধিকারকে সমর্থন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গোপালকৃষ্ণ গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নরমপন্থী নেতারা তিলকের মত চরমপন্থী মতাদর্শী নেতার বাক্-স্বাধীনতার অধিকারের দাবীকে সমর্থন করেছিলেন। আবার, অহিংসায় বিশ্বাসী কংগ্রেস নেতারা লাহোরে বিচারাধীন ভগৎ সিং সহ অন্যান্য বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন কমিউনিস্টদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৯২৮ সালে ইংরেজ সরকার যখন বামপন্থী ও শ্রমিক আন্দোলনগুলি দমন করার অভিপ্রায়ে 'জন নিরাপত্তা আইন' ও 'শিল্প বিরোধ আইন' প্রণয়ন করেছিল, তখন কেন্দ্রীয় আইনসভায় শুধু মতিলাল নেহরুই এই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করেননি, মদনমোহন মালব্য এবং এম, আর জয়াকরের মত রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ এবং ঘনশ্যামদাস বিড়লা, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের মত পুঁজিবাদী মুখপাত্রও সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে গঠিত কংগ্রেস মন্ত্রীসভা বিদ্রোহী কৃষক শ্রমিক, ছাত্র এমনকি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির মত প্রগতিশীল ও চরমপন্থী গোষ্ঠী ও দলকেও নাগরিক স্বাধীনতা প্রদান করতে দ্বিধা করেনি। সুতরাং বলা যায় যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক কাঠামোর বিকল্প একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারের প্রতি বিশ্বস্ত এই বিকল্প ব্যবস্থার সারমর্ম ছিল মতানৈক্যের প্রতি যথার্থ সম্মান, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তর্ক-বিতর্কের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মতানুযায়ী কর্ম সম্পাদন এবং সংখ্যালঘু মতের অস্তিত্ব ও বিকাশের অধিকার।

স্বাধীন ভারত তার ধর্মনিরপেক্ষতার পাঠও গ্রহণ করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে। জওহরলাল নেহরুই সম্ভবত প্রথম ভারতীয় যিনি সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ফ্যাসিবাদের ভারতীয় সংস্করণ দেখেছিলেন। যদিও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কোন উপযুক্ত রণনীতি অবলম্বন করতে পারেনি, তবুও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি তার দায়বদ্ধতা ছিল প্রশ্নাতীত। ধর্মনিরপেক্ষতার সর্বসম্মত বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিম্নরূপ : রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিধি থেকে ধর্মের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ, সমস্ত ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা অথবা সমান সম্মান প্রদর্শন, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের প্রতি ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণের অনুপস্থিতি, এবং সাম্প্রদায়িকতার সক্রিয় বিরোধিতা।

একটি গণ-আন্দোলনে জনগণের বৃহত্তর অংশকে উদ্বুদ্ধ করতে আদর্শের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার সংগ্রামের স্বার্থেই বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শকে নিয়ে চলতে হয়। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের পথ সযত্নে এড়িয়ে আন্দোলনকে হতে হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, মূলত যার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল, এই সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। বৃহত্তর লক্ষ্যে উন্নীত

অযোগ্য হবার স্বার্থে বিভিন্ন মতাদর্শের সহাবস্থান তাকে স্বীকার করতে হয়েছিল। সহাবস্থান ও সহনশীলতার এই ঐতিহ্য স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনেতারা সাদরে লালন করেছিলেন।

স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্য সংবিধান পরিষদে জাতীয়তাবাদীরা ''শক্তিশালী কেন্দ্র'' ও ''শক্তিশালী রাষ্ট্রের'' প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। রাষ্ট্রকে তাঁরা দেখিছিলেন বিশ্বের দরবারে ভারতের স্বাধীন, সার্বভৌম অস্তিত্বের মুখপাত্রস্বরূপ। রাষ্ট্র বহির্শক্রু ও আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে দেশের ক্যৈ সুরক্ষিত করবে, সমাজে শৃঙ্খলা ও অঅইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, এবং কেনদ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে শতাব্দীর অনগ্রসরতা থেকে তাকে মুক্তি দেবে।

২.৬ সংহতির পথে ভারত ঃ রাজন্যশাসিত অঞ্চলগুলির অন্তর্ভুক্তি

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে নেহরু আমলের প্রথম পর্বে রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা, যার প্রথম পদক্ষেপ ছিল আঞ্চলিক পুনর্গঠন। দু'টি ধাপে আঞ্চলিক পুনর্গঠন সাধিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সামনে প্রথম সমস্যা ছিল একটি অভিন্ন সর্ববারতীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় রাজন্য-শাসতি রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

ঔপনিবেশিক যুগে দেশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত ৫৬২টি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্যে ভারতের ৪০% ভূখণ্ড অধিকার করেছিল। ব্রিটিশ সর্বময় কর্তৃত্বের অধীনে এই রাজ্যগুলি বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাধীনতা উপভোগ করত। ১৮৫৮ সালে যখন সমগ্র ভারতীয় ভুখণ্ডে ব্রিটিশ সম্রাটের অধিরাজত্ব কায়েম হয়, তখন সম্রাট ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা 'সর্বময় কর্তৃত্ব' বা 'পরমোক্ষতা' নামে অভিহিত হয়। সম্রাট অনেকরকম চুক্তিতে দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে আবদ্ধ ছিলেন। সেসব চুক্তির একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। দেশীয় রাজন্যগুলির আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের দায়িত্ব তাদের উপরই ন্যাস্ত ছিল আর সম্রাট তাদের বহিঃসম্পর্ক ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মূলত তিনটি কারণে স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম, কিছু শাসকের স্বাধীনতা স্পৃহা। দ্বিতীয়, এই স্বাধীনতা স্পৃহায় ইন্ধন যুগিয়েছিলেন ক্লীমেন্ট অ্যাটলি, যিনি ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭-এ ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সাথে সাথে দেশীয় রাজাদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের সর্বময় কর্তৃত্ব উত্তরাধিকার রাষ্ট্রগুলির হাতে বর্তাবে না। এই ঘোষণার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলি দাবি করল যে ব্রিটিশ শাসনের অবসানে তারা স্বাধী হয়ে যাবে। তৃতীয়, দেশীয় রাজাদের স্বাধীনতা স্পৃহা আরও উৎসাহিত হয়েছিল যখন মহম্মদ আলি জিন্না ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুন জনসমক্ষে ঘোষণা করেন ব্রিটিশ আধিপত্য অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্য-শাসিত রাজ্যগুলি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ মনোভাব অবশ্য

অচিরেই পরিবর্তিত হয়, এবং ১৯৪৭-এর ভারত শাসন আইনের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে অ্যাটলী বলেন, ব্রিটিশ সরকার প্রত্যাশা করে যে দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত দুটি ডোমিনিয়নের একটিতে তাদের যথাযোগ্য স্থান খুঁজে নেবে।

এই প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদী মনোভাব ছিল স্পষ্ট ও দৃঢ়। দেশীয় রাজ্যগুলির এই রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ এই প্রবণতা স্বাধীন ভারতের ঐক্য ও সংহতির প্রতিকূল ছিল। দ্বিতীয়ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে জাতীয়তাবাদী আবেগ এই সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণকে স্পর্শ করেছিল এবং তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তৃতীয়ত, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘ সময় ধরে প্রচার করে এসেছিলেন যে শাসকশ্রেণী নয়, বরং জনসাধারণই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। রাষ্ট্র নির্মাণের পথে নেমে তাঁরা স্বভাবতই রাজন্যবর্গের স্বাধীনতা স্পৃহা অগ্রাহ্য করে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেন যে আঞ্চলিক নৈকট্য ও জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে দেশীয় রাজ্যগুলির একমাত্র পথ ছিল ভারত অথবা পাকিস্তানের সাথে সংযুক্তি। এর পাশাপাশি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন ও ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির দাবিতে এই রাজ্যগুলিতে জেগে ওঠে উত্তাল গণ-আন্দোলন। এই পরিস্থিতিতে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় ভারতীয় রাজনীতির 'লৌহ মানব' সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ওপর। "নির্ধারিত দিন" অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭-এর মধ্যে অধিকাংশ রাজন্য শাসিত এলাকাই ভারতীয় অধিরাজ্যে যোগ দেয়। ব্যতিক্রম থেকে যায় শুধু জুনাগড়, কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ।

২.৬.১ জুনাগড়

সৌরাষ্ট্রের উপকূলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য জুনাগড়। চতুর্দিকে ভারতীয় ভূভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত এই রাজ্যের পাকিস্তানের সঙ্গে কোনরূপ ভৌগোলিক নৈকট্য ছিল না। প্রতিবেশী সমস্ত রাজ্যসমূহ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। এই রাজ্যের অধিবাসীরা, অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী, ভারতের সঙ্গে একীকরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এই সমস্ত বাস্তব পরিস্থিতি অস্বীকার করে জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পাকিস্তান এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও জুনাগড়ের জনগণ বিদ্রোহ করে। কংগ্রেস নেতৃত্বে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির দাবিতে এখানে শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদের অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে জুনাগড়। কারণ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যেখানে জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিলেন, সেখানে জিন্না ভৌগোলিক অবস্থান বা জনসংখ্যার জাতিগত গঠনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ক্রমাগত প্রচার করতে থাকেন যে ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের অবসান প্রতিটি দেশীয় রাজ্যকে ভারত অথবা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। জুনাগড় সমস্যা একটি বৃহত্তর প্রশ্ন উত্থাপন করে : স্বাধীনতা এক কর্তৃপক্ষ থেকে অপর কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতার বৈধ হস্তান্তর মাত্র, না, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি? যাই হোক, গণআন্দোলনের চাপে জুনাগড়ের নবাব দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং এখানে একটি অস্থায়ী

সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জুনাগড়ের দেওয়ান শাহনওয়াজ ভুট্টো ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ চাইলে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত জুনাগড়ে সেনা পাঠায়, একটি গণভোটের আয়োজন করে, এবং জনগণের মতানুসারে ভারতের সাথে সংযুক্তিসাধন করে।

২.৬.২ কাশ্মীর

কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে। জটিলতার উৎসগুলি ছিল ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সাথে কাশ্মীরের সাধারণ সীমানা। কাশ্মীরের শাসক হরি সিং হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিন্তু জনসংখ্যার ৭৫% মুসলিম। ভারতে গণতন্ত্র এবং পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতাকে ভয় পেয়ে হরি সিং উভয়ের থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে স্বাধীনভাবে শাসন করতে প্রয়াসী হন। এদিকে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে National Conference ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক ধারাগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কিন্তু কাশ্মীর অন্তর্ভুক্ত করার কোন প্রচেষ্টা করেননি। তাঁদের চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার দায়িত্ব তাঁরা কাশ্মীরের অধিবাসীদের ওপরই ন্যস্ত করেছিলেন। অপরদিকে পাকিস্তান শুধু গণভোটের নীতি অস্বীকারই করেনি, কাশ্মীরের ক্ষেত্রে জনমত লঙ্ঘন করেছিল। ২২শে অক্টোবর, ১৯৪৭-এ যখন বেশ কিছু পাঠান উপজাতি পাকিস্তানের পরোক্ষ মদতে কাশ্মীর আক্রমণ করে শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হয়, কাশ্মীরের মহারাজা আতঙ্কিত হয়ে ভারতের কাছে সামরিক সাহায্যের আবেদন জানান। কাশ্মীরের এই আপৎকালেও কিন্তু নেহরু জনমত যাচাই না করে অন্তর্ভুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন বলেন যে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ভারত সামরিক সাহায্য পাঠাতে পারে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তির পরে। সর্দার প্যাটেল ও শেখ আবদুল্লাও অন্তর্ভুক্তির জন্য চাপ দিতে থাকেন। অতএব ২৬শে অক্টোবর মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং শেখ আবদুল্লার প্রধানমন্ত্রীত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। যদিও কাশ্মীরের মহারাজা এবং শেখ আবদুল্লা উভয়েই দৃঢ় ও চিরস্থায়ী সংযুক্তিকরণ চেয়েছিলেন, ভারত তার গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন অব্দি বিষয়টিকে মুলতুবি রাখে।

কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির পর ভারতীয় মন্ত্রী-পরিষদ শ্রীনগরে সেনা প্রেরণ করে। আক্রমণকারীদের শ্রীনগর থেকে অপসারণ করা হলেও তারা কিছু অঞ্চল দখল করে রাখে। মাসাধিককাল ধরে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলার পর যখন পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধের আকার ধারণ করার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন নেহরু মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তাপরিষদের কাছে কাশ্মীর সমস্যা উত্থাপন করে (৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭) পাকিস্তানের পশ্চাদপসরণ দাবি করেন। পরবর্তীকালে নেহরু এই সিদ্ধান্তের জন্য অনুতাপ করেছিলেন। কারণ ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে নিরাপত্তা পরিষদ পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। ভারতের অভিযোগ সম্পূর্ণ

অস্বীকার করে ‘‘কাশ্মীর সমস্যার’’ নাম দেওয়া হয় ‘‘ভারতপাক বিবাদ’’। জাতিপুঞ্জের একটি প্রস্তাব অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই যুদ্ধবিরতি মেনে নেয় (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮), কিন্তু যুদ্ধবিরতি রেখা বরাবর কাশ্মীর আজও বিভাজিত হয়ে আছে। নিয়ন্ত্রণ রেখার অপর পারে পাক অধিকৃত অঞ্চলে আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠিত হয়। পাকিস্তানের তরফ থেকে সমস্ত প্ররোচনা সত্ত্বেও নেহরু যুদ্ধ বিস্তার না করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। ভারতবর্ষের বিশেষ স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল কতগুলি সাধারণ বিবেচনায়। প্যারিস ও লণ্ডন সফরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বোঝেন যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মর্যাদা অনেকাংশেই তার হাদ্রাবাদ ও কাশ্মীর নীতির উপর নির্বরশীল। তিনি অচিরেই বুঝেছিলেন যে দলের অভ্যন্তরে এবং বিরোধীদের কাছে তাঁর কাশ্মীর নীতি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তবে সেই মুহূর্তে তাঁর কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভারত সম্পর্কে পাকিস্তানের সন্দেহ ও ভীতি নিরসনে যুদ্ধবিরতির ভূমিকা।

১৯৫১ সালে জাতিপুঞ্জ একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে যে পাক সেনাবাহিনীর অপসারণের পরই কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু গণভোটের পরিল্পনা বাস্তাবায়িত হয়নি কারণ পাকিস্তান আজাদ কাশ্মীর থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করে। অতঃপর ভারত ও পাকিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পথে মূল অন্তরায় কাশ্মীর। ভারত কাশ্মীরের আন্তর্ভুক্তিকে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করে ও কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে প্রচার করার নীতি অনুসরণ করে। নেহরুর পরিকল্পনায় ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার গৌরবময় সাফল্যের ক্ষেত্রে কাশ্মীর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৫৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য একটি পৃথক সংবিধান বলবৎ করা হয়। ভারতীয় রাজ্য সংঘের অভ্যন্তরে জম্মু কাশ্মীরই একমাত্র রাজ্য যাকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়। এই সংবিধানের সঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে ভারতের সংবিধানের উপবন্ধ অনুসারে কেন্দ্রীয় সংসদের এই রাজ্যের জন্য যে সব বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আছে সেইসব বিষয় ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ে রাজ্যের নির্বাহিক ও বিধানিক ক্ষমতা প্রসারিত হবে।

২.৬.৩ হায়দ্রাবাদ

ভারতবর্ষের বৃহত্তম রাজন্যশাসিত রাজ্য হাদ্রাবাদ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ভুখণ্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত। হায়দ্রাবাদের নিজাম ভারতের অঙ্গীভূত না হয়ে স্বাধীন মর্যাদা দাবি করেন এবং পাকিস্তানের উৎসাহে সেনাবাহিনী সম্প্রসারণ করতে থাকেন। সর্দার প্যাটেল সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেও স্পষ্টভাষায় জানিসেয় দেন যে ভারত তার ভৌগলিক ক্ষেত্রের মধ্যে এমন কোন বিচ্ছিন্ন অঞ্চল বরদাস্ত করবে না বা তার কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলবেঙ্গ ভারত সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তির ছত্রছায়ায় নিজাম তার বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে নিজাম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেবেন এই আশায় ভারত

সরকার ব্রিটিশ আইনজ্ঞ স্যার ওয়াল্টার মঙ্কটনকে নিযুক্ত করে তার হয়ে নিজারেম সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্য। হায়দ্রাবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নেহরু বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন কারণ ভারতের কাশ্মীর নীতির উপর হায়দ্রাবাদের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী ছিল। এবং দুটি বিষয়ই জাতীয় সীমা অতিক্রম করে পাকিস্তানের সঙ্গে সামগ্রিক সম্পর্কের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

ইতিমধ্যে হাদ্রাবাদের অভ্যন্তরে তিনটি ঘটনা ঘটে যা ভারত সরকারকে তৎপর হতে বাধ্য করে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে একটি মুসলিম সাম্প্রদায়িক জঙ্গী গংগঠনের উত্থান হয়—ইত্তিহাদ-উল-মুসলিমিন। ঐ সংগঠন ও তার আধা সামরিক বাহিনী রাজাকর ঐ রাজ্যের হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। রাজাকর আক্রমণ ও সরকারী দমননীতির মুখে জনগণ পার্শ্ববর্তী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ত, নিজামকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাধ্য করতে হায়দ্রাবাদ রাজ্য কংগ্রেস একটি শক্তিশালী সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তোলে। সরকারী নিপীড়নের মুখে এই আন্দোলন সশস্ত্র রূপ ধারণ করে। তৃতীয়ত, ১৯৪৬-র দ্বিতীয়ার্ধে থেকেই এই রাজেযর তেলাঙ্গানা অঞ্চলে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রাথমিক পর্বে এই আন্দোলন নিজামের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনার পাশাপাশি নিজামের অস্ত্র আমদানি অব্যাহত ছিল। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হায়দ্রাবাদে সেনা প্রেরণ করে; তিনদিন পর হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সেনাপতি এস্ ইদ্রুস্ ভারতীয় সেনাপতি মেজর জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। নিজামের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করে ভারত সরকার তাঁকে হাদ্রাবাদের আনুষ্ঠানিক শাসক বা রাজপ্রমুখ রূপে স্বীকৃতি দেয়; পঞ্চাশ লক্ষ টাকার রাজভাতা বরাদ্দ করে এবং নিজামের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর তাঁর অধিকার স্বীকার করে নেয়। ভারতীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে হায়দ্রাবাদের সংযুক্তি দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় সংঘের সঙ্গে একীকরণের প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে। আসমুদ্র হিমাচল ভারত সরকারের পরোয়ানা বলবৎ হয়। হায়দ্রাবাদ অধ্যায় ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার বিজয় আবার একবার ঘোষণা করে। হায়দ্রাবাদরে অগনিত মুসলিম প্রজাই যে শুধু নিবাম বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাই নয়, সমস্ত দেশ জুড়ে মুসলিম অধিবাসীরা ভারতীয় নীতি সমর্থন করে পাকিস্তান ও নিজাম উভয়কেই নিরাশ করেছিলেন।

দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তির দ্বিতীয় অধ্যায় ছিল অপেক্ষাকত কঠিন। ভারতীয় অধিরাজ্যে যোগদানের পর এই রাজ্যগুলি নিয়ে ভারত সরকারের দুরকম সমস্যা দেখা দেয়। এক, দেশীয় রাজ্যগুলি যাতে কিছুটা বড়ো আয়তন বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ প্রশাসনিক একক হিসাবে টিকে থাকার উপযুক্ত হয় সেইভাবে তাদের গঠন করা, এবং দুই, ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে তাদের যথোচিত স্থান দেওয়া। প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'প্যাটেল পরিকল্পনা' নামে একটি তিন দফা একীকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

(১) ২১৬টি ক্ষুদ্র রাজ্যকে ভৌগলিক দিক থেকে তাদের সন্নিহিত প্রদেশগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী ওড়িশা প্রদেশের সঙ্গে ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ের সংযুক্তি দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোচবিহারের সংযুক্তি দিয়ে তা শেষ হয়।

(২) ৬১টি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিবর্তিত করা হয়। একীকরণের এই রীতি কেবল সেইসব ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয় যেখানে প্রশাসনিক, সামরিক অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে কেন্দ্রের শাসন প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়।

(৩) কতগুলি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যকে সম্মিলিত করে টিকে থাকতে পারে এমন নতুন কিছু একক গঠন করা হয়েছিল, যাকে বলা হত রাজ্যসঙঘ। এইভাবে ২৭৫টি দেশীয় রাজ্যকে সম্মিতি করে ৫টি সঙ্ঘ গঠন করা হয়—মধ্যভারত, পাটিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব সঙঘ, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র এবং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন।

মহীশূর, হায়দ্রাবাদ এবং জম্মু-কাশ্মীর ভারত সঙেঘর অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা বজায় রাখে। সমস্ত প্রকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সমর্পন করার পরিবর্তে বিশিষ্ট রাজ্যগুলির শাসকদের সমস্ত কর থেকে মুক্ত রাজভাতা প্রদান করা হয়। ১৯৪৯ সালে যার মূল্য ছিল ৪ কোটি ৬৬ লক্ষা টাকা। শাসকদের উত্তরাধিকারের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিছু ব্যক্তিগত অধিকার ও বিশেষ অধিকার তাঁদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়।

দেশীয় রাজাদের প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলিকে সমসাময়িক ও পরবর্তী পর্যবেক্ষকরা কঠোর সমালোচনা করেছেন। সরকারী নীতিকে সমর্থন করে ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র বলেছেন যে, স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের অব্যবহিত পরের কঠিন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, দ্রুত আঞ্চলিক ও রাজনৈকিক পুনর্গঠনের স্বার্থে এই বিশেষ সুবিধাগুলি ছিল নগন্য মূল্য যার বিনিময়ে দেশীয় রাজাদের স্বাধীন অস্তিত্বের বিলোপসাধন করা হয়েছিল। এর ফলে দেশভাগের ক্ষত কিয়দংশে প্রশমিত হয়েছিল।

২.৭ সংহতির পথে ভারত ঃ পণ্ডিচেরী ও গোয়া

ভারতের ভূপৃষ্ঠে আরো দুটি সমস্যাকণ্টকিত স্থান থেকে গেল ঃ ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে ফরাসি ও পর্তুগীজ উপনিবেশ যার মূল ঘাঁটি ছিল পণ্ডিচেরী ও গোয়া। এই উপনিসেবশগুলির জনসাধারণ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগদান করতে তৎপর ছিল। ফরাসি কর্তৃপক্ষ পরিণত বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ১৯৫৪ সালে পণ্ডিচেরী ও অন্যান্য ফরাসি ঘাঁটি ভারত সরকারের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু ন্যাটো (NATO) গোষ্ঠীর মিত্র ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট হয়ে পর্তুগীজরা গোয়া ধরে রাখতে দৃশ প্রতিজ্ঞ ছিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে নেহরু ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬১ গোয়াতে ভারতীয়

সেনা পাঠান। গোয়ার শাসক কোন প্রকার সংঘর্ষে না গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। স্বাধীনতার চোদ্দ বছর পর ভারতের আঞ্চলিক সংহতি সম্পূর্ণ হয়।

স্বাধীন ভারতের আঞ্চলিক পুর্গঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি সহজেই চোখে পড়ে তা হল ভারতবর্ষের আঞ্চলকি সীমানা প্রকৃতিদত্ত বা ইতিহাসলব্ধ নয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের বিশেষ পরিস্থিতি, পদ্ধতি এবং ভারত সরকারের সাথে দেশীয় রাজাদের আপোষ আলোচনার ফলশ্রুতি এই সীমারেখাগুলি।

২.৮ সংহতির পথে ভারত ঃ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি

স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকের মধ্যে ভাষা বিভিন্নরূপে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তির অব্যবহিত পরেই ভারতীয় সংহতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি। ১৯৫০ সালে যখন সংবিধান কার্যকরী করা হয় তখন স্বাধীন ভারতের অঞ্চলসমূহ চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল—ভাগ 'ক'-এর অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রাক্তন প্রদেশসমূহ যথা, অসম, বিহার, বোম্বে, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, ওড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। পূর্বতন রাজন্যশাসিত অঞ্চলগুলিকে নিয়ে 'খ' ভাগের রাজ্যগুলি গঠিত হয়েছিল। যথা—হাদাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যভারত, মহীশূর, পাতিয়ালা ও পূর্ব-পাঞ্জাব রাজ্য সংঘ, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন। 'গ' ভাগের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি পূর্বতন মুখ্য মহাধ্যক্ষের (Chief Commissioner) প্রদেশসমূহ নতুবা রাজ্যশাসিত রাজ্যগুলির সংযুক্তির ফলে গঠিত ক্ষুদ্রতর একক। যথা—আজমীর, বিলাসপুর, ভূপাল কুর্গ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, মনিপুর, ত্রিপুরা, বিন্ধ্যপ্রদেশ। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'ঘ' বিভাগের রাজ্যগুলি। এই বিশেষ কাঠামো কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী গড়ে ওঠেনি, বরং একে এ কে রাজ্যগুলি ভারতে মিলে যাওয়ার ফলস্বরূপ গঠিত হয়েছিল।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের দাবির স্বপক্ষে কিছু জোরালো যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়েছিল। যে কোন দেশের সংস্কৃতি ও দেশাচারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে ভাষা। তাছাড়া শুধুমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও গণ-সাক্ষরতা সম্ভব। সাধারণ মানুষের কাছে গণতন্ত্র তখনই অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে যখন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় পরিচালিত হয়। কিন্তু একটি বিশেষ ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠিত না হলে সেই ভাষা কখনোই প্রশাসনিক বা বিচার বিভাগীয় কাজের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে না। এই বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে ১৯১৯ সালের পর থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মাতৃভাষার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচার শুরু করে এবং ১৯২১ সালে তার সংবিধান পরিবর্তন করে

আঞ্চলিক শাখাগুলি ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করে। গান্ধীজিও মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে আঞ্চলিক ভাষাগুলির পূর্ণবিকাশের জন্য ভাষার ভিত্তিতে প্রদেহগুলির পুর্নগঠন একান্ত জরুরী। সুতরাং স্বাধীন ভারতের অভ্যন্তররীণ সীমানাগুলি যে ভাষার ভিত্তিতে রচিত হবে এটাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিলঙ্গ কিন্তু দেশ বিভাগের হাত ধরে আসে গুরুতর প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। কাশ্মীর সমস্যার জটিলতা ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়য়ে রাষ্ট্রনেতাদের সামনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ছিল জাতীয় সংহতি রক্ষা করা। তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে ঐ ক্রান্তিকালে অভ্যন্তরীণ সীমারেখা পুনর্বিবেচনা করতে গেলে প্রশাসন ভেঙে পড়বে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে, আঞ্চলিক ও ভাষাগত বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং নাশকতামূলক শক্তিগুলি জাতীয় সংহতির কণ্ঠরোধ করবে। সুতরাং নীতিগতভাবে ভাষাভিত্তিক রাজ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেও ক্ষমতাসীন নেতারা বিষয়টিকে অগ্রবর্তীতা দিতে পারেননি।

যাই হোক,সংবিধান পরিষদে ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠনের প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়ায় ১৯৪৮ সালে বিচারপতি এস. কে. দরের সভাপতিত্বে Linguintic Provincec Commission গঠন করা হয়। এই কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় যে ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক পুর্গঠন প্রশাসনিক দক্ষতার অবক্ষয় ঘটাবে। একটি বিক্ষুব্ধ ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করবে এবং জাতীয় ঐক্য এমন একটি মুহূর্তে বিনষ্ট করবে যখন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তা ধরে রাখা একান্ত জরুরী। এই সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে কমিশন রায় দেয় যে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠন জাতীয় স্বার্তের পরিপন্থী, সুতরাং অবাঞ্ছিত। কিন্তু অর্ধশতাব্দী ধরে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে ঘিরে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতি উচ্চাশা গড়ে উঠেছিল তা সহজে ধূলিসাৎ করা সম্ভব ছিল না। সাময়িকভাবে থিতিয়ে গেলেও এই দাবি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, এবং একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবিকে অবদমিত করলে জাতীয় ঐক্য অনেক বেশী মাত্রায় বিপন্ন হবে। এই দাবিতে দক্ষিণীরা ছিলেন অনড়। মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তেলেগু ভাষীরা অন্ধ্রে পৃথক তেলেগু রাজ্যের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন; কন্নড় ভাষীরা প্রধানত মহীশূরে সন্নিবিষ্ট ছিলেন কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও সংখ্যালঘু হিসাবে উপস্থিত ছিলেন; মারাঠী ভাষীরা গুজরাতিদের সঙ্গে বোম্বাই ভাগাভাগি করে নেওয়ার পরিবর্তে নিজস্ব পৃথক রাজ্য দাবি করেছিলেন। মালয়লম ও তামিল ভাষীরাও একই কারণে বিক্ষুব্ধ ছিলেন এবং অনুরূপ আকাঙ্খা কোষণ করতেন। অংশত জনমতের চাপে এবং অংশত বিষয়টি রাজনৈতিক মাত্রাপ্রাপ্ত হচ্ছে দেখে জহওরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং পট্টভি সিতারামাইয়াকে নিয়ে জে. ভি. পি. কমিটি গঠন করে (ডিসেম্বর, ১৯৪৮) ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য। জেভিপি কমিটির প্রতিবেদনেও ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠনের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়। পরিনামস্বরূপ দেশ জুড়ে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিতে গণ-আন্দোলনের জোয়ার আসে।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য অন্ধ্ররাজ্যের দাবিতে তেলেগু ভাষীদের সংগ্রাম। অর্ধশতাব্দী ধরে এই দাবি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই সহানুভূতি লাভ করেছিল। জেভিপি কমিটি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে অন্ধ্র গঠন করার যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেয় এবং তামিলনাড়ুর নেতৃবৃন্দও এই প্রস্তাবে সম্মত হয়। কিন্তু বিতর্ক দেখা দেয় মাদ্রাজ শহরকে কেন্দ্র করে। অন্ধ্র নেতারা মাদ্রাজ ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু ভৌগলিক ও ভাষাগত দিক থেকে মাদ্রাজ তামিলনাড়ুর প্রাপ্য ছিল। ১৯শে অক্টোবর ১৯৫২ জনপ্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী পোট্টি শ্রীরামালু আমরণ অনশন শুরু করেন। ৫৮ দিন পর তাঁর মৃত্যু হলে অন্ধ্রজুড়ে শুরু হয় দাঙ্গা, মিছিল, হরতাল ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ। এই পরিস্থিতিতে অবশেষ সরকার অন্ধ্র রাজ্যের দাবি মেনে নেয়। ১৯৫৩ সালে অক্টোবরে সৃষ্ট হয় তেলেগুভাষী অন্ধ্র ও তামিল ভাষী অঞ্চল তামিলনাড়ু।

অন্ধ্রের সাফল্য ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক পুনর্গঠনের দাবিতে আন্দোলনরত অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করে। ঐ সময় নেহরু আঞ্চলিক পুনর্গঠনের নীতি সম্পূর্ণ কার্যকরী করার পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে তাঁর পক্ষে ধারাবাহিকভাবে জনমত উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিয়দংশ জনগণের চাহিদা পুরণ করতে এবং কিয়দংশে সমস্যাটিকে প্রলম্বিত করতে ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে নেহরু বিচারপরি ফজল আলি, কে. এম. পানিক্কর ও হৃদয়নাথ কুঞ্জরুকে নিয়ে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করেন রাজ্য পুনর্গঠনের সমগ্র বিষয়টি ‘‘নিরপেক্ষ ও নিরাসক্তভাবে’’ পুনর্বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে। ১৯৫৫ সালে এই কমিশনের প্রতিবেদন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেও ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সুপারিশ করে। কমিশনের রায় অবশ্য বোম্বে ও পাঞ্জাব বিভাজনের বিপক্ষে ছিল। কিঞ্চিৎ রদবদল করে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করা হয়। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন সংসদে পাশ করা হয়। এর ফলে চোদ্দটি রাজ্য ও ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সৃষ্টি হয়। হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চল অন্ধ্র রাজ্যকে হস্তান্তরিত করাহয়। পুরাতন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মালাবার জেলার সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুর কোচিনকে যুক্ত করে কেরলের সৃষ্টি হয়।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ও রাজ্য পুনর্গঠন আইনের বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মারাঠাভাষীরা। এই কমিশনের প্রতিবেদন মালয়লম ও কন্নড়ভাষীদের চাহিদাপূরণের সুপারিশ করলেও বোম্বে বিভাজনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। বরং বোম্বে ও মধ্যপ্রদেশের অংশ বিশেষ নিয়ে বিদর্ভ রাজ্য গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই প্রস্তাব কিছু মারাঠাভাষীকে নিজস্ব রাজ প্রদান করত ঠিকই কিন্তু অধিকাংশ মারাঠাভাষীই অবিভক্ত বোম্বে রাজ্যে গুজরাতীদের তুলনায় সংখ্যালঘুতে পরিণত হত। এই আপোষ মীমাংসার ফলে বোম্বে শহরে দাঙ্গা বেধে যায় এবং ৮০ জনের প্রাণহানি হয়। সমস্যা সমাধানের শেষ প্রয়াসে রাজ্য পুনর্গঠন আইন কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও হায়দ্রাবাদের মারাঠাভাষী এলাকাগুলি বোম্বের সাথে সংযুক্ত করে ও রাজ্যের আয়তন

বৃদ্ধি করে। এই পদক্ষেপ কিন্তু কোন পক্ষকেই তুষ্ট করতে পারল না। মারাটাভাষীরা বোম্বে শহরকে অন্তর্ভুক্ত করে পৃথক রাজ্যের দাবিতে অনড় থাকে। অপরদিকে অবিভক্ত নতুন রাজ্যে গুজরাতীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। অধিকন্তু সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতি ও মহাগুজরাত জনতা পরিষদ নামক দুটি ভাষাভিত্তিক গংগঠন রাজনৈতিক দলগুলির স্থাভিষিক্ত হয়। গণ-আন্দোলন ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের চাপে অবশেষে ১৯৬০ সালের মে মাসে নেহরু সরকার বোম্বে রাজ্যকে বিভাজিত করে মহারাষ্ট্র ও গুজরাত নামক দুটি পৃথক রাজ্য সৃষ্টি করে। বোম্বে শহর মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং আমেদাবাদ হয় গুজরাতের রাজধানী।

পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে কিন্তু ভাষা সংক্রান্ত নীতি লঙঘন করা হয়। ১৯৫৬ সালে পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য সমূহের সঙ্গে পাঞ্জাবকে সংযুক্ত করা হয়। পাঞ্জাবী, পাহাড়ী ও হিন্দিভাষী নিয়ে গঠিত পাঞ্জাব হয়ে যায় একটি ত্রিভাষী রাজ্য। এই রাজ্যের পাঞ্জাবীভাষী এলাকায় পৃথক পাঞ্জাবী সুবার দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিষয়টি সাম্প্রদায়িক আকার প্রাপ্ত হয়। অকালী দলের নেতৃত্বে শিখ এবং জনসঙেঘর নেতৃত্বে হিন্দু সাম্প্রদায়কি গোষ্ঠী রাজনীতির হাতিরয়ার হিসাবে ভাষাকে ব্যবহার করে। একদিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা পাঞ্জাবী মাতৃভাষা হিসাবে মেনে নিতে অসম্মত হয়ে পাঞ্জাবী সুবার দাবির বিরোধিতা করে, অপরদিকে গুরুমুখী হরফে লিখিত পাঞ্জাবীকে শিখ ভাষা বলে প্রচার করে শিখ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী পৃথক শিখ রাজ্যের দাবি তোলে। কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসের একাংশ এই দাবি সমর্থন করে। কিন্তু নেহরু ও পাঞ্জাব কংগ্রেসের অধিকাংশ এই মত পোষণ করতেন যে প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাব রাজ্যের দাবি আদি ভাষার আবরণে সজ্জিত একটি সাম্প্রদায়িক দাবি। নীতিগত কারণে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের বিরোধী চিলেন। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনও পৃথক পাঞ্জবী রাজ্যের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ তা বাষা অথবা সাম্প্রদায়িক কোন সমস্যারই সমাদান করবে না।

দশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত ও সংগ্রামের পর অবশেষে বাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন বাস্তবে পরিণত হল। নেহরু ও অন্যান্য নেতাদের সমস্ত আশঙ্কা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এই পুনর্গঠন প্রমান করে যে ভাষার প্রতি আনুগত্য জাতির প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে হুধু সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, পরিপূরকও বটে। বাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্ত করে। ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন সাধন করে জাতীয় নেতৃবৃন্দ এমন একটি ক্ষোভের উপশম করেন যা পরবর্তীকালে নিশ্চিতভাবে বিচ্ছন্নতাবাদী প্রবণতার জন্ম দিত। আবার, ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠন কোনভাবেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠাকোর পরিপন্থী ড়হয়নি বা কেন্দ্রকে দুর্বল অথবা নিষ্ক্রিয় করেনি। রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীন পুনর্বিন্যাস দেশের ঐক্যকে ব্যাহত না করে তাকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। রজনী কোঠারীর মতে বাষাভিত্তিক আঞ্চলিক পুনর্গঠন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রকে যুক্তিসঙ্গত করেছিল, এবং ভাষা সমন্বয়ের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। ভবিষ্যতের প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ অসাধারণ কার্যকুশল বলে বিবেচিত হয়েছিল। এর ফলে গণতন্ত্রের বিস্তার ঘটে এবং গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে ওঠে।

শক্তিশালী রাষ্ট্রের আদর্শ এবং তাকে সমর্থন করার জন্য সমরূপ বা বিমিশ্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সংঘাত থেকে কতকগুলি নিয়মাবলী ও রাজনৈতিক কৌশলের উদ্ভব হয় যেগুলি সমাকলনবাদী ও আত্তীকরণবাদী আদর্শের তুলনায় বাস্তবে অনেক বেশি বহুত্ববাদী। কার্যত নেহরুর যুগে ভারতীয় রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক দিক থেকে একটি বহুত্ববাদী রাষ্ট্রের আকার ধারণ করে যেখানে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সমানাধিকার স্বীকৃত ছিল। প্রথম, বলা হয়েছিল যে নীতিগতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেবে না, বরং সর্বশক্তি নিয়োগ করে, প্রয়োজনে সামরিক বল প্রয়োগ করে, এ ধরনের আন্দোলন দমন করবে। দ্বিতীয়, সরকার ধর্মের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পুনর্গঠনের কোন দাবি বিবেচনা করবে না। তৃতীয়, খামখেয়ালীভাবে অথবা একটি বিশেষ অঞ্চলে কথিত কোন বিশিষ্ট ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের দাবি গ্রাহ্য হবে না। বিদ্যমান রাজ্যগুলিকে বিভাজিত করার অনীহা থেকেই এই নীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। চতুর্থ, রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি যদি সংশ্লিষ্ট ভাষা গোষ্ঠীগুলির যে কোন একটি গোষ্ঠীর দ্বারা উত্থাপিত হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি বিবেচনাযোগ্য মনে করবে না।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন ভাষাগত সংখ্যালঘু সমস্যার সৃষ্টি করে। একভাষী রাজ্যের অস্তিত্ব কোনমতেই বাস্তবোচিত ছিল না। পরিণামস্বরূপ ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত রাজ্যগুলিতে বহু সংখ্যক ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে যায়। সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার ১৮% যে রাজ্যে বসবাস করে সেই রাজ্যের সরকারি ভাষা তাদের মাতৃভাষা থেকে ভিন্ন। ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নটি গোড়া থেকেই গুরুত্ব সহকারে বিচার্য বিষয় ছিল। একদিকে, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের সম্ভাবনা সদা বর্তমান ছিল, অপরদিকে রাজ্যের প্রধান ভাষার সঙ্গে তাদের সংহতি সাধনেরও প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করার যে তারা কোন প্রকার বৈষম্যের শিকার হবে না এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব ও বিকাশ অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে সংখ্যাগুরুদের আশ্বস্ত করতে হত যে সংখ্যালঘু চাহিদার প্রতি সহানুভূতি তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার সমার্থক নয়। এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য সংবিধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে কিছু মৌলিক অধিকার প্রদান করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০ ও ৩৪৭। অনুচ্ছেদ ৩০ অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার ও পরিচালনা করার অধিকার থাকবে এবং রাষ্ট্র ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে কোন বৈষম্য করবে না। মৌলিক অধিকার ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার্থে সংসদীয় আইন দ্বারা দুটি প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও আরো দু'জন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয় পাঁচটি আঞ্চলিক পরিষদ। পণ্ডিত নেহরুর চিন্তা অনুযায়ী এই পরিষদগুলির উদ্দেশ্য "সহযোগিতামূলক কর্মের অভ্যাস গড়ে তোলা"। যদি ঠিকমতো কাজ করে তাহলে এই পরিষদগুলি ভাষা

আর প্রদেশের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে। অধিকাংশ পরিষদের কৃতিত্বই ছিল নগন্য কিন্তু দক্ষিণ আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিবেশী রাজ্য সরকার এবং সরকারী কর্মচারীদের মিলনস্থল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য রাষ্ট্রপতি একজন বিশেষ আধিকারিক নিযুক্ত করেন। সেই বিশেষ আধিকারিক সংবিধানে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য যেসব রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে সেইসব রক্ষাকবচ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় অনুসন্ধার করে দেখবেন। কমিশন প্রতটি রাজ্যে সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবেদন জমা দিতে দায়বদ্ধ থাকবেন, এবং সেই সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট দেবেন। রাষ্ট্রপতির কর্তব্য হবে সংসদের প্রত্যেক কক্ষে রিপোর্ট পেশ করা এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো। এই দুটি পদক্ষেপ নতুন রাজ্যগুলিতে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের সম্ভবনা যথাসম্ভব নিমূল করেছিল। এই সমস্ত পদক্ষেপ সত্ত্বেও বলা যয় যে সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলি সর্বদা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেনি।

২.৯ সংহতির পথে ভারত ঃ সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংকট

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে স্বাধীন ভারতের প্রথম কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় সর্বাধিক বিভেদ সৃষ্টিকারী উপাদান ছিল ভাষা। ভাষার ভিত্তিতে আঞ্চলিক পুনর্গঠনের দাবি কিভাবে জাতীয় ঐক্য বিপন্ন করেছিল, সেই ইতিহাস আমরা আগের অংশে পাঠ করেছি। তার পাশাপাশি আমরা এও দেখেছি যে প্রধান ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠন এক শ্রেণীর ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে যারা প্রায়শই বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। এই অংশে আমরা দেখব সরকারী ভাষাকে কেন্দ্র করে দেশের সংহতি কিভাবে বিপন্ন হয় এবং রাষ্ট্র নেতারা গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে কিভাবে সযত্নে সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে সমাধানের দিকে অগ্রসর হয়।

মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ ভাষা। সব সমাজে, বিশেষত ভারতবর্ষের মত বহুভাষী সমাজে ভাষাগত পরিচয় যথেষ্ট অর্থবহ। শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, চাকরী, বৃত্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়গুলি ভাষার স।। সম্পর্কিত এবং ভাষাগত বিভিন্নতা এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে জটিল রাজনৈতিক আর্বতের সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীন ভারত অসংখ্য ভাষাকে একটি ভাষার দ্বারা সাঙ্গীকরণ করার নীতি গ্রহণ করেনি, বরং এই বহুমুখীতাকে মেনে নিয়েছিল যাতে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটে বা তা দীর্গস্থায়ী না হয়। এ সত্ত্বেও সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজির জায়গায় হিন্দির প্রচলন সমস্যা সৃষ্টি করে।

জাতীয় নেতৃবৃন্দের উদারগোষ্ঠীর জাতীয় পরিচিতির জন্য জাতীয় ভাষার প্রয়োজনীয়তা আগেই অস্বীকার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সংবিধান চোদ্দটি প্রধান ভারতীয় ভাষাকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু

সরকারী কার্যকলাপ এতগুলি ভাষায় পরিচালিত হওয়া সম্ভব ছিল না, অতএব প্রয়োজন দেখা দেয় একটি সাধারণ বাষার যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্তরে সরকারি কাজকর্ম পরিচালিত হবে, সাধারণ রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের এবং রাজ্যগুলির পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষিত হবে। এখন প্রশ্ন দেখা দিল কোন ভাষাকে সর্বভারতীয় যোগাযোগের মাধ্য হিসাবে ব্যবহার করাহবে। ইংরাজি এবং হিন্দি, এই দুটি ভাষাই কেবল এই স্তরে ব্যবহৃত হওয়ার দাবি করতে পারত। ইংরাজি ভাষার মর্যাদা এবং ভারতের সরকারী ও অন্যান্য কাজে এর সম্ভাব্য ব্যবহারের একটি বাস্তব ও একটি আবেগজনিত দিক ছিল। বাস্তব প্রশ্নগুলি চিল আন্তর্জাতক যোগাযোগের যেকানে ইংরাজি ছিল সব থেকে প্রভাবশালী ভাষা। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞা ও প্রযুক্তির ভাষা হিসাবে হিন্দি তখনও যথেষ্ট অনুন্নত ছিল শব্দভাণ্ডারের দিক থেকে এবং অনূদিত পাঠ্যপুস্তকের প্রাপ্যতার দিক থেকে।

এই বাস্তব সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য অন্তত ইংরাজি ভাষাকে সরকারী কাজে ব্যবহার করার কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধা ছিল এই যে ইংরাজি ভাষা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, অর্থাৎ জন-সংখ্যার এক শতাংশের বোধগম্য ভাষা। অতএব এই বাষাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিলে জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হবে যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। পাশাপাশি আবেগজনিত বক্তব্য ছিল এই যে একটি দেশ যথার্তই স্বাধীন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার জনসাধারণ, দেশের সীমানার ভিতর অন্তত, বিদেশী ভাষা বর্জন করে দেশীয় ভাষা গ্রহণ না করছে।

হিন্দি ভাষার প্রবক্তারা হিন্দির সমর্থনে জোরাল যুক্তি উপস্থাপন করেন। হিন্দি দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশের না হলেও বৃহত্তম অংশের, অর্থাৎ 42%-এর কথিত ভাষা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময়, বিশেষ করে গণ-আন্দোলনের যুগে হিন্দি ও হিন্দুস্তানী ভাষা সর্বভারতীয় ভাষার ভূমিকা পালন করেচিল। হিন্দিভাষা কথিত হয় না এমন অঞ্চলেও হিন্দি সর্বাধিক কথিত ও বোধগম্য ভাষা হিসাবে গ্রহযোগ্য হয়েছিল। হিন্দি ভাষার অত্যুৎসাহী সমর্থকদের মধ্যে চিলেন তিলক, গান্ধী, সি রাজাগোপালাচারী, সুবাষ গোস এবং সর্দার প্যাটেল। সংবিধান পরিষদে দুটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিতক দেখা দেয়—(১) ইংরাজি ভাষার স্থান গ্রহণ করবে হিন্দি না হিন্দুস্থানী? (২) এই পরিবর্তনের সময়সীমা কি হবে?

সরকারী ভাষার বিষৱটি শুরু থেকেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। গান্ধী ও নেহরু চেয়েছিলেন দেবনাগরী বা উর্দু হরফে লিখিত হিন্দুস্থানী ভাষা স্বাধীন ভারতে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করতে। হিন্দি ভাষার সমর্থকরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই বক্তব্য মেনে নেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাজন ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে পাকিস্তানপন্থীরা মুসলমান ও পাকিস্তানের ভাষা হিসাবে উর্দুকে তুলে ধরলে, হিন্দির অনুগামীরাও বিশেষ উৎসাহিত হন। উর্দুভাষাকে তাঁরা বিচ্ছিন্নতার প্রতীক বলে বর্ণনা করে দেবনাগরী হরফে লিখিত হিন্দি ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবি জানান। এই প্রশ্নে কংগ্রেস দলেও বিভাজন দেখা

দেয়। অবশেষে নেহরু ও আজাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে কংগ্রেস সংবিধানিক দল হিন্দি ভাষার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। হিন্দি গোষ্ঠীকেও আপোষ করতে হয়। স্থির হয় যে হিন্দি হবে স্বাধীন ভারতের সরকারি ভাষা, জাতীয় ভাষা নয়।

ইংরাজি থেকে হিন্দিভাষায় পরিবর্তনের সময়সীমার প্রশ্নটি হিন্দি ও অ-হিন্দি অঞ্চলের মধ্যে গভীর বিভাজন সৃষ্টি করে। হিন্দির প্রবক্তারা অবিলম্বে পরিবর্তন চেয়েছিলেন কিন্তু অ-হিন্দি ভাষীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য না হলেও দীর্ঘ সময়ের জন্য ইংরাজি ভাষাকে বহাল রাখতে চেয়েছিলেন। পণ্ডিত নেহরু চেয়েছিলেন হিন্দিভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দিতে কিন্তু পাশাপাশি ইংরাজিকে একটি অতিরিক্ত সরকারি ভাষারূপে বহাল রাখতে। এর ফলে হিন্দিতে পরিবর্তন ক্রমান্বয়ে সাধিত হবে এবং ইংরাজি ভাষা চর্চায় উৎসাহ দেওয়া হবে।

অ-হিন্দিভাষী ভারতীয়দের আশঙ্কার প্রকৃত কারণ ছিল এই যে হিন্দি সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হলে, অ-হিন্দিএলাকা, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত, শিক্ষা, সরকারি চাকরী, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এঁরা আরো বলেন যে অ-হিন্দি এলাকার ওপর হিন্দি ভাষা আরোপ করার অর্থ হিন্দি বলয়ের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য।

সংবিধান প্রণেতারা সচেতন ছিলেন যে একটি বহুভাষী রাষ্ট্রের নেতা হিসাবে তাঁরা কোন ভাষাভিত্তিক অঞ্চলের স্বার্থকেই অবজ্ঞা করতে পারেন না। ফলে একটি আপোষ মীমাংসায় আসা হল—সংবিধান অনুযায়ী দেবনাগরী হরফে লিখিত ও আন্তর্জাতিক সংখ্যাসহ হিন্দিকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হল। পাশাপাশি এও বলা হল যে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ইংরাজীও সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে এবং তারপরও বিশেষ বিশেষ কারণে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার হবে কিনা তা সংসদকে বিধি প্রণয়ন করে স্থির করতে বলা হয়। হিন্দিভাষার উৎকর্ষ সাধনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সরকারের ওপর এবং যথাযথভাবে এই দায়িত্ব পালন হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য সংবিধান একটি কমিশন গঠনের এবং একটি সংসদীয় যুগ্ম কমিটি নিয়োগের নির্দেশ দেয়। রাজ্যস্তরে সরকারি ভাষা নির্ধারণের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বিধানমণ্ডলীর ওপর ন্যস্ত করা হল কিন্তু কেন্দ্রের সরকারি ভাষাই একটি রাজ্যের সঙ্গে অপর রাজ্যের এবং কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের যোসূত্রকারী ভাষা হবে।

সংবিধান প্রণেতারা আশা করেছিলেন যে ১৯৬৫ সালের মধ্যে হিন্দি ভাষার প্রবক্তারা হিন্দি ভাষার দুর্বলতা অতিক্রম করবেন এবং অ-হিন্দি এলাকাগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। পাশাপাশি এই প্রত্যাশাও ছিল যে শিক্ষার দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ভাষারও প্রসার ঘটবে এবং হিন্দির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দুর্বল হতে হতে এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষার প্রসার এত মন্থর গতিতে হয়েছিল যে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। উপরন্তু সরকারি ভাষা হিসাবে হিন্দির সাফল্যের সব থেকে বড় অন্তরায় ছিলেন হিন্দিভাষার প্রবক্তারা। ধীরে, ক্রমান্বয়ে ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অ-হিন্দি এলাকায় হিন্দিকে গ্রহণযোগ্য করে

তোলার পরিবর্তে উগ্র হিন্দিবাদীরা সরকারি সক্রিয়তার মাধ্যমে হিন্দি ভাষা আরোপ করার নীতি অবলম্বন করেন। এর ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক, সমাজ বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভাষা হিসাবে হিন্দি যথেষ্ট উন্নত ছিল না; সেই ভাষাকে উচ্চশিক্ষা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিষয়ে জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে পরিশীলিত না করে হিন্দিভাষী নেতৃবৃন্দের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সরকারি ভাষার মর্যাদা। আবার সহজ, বোধগম্য ভাষা হিসাবে হিন্দিকে গড়ে না তুলে এই গোষ্ঠী হিন্দি ভাষার সংস্কৃতায়নে প্রয়াসী হয়, ফলে, আরো বেশি মাত্রায় হিন্দি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়।

১৯৫৬-৬০ সালের মধ্যে সরকারি ভাষাকে কেন্দ্র করে তীব্র মত পার্থক্য আবার একবার প্রকাশ্যে আসে এবং তিক্ত বিভাজনের সৃষ্টি করে। ১৯৫৫ সালে বি, জি খেরের সভাপতিত্বে প্রথম সরকারি কমিশন নিয়োজিত হয়। ১৯৫৬ সালে এই কমিশন তার প্রতিবেদন জমা দেয়; এই প্রতিবেদনটি খতিয়ে দেখে একটি সংযুক্ত সংসদীয় কমিটি। এই কমিটি সুপারিশ করে যে কেন্দ্রিয় সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপে হিন্দি ভাষা ইংরেজির স্থান গ্রহণ করবে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবেই এই অবস্থান্তর ঘটবে, মসৃণভাবে এবং যতদূর সম্ভব কম অসুবিধা সৃষ্টি করে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ইংরাজিই প্রধান সরকারি ভাষা থাকবে, হিন্দি সহকারি সরকারি ভাষা হিসাবে কাজ করবে। ১৯৬৫ সালের পর যখন হিন্দি কেন্দ্রের প্রধান সরকারি ভাষার স্থান গ্রহণ করবে, তখন ইংরাজি সহকারি সরকারি ভাষা হিসাবে চলতে থাকবে। কেন্দ্রের কোন কাজে ইংরাজির ব্যবহারের উপর আপাতত কোন প্রকার নিষেধ আরোপ করা হবে না এবং ১৯৬৫-র পরও সংসদ বিধিদ্বারা যে সব কাজে ইংরাজির ব্যবহার অনুমোদন করবে সেই সব কাজে যতদিন প্রয়োজন ততদিন ইংরাজির ব্যবহার থাকবে, তবে কিছুকাল পর বিকল্প মাধ্যম হিসাবে হিন্দিকে স্বীকার করা হবে, যাতে প্রার্থীরা তাদের পছন্দমতো ইংরাজি বা হিন্দি যে কোন ভাষা বেছে নিতে পারে। রাষ্ট্রপতি একটি আদেশ দ্বারা উপরোক্ত সুপারিশগুলি কার্যকরী করার নির্দেশ দেন। প্রধান নির্দেশ ছিল বৈজ্ঞানিক, প্রশাসনিক ও বিবিধ ক্ষেত্রে হিন্দি পরিভাষা উদ্ভাবন এবং প্রশাসনিক ও কার্য-পরিচালনা বিষয়ক মুদ্রিত রচনাদির ইংরাজী থেকে হিন্দিতে অনুবাদ সম্পর্কে। পরিভাষা উদ্ভাবনের জন্য সরকারি ভাষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দুটি স্থায়ী কমিশন গঠন করা হয়েছিল—(১) সরকারি ভাষা (বিধানিক) কমিশন, (২) বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক পরিভাষা সম্পর্কিত কমিশন।

সরকারি ভাষা কমিশনে পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর প্রতিনিধি, অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পি. সুব্বারোযান কমিশনের প্রতিবেদনের তীব্র সমালোচনা করেন। কমিশনের সদস্যদের বিরুদ্ধে হিন্দির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলেন যে কমিশন হিন্দিভাষীদের স্বার্থ তুলে ধরেছে যারা

চিরতরে না হলেও, অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশেষ সুবিধা উপভোগ করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় হিন্দি প্রচারিনী সভার পশ্চিমবঙ্গ শাখার দায়িত্বে ছিলেন। অনুরূপভাবে হিন্দি প্রচারিনী সভার দক্ষিণ শাখার প্রাক্তন সভাপতি সি. রাজাগোপালাচারি ঘোষণা করেন, "হিন্দি ভাষার প্রবক্তাদের কাছে ইংরাজি যতটা বিদেশী, অ-হিন্দি ভাষী মানুষের কাছে হিন্দি ততটাই বিজাতীয়।" দক্ষিণ ভারতে "হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের" ধ্বনি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অপরদিকে, হিন্দির প্রবক্তারা, যেমন, পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন ও শেঠ গোবিন্দদাস সংযুক্ত সংসদীয় কমিটির বিরুদ্ধে ইংরাজির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন। হিন্দি ভাষী নেতৃবৃন্দের একাংশ পণ্ডিত নেহরু ও শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের কঠোর সমালোচনা করেন সাংবিধানিক বিধানগুলি কার্যকর করতে অযথা বিলম্ব করার জন্য। তাঁরা যথার্থই বুঝেছিলেন যে অবিলম্বে হিন্দিতে অবস্থান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করলে তবেই ১৯৬৫ সালের মধ্যে তা সম্পূর্ণ হবে। ১৯৫৭ সালে ড. রামমনোহর লোহিয়ার সংযুক্ত সমাজবাদী দল এবং জনসঙ্ঘ ইংরাজী থেকে অবিলম্বে হিন্দিতে অবস্তান্তরের দাবিতে জঙ্গী আন্দোলন শুরু করেন।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যথার্থই বুঝেছিলেন যে সরকারি ভাষার বিষয়টি ভারতীয় রাজনীতিতে গভীর বিভাজনের সৃষ্টি করতে চলেছে। চূড়ান্ত সাবধানতার সঙ্গে তাঁরা অ-হিন্দি এলাকার ক্ষোভ বিবেচনা করেছিলেন। লক্ষ্য ছিল একটি সর্বসম্মত মীমাংসায় উপনীত হওয়া। স্পষ্ট ভাষায় নেহরু পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে দেশের কোন অঞ্চলে সরকারি ভাষারূপে হিন্দি আরোপ করা যাবে না ও হবে না, এবং অ-হিন্দি ভাষী জনগণের ইচ্ছানুসারেই হিন্দিতে অবস্থান্তর সাধন করা হবে। এক্ষেত্রে নেহরু সমাজবাদী প্রজা পার্টি ও কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থন পেয়েছিলেন। ৭ই আগস্ট ১৯৫৯ সালে সংসদে প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে নেহরু সুনির্দিষ্টরূপে আশ্বাস দেন, "যতদিন জনসাধারণের প্রয়োজন থাকবে ততদিন আমি ইংরাজিকে একটি বিকল্প ভাষারূপে বজায় রাখব, এবং আমি এই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেব হিন্দি ভাষী জনগণের উপর নয়, অ-হিন্দি ভাষী মানুষদের উপর।" দক্ষিণ ভারতীয়দের আশঙ্কা প্রশমিত করতে তিনি আরো বলেন যে তাদের পক্ষে হিন্দি শেখা কখনোই বাধ্যতামূলক নয়। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১৯৬৩ সালে সরকারি ভাষা আইন পাশ হয়। এই আইনের উদ্দেশ্যে, নেহরুর ভাষায়, ১৯৬৫ সালের পর ইংরাজি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বিধিনিষেধ শিথিল করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য পূর্ণ মাত্রায় পূরণ হয়নি। আইন অনুসারে হিন্দির অতিরিক্ত ইংরাজি ভাষা ব্যবহৃত "হতে পারে"। "হবে" শব্দের পরিবর্তে "হতে পারে" ব্যবহার অ-হিন্দি গোষ্ঠীগুলির নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়ে তোলে। এই আইন তাদের চোখে বিধিবদ্ধ অঙ্গীকার বলে প্রতীয়মান হল না। তাঁরা চেয়েছিলেন লৌহ কঠিন প্রতিশ্রুতি, কারণ যদিও নেহরুর উপর তাঁদের অগাধ আস্থা ছিল, পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে তাঁরা সন্দিহান ছিলেন। পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে যে তাঁদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

২.১০ সংহতির পথে ভারতঃ উপজাতীয় নীতি ও উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ

ভারতীয় জনজীবনের মূলস্রোতে উপজাতীয় জনসমাজকে সংহত করার কাজমি অপেক্ষাকৃত জটিল। দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়গুলি এক পৃথক সংস্কৃতির অংশীদার। ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী সমগ্র জনসংখ্যার ৬.৯% হলেন উপজাতি জনসম্প্রদায়গুলি যাঁরা ন্যুনাধিক চার'শ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর পূর্ব ভারত ব্যতীত অন্য সব রাজ্যেই তাঁরা জনসংখ্যার সংখ্যালঘু অংশ। পার্বত্য ও বনাঞ্চলে বাস করার ফলে ঔপনিবেশিক আমলে তাঁরা অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করেছিলেন এবং অ-উপজাতীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আচার-ব্যবহারের পার্থক্য ছিল লক্ষণীয়ঙ্গ ঔপনিবেশিক শাসন একাধিক উপায়ে উপজাতীয় জনজীবনকে স্পশল করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের হাত ধরে আদিবাসী এলাকাগুলিতে বেশ কিছু বহিরাগত মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটে। এই অনুপ্রবেশকারীরা ছিল মহাজন, ব্যবসায়ী, রাজস্ব সংগ্রহকার, সরকারী কর্মচারী এবং অন্তবর্তী শ্রেণীর মানুষ যারা উপজাতি জনসমূহের হিরাচরিত জীবনযাত্রা ব্যাহত করেছিল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সম্প্রদায়গুলকে শোষণ করেছিল। ঔপনিবেশকি শাসনর পরিণামস্বরূপ উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলি জমির উপর তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। মহাজনের কাছে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে, অন্তবর্তী শ্রেণীর মানুষের দ্বারা শোষিত হয়, বন এব বন্য সামগ্রীর ওপর তাদের ঐতিহ্যগত অধিকরসমূহও ক্রমে লোপ পায়।

উপজাতি জনসমূহের টপ্রতি স্বাধীন ভারতের অনুসৃত নীতির মূল প্রেণা ছিলেন জওহরলাল নেহরু। তাঁর নির্ধারিত নীতির মূল সূত্র ছিল উপজাতি জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ। নেহরুর নিজের ভাষায়, "এখানে (উপজাতি অঞ্চলে) আমাদের সর্বপ্রথম যে সমস্যার মসম্মুখীন হতে হবে তা হল এদের (উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলিকে) আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে ভারতের সঙ্গে অভিন্ন বোধ জাগানো, এবং এই উপলব্ধির উন্মেষ ঘটান যে তারা ভারতবর্ষের অংশ এবং এখানে তাদের অবস্থান সম্মানজনক।" একই সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা তাদের চোখে শুধু প্রতিরক্ষা বিধানের শক্তিস্বরূপই নয়, পরিত্রাতাও বটে। নেহরুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় অনায়াসেই উপজাতি জন জীবনের বিশিষ্টতার স্থান সঙ্কুলান হবে।

নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতে উপজাতিদের প্রতি দু'ধনের দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। একটি মতানুসারে আদিবাসী জগত বহির্ভুত আধুনিক প্রভাবের দ্বারা আদিবাসী জীবনকে কলুষিত না করে তাদের বিচ্ছিন্ন রাখাই শ্রেয়। দ্বিতীয় মতটি আদিবাসীদের সম্পূর্ণ এবং যথাসম্ভব দ্রুত ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে স্বাঙ্গীকরণ করার পক্ষপাতী ছিল। আদিবাসী জীনযাত্রার ক্রমিক অবসান তাদের কাছে ছিল উন্নয়নের সমার্থক।

নেহরু দুটি সৃষ্টিকোণই বর্জন করেন। তাঁর মতে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির নিহিতার্থ ছিল উপজাতি জনগোষ্ঠীকে জাদুগরে সংরক্ষিত গবেষণঅ যোগ্য নমুনারূপে গণ্য করা। এক অর্থে এই দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্ত অবমাননাকর। তাছাড়া উপজাতি জীবনে বহির্জগতের অনুপ্রবেশ এতদূর াগ্রসর অগ্রসর হয়েছে যে এই প্রক্রিয়াকে বিপরীত দিকে চালিত করা আর কোনমতেই সম্ভব নয়। আবার ভারতীয় জনস্রোতের আদিবাসী জীবনকে গ্রাস করাও নেহরুর কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল না কারণ তার পরিণামে আদিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্ত্বা এবং বিশিষ্ট গুণাবলী লুপ্ত হবে। নেহরু চেয়েছিলেন উপজাতি জনসমাজে বিশিষ্ট সত্ত্বা ও সংস্কৃতি বজায় রেখে তাদের ভারতবর্ষের জাতীয় সত্তাবর অংশ হিসাবে গড়ে তুলতে। নেহরুর নীতির দু'টি স্থির সূচক ছিল উপজাতি জন সমাজের উনয়ন এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে উন্নয়ন।

আপাতদৃষ্টিতে দু'টি পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিকোণের সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে নেহরু কতগুলি মূলনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথম, কোন বহিরাগত প্রভাব বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, উপজাতি সম্প্রদায়গুলি নিজেদের স্বাবাবিক গুণাবলী অনুযায়ী উন্নয়নের পথে অগ্রসর হবে। অ-উপজাতীয় মানুষরা নিজেদের আপেক্ষিক উৎকর্ষতার কোন গুঢ়ৈষা নিয়ে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করবে না। দ্বিতীয়, জমি ও বনজ সম্পদের প্রতি উপজাতি গোষ্ঠীর অধিকারকে মর্যাদা দিয়ে বলা হয়েছিল যে বহিরাগতরা কোন জমি দখল করতে পারবে না। এছাড়া উপজাতি এলাকায় বাজার অর্থনীতির অনুপ্রবেশও কঠোরভাবে নিয়ন্তণ করা হয়েছিল। তঁতীয়, উপজাতি ভাষাসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন দেওয়া হয়। চতুর্থ, নীতিগতভাবে, উপজাতি অঞ্চলের প্রশাসনরে দায়িত্ব এই সম্প্রদায়ের মানুষের ওপরেই ন্যস্ত হবে, বহিরাগতরা অত্যন্ত কম সংখ্যায় এই কাজে নিযুক্ত হবেন। যথেষ্ট সংবেদনশীল ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদেরই এই দায়িত্ব দেওয়া হবে। পঞ্চম, উপজাতি এলাকাগুলির প্রশাসনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন না করাই বাঞ্ছনীয়, বরং লক্ষ্য হবে উপজাতি সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতি প্রতিষ্ঠাসমূহের মাধ্যমেই তাদের উন্নয়ন সাধন করা।

সরকারি নীতি রূপায়িত কারার প্রথম পদক্ষেপ ছিল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৬। এই অনুচ্ছেদে সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্র বিশেষ যত্নসহকারে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর, বিশেষ করে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের শিক্ষা ও আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করবে এবং সামাজিক অন্যায় ও সমস্ত রকম শোঐণ থেকে তাদের রক্ষা করবে। যে সব রাজ্য উপজাতি ক্ষেত্র আছে সে সব রাজ্যের রাজ্যপালদের উপজাতি জনসমাজের স্বার্থরক্ষার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যপাল নির্দেশ দিতে পারেন যে সংসদের বা রাজ্য বিধানমরডলের কোন বিশেষ অআইন রাজ্যর কোন তফসিলী ক্ষেত্রে বা তার কোন ভাগে প্রযুক্ত হবে না, অথবা তিনি ঐ আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারেন। একটি রাজ্যের তফসিলী ক্ষেত্রের শান্তি ও সুশাসনের

জন্য রাজ্যপাল প্রনিয়মসমূহ প্রণয়ন করতে পারেন যা (১) তফসিলী জনজাতিসমূহের সদস্যদের দ্বারা বা সদস্যদের মধ্যে ভূমির হস্তান্তর প্রতিষিদ্ধ বা সঙ্কুচিত করতে পারে, (২) তফসিলী জনজাতিসমূহের সদস্যদের ভূমি আবন্টন প্রতিনিয়ন্ত্রিত করতে পারে, (৩) তফসিলী জনজাতিসমূহের সদস্যদের সঙ্গে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে মৌলিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সংশোধন করা হয়েছিল। বিধানমণ্ডলী ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে উপজাতি তফসিলী জাতিও জনজাতিসমূহের সদস্যদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও সংবিধানে আছে। যে সব রাজ্যে তফসিলী ক্ষেত্রসমূহ আছে, সেইসব রাজ্যে র‍্যাষ্ট্রপতির নির্দেশে একটি জনজাতি মন্ত্রণা-পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ নিযুক্ত করবেন রাষ্ট্রপতি এবং পরিষদের কর্তব্য হবে সংবিধান অনুযায়ী তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতিদের জন্য বিহিত রক্ষাকবচগুলির সম্বন্ধে সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং রাষ্ট্রপতি যেরকম নির্দেশ দেবেন সেরকম সময় অন্তর ঐ রক্ষাকবচগুলির কাজকর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট দেওয়া।

সাংবিধানিক রক্ষাকবচ এবং কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উপজাতি জনসমাজের প্রগতি ও উন্নয়নের চিত্রটি বাস্তবে অতিশয় হতাশাব্যঞ্জক। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল ছাড়া অন্য সর্বত্র উপজাতি সম্প্রদায়গুলি আজও দারিদ্র ও ঋণের শিকার, ভূমিহীন এবং প্রায়শই কর্মহীন। কারণ, সদিচ্ছাপ্রণোদিত পরিকল্পনাগুলির দুর্বল রূপায়ণ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অনুসৃত নীতিগুলির মধ্যে প্রায়শই বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। আবার তফসিলী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ তহবিল কখনো সদ্ব্যবহারের অভাবে পড়ে থাকে, কখনো বা অর্থ ব্যয় করে অভীষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না, আবার অনেক সময় তহবিল তছরূপও হয়। উপজাতি ও জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে গঠিত জনজাতি মন্ত্রণা পরিষদ প্রত্যাশিত দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেনি। তফসিলী জনজাতি এলাকায় নিযুক্ত প্রশাসনিক ভারপ্রাপ্ত কর্বচারীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অর্ধপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অথবা উপজাতি সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট।

আইন ও আইনী ব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলি প্রায়শই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। বহিরাগতদের হাতে জমির হস্তান্তর রোধ করার সঙ্কল্পে আইনগুলি লঙ্ঘিত হওয়ার ফলে উপজাতি সমাজের মানুষরা ক্রমবর্ধমান হারে জমির উপর অধিকার হারাতে থাকে। অনেক এলাকায় খনি ও শিল্পের দ্রুত প্রসার এদের অর্থনৈতিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়েছে। একদিকে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মচারি ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে জঙ্গলের ঠিকাদারদের অশুভ আঁতাতের ফলে অরণ্য সংহার অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে, অন্য দিকে বন ও বনসম্পদের উপর উপজাতি সম্প্রদায়গুলির ঐতিহ্যগত অধিকার ক্রমাগত সঙ্কুচিত হচ্ছে। বন সংক্রান্ত আইন ও প্রতিয়িনমগুলিও বন দপ্তরের সহানুভূতিহীন ও দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীরা উপজাতি জনগোষ্ঠীকে য়েরান ও শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। উপজাতি জনসমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও নৈরাশ্যজনক।

উপরে পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে উপজাতি জনসমাজকে ভারতীয় রাজলনতিক ও সামাজিক জীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করার যে নীতিসমূহ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী অবলম্বন করেছিলেন তা নিংসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। এক কথায় এই নীতির অন্তর্হিত উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে উপজাতি জনজাতিগুলির চিরাচরিত অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ সংবিধানের বলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, উপজাতি জন সম্প্রদায়ের সত্ত্বা ও সংস্কৃতির প্রতি যথাযথ মযাদা জ্ঞাপন করে তাদের শিক্ষার পাদপ্রদীপে নিয়ে আসা ও তাদের সার্বিক উন্নতি সাধন করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই সমস্ত নীতি অক্ষরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে এবং বাতবিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের উপজাতি সংক্রান্ত নীতি ঔপনিবেশিক নীতিরই নয়া সংস্করণ হয়ে উঠেছে। রাজ্যস্তরে সরকারি উদাসীনতা , দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের অসংবেদনশীলতা ও দুর্নীতি, এদের একাংশের সঙ্গে রাজনীতিবিদ ও ঠিকাদারদের অশুভ আঁতা উপজাতিদের বিরাচরিত অধিকার সংরক্ষণ করারপরিবর্তে তা আরো সঙ্কুচিত করেছে। পরিণামও হয়েছে ভয়াবহ। অনগ্রসরতা, বঞ্চনা থেকে জন্ম নিয়েছে হতাশা, ক্রমবধমান অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও বৃত্তির ক্ষেত্রে বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের আকার ধারণ করেছে। পরিতাপের বিষয় এই উপজাতি জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মোকাবিলা করতে গিয়ে স্বাধীন ভারতের শাসকবৃন্দ সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তাদের ক্ষোভের প্রতিকার না করে, ঔপনিবেশিক শাসকদের াদলেই নিষ্ঠুর দমননীতির আশ্রয় নিয়েছে। ফলে আন্দোলনগুলি দমন করা সম্ভব হয়েছে এবং ভৌগলিক দিক থেকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি ভারতীয় রাজ্য সংঘের অংশ হিসাবে টিকে আছে। কিন্তু নেহরুর নীতির মূলভাব পরাস্ত হয়েছে—উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলি ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে অসম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতি জনগোষ্ঠী ঃ

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অসমের পার্বত্য এলাকায় প্রায় শতাধিক উপজাতি জনগোষ্ঠীর বাস। এরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক দুর্দশার শরিক হলেও এই অঞ্চলের কিছু বিশিষ্টতা ছিল। প্রথম, এই অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিসমূহ জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। দ্বিতীয়, ইংরেজ শাসনকালে এই এলাকার সঙ্গে অ-উপজাতি এলাকার অর্থনৈতিক সংস্রব ঘটলেও, বহিরাগতরা এই অঞ্চলে খুব বেশি মাত্রায় অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। তৃতীয়, এই অঞ্চলসমূহ অসম প্রদেশের অংশ হলেও তাদের পৃথক প্রশাসনিক মর্যাদা ছিল। এদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় ব্যাপক হস্তক্ষেপ করা হয়নি। উপজাতি সমাজ বহির্ভূত সমতলবাসীদের কৌম জমি করায়ত্ত করা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। পাশাপাশি ইংরেজ সরকার এই এলাকায় খ্রিস্টান মিশনারীদের অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়েছিল। মিশনারীরা যেমন বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করেন, তেমনই গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে ব্যাপক আকারে ধর্মান্তর সাধন করেছিলেন। মিশনারী কার্যকলাপ একাধারে উপজাতিদের আধুনিক ধারণার সঙ্গে পরিচিত করেছিল, জাতীয়তাবাদী প্রভাব থেকে তাদের

মুক্ত রাখতে সহায়তা করেছিল এবং অসম ও অবশিষ্ট ভারতের জনজীবন থেকে এদের বিচ্ছিন্নতায় উৎসাহ দিয়েছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই কিছু মিশনারী ও অন্যান্য বিদেশী কর্মকর্তারা উত্তর পূর্ব ভারতে পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রেরণা দিয়েছিল।

উত্তর পূর্ব ভারতের উপজাতি জনসমাজের অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে নেহরু যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "......তারা কোনদিনই ভারতবর্ষ নামক একটি দেশে বসবাস করার অনুভূতি ভোগ করেনি। বহিরাগতদের সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা ইংরেজ প্রশাসক ও খ্রিস্টান মিশনারীদের যারা তাদের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাবের জন্ম দিয়েছিলেন।" সুতরাং নেহরু সরকারের উপজাতি সংক্রান্ত নীতি উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে অধিকতর মাত্রায় প্রাসঙ্গিক ছিল। এই নীতির প্রতিফলন ঘটেছিল সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে যা শুধুমাত্র অসমের উপজাতি অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ষষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামের উপজাতি অঞ্চলগুলি শাসিত হবে স্বশাসিত জেলা হিসাবে। এই স্বশাসিত জেলাগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্বাহিক প্রাধিকারের বাইরে নয়, কিন্তু কতকগুলি বিধানিক ও বিচারিক কর্মসম্পাদনের জন্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পরিষদগুলি মুখ্যত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা। তাদের কতকগুলি বিশেষক্ষেত্রে বিধিপ্রণয়নের ক্ষমতা আছে। যেমন—সংরক্ষিত বন ছাড়া অন্যান্য বন পরিচালন, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ ও সামাজিক প্রথা। রাজ্যপাল এই পরিষদগুলিকে কোনো কোনো মামলা বা অপরাধের বিচার করার ক্ষমতাও অর্পণ করতে পারেন। এই পরিষদগুলির ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করার এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট করে ধার্য করার ক্ষমতাও আছে। তবে এই পরিষদগুলি কর্তৃক প্রণীত কোনো বিধি রাজ্যপালের সম্মতি না পেলে কার্যকর হবে না। এই তফসিলের উদ্দেশ্য ছিল উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলিকে নিজস্ব পদ্ধতিতে জীবনধারণ করতে সহায়তা করা। উপজাতি জনসমূহকে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন প্রদান করার অভিপ্রায়ে ভারত সরকার সংবিধানের অধিকতর সংশোধন করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল। পাশাপাশি নেহরু স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সরকার কোনপ্রকার বিচ্ছিন্নতাবাদ বা হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ বরদাস্ত করবে না।

অসমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিকে নিয়ে ১৯৪৮ সালে নেফা (NEFA—North East Frontier Agency) বা উত্তর পূর্ব সীমান্ত অনুসংগঠন সৃষ্টি নেহরু ও ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ার এলউইনের উপজাতি নীতির শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ। অসমের প্রশাসনিক এক্তিয়ারের বাইরে একটি বিশেষ প্রশাসনের অধীনে নেফা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে নেফা অরুণাচল প্রদেশ নাম প্রাপ্ত হয় এবং পৃথক রাজ্যের মর্যাদা পায়। একদিকে যখন নেভা ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছিল, সমস্যা দেখা দেয় অসমের প্রত্যক্ষ এক্তিয়ার ভুক্ত অন্যান্য উপজাতি অঞ্চলে। সমতলভূমির বাংলা ভাষী ও অসমীয়া ভাষী অধিবাসীদের সঙ্গে পার্বত্য উপজাতি সম্প্রদায়ের কোন সাংস্কৃতিক সৌসাদৃশ্য ছিল না। উপরন্তু

উপজাতি গোষ্ঠীগুলির আশঙ্কা ছিল অসমীকরণের নীতি তাদের উপজাতি সত্ত্বার বিলোপ সাধন করে অসমীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের একীভূত করবে। উপজাতি এলাকায় কর্মরত অ-উপজাতীয় শিক্ষক, চিকিৎসক, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী প্রভৃতির শ্রেষ্ঠাভিমান তাদের কাছে ছিল বিশেষ আপত্তিজনক। উপজাতি সম্প্রদায়গুলির ক্ষোভের অন্যতম কারণ ছিল তাদের স্বার্থ সম্বন্ধে অসম সরকারের প্রযত্ন ও সহানুভূতির অভাব। অসম সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে উপজাতি জনসমূহের একাংশের মধ্যে পৃথক পার্বত্য রাজ্যের দাবি দানা বাঁধে। ১৯৬০-এর দশকে এই দাবি আরো জোরদার হয়ে ওঠে যখন রাজ্যের নেতৃবৃন্দ অসমীয় ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন করে। ১৯৬০ সালে পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলি একত্রে সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃবৃন্দের সম্মেলন (All Party Hill Leaders' Conference) আহ্বান করে এবং পুনরায় ভারতীয় সংঘের অভ্যন্তরে পৃথক রাজ্যের দাবি তোলে। অসম সরকারি ভাষা আইন যখন প্রশাসনিক কার্যে উপজাতীয় ভাষাগুলির ব্যবহারের দাবিকে নস্যাৎ করে অসমীয় ভাষাকে রাজ্যের সরকারি ভাষার মর্যাদা দেয়, তখন উপজাতি অধ্যুষিত জেলাগুলিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পৃথক রাজ্যের দাবি গুরুতর আকার ধারণ করে। ১৯৬২-র নির্বাচনে বিধানসভার অধিকাংশ আসনই পৃথক রাজ্যের প্রবক্তাদের দখলে চলে যায় যাঁরা বিধানসভা বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন। দীর্ঘ সংগ্রাম ও আলাপ আলোচনার পর অবশেষে ১৯৬৯ সালে অসম থেকে মেঘালয়কে বিচ্ছিন্ন করে "রাজ্যের অভ্যন্তরে একটি রাজ্য" হিসাবে গঠন করা হয়, আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি ব্যতীত স্বশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। মেঘালয়ের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা অসম সরকারের দায়িত্ব থেকে যায়।

নাগাল্যাণ্ড :

নাগা সম্প্রদায় অসম-ব্রহ্মদেশ সীমান্ত বরাবর নাগা পর্বতের অধিবাসী। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী সংখ্যায় পাঁচ লক্ষ নাগা সম্প্রদায় ভারতীয় জনসংখ্যার ০.১ শতাংশেরও কম, এবং বিভিন্নভাষী উপজাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভারত সরকার নাগা উপজাতিগুলিকে অসমের সঙ্গে এবং সামগ্রিকভাবে ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে সচেষ্ট হয়। নাগা নেতৃবৃন্দের একাংশ এই সমাকলন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে এবং ফিজোর নেতৃত্বে স্বাধীনতার দাবিতে সহিংস অভ্যুত্থানের পথে যায়। নেহরুর সামগ্রিক উপজাতি সংক্রান্তনীতির সঙ্গে সংগতি রেখে ভারত সরকার এক দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে। দৃঢ় ভাষায় সরকার জানিয়ে দেয় যে নাগা অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি এবং সহিংস আন্দোলন বরদাস্ত করা হবে না। ১৯৫৫ সালে নাগাল্যাণ্ডে আইন শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করতে ভারত সরকার সেনা পাঠিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করে। পাশাপাশি নেহরু সরকার নরমপন্থী নাগা নেতৃবৃন্দের দিকে সৌহার্দের হাত বাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর অবশেষে ১৯৬৩ সালে ভারতীয় সংঘের অভ্যন্তরে পৃথক নাগাল্যাণ্ড রাজ্য সৃষ্টি করা হয়।

নাগা অভ্যুত্থানের কয়েক বছরের মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মিজো জেলায় অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ১৯৪৭ সাল থেকেই ব্রিটিশ প্রশাসনদের মদতে এই অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতার জন্ম হয়, কিন্তু এই প্রবণতা তরুণ মিজো নেতৃবৃন্দের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয় কারণ তাঁরা মিজো সমাজের গণতন্ত্রীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অসম বিধানমণ্ডগুলীতে পর্যাপ্ত মিজো প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলি নিয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু অসমীয় ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা পেলে লালডেঙ্গার সভাপতিত্বে মিজো জাতীয় মোর্চা গঠিত হয় (Mizo National Front)। এই মোর্চা ভারতের থেকে বিচ্ছিন্নতার দাবিতে জঙ্গী আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৭ সালে মিজোরাম একটি পৃথক রাজ্য হিসাবে গঠিত হয়।

২.১১ গণতন্ত্রের পথে ভারত

নেহেরু পরিচালিত স্বাধীন ভারতের রাজনীতির দ্বিতীয় অধ্যায়, অর্থাৎ, ১৯৫১ পরবর্তী যুগটি ছিল রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতা যুগ। এই পর্বে অর্জিত কৃতিত্বসমূহের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভারতীয় রাজনীতিতে দৃঢ়ভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং নির্বাচন পদ্ধতির সূচনা করা। রাজন্যশাসিত অঞ্চলগুলির অন্তর্ভুক্তি আঞ্চলিক পুনর্গঠনের প্রাথমিক পর্বের সমাধা করেছিল। কিন্তু ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি, সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সমস্যা, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সমস্যা ভারতীয় রাজনীতিতে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করছিল তা দক্ষতার সঙ্গে প্রশমিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল দায়িত্বশীল প্রতিনিধিমূলক সরকারের। আবার অদক্ষভাবে মোকাবিলা করলে এই সমস্যাগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিত যা অনায়াসেই নতুন রাষ্ট্রটির সংহতি বিপন্ন করত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সূচনার গুরুত্ব সহজেই চোখে পড়ে।

২.১১.১ গণতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে ঃ

ভারতবর্ষ সম্ভবত একমাত্র উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যেখানে সাম্রাজ্যবাদের অবসানে গণতন্ত্র স্থায়ী হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্তটিঅবিসংবাদিতভাবে গৃহীত হয়নি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা হয়েছিল। প্রথমত, কোন কোন মহল থেকে বলা হয়েছিল যে গণতন্ত্র ও নাগরিক সভ্যতার ধারণা ও আদর্শ পাশ্চাত্য সমাজে উদ্ভূত। এই সমাজের বিশেষ পরিস্থিতি থেকে এই ধারণাগুলিকে কখনোই বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিরক্ষরতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, ধর্ম, শ্রেণী ও জাত-পাতের ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত সমাজে সংসদীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ অথবা সাম্যতন্ত্র শিকড় গাড়তে পারে না। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষের মত দারিদ্র কন্টকিত দেশে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ অচল কারণ এহেন অনুন্নত দেশের দরিদ্র জনসাধারণ গণতান্ত্রিক

অধিকারের চেয়ে বেশি আগ্রহী হবে "এক গ্রাস অন্নে" এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাদের কাছে হবে অর্থহীন যদি তা তাদের পর্যাপ্ত খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থানের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে নেহরু ভাববাদীতার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলেছিলেন যে, আজ না হোক কাল দরিদ্র জনগণ ভোটাধিকারের মাধ্যমে নিজেদের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা ব্যবহার করে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে যা তাদের প্রয়োজন-গুলির প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। যাই হোক, এইভাবে সমস্ত বিরোধিতা নস্যাৎ করে ভারতীয় গণ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে গণতন্ত্র ও নাগরিক স্বাধীনতার অঙ্গীকার নেন, এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বাতাবরণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

২.১১.২ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি ঃ

সংবিধান ভারতের জন্য বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিধান দেয়। স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র নেতারা কিভাবে গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করেন এবং নেহরুর যুগে এই প্রচেষ্টা কতদূর সফল হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করার আগে স্বাধীনতার প্রাক্কালে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

(ক) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঃ

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দল, নির্বাচন প্রক্রিয়া ও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা ঔপনিবেশিক যুগে ধীরে, পর্যায়ক্রমে বিবর্তিত হয়েছে। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতঙৃত্ব দান করেছিল এবং স্বাধীন ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছিল। অন্তবর্তী সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটেছে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক সূচনা হয়েছি ব্রিটিশ সরকারের কাছে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য আবেদন নিবেদনকারী একটি সংঘবদ্ধ শিরোমণি গোষ্ঠীর সংগঠন হিসাবে। ১৯২০ সালের পর কংগ্রেস হয়ে ওঠে একটি গণ-সংগঠন যা একদিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জনগণকে সক্রিয় করার কর্মসূচী গ্রহণ করে ও অপরদিকে প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর নির্বাচনে অংশ নিতে শুরু করে। ১৯৩৫ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন চালু হলে ব্রিটিশ শাসনাধীন অধিকাংশ প্রদেশে শাসক দল হিসাবে কংগ্রেসের তৃতীয় পর্যায়ের বিবর্তন সূচিত হয়, যার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে স্বাধন ভারতের শাসক দল হিসাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান কংগ্রেসের সামনে সব থেকে বড় যে প্রশ্ন উত্থাপন করে তা হল আদৌ একটি দল হিসাবে কংগ্রেসো অস্তিত্ব থাকবে কি না। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে গড়ে তুলেছিলেন নিছক একটি রাজনৈতিক দলের ভূমিকা পালন করার জন্য নয়, জাতীয় স্বার্থের মুখপাত্রস্বরূপ গঠনমূলক কর্মসূচী রূপায়ণের হায়িার রূপেও বটে। গঠনমূলক কর্বসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বদেশীর রাজনীতি বহির্ভূত অংশ—চরকায় সুতো কাটা

ও খাদি পরিধানে উৎসাহ দেওয়া থেকে শুরু করে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন ও অস্পৃশ্য জাতিগুলির উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিনগুলিতে গঠনমূলক কর্বসৌচীর একটা বাস্তব উপযোগিতা ছিল। সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির মুখে পড়ে যখন কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনগুলি পিছু হটতে বাধ্য হত তখন এই কর্মসূচী কংগ্রেস কর্মীদের সক্রিয় রাখতে সাহায্য করত। গান্ধী চেয়েছিলেন যে এই রাজনীতি বহির্ভূত কর্মসূচীই কংগ্রেসের সামগ্রিক কর্মসূচী হয়ে উঠুক। তিনি সম্ভবত দলীয় রাজনীতি ও আন্দোলনের রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। তাঁর কাছে কংগ্রেসের অর্থ ছিল জাতির সামগ্রিক সেবামূলক কাজ, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল নয়। তগে বংগ্রেসের অপর কোন নেতাই গান্ধীর সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। কংগ্রেসের মত একটি শক্তিশালী রাজনৈকি যন্ত্রকে ভেঙে ফেলতে কেউই বড় একটা আগ্রহী ছিলেন না। গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রস্বা পেশ করার আগেই কংগ্রেসের সধারণ সম্পাদক শঙ্কররাও দেও একটি দলীয় বিজ্ঞপ্তিতে বলেন সংকট ও পরীক্ষার আগামী দিনগুলিতে ভারতের ঐক্য ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজন মেটাতে পারে একটি "বৃহৎ রাজনৈতিক দল"। অতএব কংগ্রেসের ধারাবাহিকতার প্রয়োজন প্রশ্নাতীত। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গংগ্রেস সেই সময়কার সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য রানৈতিক দল হিসাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখল।

আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি বণ সসংগঠন যার চাঁদাভিত্তিক সদস্যপদ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। সাংগঠনিক দিক থেকে এই দল পদমর্যাদা অনুযায়ী নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত স্তরে বিভক্ত। সর্বনিম্নে আঞ্চলিক কমিটি, তার উপর জেলা কমিটি, এবং জেলা কমিটির উপর রাজ্য কমিটি। রাজ্য কমিটির উপর সর্বভারতীয় কমিটি যী শীর্ষে একজন নির্বাচিত সভাপতির নেতৃত্বে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি আছে। নেহরুর আমলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে সংসদীয় পর্ষৎ দলের সদস্যদের রাজ্য বিধানমণ্ডলী ও সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করত। নেহরুর সময় এই আনষ্ঠানিক গঠন কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ হলেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল আঞ্চলিক থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত গোষ্ঠীগত সম্পর্কের শৃঙ্খলা। প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ কমিটির নিয়ন্ত্রণের জন্য গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব দেখা যেত। দলের অভ্যন্তরে এই উপদলীয় বিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল রাজ্যস্তরে সরকার গঠনের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতটি রাজ্যেই দল দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ত— একটি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী যারা সরকার এবং কখনো কখনো দলীয় সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করত এবং একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী যারা দলীয় সংগঠনকে হাতিয়ার করে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে লিপ্ত হত। সুতরাং ১৯৫০ ও '৬০-এর দশকে কংগ্রেস নীতির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে ব্যক্তিগত সুবিধাবাদের দ্বারাই চাতি হত। সমস্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরে এসে পরিসমাপ্ত হত যেখানে ১৯৫-৫১-র পর থেকে নেহরু নীতি ও রাজনীতির অবিসংবাদিত কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ঐ সময় জাতীয় নেতৃত্বকে "হাইকমান্ড"

বলে অভিহিত করা হত, এবং অন্তর্ভুক্ত হতেন নেহরুর ঘনিষ্ঠ রাজনীতিবিদরা। রাজ্যস্তরে গোষ্ঠী সংঘাত যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে দলীয় সংহতিকে বিপন্ন করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করত, তখন নেহরুর ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত রাজনীতিবিদরা দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে দলীয় সংহতি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা সুরক্ষিত করতেন।

সাম্রাজ্যবাদের অবসানে কংগ্রেস যখন স্বাধীন ভারতের শাসকদল রূপে প্রতিষ্ঠিত হল তার সামনে সব থেকে বড় প্রশ্ন ছিল দলীয় নেতৃত্ব ও সরকারের সম্পর্ক। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে নেহরু যখন অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করেন তখনই তিনি দলীয় সভাপতিত্ব থেকে ইস্তফা দেন কারণ সরকারের নেতা ও দলীয় সভাপতির যুগ্ম দায়িত্ব পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কংগ্রেস সভাপতি পদে তাঁর উত্তরাধিকারী জে. বি কৃপালনী দাবি করেছিলেন যে সরকারি নীতি নির্ধারণে দলের সভাপতির ও কার্যনির্বাহী কমিটির প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকবে এবং এদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরেই সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও সরকারি ক্ষমতায় আসীন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁদের মতে সরকারি কার্যাবলী ও নথিপত্র সম্বন্ধে চূড়ান্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং সরকার বহির্ভূত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে তা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয়। দল নিঃসন্দেহে দীর্ঘমেয়াদী নীতি ও লক্ষ্য স্থির করে দেবে কিন্তু কখনোই শাসনতন্ত্রে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করবে না। সংবিধান অনুযায়ী সরকার নির্বাচিত বিধানমণ্ডলীর কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, দলের কাছে নয়। সরকারের পরিপ্রেক্ষিতে দলের এই গৌণ অবস্থান মেনে নিতে অস্বীকার করে কৃপালনী দুই বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করেন (নভেম্বর, ১৯৪৭)। তাঁর বক্তব্য ছিল যে সরকার ও দলের কোন সমন্বয় নেই এবং সভাপতি হিসাবে তাঁর অবস্থান অসম্ভব হয়ে উঠেছিল কারণ তিনি মন্ত্রীত্বে আসীন সদস্যদের আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারেননি। এক বছরের জন্য কৃপালনীর স্থলে অভিষিক্ত হন রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং পরবর্তী দুই বছরের জন্য পট্টভী সিতারামাইয়া। এঁরা কেউই সরকারের সঙ্গে সাংগঠনিক শ্রেষ্ঠত্ব বা সমতার প্রশ্ন তোলেননি এবং সভাপতির কার্যাবলী সাংগঠনিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তবে এই বিতর্ক পাকাপাকিভাবে মিটে যায়নি।

১৯৫০ সালের আগস্ট মাসে দলীয় সভাপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নেহরুর সঙ্গে দলের দক্ষিণপন্থীদের সংঘাত প্রকাশ্যে আসে এবং এক বছর ধরে চলে। এই দ্বন্দ্বে নীতি ও আদর্শগত প্রশ্ন জড়িত ছিল ঠিকই কিন্তু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে নতুন পদাধিকারীরা দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়নে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনজন প্রার্থী দলের সভাপতিত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন— সর্দার প্যাটেল সমর্থিত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, নেহরু সমর্থিত জে, বি কৃপালনী এবং শঙ্কর রাও দেও। ট্যাণ্ডনের রক্ষণশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নেহরু তাঁর বিরোধী ছিলেন, এবং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে

দেন যে ট্যাণ্ডন নির্বাচিত হলে নেহরুর পক্ষে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরূপে থাকা, এমন কি সরকার চালানো পর্যন্ত কঠিন হয়ে উঠবে। অপরদিকে ট্যাণ্ডনের সমর্থকরা আশা করেছিলেন যে তাঁর নির্বাচন নেহরুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়ক হবে এবং নেহরুর আর্থ সামাজিক ও পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন আনবে। ট্যাণ্ডন সভাপতি পদে নির্বাচিত হন এবং কার্যনির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি তাঁর অনুগামীদের দিয়ে পূর্ণ করা হয়।

কৃপালনী কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করে ট্যাণ্ডনের সক্রিয় বিরোধিতা করতে থাকেন। এর ফলে বিস্তর তিক্ততার সৃষ্টি হয়। অবশেষে কর্মসমিতির নির্দেশানুসারে তিনি এই সংগঠন ভেঙে দেন। ১৯৫১-র শেষের দিকে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে কিষান মজদুর প্রজা পার্টি গঠন করেন। দক্ষিণপন্থী নেতারা প্রগতিবাদীদের নিয়ন্ত্রণ করার সাফল্যে বিভোর। নেহরু সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধেও একই অস্ত্র প্রয়োগ করেন।

ট্যাণ্ডন কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর দল ও সরকারের সম্পর্কের প্রশ্নটি আবার একবার উঠে আসে। ট্যাণ্ডন ও তাঁর অনুগামীরা দাবী করেন যে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদ দলীয় আজ্ঞা কার্যকরী করবে এবং সরকারি নীতি রূপায়িত করার ক্ষেত্রে দলের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। এই পর্যায়ে নেহরু দলের অভ্যন্তরে সমস্ত বিরোধিতা নির্মূল করতে মরীয়া হয়ে ওঠেন। প্যাটেলের মৃত্যু (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০) হলে দল নেহরুর কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং তিনি সরাসরি দলীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ শুরু করেন। এই সময় একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজনৈতিক সংগ্রামী রূপে নেহরুর উত্থান সম্পূর্ণ হয়। অবিচল পদক্ষেপে তিনি দলীয় সংঘাতের স্থায়ী নিষ্পত্তির দিকে অগ্রসর হন। সম্ভবত তাঁর লক্ষ্য ছিল আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা কারণ এই মনোনয়নগুলিই বিধানমণ্ডলী এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার চরিত্র নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল দৃঢ় ভাষায় একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করে দলের অভ্যন্তরে দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করা এবং আরো এক পা এগিয়ে কোন সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সঙ্গে সংস্রব নিষিদ্ধ করা। দলের প্রার্থী হিসাবে তিনি "প্রগতিশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির" সদস্যদের আহ্বান জানান। আসলে নেহরু চেয়েছিলেন দলীয় সংহতি ব্যাহত না করে দল বা আসন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় দক্ষিণপন্থীদের আধিপত্য খর্ব করা। অসামান্য নৈপুণ্য, দৃঢ়তা এবং রাজনৈতিক প্রতিভার বলে তিনি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে তাঁর আর্থ সামাজিক ও পররাষ্ট্র নীতি অনুমোদন করিয়ে নেন। অতঃপর তিনি দলের উপর সামগ্রিক কর্তৃত্ব দাবি করেন : হয় ট্যাণ্ডন কর্মসমিতির পুনর্গঠন করবেন নচেৎ নেহরু পদত্যাগ করবেন। এই দাবি পেশ করে নেহরু পরোক্ষভাবে ট্যাণ্ডনের বহিষ্কারের পথটি প্রস্তুত করেছিলেন। ৬ই আগস্ট ১৯৫১ নেহরু কর্মসমিতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন সমিতি থেকে পদত্যাগ করে সদস্যদের বাধ্য করেন তাঁর এবং ট্যাণ্ডনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে। সদস্যদের

মধ্যে দ্বিমতের কোন অবকাশ ছিল না। তাঁরা এবং ট্যান্ডন নিজেও পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন যে আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য সুনিশ্চিত করতে নেহরুর নেতৃত্ব অপরিহার্য ছিল। অতএব ব্যাণ্ডন নেহরুর পদত্যাগ স্বীকার না করে নিজেই ইস্তফা দেন। নেহরু কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। যদিও নীতিগতভাবে নেহরু একই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রীত্ব ও দলীয় সভাপতিত্বের বিরোধী ছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন "বিশেষ পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায়"। দলের অভ্যন্তরে অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে নেহরুর উত্থান সম্পূর্ণ হয়। আমৃত্যু তিনি দলের ও সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করেন।

(খ) ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি ঃ

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ও বিভিন্ন পর্যায়ের চরমপন্থী দল ও রাজনীতি স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ত্রিশের দশক থেকে বামপন্থী ধারা দুটি মূল স্রোতে বিভক্ত হয়ে পড়ে—সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট। স্বাধীনতার পর দুটি আন্দোলনই অসংখ্যবার বিভাজিত হয়েছে। ফলে স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে অ-কমিউনিষ্ট বাসেমর অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে বিভাজন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিণামে ঘটেনি, ঘটেছে নীতিগত কারণে। বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের এবং বামপন্থী দলগুলির নিজেদের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পার্থক্য ছিল। সমাজবাদী দলগুলি যেখানে শ্রমনিবিড় ছোট মাপের শিল্পের বিকাশ বেং বিকেন্দ্রীভূত যোজনা পদ্ধতির গান্ধীবাদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমর্থন করেছিল, কমিউনিস্টদের দাবি ছিল কংগ্রেস অনুসৃত শিল্পায়নের নীতির থেকে আরো ব্যাপক হারে ভারী শিল্পের বিকাশ। আবার দক্ষিণ এশিয় রাজনীতিতে ভারতের স্বাধীন স্বতন্ত্র্য ভূমিকার উপর জোর দিয়ে সমাজবাদীরা আন্তর্জাতিক সমস্যায় একটি বিশিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা তাকিয়ে ছিল বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের দ্বন্দ্বের দিকে এবং সেই দ্বন্দ্বে তারা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার নীতি অনুসরণ করেছিল। সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনগুলির সমর্থন প্রধানত আঞ্চলিক। কমিউনিস্ট আন্দোলন সেই সমস্ত অঞ্চলেই শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস দল আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি, যেমন কেরল, অন্ধ্র। অনুরূপভাবে সমাজবাদী আন্দোলনের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ১৯৪২-র ভারত ছাড় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তরুণ সমাজতন্ত্রীরা। সুতরাং এই আঞ্চলিক সমর্থন উৎসারিত হয়েছিল রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি থেকে, অর্থনৈতিক পেক্ষাপট থেকে নয়।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে কমিউনিস্ট পার্টির সব থেকে বড় সম্পদ ছিল অসামান্য যোগ্যতাসম্পন্ন একাধিক নেতৃবৃন্দ এবং অসংখ্য একনিষ্ঠ, সুশৃঙ্খল ও পরিশ্রমী সদস্য ও কর্মীবৃন্দ। স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম পর্যায়ে কমিউনিস্টরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে আহ্বান করেছিল

নেহরুর পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক শক্তিগুলিকে পরাস্ত করতে। কিন্তু সোভিয়েত নির্দেশে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর থেকেই তারা বলতে শুরু করে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মেকী ("ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়")। ১৫ই আগস্টকে তারা জাতীয় প্রবঞ্চনার দিন হিসাবে চিহ্নিত করে বলে যে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র পরিগ্রহ করেছে এবং নেহরু সাম্রাজ্যবাদের দালালস্বরূপ ফ্যাসিস্ট কায়দায় সরকার পরিচালনা করছেন। সংবিধানকে তারা বর্ণনা করে দাসত্বের সনদ রূপে। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সামন্ততন্ত্র বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নেয়। এই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলনকে প্রলম্বিত করা হয়। হায়দ্রাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন এখন ভারত বিরোধী আকার ধাণ করে। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৫১ সালের শেষের দিকে যখন অজয় ঘোষ দলের সাধারণ সম্পাদক, স্ট্যালিনের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় কমিউনিস্ট পার্টি তখন তাদেররণনীতি পরিবর্তন করে। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে পূর্বেকার নীতিগত অবস্থান বজায় রেখে তারা সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী পিছিয়ে দেয় এবং আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ভারতীয় গ্রামীণ শ্রেণীগুলির সুস্পষ্ট পৃথকীকরণের অভাব ও আঞ্চলিক স্তরে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের ফলে বামপন্থী দলগুলির পক্ষে শুধুমাত্র দারিদ্র্য ও ভূমিহীন রায়তদের স্বার্থ তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। বরং তারা শ্রেণীসমষ্টিগত কৌশল অবলম্বন করেছিল এবং শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাই হোক, প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দল সেইসব অঞ্চলেই মনোনিবেশ করেছিল যেখানে তার সমর্থন নিশ্চিত ছিল, অর্থাৎ, যে অঞ্চলগুলি পরবর্তীকালে অন্ধ্র ও কেরল বলে পরিচিতি হয়েছিল। মোট প্রদত্ত ভোটের ৪.৬% ভোট পেয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট দল বৃহত্তম বিরোধী দল হিসাবে উঠে আসে। এই ফলাফল থেকে মনে হয়েছিল যে কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিপ্লবের অপরিহার্যতা, নেহরু সরকারের গঠনমূলক কর্মসূচীর প্রতি দলের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অভ্যন্তরীণ নীতিগত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কামিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক অবস্থানে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। প্রথম, ১৯৫৩ সালের মাদুরাই অধিবেশনে দল স্বীকার করে নেয় যে ভারত সরকার একটি স্বাধীন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে কিন্তু পুনরাবৃত্তি করে বলে যে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তার নীতি সমূহের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী নীতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। দ্বিতীয়, ১৯৫৬ সালের পালঘাট অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টি দেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয় এবং ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম গণরাজ্যের মর্যাদা দেয়। কিন্তু তারা বলে যে

সরকার জনবিরোধী নীতি অনুসরণ করে পুঁজিবাদীর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী। সুতরাং ''প্রতিক্রিয়াশীল'' কংগ্রেস সরকারকে গদীচ্যুত করতে একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তৃতীয়, ১৯৫৮ সালের অমৃতসর অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে যে শান্তিপূর্ণ ও সংসদীয় পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই অধিবেশনে আরো বলা হয় যে ক্ষমতায় এলে কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ নাগরিক স্বাধীনতা প্রদান করবে, এমনকি বিরোধী দলগুলির সমালোচনার অধিকারও স্বীকৃতি পায়। চতুর্থ, বিজয়ওাড়া অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের প্রতি সংগ্রাম ও সহযোগিতার দ্বৈতনীতি গ্রহণ করে।

আপাতদৃষ্টিতে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে ঐক্যমত বজায় থাকলেও কিছু আন্তর্জাতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য আবার তীব্র আকার ধারণ করে। স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সমালোচনা, চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিভেদ এবং সবশেষে ১৯৬২-এর ইন্দো-চীন যুদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ১৯৬৪ সালে দক্ষিণপন্থী সোভিয়েত অনুগামী গোষ্ঠী সি.পি.আই. এবং বামপন্থী সি.পি.এম. দলের প্রকাশ ঘটে। ভারতের জাতীয় জীবনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক বিপিনচন্দ্র বলেছেন যে কমিউনিস্টরা ভারতীয় রাজনীতির বাস্তবতা যথার্থ অনুধাবন করতে পারেননি। এই কারণেই কিছু অঞ্চলের বাইরে বৃহত্তর বারতীয় জনজীবনে তাঁরা কোনো বড় মাপের প্রভাব ফেলতে পারেননি।

(গ) সমাজবাদী দল ঃ

সমাজবাদী দল তার জন্মলগ্ন (১৯৩৪) থেকেই কংগ্রেসের অঙ্গ ছিল যদি তার নিজস্ব পৃথক সংবিধান, সদস্যপদ, নিয়ম শৃঙ্খলা ও মতাদর্শ ছিল। স্বাধীনতার সময় সমাজবাদী দলের সব থেকে বড় সম্পদ ছিল তার নেতৃবৃন্দ—জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, অচ্যুত পটবর্ধন, অশোক মেহতা, রামমনোহার লোহিয়া প্রমুখ। ১৯৪৮ সালের শুরুর দিকে যখন কংগ্রেস নিয়ম করে যে তারা সদস্যরা এমন কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবে না যার পৃথক সংবিধান ও নিয়মশৃঙ্খলা আছে, সমাজবাদীরা কংগ্রেস ত্যাগ করে। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের মতে সমাজবাদীদের এই সিদ্ধান্ত ছিল একটি ঐতিহাসিক ভুল। কারণ কংগ্রেসের সর্বব্যাপী চরিত্রের মধ্যে মতপার্থক্য যথাযথ স্থান পেত। কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল সাংগঠনিক ঐক্য আরোপ করা, আদর্শগত অভিন্নতা নয়। যাইহোক, ১৯৫১-৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে সমাজবাদী দল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। প্রদত্ত ভোটের ১০.৬% লাভ করে লোকসভায় ১২টি আসন দখল করে। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস সদস্যদের নিয়ে গঠিত কিষাণ মজদুর প্রজাপার্টি সাধারণ নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের দ্বারা কোনঠাসা হয়ে যাবার আশঙ্কায় ১৯৫২ সালে সমাজবাদী দল ও কিষান মজদুর প্রজাপার্টি একত্রিত হয়ে সমাজবাদী প্রজাপার্টি গঠন করে। গোড়া থেকেই নীতিগত ও গোষ্ঠী সংঘাত, অদক্ষ ও পরিবর্তনশীল নেতৃত্ব এই সংগঠনের সম্ভাবনাকে ম্লান করে দিয়েছিল।

(ঘ) ভারতীয় জনসঙ্ঘ ঃ

১৯৫১ সালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে জনসঙ্ঘ তার রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করে। এই দল মূলত একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন, অর্থাৎ, সাম্প্রদায়িক মতাদর্শকে ঘিরে গঠিত একটি সংগঠন। এ ধরনের সংগঠনের সাধারণত কোন কর্মসূচি বা সুনির্দিষ্ট নীতি থাকে না। আবরণস্বরূপ কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি থাকে যা নির্বাচনী সুযোগ সুবিধার্থে অথবা অন্য কোন রাজনৈতিক সুবিধার্থে ক্রমাগত পরিবর্তন সাপেক্ষ। এই দল দক্ষিণপন্থী কারণ অর্থনীতির প্রতিক্রিয়াশীল ও নিপীড়নমূলক উপাদনগুলিকে শক্তিশালী না করে রাষ্ট্র ও সামজের সাম্প্রদায়িকীকরণ সম্ভব নয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ প্রকাশ্যে প্রচার করার ক্ষেত্রে জনসঙ্ঘের দু'টি প্রধান বাধ্যবাধকতা ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে তার লক্ষ্য ছিল অ-সাম্প্রদায়িক অংশের কাছে আবেদন রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট সংগ্রহ করা। ভারতীয় জনমানসে সাম্প্রদায়িকতার কোন গৌরবোজ্জ্বল মর্যাদা ছিল না। উপরন্তু নির্বাচন সক্রান্ত আইন ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রচার নিষিদ্ধ করেছিল।

২.১১.৩ নির্বাচনী পদ্ধতির সূচনা ঃ

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী সংবিধান কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গণতন্ত্রের পথে ভারতের যাত্রা শুরু হয়। প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫১-৫২) গণতন্ত্রের বাস্তব রূপায়ণের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সাধারণত মনে করা হয় যে এই নির্বাচন সারা পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৃহত্তম পরীক্ষা নিরীক্ষা। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই নির্বাচনে ১৮ বছর বয়স্ক ও তদূর্ধ সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের ভোটদানের অধিকার স্বীকৃত ছিল। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনসমূহের অধীক্ষণ, নির্দেশন ও নিয়ন্ত্রণ একটি নির্বাচন কমিশনের উপর বর্তিত হয়েছিল এবং এই কমিশন নির্বাহিক, সসদীয় অথবা শাসকদলের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল।

ব্রিটিশ সংসদীয় পদ্ধতির অনুকরণে ভারতীয় সংবিধান প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সংসদের নিম্নকক্ষের অর্থাৎ লোকসভার নির্বাচন ধার্য করে। কিন্তু কখনো কখনো প্রদানমন্ত্রীর উপদেশে রাষ্ট্রপতি সভার পাঁচ বছরের মেয়াদাবসানের আগেই নির্বাচন তলব করতে পারেন। যেহেতু অনেক ভারতীয়রই অক্ষরজ্ঞান নেই সেহেতু প্রতিটি রাজনৈতিক দল, এমনকি নির্দল প্রার্থীদেরও নির্বাচনী প্রতীক দেওয়া হয়। ১৯৭১-র আগে পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীর নির্বাচন একই সাথে অনুষ্ঠিত হত।

নির্বাচনে অংশগ্রণকারী দল বা প্রার্থীদের নির্বাচনী রণনীতির প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ নির্বাচনী প্রচার। প্রধানত তিনটি উপায়ে একটি দল বা নির্দল প্রার্থী তার রাজনৈতিক বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছতে পারে। প্রথম, প্রতিটি সুসংগঠিত দলই তাদের নীতি ও উদ্দেশ্য সংবলিত ইস্তাহার ইংরাজী ও মাতৃভাষায় মুদ্রিত করে বিলি

করে, যেখানে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের বিশিষ্ট অবস্থান ব্যাখ্যা করা থাকে। দ্বিতীয়, গ্রামাঞ্চল ও শহরের রাজপথে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখে তাঁদের নীতিগত অবস্থান বিশ্লেষণ করেন। তৃতীয়, সর্বসমক্ষে অপ্রকাশ্য গূঢ় পন্থায় প্রার্থীরা সমর্থনের ভিত্তি দৃঢ় করেন। এক্ষেত্রে প্রচারকরা তাঁদের মুদ্রিত ঘোষণাপত্র ও প্রকাশ্য বিবৃতির বাইরে গিয়ে প্রার্থী ও নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটদাতাদের মধ্যে জাতপাতের বন্ধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, বিশেষ গ্রাম বা এলাকার উন্নয়নে তাঁর অবদান তুলে ধরেন অথবা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন।

অলোকসামান্য নেতাদের ব্যক্তিগত আবেদন থেকে শুরু করে শ্রেণী, সম্প্রদায়, জাতপাত ও গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য, প্রভৃতি ভারতীয় ভোটদাতাদের নির্বাচনী সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করে। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে প্রচারের পাদপ্রদীপে ছিলেন জওহরলাল নেহরু যিনি অসাধারণ উদ্যমে দলকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। বাস্তবিক এই নির্বাচনের প্রতিটি স্তরেই নেহরুর উপস্থিতি ও প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। কিন্তু তৃণমূল স্তরে কিছু অন্যান্য বিবেচনাও অনুভূত হয়েছিল। কিছু প্রার্থী সফল হয়েছিলেন কারণ তাঁরা নেহরু ও গান্ধীর কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, আবার কিছু প্রার্থীকে কংগ্রেসের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল কারণ আঞ্চলিক প্রভাবের জন্য তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত ছিল। ভারতীয় জনসাধারণের রীতিনীতি ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রার টানাপোড়েনের সঙ্গে ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদদের নীতি ও উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে তাঁরা শিল্প ও কৃষির বর্ধিত সমগ্র উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা দেখেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে দুরূহ। সমাজের দরিদ্রতর অংশের দৈনন্দিন উদ্বেগের বিষয় গ্রাসাচ্ছাদন, পানীয় জল, বাসস্থান ও কর্ম নিযুক্তি। দারিদ্র সীমার উপরে যাঁরা বাস করেন তাঁদের স্বার্থ খামার জাত দ্রব্যের বাজার দর, সেচ ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা, নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, বর্ষাকালে ব্যবহারযোগ্য সড়ক ও সেতু, শিক্ষা ও কর্ম-নিযুক্তি। আঞ্চলিক স্তরের সমস্ত রাজনীতিবিদই এই দাবি দাওয়াগুলির অগ্রগণ্যতা সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু দাবিদাওয়া পূরণে তাদের কৃতিত্ব হতাশাব্যঞ্জক। সুতরাং নির্বাচনী প্রচারের সময় তাঁরা এই সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত না করে জনগণকে ভাবতে বাধ্য করেন যে জাতির প্রকৃত সমস্যা অন্ন বস্ত্র বা আশ্রয় নয়—বরং পাকিস্তানের রণ দামামা, কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন অথবা (সাম্প্রতিককালে) অযোধ্যার রামমন্দির নির্মাণ।

পশ্চিমী গণতন্ত্রের মত দলের প্রতি আনুগত্য ভারতীয় নির্বাচনী রাজনীতিকে চিহ্নিত করে না। ভারতবর্ষে এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি, সম্ভবত কোন বৃহৎ জমিদার অথবা রাজন্য পরিবারের বংশধর অথবা জাতপাতের ভিত্তিতে প্রভাবশালী ব্যক্তি, হয় নির্দল প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয় লাভ করে নতুবা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মনোমত শর্তে সমর্থন বিক্রয় করে। আবার দলের

কোন সদস্য মনোনয়ন পেতে ব্যর্থ হলে অন্য দল অথবা নির্দল প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দ্বিধা করেন না।

পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়েও বলা যায় যে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে প্রচার ও ফলাফলের দিক থেকে একক আধিপত্য বিস্তার করেছিল কংগ্রেস তার সর্বময় নেতা জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে। নেহরুর প্রচারাভিযান মূলত রক্ষণশীল সাম্প্রদায়িকদের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল। এর কারণ অংশত তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও চেতনা এবং অংশত দলের অভ্যন্তরে তাঁর অভিজ্ঞতা। ভারতের ঐক্যের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির আশঙ্কাও তাঁকে এই রণনীতি অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। নির্বাচনের ফলাফল তাঁর আশঙ্কা প্রশমিত করেছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস লোকসভায় ৭৫% আসন দখল করে ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীর ৬৮.৫% আসন দখল করে। শুধু চারটি রাজ্যে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেনি—মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, ওড়িষ্যা এবং পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব সংঘ। এই রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস নির্দল প্রার্থী ও ক্ষুদ্রতর স্থানীয় দলগুলির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে সরকার গড়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে তিনটি মুখ্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা ও রামরাজ্য পরিষদ মাত্র ১০টি আসন দখল করেছিল। অপরদিকে কমিউনিস্ট দল এককভাবে ২৩টি আসন দখল করে। কৃপালনীর কিষান মজদুর প্রজাপার্টি ও সমাজবাদীরা একত্রে ২১টি আসন দখল করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে সমাজবাদী ও কিষান মজদুর প্রজাপার্টি যেখানে ৩৯১ জন প্রার্থী দিয়েছিল, কমিউনিস্ট দল সেখানে মাত্র ৭০টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই নির্বাচনের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে—'যে আসনগুলিতে কংগ্রেস দল পরাজিত হয়েছিল, তার অধিকাংশ আসনে তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বীরা নির্বাচিত না হয়ে অন্যান্য দল ও নির্দল প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন। এই অন্যদলগুলি অধিকাংশই ছিল অবিমিশ্র আঞ্চলিক সংগঠন—পাঞ্জাবী শিখদের অকালী দল, বিহার উপজাতিদের ঝাড়খণ্ড, মাদ্রাজের দ্রাবিড় দলসমূহ, এবং ওড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদ। সফল নির্দল প্রার্থীরা সকলেই প্রায় স্থানীয় মানুষ যাঁরা কোন মতাদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে একটি বিশিষ্ট মূল্যবোধ তুলে ধরেছিলেন। এহেন দল ও প্রার্থীদের সাফল্য একটা মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছিল—সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার কি যথার্থই একটি সর্বভারতীয় রাজনীতির চালিকাশক্তি হতে পারবে?

১৯৫২ সালের পর নেহরুর আমলে আরো দুটি নির্বাচন হয়েছে, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে। উভয়ক্ষেত্রেই ভোটদাতাদের সংখ্যা বেড়েছিল। ১৯৫১-৫২তে ৪৬% শতাংশ ভোটদাতা তাঁদের ভোটাধিকার ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তী নির্বাচনে, অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে ৪৭% এবং ১৯৬২ সালে প্রায় ৫৪%। দু'টি নির্বাচনেই কংগ্রেস লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল—দ্বিতীয় লোকসভা নির্বাচনে ৩৭১টি আসন দখল করেছিল এবং তৃতীয় নির্বাচনে ৩৫৮টি। ইতিমধ্যে ১৯৫৭ সালে কমিউনিস্ট দল কেরলে বিশ্বের প্রথম নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকার গঠন করে।

২.১২ উপসংহার

স্বাধীন ভারতে নেহরু আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলা যায় যে এই যুগের সব থেকে বড় কৃতিত্ব ছিল সদ্যজাত ভারতীয় রাষ্ট্রকে স্থায়িত্ব দান। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিতুলনার প্রলোভন এড়ানো কঠিন। আজ যখন ভারতবর্ষে, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, গণতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, পাকিস্তান কিন্তু সামরিক শাসনে ধুঁকছে। ভারতীয় রাজনীতিতে বা রাষ্ট্রনীতিতে যে স্বৈরাচারী প্রবণতা মতা তোলেনি, তা নয়। (উদাহরণস্বরূপ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালের কথা মনে করা যেতে পারে।) কিন্তু তাকে পরাস্ত করতে সামরিক শাসন জারী করার প্রয়োজন হয়নি, গণতন্ত্রের অস্ত্র দিয়েই এই প্রবণতাকে ঘায়েল করা সম্ভব হয়েছে। গণতন্ত্রের এই সাফল্যের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে নেহরু ও সমকালীন রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনেতাদের প্রাপ্য। স্মরণ করা যেতে পারে যে পঞ্চাশের দশকের শুরুতে যখন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খাঁ আতাতয়ীর গুলিতে প্রাণ হানার, ভারতবর্ষ তখন প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল —প্রতিতুলনা নিঃসন্দেহে চোখে পড়ার মত। পাকিস্তানের তুলনায় ভারতে গণতন্ত্রের এই সাফল্যের কতকগুলি সামাজিক কারণ নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এক, ভারতবর্ষ সাম্রাজন্যবাদী শাসন কাঠামো অবিকৃত ও অখণ্ডিত আকার ধারণ করেছিল। যেটা পারিসন্নের পক্ষে সম্ভব হয়নি কারণ পাকিস্তান ছিল খণ্ড রাজ্য। দুই, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ও তার ঐক্যমতের রাজনীতির একটা সর্বভারতীয় আবেদন ছিল। প্রথম তিনটি সাধারণ নির্বাচনে (নেহেরু যুগে) কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করেছিল। ফলে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। পাকিস্তান যে অঞ্চলগুলি নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেখানে মুসলিম লীগের সমর্থনের ভিত্তি দুর্বলতম। সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য একনি রাজনৈতিক দলের অভাব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করেছিল। তিন, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরুর সময় স্বাধীন ভারতের সব থেকে বড় সম্পদ ছিল জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বের পাশাপাশি সর্দার প্যাটেল, রাজাগোপালাচারি, গোবিন্দ বল্লভপন্থ, বি. জি. খের, ও মোরারজি দেশাইয়ের মাপের নেতৃবৃন্দ। সমকক্ষ নেতৃত্বের অভাব পাকিস্তানে রাজনীতি সম্ভবনাকে ম্লান করে দিয়েছিল।

২.১৩ অনুশীলনী

বিভাগ—ক (রচনাধর্মী প্রশ্ন)

১। অন্ধজর, বোম্বে ও পাঞ্জাবের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান নেহরু সরকার ভাষাভিত্তিক রাজ পুনর্গঠনের সমস্যা কিভাবে মোকাবিলা করেছিলেন।

২। সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সমস্যা ভারতীয় রাজনীতিতে কিরূপ বিভাজনের সৃষ্টি করে?

৩। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ভারতীয় নির্বাচনী রাজনীতির কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।

বিভাগ—খ (সংক্ষিপ্ত বিষয়মুখী প্রশ্ন)

১। নেহরুর উপজাতি সংক্রান্ত নীতি উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল?

২। নেহরু কিভাবে কংগ্রেস দল ও কংগ্রেস সরকারের বিরোধের নিষ্পত্তি করেছিলেন সংক্ষেপে লিখুন।

৩। ১৯৪৭-১৯৬৪ পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে কমিউনিস্ট আন্দোলন কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল?

২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১। Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee : *India After Independence* (1999).

২। Paul Brass : *The Politics of India Since Independence* (1999).

৩। W. H. Morris Jones : *The Government and Politics of India* (1967).

৪। Zoya Hasad (ed.) : *Politics and the State in India* (2000).

৫। Partha Chatterjee (ed.) : *State and Politics in India* (1998).

৬। S. Gopal, Jawaharlal Nehru : *A Biography, Vols. 2 and 3* (1989).

৭। *দুর্গাদাস বসু, ভারতের সংবিধান পরিচয়* (1994)

৮। Sujata Bose and Ayesha Jalal, *Modern South Asia* (1998).

একক ৩ ❑ পরিকল্পনা এবং ভারতীয় অর্থনীতি

গঠন

৩.১ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

৩.২ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিতা

৩.৩ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

৩.৪ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের মূল্যায়ন

৩.৪.১ পরিকল্পনাকারে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি

৩.৪.২ পরিকল্পনাকালে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের মূল্যায়ন

৩.৪.৩ পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াসের মূল্যায়ন

৩.৪.৪ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নয়নের মূল্যায়ন

৩.৫ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ব্রিটিশ শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোনো সক্রিয় উদ্যোগ ছিল না। তাছাড়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা ১৯২০ সাল পর্যন্ত ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের অগ্রণী প্রবক্তাগণ (যেমন, দাদাভাই নওরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে) দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন; কিন্তু তখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কোনো দেশেই ছিল না—ভারতেও ছিল না।

১৯২৪ সালে ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনে ডঃ এম. বিশ্বেশ্বরায়া তাঁর সভাপতির ভাষণে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিশ্বেশ্বরায়ার দুটি উল্লেখযোগ্য বই হল Reconstructing India এবং Planned Economy for India। ত্রিশের দশকে তিনি এই বই দুটো লিখেছিলেন। তবে এম. বিশ্বেশ্বরায়া ভারতের তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রকল্প পরিকল্পনার (Project planning) উপর আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি দিয়েছিলেন, যদিও একটি সার্বিক জাতীয় পরিকল্পনার গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেছিলেন।

ত্রিশের দশকে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে প্রধান প্রবক্তা ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২৮ সালে Independence League of India-র বাংলা শাখার ইস্তাহারে সুভাষচন্দ্র মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ এবং রেল, জাহাজ ও বিমান পরিবহনের জাতীয়করণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৩৩ সালে লন্ডনে রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রেরিত সভাপতির ভাষণে স্পষ্টই বললেন—ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তন করতে হবে বৈজ্ঞানিক পথে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এগিয়ে এসেছিলেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমর্থনে। ১৯৩৫-১৯৩৯ সালে Science and Culture পত্রিকায় মেঘনাদ সাহা বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমর্থনে জোরালো যুক্তি দেখিয়েছিলেন। বিশেষ করে ১৯৩৭ সালে তাঁর লিখিত প্রবন্ধ "Indian National Reconstruction and Soviet Example" সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রর চিন্তাভাবনা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮) সভাপতির ভাষণে। তাছাড়া ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনে দেওয়া (Indian Science News Association) ভাষণ (১১ আগস্ট, ১৯৩৮), প্রাদেশিক কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রিদের সভায় প্রদত্ত ভাষণ (২রা অক্টোবর, ১৯৩৮) এবং নিখিল ভারত প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধনী ভাষণে (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮) সুভাষচন্দ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষির উন্নয়ন নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রের মালিকানায় ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা অপরিহার্য হবে। “পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে রাষ্ট্রকে উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে সমগ্র কৃষি ও শিল্পব্যবস্থাকে ক্রমশ সামাজিকীকরণের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।”

ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের সভায় প্রদত্ত ভাষণে সুভাষচন্দ্র জাতীয় পরিকল্পনার নিয়ামক নীতি নির্ধারণের কথা বলেছিলেন। জাতীয় স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে মূল শিল্পগুলির যথা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন, যানবাহন ও যোগাযোগ বস্তু নির্মাণ প্রভৃতির বিকাশ সাধন পরিকল্পনার নিয়ামক নীতির অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেসী

শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন ভারতের প্রয়োজন হল একটি শিল্প বিপ্লব,—ইংলন্ডের মতো নয়, রাশিয়ার মতো।

১৯৩৮ সালে ভারতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির গঠন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির (National Planning Committee) সভাপতি। নিখিলভারত প্ল্যানিং কমিটি (All-India Planning Committee) হিসাবেও এটা পরিচিত ছিল। ১৯৩৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর এই কমিটির উদ্বোধন করেন সুভাষচন্দ্র। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি শিল্পের স্থান নির্ণয় (Location of Industry), শিল্প সংগঠন, শিল্প পরিচালনা ও তার আর্থিক নীতি তৈরি করবে তখন এটাই আশা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ছাড়া বোম্বাইয়ের আটজন শিল্পপতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন; এটাকে বলা হল "বোম্বাই পরিকল্পনা" (Bombay Plan) শ্রী এম. এন. রায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি 'জনগণের পরিকল্পনা' (People's Plan) তৈরি করেন। তাছাড়া শ্রীমন নারায়ণ এবং পরবর্তীকালে শ্রী এস. এন. আগরওয়ালা "গান্ধী পরিকল্পনা" (Gandhian Plan) নামে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনাগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশেষ নেই।

এই প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিকল্পনার যৌক্তিকতা নিয়ে সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। গান্ধীজী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব কখনই মেনে নেননি। গান্ধীজীকে আশ্বস্ত করার জন্য সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলাল নেহেরু উভয়েই ঘোষণা করেছিলেন যে বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন হবে বলে পরিকল্পনায় কুটির শিল্পকে উপেক্ষা করা হবে না। কুটির শিল্প যন্ত্রশিল্পের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গুরুভার শিল্পের উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি প্রভৃতিকে পরিকল্পনার কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী চেয়েছিলেন গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় বৃহদায়তন শিল্প ও কুটির শিল্পের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই। একটি অপরটির পরিপূরক হতে পারে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে কৃষিকে বাদ দিয়ে ভারতে কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত হতে পারে না। জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কার, সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রভৃতির উপরও জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। শ্রী ভি. ভি. গিরি, শ্রী হরিবিষ্ণু বাসাথ প্রভৃতি নেতারা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীর জীবদ্দশায় নিজেকে পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে তৈরি করতে পারেননি। তারণ তাঁর উপর ছিল গান্ধীজীর বিরাট প্রভাব। সেজন্য জওহরলাল নেহরু জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির কর্মসূচী কংগ্রেস শাসিত প্রাদেশিক সরকারগুলিতে ঠিকভাবে রূপায়িত করতে পারেননি। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায়।

স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূচনা হয় জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে। স্বাধীন ভারতে নেহরুকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান স্থপতি হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায়। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে (তখন গান্ধীজী প্রয়াত হয়েছেন) ঘোষিত ভারতের শিল্পনীতিতে মিশ্র অর্থনীতির (Mixed Economy) কথা বলা হয়। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়; তাতেই রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দেশক (Directive Principles of State Policy) সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে ভারতের আর্থ-সামাজিক বিকাশের লক্ষ্য কী হবে তা বলা হয়। জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতের প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন (National Planning Commission) গঠিত হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণীত হয়। এই পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৫৬-৫৭—১৯৬০-৬১) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের (Socialist Pattern of Society) কথা বলা হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও নিজস্ব কর্মসূচীতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনকে গুরুত্ব দিয়েছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ২৫ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ এবং আয় ও ধনের বৈষম্য কমাবার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাটি বহুলাংশে প্রশান্ত মহলানবীশ প্রদত্ত মডেল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মহলানবীশ মডেলে একদিকে গুরুভার ও মৌলিক শিল্প এবং অপরদিকে ভোগ্য সামগ্রী শিল্পের উৎপাদন বাড়াবার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। জওহরলাল নেহরু একদিকে মহলানবীশ মডেল এবং অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা—এই দুটোর উপর নির্ভর করেই দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদন, বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং তাদের সামনে আরও উন্নত ধরনের এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করার কথা বা হয়েছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি এবং গুরুভার ও মৌলিক শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের প্রতি। এই দুটো পরিকল্পনাতেই অসম-উন্নয়ন বা অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন পদ্ধতি (Technique of Unbalanced Growth) প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যায়ে যাতে সুষম উন্নয়ন (Balanced Growth) বর্জন করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া যায় সে চেষ্টা করা হয়েছিল।

জওহরলাল নেহরুর আমলে তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল। এই তিনটি পরিকল্পনাকালে সরকারি ক্ষেত্রের (Public Sector) দ্রুত সম্প্রসারণ হয়েছিল, এবং মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই শিলোপন্নয়নের প্রয়াস চলছিল।

নেহরু-মহলানবীশ পরিকল্পনা মডেল যদিও দেশকে শিল্পোন্নয়নের পথে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তবুও এটা অস্বীকার করা যাবে না যে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রা সংকট তীব্র হয়েছিল। দেশের প্রকৃত সম্পদ (real resources) কতটা ছিল, বিদেশ থেকে মূলধনী দ্রব্য আমদানি করার ক্ষমতা কতটা ছিল এবং কতটা বাজেট ঘাটতি করা যুক্তিযুক্ত ছিল—এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসঙ্গতি থাকায় দেশের অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়েছিল। অনেকে একটা ‘‘উচ্চকাঙ্খার সংকট’‘ (crisis of ambition) বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সংকটো তীব্রতা কমানো সম্ভব হয়েছিল। নেহরুর আমলে আমদানির বিকল্পীকরণ (Import substitution) নীতি গৃহীত হয়েছিল। আমদানির উপর অধিক হারে শুল্ক ধার্য করে এবং আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে যাতে আমদানির বিকল্প দ্রব্য দেশেই উৎপাদন করা যায় সেই চেষ্টা চালানো হয়েছিল। এই নীতির পক্ষে যুক্তি ছিল, বেশি হারে আমানি শুল্ক ধার্য করা হলে রাজস্ব বাড়বে, আমদানির পরিমাণ কমবে এবং তার একটি অনুকূল প্রভাব হবে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি মেটাবার ক্ষেত্রে, দেশীয় শিল্পগুলি আমদানির বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহী হবে এবং যদি এর ফলে বিকল্প দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে তবে কর্মসংস্থানেরও সম্প্রসারণ হবে। বলা বাহুল্য, এই নীতিতে রপ্তানি বাড়াবার প্রয়োজন থেকে আমদানি কমাবার প্রয়োজনের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এজন্য এটাকে বলা হত ‘‘হতাশাব্যঞ্জক রপ্তানি’’ (Export Pessimism)। ষাটের দশকেও এই নীতি কার্যকর ছিল। সত্তরের দশক থেকে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বুঝতে থাকেন যে আমদানি নিয়ন্ত্রণ নয়—রপ্তানি উন্নয়নই (Export Promotion) হল ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সংকট দূর করার উপায় এবং রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও মূলধন সামগ্রী আমদানির খুবই প্রয়োজন।

আগেই বা হয়েছে, জওহরলাল নেহরু সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অনুগামী ছিলেন। সেই চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ১৯৬০ সালে দেশে আয়ের বন্টন ও জীবনধারনের মানে যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য প্রশান্ত মহলানবীশের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি তাঁদের প্রতিবেদন দাখিল করেন ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষে। এই কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের

এক বছর বাদেই (১৯৬৪) গঠিত হয় একচেটিয়া ক্ষমতা তদন্ত কমিশন (Monopolies Inquiry Commission)।

জওহরলাল নেহরু প্রয়াত হাবার পর শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আদর্শ সামনে রেখে পরিকল্পনার নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। ১৯৬৯ সালে দেশের ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং ১৯৮০ সালে আরও ছয়টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল, এবং দেশ ক্রমশ আমদানি বিকল্পীকরণ নীতি থেকে রপ্তানি উন্নয়ন নীতির দিকে সরে আসছিল। ইন্দিরা গান্ধীর আমলেই দারিদ্র দূরীকরণ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হয়।

ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবার পর চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫) পর পর দু'বছর প্রচণ্ড খরা, টাকার মূল্যহ্রাস (১৯৬৬) এবং প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফিতী ও রাজকোষের তীব্র ঘাটতি—এই কারণগুলির জন্য পাঁচ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা তখন সম্ভব ছিল না। এজন্য ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ এই তিন বছরের জন্য তিনটি আলাদা বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই সময় থেকে নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের সুফল পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকেই দেশে সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। যে সবুজ বিপ্লবের সূচনা তখন হয়েছিল সেটি নতুন সহস্রাব্দের শুরুতেও অব্যাহত আছে।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যন্ত। উন্নয়নের গতি বাড়ানো এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা ছিল চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। ইন্দিরা গান্ধী দেশ থেকে দারিদ্র্য হটাবার শ্লোগান দিয়েছিলেন। তবে বিংশ শতাব্দীর শেষেও দেশে ২৫ শতাংশেরও বেশি লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে আছে বলে অনুমিত হয়েছে।

১৯৭৪-৭৫ সালে পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ১৯৭৭-৭৮ সালে তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারেরও পরিবর্তন হয়। জনতা দলর নতুন সরকার (মোরারজী দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বে) দেশে Rolling Plan চালু করেছিলেন এবং তার ভিত্তিতে ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনাও তৈরি হয়েছিল। ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনা দুবার রচিত হয়েছিল। ১৯৮০-৮৫ সালের জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল ১৯৭৮-৭৯ সালে। কিন্তু জনতা দলের

সরকার সেই পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছিলেন। পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আবার সরকার গঠন করলে ১৯৮১ সালে নতুন করে ষষ্ঠ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল; কিন্তু খাতায় কলমে ১৯৮০ সাল থেকেই ষষ্ঠ পরিকল্পনা কার্যকর হয়। এই পরিকল্পনাটিও দারিদ্র্য হটানোর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) ছিল রাজীব গান্ধীর আমলে তৈরি। রাজীব গান্ধী নতুন প্রযুক্তির দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালেই অমদানি উদারীকরণের নীতি প্রথম অনুসৃত হয়, যদিও তারগণ্ডী ছিল সীমিত। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনায় একদিকে কোষাগার ঘাটতির (Fiscal Deficit) ক্রমবৃদ্ধি এবং অপরদিকে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি ও বৈদেশিক ঋণের বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক সংকটের সূচনা করে। তবে সপ্তম পরিকল্পনায় গড় উন্নয়ন হার ছিল ৫.৯ শতাংশ। অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করে ১৯৯০-৯১ সালে। ১৯৯১ সালে নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী এবং মনমোহন সিং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হবারপর দেশে অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী গৃহীত হয়।

ভারতে অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি গৃহীত হবার পূর্ববর্তী পরিকল্পিত অর্থনীতির কর্মসূচী থেকে দেশের অর্থনীতি অনেক সরে আসে। সারা বিশ্বে বাজার-অর্থনীতির ঢেউ এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের শর্তাবলর পূরণ করার বাধ্যবাধকতা ভারতকে অর্থনৈতিক উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। অর্থনৈতিক উদারীকরণ (Economic Liberalisation), বেসরকারীকরণ (Privatisation) এবং বিশ্বায়ন (Globalisation)—এই তিনটি লক্ষ্য সামনে রেখে অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী এবং দেশের অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বিভাগের কর্মসূচী (Structural Adjustment Programme) গৃহীত হয়। তার ফলে যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হত, সেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে দেশের অর্থনীতি অনেকটাই সরে আসে। তবে এর মধ্যেই নব্বইয়ের দশকে অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনা এবং নবম পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি হয়। এক্ষেত্রে উল্লখ করা যেতে পারে, সপ্তম পরিকল্পনার মেয়াদ আগে শেষ করে দিয়ে আবার দুটি বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল। অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৯২-৯৭ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বা গতি প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের দেশে যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখই দেশে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা (Democratic Planning) প্রবর্তিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় মিশ্র-অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে বেসরকারী ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। ভারতে যে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে তাতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি উদ্যোগের ভূমিকা ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ভূমিকা ক্রমেই সক্রিয় হচ্ছে। অষ্টম ও নবম পাঁচসালা পরিকল্পনায় বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা পূর্ববর্তী

পরিকল্পনাগুলি অপেক্ষা অনেক বেশি প্রতিভাত হয়েছে।

গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতে পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণও (Decentralisation) শুরু হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ব্লক পর্যায়, মহকুমা পর্যায় এবং জেলা পযায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে রাজ্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিভিন্ন রাজ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেই জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

৩.২ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা

যে কোনো অনগ্রসর দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। অনগ্রসর দেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত অনুন্নত থাকে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারও কম থাকে। এসব দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির হারও খুব কম থাকে। জাতীয় আয় ও ধনের বৈষম্য, তীব্র দারিদ্র, বেকার সমস্যা, অসামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্পের বিকাশ প্রভৃতি অনগ্রসর দেশের বৈশিষ্ট্য। উন্নতিকামী দেশগুলির এই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি দূর করার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

পরিকল্পনাবিহীন অর্থনীতির পক্ষে দ্রুত জাতীয় আয় বাড়ানো সম্ভব নয়। সীমিত আর্থিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করে এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় উৎপাদন বাড়াতে হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে আয় ধনের বৈষম্য বেড়ে যায় এবং দেশগুলি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত উন্নতির পথে এগোবার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে রাশিয়ার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯১৭ সালের অবব্যহিত পরে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল ভারতের মতো। বরং তখন রাশিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং দেশে বড় বড় জোতদার (kulaks) ছিল। রাশিয়া তখন শিল্পোন্নত ছিল না। কৃষিক্ষেত্রে দেশটি অনগ্রসর ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই সেই দেশের চেহারা পাল্টে দিয়েছিল। তখনকার রাশিয়া (পূর্বতন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র) অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল।

উন্নত এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান দূর করার জন্য তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয়েছে। (১) জাতীয় আয়ের বদ্ধি, (২) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, (৩) দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, (৩) জাতীয় উৎপাদনের সুষ্ঠু বন্টন, (৫) মূলধন সৃষ্টির হার বাড়ানো, (৬) কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ, (৭) বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন এবং (৮) সামাজিক ন্যায়

প্রতিষ্ঠার জন্য ও দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার খুবই প্রয়োজন। পরিকল্পনাবিহীন অর্থনীতিতে এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণ কর সম্ভব নয়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভাবে দেশে উৎপাদনের উপকরণগুলির অপচয় বেশি হয় এবং তার ফলে দেশের আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম হয়। শিল্প-উৎপাদন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতার অভাব দূর করার জন্যও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অপরিহার্য। পরিকল্পনাহীন অর্থনীতিতে জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব বেড়ে যেতে পারে, আবার সেই সঙ্গে বেকার সমস্যার তীব্রতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাও বেড়ে যেতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দূর করা এবং বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত, সেগুলি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে গ্রহণ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আধুনিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেজন্য সে সব দেশের জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেশি হলেও বর্ধিত আয়ের সুফল জনসাধারণের মধ্যে সমানভাবে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টিত হয় না। সেজন্য এইসব দেশে বড়লোকের পাশাপশি বহু গরীব লোক থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ব্রিটেন, জাপান প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে বেকার সমস্যার তীব্রতা এবং জনসাধারণের মধ্যে আয় ও সম্পদের বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বেকার সমস্যার তীব্রতা কমাতে পেরেছিল এবং দেশের অর্থনৈতিক শক্তি ও সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনও করতে পেরেছিল। এখানেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা প্রতিভাত হয়।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে এটাও বলা যায় যে পুরোপুরি বাজার-অর্থনীতি ব্যবস্থায় ভারতের পক্ষে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বাজার-অর্থনীতিতে যে কোনও ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব থাকতে পারে। কোনও দ্রব্যের জন্য (যেমন খাদ্যশস্য অথবা শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল) চাহিদা যদি যোগান অপেক্ষা বেশি হয় তবে সেই ক্ষেত্রে যোগান বাড়াবার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ খুবই জরুরী। আবার জনসাধারণের অতিরিক্ত চাহিদা ও ক্রয়শক্তির দরুন যদি মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয় তবে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয়। শুধু বাজারে চাহিদা ও যোগানের স্বাধীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার হাতে গোটা অর্থনীতিকে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্তি নয়। এজন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন খুবই বেশি। স্বল্পোন্নত দেশে আর্থিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকে। বেসরকারি ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিনিয়োগও অর্থের অভাবে আটকে যেতে পারে। তাছাড়া আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ভারসাম্যের অভাবে দেশে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট হতে পারে ও বৈদেশিক নেলদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দেখা যেতে পারে। এই সমস্যাগুলির প্রতিকার করার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ খুবই জরুরী এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই রাষ্ট্র এক্ষেত্রে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। এজন্য ভারতের মতো দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা খুব বেশি।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা খুব বেশি থাকা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন ভারত পরিকল্পিত অর্থনীতি থেকে দূরে সরে আসছে এবং অর্থনৈতিক উদারীকরণের (Economic Liberalisation) পথ বেছে নিয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে ভারতে ১৯৯০-৯১ সালের তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে—যে সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ভারতকে অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী (Package of Economic Reforms) গঠন করতে হয়। ১৯৯০-৯১ সালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে তীব্র ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের সংকট প্রতিফলিত হয়েছিল দেশের ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণে। ১৯৯১ সালের জুন মাসে ভারতীয় মুদ্রায় দেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ১,২০,০০০ কোটি টাকা। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (Gross Domestic Product) এটা ছিল প্রায় ৩৩ শতাংশ। অপরদিকে সরকারের কোষাগার ঘাটতির (Fiscal Deficit) পরিমাণও অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল এবং এটা ছিল দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) প্রায় ৮.৫ শতাংশের মতো। ১৯৯১ সালের গোড়ায় ভারতে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১২ শতাংশ। দেশের অভ্যন্তরে শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতা এবং শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হার হ্রাস, এবং বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হারে অবমূল্যায়ন—প্রভৃতি কারণে ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার খুব জরুরী বলে বিবেচিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা সংকট থেকে উদ্ধার পেতে ভারতকে প্রচুর বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে হয়, এবং এই ঋণের বেশির ভাগ নেওয়া হয় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund) থেকে। তাছাড়া দেশের অর্থনীতির কাঠামোগত সামঞ্জস্য (Structural Adjustment) বিধানের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকেও প্রচুর ঋণ গ্রহণ করতে হয়। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে ঋণ গ্রহণের শর্ত হল দেশকে অভ্যন্তরীণ সরকারি ব্যয়ের চাপ কমিয়ে অতিরিক্ত চাহিদাকে নিয়ন্ত্রিত (demand management) রাখতে হবে এবং ভারতীয় মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাস ঘটিয়ে বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের শর্ত হল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ (Privatisation), উদারীকরণ (Liberalisation) এবং বিশ্বায়ন (Globalisation) সুনিশ্চিত করতে হবে।

ভারতকে এই শর্তগুলি পালন করার জন্য একগুচ্ছ অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি (Package of Economic Refroms) গ্রহণ করতে হয়েছে, এবং তার ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে অনেকটা সরে আসতে হয়েছে।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সারা বিশ্বে বাজারে অর্থনীতির দিকে একটি ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation) গঠিত হবার পর বহুপাক্ষিক বাণিজ্য এবং সেই বাণিজ্যের বিশ্বায়ন (Globalisation) দ্রুতগতিতে এগিয়ে আছে। ভারতের পক্ষেও এই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে দূরে সরে থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা এজন্য ক্ষুন্ন হয়নি। সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন, বিশেষ করে শিক্ষার সম্প্রসারণ, জনস্বাস্থ্যের সুবিধা সম্প্রসারণ ও তার মান উন্নয়ন, ময়লা সাফাই ব্যবস্থা, দূর গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সরবরাহ, কৃষির উন্নয়ন, বিশেষ করে জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, জনসাধারণের জন্য খাদ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামো (Economic Infrastructure) উন্নয়নের জন্য ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা এখনও অপরিসীম।

৩.৩ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা আরও বেশী অনুভূত হয়। কারণ পরিকল্পত অর্থনীতি ছাড়া এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করা অসম্ভব। ভারতের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ

১) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং তাদের সামনে আরও উন্নত ধরনের এবং বৈচিত্র্যপুর্ণ জীবনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করা।

ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে অনুযায়ী মানবীয় এবং বস্তুগত সব সম্পদের সদ্ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানো এবং পরবর্তীকালে আয়, ধন ও সুযোগের বৈষম্য কামানোর কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল। প্রথম পাঁচসালা পবিকল্পনায় যুদ্ধোত্তর ভারত এবং দেশ-বিভাগজনিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উপর এবং খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা সহজ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দেশের উন্নয়ন কর্মসূচী প্রস্তুত করে এবং সেগুলি ঠিকভাবে কার্যকর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভবিষ্যতের জন্য সুদৃঢ় করার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেই সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক সংগঠন উন্নত করার উপরেও প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(২) জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা।

যে কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনারই প্রধান উদ্দেশ্য হল জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান লক্ষণ প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি। স্থির মূল্যস্তরের ভিত্তিতে ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় বাৎসরিক ৩.৭ শতাংশ এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় বাৎসরিক ৪.২ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বেড়েছিল। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির বার্ষিক হারে ছিল ৫.৯ শতাংশ এবং অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনায় সেই হার ছিল ৬.৭ শতাংশ।

(৩) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি পরিকল্পত বিনিয়োগ হার বর্জন করা।

পরিকল্পিত বিনিয়োগ হার অর্জন করতে পারলে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনী শক্তি বাড়ে এবং তার সাহায্যে পরিকল্পিত হারে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়। তাছাড়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকল্পিত হারে বিনিয়োগ বাড়ালে পরিকল্পনার শেষে দেশের মূলধন সরবরাহের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং যার ফলে ভবিষ্যতের উৎপাদনী শক্তি বাড়ানো সম্ভব হয়। ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনা পর্যন্ত ভারতে কোনও পাঁচসালা পরিকল্পনাতেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পরিকল্পিত বিনিয়োগ হার অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনায় বাজার দরে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) ২২.৭ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনায় বাজার দরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২৪.৯ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার বাজার দরে বিনিয়োগ হার বেশি হলেও প্রকৃত আয়ের (Real Income) ভিত্তিতে বিনিয়োগ হার তার চেয়ে কম ছিল। নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার বাজার দরের ভিত্তিতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২৮.২ শতাংশ বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।

(৪) আয় ও ধনের বৈষম্য এবং সম্পদের উপর অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীকরণ হ্রাস করা যাতে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক ন্যায় সুনিশ্চিত হতে পারে, এবং দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা যেতে পারে।

যদি আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আয় এবং ধনের বৈষম্য হ্রাস করা, তবুও আয় এবং ধরেন পুনর্বন্টন করার জন্য এখন পর্যন্ত অভাবনীয় কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বলা চলে না। তবে শিল্প লাইসেন্স প্রদানে কড়াকড়ি করা, অপেক্ষাকৃত ধনী শ্রেণীর উপর বেশি হারে করা ধার্য করা, জোতের আয়তনের উপর সর্বোচ্চ সীমা আরোপ করা, প্রভৃতি ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং শহর-অঞ্চলের সম্পত্তির উপর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন ধনী-শ্রেণীর উপর বেশি করে কর ধার্য করে গরিব-শ্রেণীর জন্য তা খরচ করলে আয় ও ধনের বৈষম্য কমানো সম্ভব হবে। বাণিজ্যিক ব্যাংক, জীবনবীমা কোম্পানি, সাধারণ বীমা কোম্পানি, কয়লাখনি, প্রভৃতি জাতীয়করণ এবং সরকারী সংস্থা গঠন প্রভৃতির মাধ্যমে বৃহৎ শিল্প-গোষ্ঠীর হাতে অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় আয় ও ধনের বৈষম্য হ্রাস করা এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া বন্ধ করা অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনায় থেকেই আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং আয়ের বৈষম্যই দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। সেজন্য পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনায় আয় ধনের বৈষম্য হ্রাস করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনারও অন্যতম উদ্দেশ্য

ছিল জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করা। সপ্তম অষ্টম এবং নবম পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও এই উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

সরকারের লক্ষ্য ছিল ২০০০ সালের মধ্যে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। একটি সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৯৭-৯৮ সালে অর্থাৎ, নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম বছর ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩৫.৯৭ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল। ২০০০ সালের শেষে এই অনুপাত কিছুটা করেছে বটে, —কিন্তু দারিদ্র্য নিমূল করার মতো অবস্থা ভারতে এখনও তৈরি হয়নি।

(৫) অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

ভারতের লক্ষ লক্ষ কর্মহীন লোকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম উদেদশ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা থেকে শুরু করে প্রতিটি পরিকল্পনারই অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বেকার সমস্যার তীব্রতা কমানো এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। বেকার সমস্যার তীব্রতা কমানোর জন্য গ্রামাঞ্চলের জন্য এবং শহরাঞ্চলের জন্য আলাদা আলাদা বেশ কয়েকটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। স্ব-নিয়োজিত কাজের সুযোগ বাড়াবার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়াস চালাচ্ছেন। কিন্তু অতিরক্তি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। বরং সংগঠিত ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা অবসর নীতি (Voluntary Retirement Scheme) চালু হওয়ায় এবং বহু রুগ্ন শিল্প ও কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংগঠিত ক্ষেত্রে বেকার সমস্যাকে নূতন মাত্রা দিয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রেও স্বনিয়োজিত কাজের সুযোগ আশানুরূপ বাড়ছে না। বেকার সমস্যাই দেশের দারিদ্র্যের মূল কারণ।

(৬) ভারতের অথনৈতিক পরিকল্পনার তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে যথা—কৃষি উৎপাদন, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষমতা এবং বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সের অবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমুদয় প্রতিবন্ধক ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য ব্যবস্থা অবম্বন করা।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে বদ্ধি করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষিক্ষেত্রে পর আপেক্ষিকভাবে কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রের উপর সমানভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হলেও কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার শোচনীয় ব্যর্থতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় নতুন কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতি (New Agriculture Strategy) কার্যকর হয়।

পরবর্তীকালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে "সবুজ বিপ্লবের" সৃষ্টি হয়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়লেও আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধক এখনও আছে। জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা, দূর গ্রামাঞ্চলে জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা এবং সময় মতো যাতে জলসেচ করা হয় তার ব্যবস্থা করা এবং গরীব কৃসকরা যাতে উচ্চফলনশীল বীজ কিনতে এবং সার ও কীটনাশক ওষুধ কিনতে সমর্থ হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা, —এই প্রয়োজনগুলি ঠিকভাবে মেটাতে না পারলে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কৃষি-উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না। কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকগুলি দূর করে কৃষি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা আমাদের অর্থনৈতিক পকিল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। শিল্প উৎপাদনরে ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে কোনো কোনো শিল্পের অতিরিক্ত উৎপাদনয় শক্তির সদ্ব্যবহারের অভাব, কোনো কোনো শিল্পে উৎপাদনী শক্তির স্বল্পতা, কাঁচামালের উপযুক্ত সরবারাহের অভাব, কাঁচামালের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরতা, উৎপাদন ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যের অভাবহেতু কোনো কোনো শিল্পজাত সামগ্রীর ক্ষেত্রে বাজারের বিস্তৃতি না হওয়া, বহুক্ষেত্রে উপযুক্ত শিল্প-মূলধনের অভাব, শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রভৃতি। আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধক ও বাধা-বিপত্তি দূর করে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিদেশ থেকে যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি করা দরকার তা বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। যদি উপযুক্ত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ না থাকে তবে বৈদেশিক সাহায্যের উপর দেশকে অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল হতে হয়। বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা বেশি করে অর্জন করার জন্য প্রধান প্রয়োজন হল রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো, অপ্রয়োজনীয় আমদানির পরিমাণ কমানো এবং যতটা সম্ভব কম খরচে আমদানির বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করা। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে এগুলি গৃহীত হয়েছে।

৩.৪ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল্যায়ন

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অর্থনীতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভারত একটি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশেই ভারতের মতো অর্থ শতাব্দী ধরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা নেই। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পার সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই-ই আছে। অর্থনীতির পরিকল্পনার মল্যায়নে এক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয়ই আলোচনা কতে হবে। আগে সাফল্যের দিকটি বিবেচনা করা যেতে পারে এবং যে যে ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে সেগুলির সঙ্গেও যে ব্যর্থতা জড়িত তা আলোচনা করা যেতে পারে।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের মূল্যায়ন ঃ

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য বিবেচনা করেত গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করা দরকার। —(১) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি, (২) কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সবুজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা, (৩) দেশে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস, (৪) অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় কিছুটা উন্নতি।*

৩.৪.১ পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি

পরিকল্পনাকালে দেশের জাতীয় আয় যথেষ্ট বেড়েছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম তিন দশকে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি। ষাটের দশকে বাৎসরিক উন্নয়ন হারের গড় হয়েছিল ৩.৮ শতাংশ। দ্বিতীয় দশক এবং তৃতীয় দশকে এই উন্নয়ন হার ছিল যথাক্রমে ৩.৫ শতাংশ এবং ৩.৪ শতাংশ। অথচ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল বার্ষিক অন্ততঃ পাঁচ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি। জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রায় তিন দশকে বিশেষ সাফল্য অর্জিত না হলেও আশির দশকে এবং নব্বইয়ের দশকে জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আশির দশকে গড় উন্নয়ন হার ছিল ৫.২ শতাংশ। এর মধ্যে সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৯ শতাংশ। ১৯৯০-৯২ এই দুই বছর জাতীয় আয় সামান্য বাড়লেও (গড়ে ২.৯ শতাংশ) অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৯২-৯৭) গড় উন্নয়ন হার, অর্থাৎ, গড় জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৭ শতাংশ। নবম পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও প্রথম তিন বছরে অর্থাৎ, ১৯৯৭-৯৮ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন হার গড়ে ৬.১৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়নে এটা নিশ্চয়ই সাফল্যে নিদর্শন।

৩.৪.২ পরিকল্পনাকালে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের মূল্যায়ন

আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিকী করিকল্পনার গোড়া থেকেই কৃষি উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভারতের কৃষি উন্নয়নের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল উন্নত ধরনের কৃষি প্রযুক্তির প্রবর্তন এবং সবুজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে কৃষি উন্নয়নের জন্য যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তার বিভিন্ন দিক

---

* ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যার্থতা সম্পর্কে যে সব পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, তার উৎসগুলি হল ঃ (1) Different Plan Documents, (2) Reserve Bank of India Bulletin, (3) Prabhat Patnaik—"India's Growth Experience" Economic and Political Weekly, May 1987, (4) V.K.R.V. Rao—India's National Income 1950-58 (Sterling Publisher). (5) Sukhamoy Chakrabart, Develo;pment Planning (Clarendon Press, Oxford, 1987), (6) Economic Survey, Government of India (7) Economic Survey, 1999-2000 (Government of India).

আলোচনা করলে দেখা যায়, ভূমি-সংস্কার, কৃষিক্ষেত্রে নূতন প্রযুক্তি, কৃষি-পণ্য বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন, কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষির যন্ত্রীকরণ এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য অর্থ-সংস্থান—প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যদি প্রথম থেকে অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনা পর্যন্ত কৃষি উন্নয়ন পর্যালোচনা করা হয় তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে কৃষিক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যথেষ্ট সফল হয়েছে।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তার কারণ ছিল দুটি। প্রথমত, যখন প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি করা হয় তখন দেশ খাদ্য-সমস্যায় বিশেষভাবে জর্জরিত ছিল। তখন প্রধান প্রয়োজন ছিল খাদ্যশস্য তথ্য কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করা। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি যাতে কমানো যায় তারও প্রয়োজন তখন অনুভূত হয়েছিল। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রচেষ্টার এটাও একটি কারণ ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রথমে পাঁচসালা পরিকল্পনার পরবর্তী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় যাতে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান বাড়ে সেজন্য প্রথম পরিকল্পনায় কাঁচামাল উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বলা বাহুল্য, এই কাঁচামালগুলি ছিল কৃষিজাত সামগ্রী। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদন কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। পল্লীজীবনের সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পও (Community Development Projects) চালু করা হয়েছিল। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভূমি-সংস্কারের নীতি, বিশেষ করে জমিদারি প্রথা ও মধ্যস্বত্বাধিকার বিলোপ করার এবং জমির মালিকানার ঊর্ধ্বতন সীমা নির্ধারণ করার নীতি ঘোষণা হয়েছিল। তবে ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে তখন বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য লাভ হয়েছিল খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পোন্নয়নের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হলেও কৃষিক্ষেত্রকে উপেক্ষা করা হয়নি। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৬০-৬১ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে হয়েছিল ৮১ মিলিয়ন টন। কিন্তু তৈলবীজ, পাট, আখ প্রভৃতির উৎপাদনে আশানুরূপ সাফল্য পরিলক্ষিত হয়নি, তামাকের উৎপাদন কমে গিয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে যে নীতি গৃহীত হয়েছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেই নীতিই অনুসৃত হয়েছিল; কিন্তু কৃষিজাত সামগ্রীর দাম দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া কৃষি-পণ্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সমবায় খামার (Co-operative Farming) স্থাপনের উদ্যোগও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় নেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে নতুনভাবে সাজানো হয়।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী হওয়া এবং রপ্তানি চাহিদা মেটাবার মতো কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করা। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির চিত্র ছিল খুবই নৈরাশ্যজনক।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে কৃষির উৎপাদন মোটেই বাড়েনি। যদিও তৃতীয় পরিকল্পনার চতুর্থ বছর খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশাতীত বেড়েছিল (৮৯ মিলিয়ন), তবুও পরিকল্পনার শেষ বছর দেশে খাদ্যসংকট চরমরূপ ধারণ করেছিল। পাট এবং তৈলবীজের উৎপাদনও সামান্যই বেড়েছিল; আখের উৎপাদন (গুড়) দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে যেখানে ছিল ৩০.২৭ মিলিয়ন টন, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সেটা কমে হয়েছিল ২৭.৩৪ মিলিয়ন টন।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার পরবর্তী দুই বছর ভারতে খাদ্যসংকট তীব্র হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে কৃষির উৎপাদনও যথেষ্ট কমে গিয়েছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে খরা এবং পর্যাপ্ত জলসেচ ব্যবস্থার অভাব ছিল কৃষি-উৎপাদন কমে যাবার প্রধান কারণ। ভারত সরকার তখন বাৎসরিক পরিকল্পনা করে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা পিছিয়ে দিয়েছিল।

ভারতে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের সূচনা হয় চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায়। আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (Food and Agricultural Organisation) ডিরেক্টর বোরলগ প্রবর্তিত নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে ভারতে ষাটের দশকের গোড়ায় প্রবর্তিত হয়েছিল। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি বা নতুন কৃষি প্রযুক্তি কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচী হিসাবে গৃহীত হয়। নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী (Intensive Agricultural Development Programme) এবং বিভিন্ন ধরনের উচ্চ ফলনশীল কর্মসূচী (High Yielding Varieties Programme) নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষির যন্ত্রীকরণ, গ্রামাঞ্চলে গভীর নলকূপ স্থাপন এবং বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করে পাম্পসেটের মাধ্যমে জমিতে জলসেচের সুব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগে জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন (multiple cropping), চারা সংরক্ষণ এবং কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ এবং কৃষকদের উপযুক্ত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য ও ঋণ দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন এবং সরকারি এজেন্সিগুলি কর্তৃক কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাদান (inputs) সরবরাহ করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ভরতুকি (subsidy) প্রদান, প্রভৃতি ছিল এই নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক।

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ করে কৃষির সার্বিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং তার ফলে দেশে সবুজ বিপ্লবের (Green Revolution) সূচনা হয়েছিল। খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হলেও এবং খাদ্যশস্যের আমদানি যথেষ্ট কমে গেলেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়নি। চতুর্থ পরিকল্পনায় অন্যান্য কৃষি সামগ্রীর ক্ষেত্রে, যেমন—আখ, কাঁচা তুলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে, উপাদান বৃদ্ধি আশানুরূপ ছিল না। কাঁচা পাটের উৎপাদন কমে গিয়েছিল।

পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল। পঞ্চম পরিকল্পনায় নতুন কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির সার্থক রূপায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। বিশেষ করে উচ্চ ফলনশীল বীজ রোপণ, জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ, জলসেচের ব্যাপক ব্যবস্থা, জমিতে কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ প্রভৃতি কর্মসূচী রূপায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ উৎপাদন তৈলবীজ উৎপাদন এবং আখের চাষও বেড়ে গিয়েছিল। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সবুজ বিপ্লবের বিস্তৃতি হয়েছিল বটে, তবে সবুজ বিপ্লবের সুফল সমগ্র দেশে সমানভাবে বন্টিত হয়নি। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ভূমি-সংস্কারের গতি ত্বরান্বিত কথা, কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা নতুন অঞ্চলে সম্প্রসারিত করা এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনায় গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের এবং কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণ ও সেই সঙ্গে সবুজ বিপ্লবের সুফল দেশে বিস্তৃত এলাকায় সম্প্রসারিত করার কথা বলা হয়েছিল। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনায় গড়ে বার্ষিক চার শতাংশ হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছিল এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদনও বেড়ে হয়েছিল ১৭৯ মিলিয়ন টন।

অষ্টম এবং নবম পাঁচসালা পরিকল্পনায় ও কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য অব্যাহত আছে। ১৯১৯-২০০০ সালে, অর্থাৎ নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার তৃতীয় বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে ২০৩ মিলিয়ন টন। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ভারত প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Near Self-sufficiency) অর্জন করেছে।

পরিকল্পনাকালে কৃষির উন্নয়ন পর্যালোচনায় দেখা যায় শুধু যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে তা-ই নয়, কৃষির পরিকাঠামোরও যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে। ১৯৬৯ সালে চোদ্দটি ব্যাংক এবং ১৯৮০ সালে ছয়টি ব্যাংক রাষ্ট্রয়াত্ত করা হয়। এই ব্যাংকগুলি এবং সেই সঙ্গে স্টেট ব্যাংক অভ ইন্ডিয়া ও তার সহযোগী ব্যাংকগুলি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলি কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ঋণ প্রদান করার নীতি অনুসরণ করেছে। তবে গ্রামীণ ঋণ সরবরাহে গরীব কৃষকরা কতটা উপকৃত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বর্তমানে পাম্পসেটের সাহায্যে জলসেচের জন্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে; তাছাড়া গভীর নলকূপ স্থাপন করার জন্যও সরকারের আর্থিক বরাদ্দ বেড়েছে। এখনও গ্রামাঞ্চলে বহু জমি জলসেচের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দেশের গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র এখনও বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত হয়নি।

ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে দেশ এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায় ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তবে কোনো কোনো রাজ্যে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে খুবই সামান্য অগ্রগতি হয়েছে; আবার কোনো কোনো রাজ্যে ভূমিসংস্কার আদৌ হয়নি।

৩.৪.৩ পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াসের মূল্যায়ন

ভারতে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রকৃত প্রয়াস আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায়। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত যে অনেক এগিয়ে আছে এ বিষয়েসন্দেহ নেই। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্যতম উদেনদশ্য ছিল দ্রুত শিল্পোন্নয়ন অর্জন করা। এই উদ্দেশ্যে একদিকে গুরুভার ও মূলধনি শিল্পের উন্নয়নের উপর এবং অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দেশের শিল্পোন্নয়ন যাতে রাষ্ট্র একটি ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য ১৯৫৬ সালে ভারতের শিল্পনীতি (আগে ১৯৪৮ সালে শিল্পনীতি ঘোষিত হয়েছিল) ঘোষিত হয়। এই নীতি অনুযায়ী দেশের ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসা হয়।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় মৌলিক, মূলধন-সামগ্রী শিল্প এবং উৎপাদন দ্রব্য শিল্প, বিশেষত যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি অর্জিত হয়। সিমেন্ট, কয়লা, এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির মতো অত্যাবশ্যক শিল্প দ্রব্যগুলির উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, ওষুধপত্র, সারে, রাসায়নিক শিল্পেরও ব্যাপক অগ্রগতি হয়। তাছাড়া পাট, সূতিবস্ত্র, চিনি প্রভৃতি শিল্পে আধুনিকীকরণের কাজ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে সরকারি উদ্যোগে দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পও যথেষ্ট উন্নত হয়।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় গুরভার শিল্প এবং মূলধনি সামগ্রী শিল্পের (Heavy industries and capital goods industries) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু বৃহদায়তন ভোগ-সামগ্রী শিল্প (Lare-scale consumption goods industries) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ততটা গুরুত্ব পায়নি। এই অবস্থায় শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উৎপাদন পদ্ধতি মূলধন-নিবিড় (Capital intensive) হয়ে গিয়েছিল। অথচ আমাদের দেশে মূলধনের যোগান কম ছিল। এজন্য সরকারের অমাদানির উপর নির্ভরতা বেড়ে গিয়েছিল। বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করে দেশের ভিতর দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানোর জন্য শিল্প-উৎপাদনে আমদানি-অনুপাত (import-content) বেশী রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ১৯৫৭ সালে আমদানি লাইসেন্স নীতি শিথিল বা হয়েছিল। কিন্তু বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করার জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন, তা ভারতের ছিল না। তার ফলে দেশে তীব্র বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার সংকট দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সের যে সমস্যা আমরা বরাবর দেখেছি, তার সৃষ্টি হয়

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে এজন্য ভারতকে প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

ভারতে শিল্পোন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমদানির বিকল্প জিনিস উৎপাদনের (import substitution) উপর এবং ভোগ-সামগ্রী শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া বিদেশী প্রযুক্তির সাহায্যও গ্রহণ করা হয়, যদিও তার প্রভাব খুব বিস্তৃত হয়নি।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত শিল্পোৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছিল। ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে দেশে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা দেখা যায়।

শিল্পোন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে শিল্পক্ষেত্রে যে মন্দা সূচিত হয় তা আমাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতার অন্যতম পরিচায়ক। প্রথম তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদন গড়ে ৭.৭ শতাংশ হারে বেড়েছিল—কিন্তু ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত—এই দশ বছরে শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল গড়ে ৩.৬ শতাংশ হারে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া ১৯৮৬ সালে "Trends in Industrial Production" শীর্ষক যে সমীক্ষা করেছিল, তাতে দেখা যায় ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছিল প্রতি বছর ৫.৮ শতাংশ হারে। রিজার্ভ ব্যাংকের সমীক্ষা অনুযায়ী শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার শ্লথ হবার কারণগুলি ছিল—(১) সঠিক উৎপাদনের মাত্রা ও উৎপাদন-কৌশল (inapproirate choice of scale and technology) নিয়োগ না হওয়া, (২) উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের স্বল্পহার (poor rate of capacity utilisation), (৩) উৎপাদন-ক্ষমতা এং চাদিার মধ্যে সঙ্গতির অভাব (inconsistency between production capacity and demand), (৪) শিল্প-সামগ্রী নির্বাণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা (failure of the manufacturing industry)। ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত আমরা যে শিল্প-মন্দা দেখতে পেয়েছি, এটা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম ব্যর্থতা।

পরিকল্পনাকালে শিল্পোৎপাদনের গতি শ্লথ হবার স্বল্পকালীন কারণগুলি হল, বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের অনুৎপাদনমূলক ব্যবহার, ১৯৬৫ সাল থকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পর পর তিন বছর ধরে খরা ও পরবর্তীকালে ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ সালে খরা, এবং এই খরার প্রভাবে কাঁচামালের সরবরাহ হ্রাস, বিদ্যুৎ ঘাটতি, পরিবহনে অব্যবস্থা প্রভৃতি। ১৯৭৩ সালের তেল সংকট শিল্পক্ষেত্রে কাঠামোগত বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল। শিল্প মন্দার দীর্ঘকালীন কারণগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য ঃ—(১) শিল্প লাইসেন্সের ক্ষেত্রে জটিল আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ শিল্পক্ষেত্রে সম্পদের অসম বন্টনের সৃষ্টি করেছিল এবং তার পুঞ্জীভূত প্রভাব শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল। (২) ষাটের দশকে কৃষি-উৎপাদন কম হওয়া শিল্পক্ষেত্রে মন্দা সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল। (৩) সরকারি ক্ষেত্রে প্রকৃত বিনিয়োগের (real investment)

পরিমাণ কমে যাওয়া শিল্পোৎপাদন কম হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল। (৪) শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ ক্রমেই বেড়ে যাওয়া, (cost excalation), উৎপাদনী ক্ষমতার প্রকৃত ব্যবহারের অভাব (underutilisation of capacity), মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে অবনতি, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের অভাব এবং ক্ষেত্রবিশেষে আর্থিক সংকট— প্রভৃতিও শিল্পোৎপাদন শ্লথ হবার কারণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

পরিকল্পনাকালে আমরা দেখতে পেয়েছি সামগ্রিকভাবে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস এবং সরকারি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ (আশির দশক পর্যন্ত) অব্যাহত থাকলেও এক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জিত হয়নি। ১৯৯১ সালে দেশের নতুন শিল্পনীতি ঘোষিত হয় এবং এই শিল্পনীতি অনুযায়ী শিল্পক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ (privatisation) লাইসেন্স প্রথার প্রায় বিলোপ (Near abolition of the licensing system) সরকারি উদ্যোগগুলির বিলগ্নীকরণ (Public Disinvestment), রুগ্ন শিল্পগুলিতে বিদায়নীতির (Exit Policy) প্রবর্তন এবং দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য ঢালাও ব্যবস্থা ও বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে (Multinational Corporations) ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান, প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়। অর্থনৈতিক উদারীকরণের (Economic Liberlisation) এবং বিশ্বায়নের (Globalisation) নীতি গৃহীত হবার পরিপ্রেক্ষিতেই নতুন শিল্পনীতি ঘোষিত হয় এবং আমদানি নীতিও উদার করা হয়। কিন্তু নতুন শিল্পনীতি ঘোষিত হবার পরও শিল্পোৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ বছর (১৯৯৬-৯৭) শিলোৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৬ শতাংশ; নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম দুই বছর শিলোৎপাদন বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক ছিল না। যদিও শিলোৎপাদন বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত একটি অগ্রণী দেশ, তথ্য-প্রযুক্তির (Information Technology) ক্ষেত্রে ভারত বর্তমানে অনেক উন্নত দেশের চেয়েও এগিয়ে আছে।

৩.৪.৪ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নয়নের মূল্যায়ন

অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে ভারতের প্রধান সাফল্য হল রেলওয়ে সম্প্রসারণ। বর্তমান বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম রেলওয়ে ব্যবস্থা হল ভারতের কিন্তু সড়ক পরিবহন এবং নদী পরিবহনের ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি। তবে সড়ক পরিবহন এবং জল পরিবহন যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নত হবার প্রধান উপাদান হচ্ছে কয়েকটি মূল শিল্প, যেমন—কয়লা, গ্যাস, বিদ্যুৎ, সিমেন্ট প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি। তাছাড়া পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধিও গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে পরিকল্পনাকালে যথেষ্ট উৎপাদন বেড়েছে। পরিকল্পনাকালে কলকাতার মেট্রো রেল স্থাপনও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে বিশিষ্টতা দান করেছে। দেশের নগর উন্নয়ন (urban development), স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট; নতুন শহর নির্মাণ, আবাসন

প্রকল্প, প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সবক্ষেত্রে যে সাফল্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়েছে তা নয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ, জাতীয় সড়ক আরও উন্নত করা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। ১৯৯৬ সালে কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক ৫০০০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ একটি পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থ কোম্পানি (Infrastructure Development Finance Company) গঠিত হয়েছিল। বিদেশী প্রতিষ্ঠানগত বিনিয়োগগারীরা যাতে ভারত মূলধন বিনিয়োগে আগ্রহী হয় সেজন্য পরিবহণ কাঠামোর উন্নয়ন দরকার—এই উন্নয়নের জন্য অর্থ-সরবরাহকারী হিসেবে এই কোম্পানি গঠিত হয়েছে।

৩.৫ ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যে সব উদ্দেশ্য আগে আলোচিত হয়েছে তার কোনটিই পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। বরং কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিকল্পনার ব্যর্থতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে, যেমন—(ক) দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা, (খ) বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সের সমস্যা ও বৈদেশিক মুদ্রা সংকট, (গ) মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা—প্রভৃতির সমাধান করা এখনও সম্ভব হয়নি; বরং সমস্যাগুলির তীব্রতা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে।

পরিকল্পনাকালে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ভারতের উন্নয়ন হার হয়েছিল গড়ে ৩.৭৬ শতাংশ, অথচ গড়ে পাঁচ শতাংশ হারে উন্নয়ন হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তরের দশকের শেষ পর্যন্ত দেশে শিল্পক্ষেত্রে আমরা মন্দা দেখতে পেয়েছি। আশির দশকে শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধি হলেও এখনও দেশ উৎপাদন লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে আছে। আয়ের বৈষম্য দেশে বেড়ই চলেছে—সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের লক্ষ্য থেকেও দেশ এখন অনেক দূরে সরে এসেছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের সর্মসূচীও সফল হয়নি। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে দেশে ২৫ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকবে বলে ধরা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক বেশি শতাংশ লোক এখন দারিদ্র্যসীমার নীচে আছে। অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে পরিকল্পনা কমিশনের মতে ২৯.১৮ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে ছিল। অপর একটি হিসাবে দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল মোট জনসমষ্টির ৩৫.৯৭ শতাংশ।

পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বাপেক্ষা বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে। এই সমস্যার সমাধানের প্রতি যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল, পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অবশ্য দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, কিন্তু ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধানের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা গহীত হয়নি। সংগঠিত শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাওয়ায় কর্মবিনিময় সংস্থার

(Employment Exchange) মাধ্যমে চাকুরীর সুযোগও কমে গেছে। গ্রামীণ বেকার সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব হয়নি। একদিকে বেকার সমস্যা, অপরদিকে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসমষ্টির নিদারুণ দারিদ্র্য দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সার্বিক ব্যর্থতার পরিচায়ক।

আমাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতার আরেকটি দিক হল মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা। পরিকল্পনাকালে দেশে একশ্রেণীর লোক যথেষ্ট বড়লোক হচ্ছে এবং তারা দেশে কালো টাকার মাধ্যমে একটি সমান্তরাল অর্থনীতির (Parallel economy) সৃষ্টি করেছে। দেশের কালো টাকার সঠিক হিসাব করা সম্ভব নয়। তবে আনুমানিক এক লক্ষ কোটি কালো টাকা দেশে আছে বলে অনুমিত হয়েছে। ভারত সরকার কঠোর হস্তে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারেন নি। কালো টাকা মুদ্রাস্ফীতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা প্রতিফলিত হয় অতিরিক্ত কোষাগার ঘাটতি (Fiscal Deficit) এবং বাজেট ঘাটতির (Budgetary Deficit) মধ্যে। নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় সরকারের কোষাগার ঘাটতি বা আর্থিক ঘাটতি ছিল দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) প্রায় ৯ শতাংশের কাছাকাছি। আশির দশকেও এই ঘাটতির তীব্রতা খুব বেশি ছিল। নব্বুইয়ের দশকের শেষে এই ঘাটতির অনুপাত ৫.৬ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ বরাবরই বেশি দেখতে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা থেকেই আমাদের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এবং ভারত সরকার অত্যধিক পরিমাণে ঘাটতি অর্থসংস্থানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। যে হারে দেশের উৎপাদন বেড়েছে তার চারগুণ বেশি হারে টাকার যোগান বেড়েছে। তার ফলে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বেড়েই চলেছে, কালো টাকার প্রচলন ও ঘাটতি অর্থসংস্থান ছাড়াও দেশে অত্যাবশ্যক সামগ্রীগুলির ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের অভাব, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী পেট্রোল, কয়লা, সিমেন্ট, চিনি, তেল প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি, চোরা কারবার দমনে ব্যর্থতা প্রভৃতিও মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী। খাদ্য সংগ্রহের মূল্যবৃদ্ধি (Rise in Procurement Prices), সরকারি নির্দেশনার ফলে সরকারি বন্টনের আওতায় বিভিন্ন জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি (Administered Price hike), ভরতুকির পরিমাণ বৃদ্ধি, এবং আমদানির মূল্যবৃদ্ধি (Import Price) মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী। সরকারি উদ্যোগগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমানে লোকসানে চলছে। সরকারি উদ্যোগগুলির দক্ষতার অভাব এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিদান হার (rate of return on investment) কম হওয়াও আমাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতার পরিচায়ক। পরিকল্পনার পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় এই জিনিসগুলি প্রতিটি পরিকল্পনাতেই পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। এই সবগুলি কারণই পরিকল্পনাকালে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা সমাধানে সরকারের ব্যর্থতার জন্য যায়ী। ভারতে পরিকল্পনার ব্যর্থতা প্রতিফলিত হয়েছে সামাজিক সুরক্ষা (Social Safety net) বজায় রাখার

ক্ষেত্রেও। এখনও দেশের প্রায় ৩৮ শতাংশ জনসমষ্টি নিরক্ষর। শিক্ষার সম্প্রসারণ, শিশু শ্রমের (Child Labour) অবসান, জনস্বাস্থ্য ও ময়লা সাফাইয়ের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ এবং আবাসন ব্যবস্থা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কর্মসূচি পুরোপুরি বাস্তাবায়িত হয়নি।

সর্বশেষে, পরিকল্পনার ব্যর্থতা আমরা দেখতে পাই বৈদশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। বছরের পর বছর (১৯৭৬-৭৮ বাদ) বৈদেশিক লেনদেন ব্যাসান্সের চলতি অ্যাকাউন্টে (Current Account of the Balance of Payments) ঘাটতির ফলে সরকারের বৈদেহিক ঋণের বোঝাও বেড়েছে। বৈদেশিক লেনদেন ব্যাসান্সের ঘটতি খুবই তীব্র হয়েছিল ১৯৯১-৯২ সালে। সে বছর বৈদশিক ঋণ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনরে ানুপাত Debt_GDP ratio) চিল ৪১.০ শতাংশ। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনাকালে যেসব ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলি পরিশোধ করার জন্য এবং সেগুলির উপর সুদ প্রদান করার জন্য (debt servicing) পরবর্তীকালে আবার ঋণগ্রহণ করতে হয়েছিল এবং এখানে দেশ বৈদেশিক ঋণের ফাঁদে (Foreign Debt Trap) আটকে গিয়েছিল। ১৯৯৯ সালের ৩১শে মার্চ ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৭.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এটা ছিল দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২৩.৫ শতাংশ। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ভারতকে প্রচুর ঋণ নিতে হয়েছে।

পরিকল্পনার ব্যর্থতার বোঝা দেশের অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রই দেখা যাচ্ছে। তবে পরিকল্পনার সাফল্যও যে কিছু নেই তা নয়, এবং আমরা আলোচনা করেছি। তবে ব্যর্থতা সর্বাপেক্ষা বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে দারিদ্র্য—দূরকরণের ক্ষেত্রে, বেকার সমস্যার ক্ষেত্রে ও বৈদেশিক ব্যালন্সের ক্ষেত্রে। রপ্তানির চেয়ে আমদানি অনেক বেশি হওয়ায় বৈদেশিক বানিজ্যের ঘাটতি দূর করা সম্ভব হচ্ছে না।

৩.৬ সারাংশ

ভারত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। ১৯২৪ সালে বারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনে ডক্টর বিশ্বশ্বরায়া ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হরিপরা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, তখন সভাপতির ভাষণে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি সুনিদিলষ্ট কর্মসূচীর রূপরেখা প্রদান করেন। এই সময় ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নানা দিক সম্পর্কে অন্যান্য যাঁরা সুনির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর বিশ্বশ্বরায়া, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, শ্রীজওহরলাল নেহরু ও শ্রী ভি.বি. গিরি। তা ছাড়া শ্রী এম. এন. রায় একটি জনগণের পরিকল্পনা (People's Plan) প্রস্তুত

করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) গঠিত হয় তার সভাপতি পদে নির্বাচিত হন শ্রী জওহরলাল নেহরু। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতে যে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় তার পূর্বসূরী হিসাবে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন আমাদের পরিকল্পনার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র গুরুভার শিল্পের উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষির উন্নতি, প্রভৃতিকে পরিকল্পনার কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার প্রদান করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ ও কুটির শিল্প, বিশেষত খাদি শিল্পের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের উপর আস্থাবান ছিলেন। অর্থনৈতিক কর্মসূচী সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ছাড়া বোম্বাইয়ের আটজন শিল্পপতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন; তাকে "বোম্বাই পরিকল্পনা" ("Bombay Plan") বলা হত। তাছাড়া শ্রীমন নারায়ণ (Shriman Narayan) "গান্ধী পরিকল্পনা" ("Gandhian Plan") নামে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। শ্রী এম. এন. রায় প্রস্তুত করেন "জনগণের পরিকল্পনা" ("People's Plan)। ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছাড়া এগুলির বিশেষ কোনো গুরুত্ব বর্তমানে নেই।

স্বাধীনতালাভের পর ১৯৫০ সালে ভারতে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) গঠিত হয় এবং ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় মডেল প্রস্তুত করেন। এটি মহলানবীশ মডেল (Mahalanobis Model) নামে বিখ্যাত। ভারতে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত ছিল প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা; ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত ছিল দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা; ১৯৬১-৬২ সাল থেকে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত ছিল তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা শেষ হবার পর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণীত হয়নি। ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত। পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার (১৯৭৪-১৯৭৯) পর আবার একবছরের জন্য একটি পরিকল্পনা (১৯৭৯-৮০) তৈরি করা হয়। ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) এবং সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনার (১৯৮৫-৯০) পর আবার দুটি বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২) তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সপ্তম পরিকল্পনা ১৯৯০-৯১ সালের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নেওয়া হয়নি। কারণ তখন ছিল তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে ভারতে নতুন অর্থনৈতিক নীতি ঘোষিত হয় এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজ শুরু হয়। অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনা ছিল ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত। ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে নবম পাঁচসালা পরিকল্পনা শুরু হয়েছে।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা :

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। বর্তমানকালে পরিকল্পনাবিহীন অর্থনীতির পক্ষে জাতীয় আয় দ্রুত বাড়ানো সম্ভব নয়। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ও তার সুষ্ঠু বণ্টন, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ, মূলধন সৃষ্টির হার বাড়ানো, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আয় ও ধনের বৈষম্য কমিয়ে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা, ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতিজনিত সমস্যার মোকাবিলা করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা, প্রভৃতি উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন খুবই বেশি। নব্বুইয়ের দশকের গোড়ায় অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করার জন্য ভারতে নতুন অর্থনৈতিক নীতি গৃহীত হয় এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী গৃহীত হয়। ভারত ক্রমশ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রাচীন কাঠামো থেকে অনেকটা সরে আসে এবং বাজার অর্থনীতির দিকে অর্থনৈতিক নীতি চালিত করতে থাকে। অর্থনৈতিক উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ন—এই তিনটি কর্মসূচীর প্রভাবে পরিকল্পনার গুরুত্ব যথেষ্ট কমে যায়। কিন্তু এজন্য পরিকল্পনার যৌক্তিকতা শেষ হয়ে যায়নি। বাজার অর্থনীতিতে যদি যোগান ও চাহিদার মধ্যে কখনও ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় সেখানে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং ভারতে সেটা পরিকল্পিতভাবেই করা যেতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য :

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল—(১) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং তাদের সামনে আরও উন্নত ধরনের এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করা; (২) জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা (অন্তত বছরে ৫ শতাংশ থেকে ৫.৫ শতাংশ); (৩) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি পরিকল্পিত বিনিয়োগের হার অর্জন করা; (৪) আয় ও ধনের বৈষম্য হ্রাস করা এবং আয় ও সম্পদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীয়করণ হ্রাস করা; (৫) অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা; এবং (৬) ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে, যথা—(ক) কৃষি উৎপাদন, (খ) শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষমতা প্রসার এবং (গ) বৈদেশিক লেনদেনের অবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রের সমুদয় প্রতিবন্ধক ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের মূল্যায়ন :

জাতীয় আয় বৃদ্ধি—ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি। জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রথম তিন দশকে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে জাতীয় আয় গড়ে ৩.৬ শতাংশ বেড়েছিল। আশির দশকে গড় উন্নয়ন হার ছিল ৫.২ শতাংশ। অষ্টম পরিকল্পনায় জাতীয় আয় গড়ে ৬.৭ শতাংশ হারে বেড়েছিল।

ভারতে কৃষি উন্নয়ন—প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনরে উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন আপেক্ষিকভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল, এবং শিল্পোন্নয়নর উপর আপেক্ষিকভাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ বছর খাদ্য সংকট তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। ভারতে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের সূচনা হয় চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায়। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় নতুন কৃষি প্রযুক্তি প্রবর্তিত হয়। জমিতে রাসায়নিক সারের উপযুক্ত ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষির যন্ত্রীকরণ, উচ্চ ফলনশীল বীজ রোপণ, জমিতে উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা ও কীটনাশক ওষুধের সাহায্যে চারা সংরক্ষণ এবং সরকারি এজেন্সিগুলি গর্তৃক কৃষিটেত্রে প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ প্রভৃতি ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় কৃষি-উৎপাদনে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম তিন বছর পর্যন্ত কৃষি উৎপাদনের ধারা অব্যাহত আছে। বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে।

সবুজ বিপ্লবের সূচনা থেকে নবম পরিকল্পনা পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন হলেও ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার অগ্রগতি (পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা বাদে) বিশেষ হয়নি। এখনও দেশের এক তৃতীয়াংশ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। দূর গ্রামাঞ্চলের অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারিত হয়নি।

শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস ঃ ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সাময়িকভাবে এক বছরের জন্য আমদানি নীতি শিথিল করা হয়েছিল যাতে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করা সম্ভব হয় ও তার ফলে পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রা সংকটেরও সৃষ্টি হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগ থেকে ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত আমদানি বিকল্পীকরণেরওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিল্পোন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা পরিলক্ষিত হয়। সত্তরের দশকে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয় বটে; তবে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়নি।

আশির দশকের শেষে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। ১৯৯০-৯১ সালের অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং তার অঙ্গ হিসাবে নতুন শিল্পনীতি (১৯১১) ঘোষিত হয়। নতুন শিল্পনীতিতে শিল্পক্ষেত্রে সবসরকারিকরণ, সরকারি উদ্যোগের বিলগ্নীকরণ, রুগ্ন শিল্পের ক্ষেত্রে বিদায় নীতি, লাইসেন্স ব্যবস্থার প্রায় অপসারণ, আমদানি উদারীকরণ (বাণিজ্য নীতির পরিবর্তনের ফলে) এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বহুজাতিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতে ব্যবসা করার জন্য আমন্ত্রণ—এগুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির

মধ্যে ভারত শিল্পক্ষেত্রে একটি অগ্রণী দেশ হিসাবে পরিচিত। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত অসাধারণ উন্নতি করেছে।

অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নতি—ভারতে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত পরিবর্তনে দেখা যায় তৃতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাড়ছে। এও দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন প্রতিফলিত হয়। কিন্তু দেশের পরিবহন ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এখনও আশানুরূপ হয়নি। ১৯৯৬-৯৭ সালে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং পাঁচ হাজার কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ একটি পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থসংস্থা গঠন করা হয়েছে।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা ঃ (Failures of Planning in India) : ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন—(ক) বেকার সমস্যা, (খ) বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সের সমস্যা ও বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট এবং (গ) মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা। এই সমস্যাগুলির সমাধান করা ভারত সরকারের পক্ষে এখনও সম্ভব হয়নি। বেকার সমস্যার তীব্রতা বেড়েই যাচ্ছে। বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যালান্স এবং লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি ও বৈদেশিক মুদ্রা সংকট চরমে উঠেছিল ১৯০০-৯১ সালে। বৈদেশিক ঋণের সমস্যাও ভারতে তীব্র। মুদ্রাস্ফিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে মুদ্রাস্ফিতি বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি।

দারিদ্র্য হটানোর ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৭-৯৮ সালে জনসমষ্টির ২৯.১৮ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল। অপর একটি হিসাবে দেখা যায় ১৯৯৭-৯৮ সালে দারিদ্র্য অনুপাত ছিল ৩৫.৯৭ শতাংশ। সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে, অর্থাৎ শিক্ষা সম্প্রসারণ, জনস্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা, ময়লা সাফাই, শিশু শ্রমের অবসান, গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ—প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। এখনও দেশের ৩৮ শতাংশ লোক নিরক্ষর।

পরিকল্পার এই ব্যর্থতাগুলি থাকা সত্ত্বেও পঞ্চাশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চালিয়ে যাওয়া ভারতের ক্ষেত্রে খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক।

৩.৭ অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। স্বাধীনতার আগে প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়————সালে। তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন———এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি ছিলেন———।

২। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা————মডেলের উপর ভিত্তিশীল ছিল।

৩। স্বাধীন ভারতে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা শুরু হয়————সাল।

৪। ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়—————সালে।

৫। অষ্টম পাঁচসালা পরিকল্পনায় অতীয় আয় বার্ষিক ———— হারে বেড়েছিল।

৬। ———সাল থেকে দেশে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা দেখা যায়।

২। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

১। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের কথা কোন পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রথম বলা হয়েছিল?

২। ভারতে মিশ্র অর্থনীতি গঠনের কথা কখন ঘোসিত হয়েছিল?

৩। নতুন শিল্পনীতি কোন সালে ঘোষিত হয়েছিল?

৪। বাজার অর্থনীতিতেও সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন কোথায়?

৫। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্ততঃ তিনটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার উল্লেখ করুন।

৬। অর্থনতিক সংস্কারের তিনটি মূল নীতি কি কি?

৭। ভারতে অথনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা কি ছিল?

৮। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তরের বাইরে প্রশ্নমালা।

১। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করুন।

২। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। নব্বুইয়ের দশকে পরিকল্পিত অর্থনীতি থেকে দেশ কিছুটা সরে এলেও পরিকল্পনার যৌক্তিকতা কী শেষ হয়ে গেছে?

৩। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করুন এবং বিভিন্ন পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যগুলি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখান।

৪। ভারতে পরিকল্পনাকালে কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের মূল্যায়ন করুন।

৫। ভারতে পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়নের প্রয়াসের মূল্যায়ন করুন।

৬। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক আলোচনা করুন।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশানাস প্ল্যানিং (জয়শ্রী প্রকাশন) কলকাতা।

২। Sukjamoy Chakrabarty : *Development Planning* (1987).

৩। Pramit Chaowdhury (ed.) : *Aspects of Indian Economic Development* (1971).

৪। Prabhat Patnaid : "Indian's Growth Experience", *Economic and Political Weekly*, May 1987.

৫। সুব্রত গুপ্ত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (2000).

৬। A. Vidyanathan, "The Indian Economy Since Independence (1947-1970); Dharma Kumar (ed.), *The Cambridge Economic History of Indai* : Vol. II (1983).

৭। Montek Allutialia, "Economic Performance of States in Post-Reforms Period", *Economic and Political Weekly*, May 6–12, 2000.

৮। Bipan Chandra, Mirdula Mukherjee, Aditya Mukherjee, *India After Independence* (1999).

একক ৪ ❐ নেহেরুর পররাষ্ট্রনীতি—জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বরাজনীতির পরিস্থিতি—ঠাণ্ডা যুদ্ধ **(Cold War)** এবং তৃতীয় বিশ্বের **(Third World)** উত্থান।

৪.৪ তৃতীয় বিশ্ব সহযেগিতা এবং জোটনিরপেক্ষ তত্ত্ব—সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য।

৪.৫ নেহরুর নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্বসহযোগিতা এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম।

৪.৬ নেহেরুর নেতৃত্বে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (১৯৬১-১৯৬৪)—পরবর্তী পর্যায়—বর্তমান সময়।

৪.৭ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল্যায়ন।

৪.৮ উত্তর—ঠাণ্ডা যুদ্ধ **(Post-Cold War)** প্রভাবিত বিশ্বরাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

৪.৯ সারাংশ

৪.১০ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির প্রধান উদ্দেশ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি গঠন এবং নির্মাণ পরিক্রয়ার সঙ্গে আপনাদের পরাথমিক পরিচয় করানো। স্বাধীন ভারতের প্রথম দুই দশকে পররাষ্টরনীতির প্রধান রূপকার ছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (১৯৪৭-১৯৬৪)। দিবতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বরাজনীতিতে মেরুকরণ (Polarisation) প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করে, নেহরু ভারতের নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্ব সহযোগিতার একটি ধারা গড়ে তোলেন যা শেষ পর্যন্ত জন্ম দেয় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের। এই এককটিতে আপনারা দেখবেন—

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বরানীতির প্রেক্ষাপট—ঠারডা যুদ্ধ এবং তৃতীয় বিশ্বের উত্থান।
- জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন—সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য।
- তৃতীয় বিশ্ব সহযোগিতা এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের পেছনে নেহরুর ভূমিকা।
- ভারতের নেতৃত্বে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অগ্রগতি ও বিস্তার।
- জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল্যায়ন।
- জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বর্তমান সময় প্রাসঙ্গিকতা।

৪.২ প্রস্তাবনা

এই পর্যায়ের অন্য এককগুলি পড়ে আপনারা জেনেছেন যে কিভাবে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রথম দুই দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সাংবিধানিক এবং অর্থনৈতিক—নানাবিধ সংস্কারের মাধ্যমে ভারত একটি বিকাশশীল, জনকল্যামুখী রাষ্ট্রে (Welfare State) রূপান্তরিত হয়েছিল। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য হল পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ণ। স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান রূপকার ছিলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু (১৯৪৭-১৯৬৪)। তাই, স্বাধীনতার পরবর্তী দুই দশকে ভারতের বিবর্তিত পররাষ্ট্র নীতিকে "নেহেরুনীতি" বলা যুক্তিসংগত।

'নেহেরুনীতির' অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তৃতীয় বিশ্ব সহযোগিতার কাঠামো গড়ে তোলা এবং ঠাণ্ডাযুদ্ধ প্রভাবিত বিশ্ব মেরুকরণ প্রক্রিয়ার বাইরে ভারতকে রাখা। এই লক্ষ্যে নেহরু সফল হন। তাঁর নীতি, ভারতকে তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির নেতৃত্ব এনে দেয়, এবং ভারত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান রূপকার হয়ে ওঠে।

এক এককটিতে আপনার দেখবেন যে দ্বিতীয় বিশ্ব পরবর্তী বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপট কিভাবে একদিকে ঠাণ্ডাযুদ্ধ এবং অপরদিকে তৃতীয় বিশ্বের উত্থান দ্বারা আন্দোলিত হচ্ছে এবং, সদ্য স্বাধীন ভারতের কর্ণধার হিসেবে কেন নেহেরু ভারতকে মেরুকরণ প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে, তৃতীয় বিশ্ব জোট গঠনে সচেষ্ট ছিলেন। এছাড়া, আপনারা দেখবেন যে নেহরু কিভাবে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে একদিকে ভারতের সুরক্ষা নীতি, এবং অপরদিকে ভারতের নেতৃত্বে তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করাবার প্রয়োজনে ব্যবহার করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সবশেষে, আপনারা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সাফল্য এবং ব্যর্থতার একটি মূল্যায়ন দেখবেন এবং জানতে পারবেন যে বর্তমান সময়ে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা কতখানি।

৪.৩ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বরাজনীতির পরিস্থিতি—ঠাণ্ডাযুদ্ধ এবং তৃতীয় বিশ্বের উত্থান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই জয়ী মিত্রপক্ষের মধ্যে ভাঙন লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে এক মেরুকরণ (Polarisation) প্রক্রিয়া নিয়ে আসে। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি (প্রধানত গ্রেট ব্রিটেন) দীর্ঘমেয়াদী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার ফলে সামরিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এর ফলে বিশ্বরাজনীতির একদা প্রধান বৈশিষ্ট্য 'ইউরোপ-কেন্দ্রিকতার' (Euro-Centrism) অবসান ঘটে। ধনতান্ত্রিক, পশ্চিমী গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির অবিংসবাদিত নেতা হয়ে ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি।

এর বিপরীতে, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েট ইউনিয়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিজের প্রভাব বাড়াতে সক্ষম হয়। প্রথমে ইউরোপে, পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বে, একে অপরের প্রভাব খর্ব করা এবং নিজের প্রভাব বিস্তার করার প্রচেষ্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সেভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এক দীর্ঘমেয়াদী দ্বন্দ্বের সূচনা করে। বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে যাকে বলা হয় ঠাণ্ডা যুদ্ধ (Cold War)।

ঠাণ্ডা যুদ্ধ, বিশ্বরাজনীতিতে এক মেরুকরণ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আমেরিকার নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক, পশ্চিমী গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি যে জোট গঠন করে তাকে বা হয় প্রথম বিশ্ব (First World)। অপরদিকে, সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত হয় সমাজবাদপন্থী দেশগুলির সংগঠন, যাকে বলা হয়, দ্বিতীয় বিশ্ব (Second World)। মাঝে মাঝে, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, দ্বন্দ্ব লাঘব করবার প্রচেষ্টা হলেও, ঠাণ্ডা যুদ্ধের ইতিহাস, মূলত, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাসে দ্বন্দ্ব, পরো লড়াই, সামরিক প্রতিযোগিতা এবং গুপ্তচর বৃত্তির ইতিহাস, যা বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টাকে প্রবলভাবে ব্যাহত করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের ইতিহাসের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল প্রাক্তন উপনিবেশগুলির স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে উত্থান, এবং বিশ্বরাজনীতির মানচিত্রে এদের আত্মপ্রকাশঙ্গ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে, ইউরোপীয় দেশগুলির দৈন্যদশার ফলে, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে শুরু করে। এর প্রতিফলন ঘটে এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমরেকিা মহাদেশভুক্ত উপনিবেশগুলিতে। এটি যদিও একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকিরয়া, তবু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে, এশিয়া এবং আফ্রিকার অধিকাংশ দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে। একটি হিসেব অনুযায়ী ১৯৪৫ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বিশ্বের মানচিত্রে ৬৬টি দেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে; এদের মধ্যে অধিকাংশই এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত।

এই নতুন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নানা প্রকারের বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য থাকলেও, এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অর্থনৈতিক দুর্বলতা। উপনিবেশ হিসেবে এই দেশগুলির অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির শিল্পের উপযোগী কাঁচা মাল (Raw materials) জোগানদারের ভূমিকায় কাজ করেছে এবং পশ্চিমী শিল্প দ্রব্যের বৃহৎ বাজার হিসেবে কাজ করেছে। এর ফলে ভারতসহ অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া সেরকম সুদৃঢ় হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতসহ অন্যান্য উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করলেও, তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। এইসব দেশগুলি তাই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমী দেশগুলির ওপর আরো নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এছাড়া, তারা নতুন গড়ে ওঠা বিশ্ব সংগঠনগুলি যেমন, আন্তর্জাতিক অর্থ ভারডার (International Monetary Fund I.M.F.) এবং বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) (যেগুলির ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ ছিল অবিসংবাদিত)-এর ওপরও নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। নতুন রাষ্ট্রগুলির ওপর প্রথম বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বর্ধিত হয় প্রধানত অর্থনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে। বিভিন্ন প্রকল্প যেমন, ঋণদান, অনুদান, শিল্পদ্রব্য জোগান ইত্যাদির মাধ্যমে, ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী গোষ্ঠীর আধিপত্য তাই এই রাষ্ট্রগুলির ওপর বজায় থাকে, এবং বর্ধিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে অভিহিত করা হয় 'নব্য উপনিবেশবাদ' নামে (Neo-colonialism)। ঠাণ্ডা যুদ্ধের পটভূমিকায় এই নব্য উপনিবেশবাদ আলাদা মাত্রা লাভ করে কারণ, তখন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব উভয়েরই লক্ষ্য হয় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করা। প্রথম বিশ্বের অনুকরণে সোভিয়েট ইউনিয়নও পূর্ব ইউরোপে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে।

এই বিশ্বব্যাপী মেরুকরণের বিপক্ষে এই নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি হয় যার ফলে তারা কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত হতে অস্বীকার করে। এই চেতনা থেকেই জন্ম নেয় 'তৃতীয় বিশ্বের' ধারণা। এই চেতনা গঠনের ক্ষেত্রে নেহরুর ভূমিকা অপরিসীম। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অংশীদার হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ১। তৃতীয় বিশ্ব বলতে কি বোঝেন?

প্রশ্ন ২। 'নব্য-উপনিবেশবাদ' মানে কি?

৪.৪ তৃতীয় বিশ্বসহযোগিতা এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন—সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য

তৃতীয় বিশ্ব গঠনের পেছনে নেহেরুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারত তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির নেতৃত্ব লাভ করে। আবার, নেহরুর পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের নেতৃত্বে তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অংশীদার হয়।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত, দুর্বল তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের মেরুকরণ প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার দ্বারা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া। অধ্যাপক আপ্পাদোরাই (A. Appadorai), তাঁর ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট এন্ড ইন্ডিয়াস ফরেন পলিসি (National Interest and India's Foreign Policy) গ্রন্থে, জোট নিরপেক্ষ তত্ত্বের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা লিখেছেন—

১। কোনো দেশের সঙ্গে সামরিক চুক্তির বা কোন সামরিক গোষ্ঠীর সদস্য না হওয়া। মূলত, এর প্রধান লক্ষ্য ছিল জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে গঠিত উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংগঠন (North Atlantic Treaty Organisation অথবা NATO) এবং, সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত ওয়ারশ চুক্তি সংগঠনের (Warshaw Pact) বাইরে রাখা। এই প্রধান দুই সামরিক সংগঠন ছাড়া, জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি অন্যান্য সামরিক সংগঠনগুলিরও (উদাহরণ SEATO, বা CENTO) বিরুদ্ধে ছিল।

২। জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখা। কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে, নির্দিষ্ট এবং বিশ্বশক্তি নির্দেশিত নীতি অনুধাবন করা হত না।

৩। শুধুমাত্র নিজস্ব গোষ্ঠীতে আবদ্ধ না থেকে বিশ্বের সব দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক এবং সহযোগিতা বজায় রাখা।

জোটনিরপেক্ষ তত্ত্ব সম্বন্ধে এটাও মনে রাখা দরকার যে এটি কখনই একটি স্বাতন্ত্র্যবাদী (Isolationist), নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নয়। নিরপেক্ষতা শুধুমাত্র সামরিক চুক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। অন্যান্য বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান রূপকার নেহরু ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায়, এই প্রসঙ্গে ও ৯ ডিসেম্বর ১৯৫৮ সালে, একটি ভাষণে বলেন, "....আমরা যখন বলি যে আমাদের নীতি হল জোটনিরপেক্ষতা, আমরা নিশ্চিতভাবে সামরিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই জোটনিরপেক্ষতার কথা বলি। এটি কোন নেতিবাচক নীতি নয়, বরং ইতিবাচক এবং স্পষ্ট নীতি, এবং আমার বিশ্বাস, এটি একটি গতিশীল নীতি।" ("When we say our policy is one of non alignment, obviously me mean non alignment with military blocks. It is not a negative policy. It is positive one, a definite one and I hope, a dynamic one." (*Source : A Appadorai. National Interest and India's Foreign Policy*)। পুনরায়, ২২ নভেম্বর ১৯৬০ সালে আরেকটি ভাষণে, নেহরু বলেন, "আমি আগেও বারংবার বলেছি যে ভারতের ক্ষেত্রে 'নিরপেক্ষ' কথাটির ব্যবহার আমি পছন্দ করি না। এমনকি, কয়েকটি দেশের দ্বারা ভারতের নীতিকে 'ইতিবাচক নিরপেক্ষতা' বলে মন্তব্য করাটাও আমি পছন্দ করি না, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহভাবে আমরা জোটনিরপেক্ষ, আমরা কোন সামরিক জোটের প্রতি পক্ষপাতী নই। কিন্তু যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, আমরা বিভিন্ন নীতি, ইচ্ছা, প্রয়োজন এবং আদর্শের প্রতি পক্ষপাতী...." ("As I have said repeatedly, I do not like the world "neutral" as being applied to India. I do not even

like India's policy being referred to as 'positive neutrality' as is done in some countries. Without doubt, we are unaligned: we are uncommitted to military blocks; but the important fact is that we are committed to various policies, various urges, various objectives, ad various principles....." (Source : Appadorai).

এই লক্ষ্যে নেহরুর নেতৃত্বে ভারত কমনওলেথ্ (Commonwealth) গোষ্ঠীর সদস্য হয়। ভারতের নেতৃত্বে গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি রাষ্ট্রসংঘে নিজেদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া পেশের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৃতীয় বিশ্ব সহযোগিতার পূর্ণ রূপায়ণ ঘটে নির্জোট আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে।

প্রশ্ন ১। 'জোটনিরপেক্ষ' এবং 'নিরপেক্ষ'র মধ্যে পার্থক্য কি?

৪.৫ নেহরুর নেতৃত্বে বিশ্ব সহযোগিতা এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম

পিটার ক্যালভোকোরেসী (Peter Calvocoressi) তাঁর ওয়ার্লড পলিটিকস সিন্স ১৯৪৫ (World Politics since 1945) গ্রন্থে লিখেছেন যে তৃতীয় বিশ্বের সহযোগিতা এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান রূপকার এবং কর্ণধার ছিলেন নেহরু যাঁর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ এই তৃতীয় গোষ্ঠীর অন্যতম রূপকার হয়ে ওঠে।

তৃতীয় বিশ্বসহযোগিতা এবং বিশ্বশান্তির প্রবক্তা হিসেবে নেহরুর আত্মপ্রকাশ ভারতের স্বাধীনতার পূর্বেই লক্ষ্যণীয়। ১৯২০ দশকে নেহরু জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। ১৯২৭ সালে নেহেরু ইউরোপে ব্রাসেলস শহরে অনুষ্ঠিত 'উপনিবেহবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী' আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন। মূলত তাঁর প্রভাবে জাতীয় কংগ্রেসে একটি বিদেশ দপ্তর খোলা হয়। ১৯৩০-এর দশকে নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস বারংবার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাসী বাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের নিন্দা করেছিল। নেহরু আন্তর্জাতিক সমাজবাদ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ইথিওপিয়া, স্পেন, চীন, চেকোস্লাভিকিয়া বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। স্বাধীনতার পূর্বেই নেহরুর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাম্রাজ্যবাদ এবং সামরিক নীতি পরিপন্থী চিন্তাধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'তৃতীয় বিশ্বসহযোগিতা' তত্ত্বের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে, যখন নেহেরুর তত্ত্ববধানে নতুন দিল্লীতে একটি এশিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৮টি সদস্যদেশ অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে কেবল একজন স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি ছিলেন। এই সম্মেলনে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় যেমন, ভূমিসংস্কার, শিল্পায়ন, এশীয় সমাজবাদ, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি এবং রাষ্ট্রসংঘে এশীয় দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব

বাড়ানো। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে পুনরায় নতুন দিল্লীতে একটি এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ বা ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে। নেহেরুর প্রচেষ্টাতে প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিকে কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত করা সম্ভব হয়। ভারত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও, কমনওয়েলথ্ সদস্য হয় মূলত পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে।

১৯৫০-এর দশকে, ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বমেরুকরণ প্রক্রিয়া আরো সুদৃঢ় হয়। ঠাণ্ডাযুদ্ধের প্রভাব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। থাইল্যান্ড এবং ফিলিপিনস্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তি সাক্ষরিত করে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত দুটি সামরিক সংগঠন, সাউথ-ইস্ট এশিয়ান ট্রিটি অরগানাইজেসন (South-east Asian Treaty organisation—SEATO) এবং সেন্ট্রাল টিট্রি অরগানাইজেসান (Central Treaty organisation—CENTO)-এর সদস্য পদ গ্রহণ করে। অপরদিকে, সোভিয়েট ইউনিয়ন আফগানিস্থানের সঙ্গে একটি চুক্তি সাক্ষরিত করে। এই পরিস্থিতিতেও ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতি এবং সামরিক গোষ্ঠীর বাইরে থাকার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ১৯৪৫ সালে ভারত এবং চীনের মধ্যে পঞ্চশীল চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এছাড়া, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়া, উভয়েরই সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষরিত করে।

এই দশকের মেরুকরণ প্রক্রিয়া এবং এশিয়ায় তার বিস্তার নেহেরু এবং সমভাবাপন্ন তৃতীয় গোষ্ঠীর নেতাদের বিচলিত করে তোলে, এবং তারা তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বানদুং শহরে একটি অ্যাফ্রো-এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বানদুং সম্মেলনে ২৯টি সদস্য অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ৬ জন আফ্রিকা দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন। নেহরু ছাড়া এই সম্মেলনের অপর গুরুত্বপূর্ণ নেতারা হলেন ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ এবং মিশরের নাসের। প্রধানত নেহরুর আমন্ত্রণে চিনের প্রধানমন্ত্রী ঝৌ-এন-লাই বানদুং সম্মেলনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বানদুং সম্মেলনে বিভিন্ন ঘোষণা করা হয়, যার মধ্যে প্রধানগুলি হল—

১। মানবসভ্যতা রক্ষা করার জন্য বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ এবং আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যাগ।

২। বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে অ্যাফ্রো-এশীয় দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা।

৩। নিরস্ত্রীকরণ এবং আনবিক অস্ত্র পরিহারের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা। এছাড়া, তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি, রাষ্ট্রসংঘে একত্রে কাজ করার অঙ্গীকারও করে।

বানদুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কিছু পরেই, ১৯৫৬ সালে নেহরু এবং নাসের, যুগোস্লাভিয়ার নেতা মার্শাল টিটোর সঙ্গে ব্রিয়োনীতে (Brioni) সাক্ষাৎ করেন। যুগোস্লাভিয়া, এই সময় থেকে, সোভিয়েট ইউনিয়নের

প্রভাব কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অংশীদার হয় এবং প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে, ১৯৬১ সালে।

প্রশ্ন ১। নেহরুর 'আন্তর্জাতিকতাবাদ' কিভাবে ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে গঠিত হয়?

প্রশ্ন ২। তৃতীয় গোষ্ঠীর সহযোগিতা কিভাবে প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার (১৯৬১) আগে পর্যন্ত বিবর্তিত হয়েছিল?

৪.৬ নেহরুর নেতৃত্বে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (১৯৬১-৬৪) পরবর্তী পর্যায়

বেলগ্রেডের প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নেহেরু, টিটো, নাসের এবং সুকর্ণ। সম্মেলনের উন্নয়নশীল দেশগুলির সুবিধার্থে নব্য উপনিবেশবাদ এবং মেরুকরণের বিরুদ্ধে একটি ঘোষণা পত্র জারি করা হয়। এছাড়া, তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সহযোগিতার ওপর জোর দেওয়া হয়।

প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন বিশ্বরাজনীতির এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাহারা অঞ্চলে ফরাসি আণবিক বিস্ফোরণ, আফ্রিকায়, তিউনিসিয়া এবং কংগোতে ক্রবর্দ্ধমান সংঘাত, সোভিয়েট রাশিয়ার পারমানবিক বিস্ফোরণ এবং, কিউবাকে কেন্দ্র করে আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে প্রায় যুদ্ধাকলীন পরিস্থিতি—এই সব বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আরো গভীরভাবে অনুভূত হয়। ওই পরিপ্রেক্ষিতে, সম্মেলনের পক্ষ থেকে দুই বিশ্বশক্তির উদ্দেশ্যে একটি ঘোষণা পত্র জারী করা হয়। এতে, আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতার সম্বন্ধে হুঁশিয়ারী জারি করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন, উভয়কেই অবিলম্বে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নেবারঅনুরোধ জানানো হয়।

দ্বিতীয় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন কায়রোতে (মিশর) ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই নেহরুর মৃত্যু হয় (১৯৬৪)। কিন্তু ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী, লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। কায়রো সম্মেলনে, 'শান্তি এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতার একটি পরিকল্পনা নামক একটি ঘোষণা গৃহীত হয় যাতে বিশ্বশান্তি, আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা এবং শান্তির মাধ্যমে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মেটানোর প্রস্তাব করা হয়।

তৃতীয় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয় লুসাকায়, চতুর্থ, আলজিয়ার্স এবং পঞ্চম কলম্বোয়। ষষ্ঠ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয় হাভানায়। সপ্তম সম্মেলন নতুন দিল্লীতে ১৯৮৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়, যেটি ছিল ভারতে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলন।

এ পর্যন্ত (২০০০ সাল) বারোটি জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই আন্দোলনের

সাথে সংযুক্ত সদস্য দেশের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো পনেরয় (১১৫)।

প্রশ্ন ১। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম তিন উদ্যোক্তা কারা ছিলেন?

২। প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

৪.৭ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল্যায়ন

এই অংশে, মূলত নেহরুর আমলে (১৯৬৪) জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ধারা নিয়ে আলোচনা করা হল। 'জোটনিরপেক্ষ' সংজ্ঞাটির মধ্যে একটি আদর্শের প্রশ্নও অন্তর্নিহিত ছিল। নেহরু তার বিভিন্ন ভাষণে 'জোট-নিরপেক্ষ' আন্দোলনকে একটি আদর্শের স্তরে উত্তীর্ণ করেছিনে; নেহরুর মতে, জোট নিরপেক্ষতা, কোন সুযোগসন্ধানী, বিদেশনীতি নয়। আধুনিক অনেক গবেষকরা কিন্দু নেহরু প্রবর্তিত জোটনিরপেক্ষ নীতিকে মূলত তাঁর বিদেশনীতির অঙ্গ হিসবে দেখেন। তাই, এই অংশে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল্যায়ন নেহরুর বিদেশনীতির অঙ্গ হিসাবেই করা হল।

কোন পররাষ্ট্র নীতি বা বিদেশ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা এবং, বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা। নেহরু, মূলত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মাধ্যমে, ভারতকে তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির শীর্ষস্থানে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এটি তার এক প্রধান কৃতিত্ব। দ্বিতীয়ত, জোটনিরপেক্ষ অবস্থানের ফলে, ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়েরই সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। এছাড়া, চীনের সঙ্গে পঞ্চশীল মৈত্রীচুক্তির দ্বারা ভারতের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়, যদিও সীমান্ত এলাকা নিরূপণ এবং তিব্বতের ওপর চীনের অধিকারকে কেন্দ্র করে দুই দেশের সম্পর্কের অবনিতি ঘটে, যার চূড়ান্ত পরিণাম, ১৯৬২ সালের যুদ্ধ।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সাফল্যের এবং যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেক গবেষকরাই সন্দিহান। কিছু মহলে এমন অভিযোগ করা হয়েছিল যে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, পশ্চিমী গোষ্ঠীগুলির তুলনায় সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রতিবেশী সহানুভূতিশীল ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে নেহরু ১৯৫৬ সালের সুয়েজখাল সংকট নিয়ে পশ্চিমী দেশগুলির হস্তক্ষেপের সমালোচনা করলেও, একই সময়ে রাশিয়ার ফৌজ দ্বারা হাঙ্গেরীর গণ-অভ্যুত্থান দমন করার সময় নেহেরু কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। আবার, ইথিওপিয়ার গৃহযুদ্ধের সময়ে, বিপ্লবী এরিট্রীয় (Eritreans) পক্ষ, সোভিয়েট ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইথিওপিয়া, জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য হলেও, এই গোষ্ঠী সেভাবে কোন সাহায্য করতে অসমর্থ হয়। ভারত নিজেও, ১৯৭১ সালে, সেভিয়েট ইউনিয়নের সাথে এক চুক্তি সাক্ষরিত করে। এছাড়া, সত্তরের দশকে,

জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, এদের মধ্যে অধিকাংশই প্রথম ও দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। সবশেষে, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সামলোচকদের মতে, ১৯৯০ সালের পরবর্তী সময়ে, সোভিয়েট পতন এবং ভেঙে যাবার পর, বিশ্বরাজনীতিতে, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন তার সমস্ত প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলা অবশ্য যুক্তিযুক্ত নয়। প্রথমত, পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে এটি ভারতীয় জাতীয় স্বার্থকে (National Interest) সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারত, আমরা আগেই দেখেছি, কিভাবে দুই বিশ্বশক্তির সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৬২ সালে চীন ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক চুক্তি না থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন, উভয়েই ভারতের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সেভিয়েট ইউনিয়ন প্রথমদিকে ভারতের জোট বহির্ভুত নীতির প্রতি সন্দিহান হলেও, স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর (১৯৫৩), জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক হয়ে ওঠে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, নেহরুর আমলে একদা উপনিবেশগুলি, যেমন ফরাসি অধিকৃত পণ্ডিচেরী, নাহে এবং পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া, দমন, দিউ, ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গোয়ার ক্ষেত্রে নেহরু সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেন। জোটনিরপেক্ষ নীতির ফলেই এই ক্ষেত্তরগুলিতে বিশ্বশক্তির হস্তপেক্ষ ঘটেনি।

বিশ্বরাজনীতির পটভূমিকাতেও তৃতীয় গোষ্ঠী গঠনের ক্ষেত্রে নেহেরু সম্পূর্ণ অসফল ছিলেন না। ঠাণ্ডা যুদ্ধের বিস্তার রোধ করার লক্ষ্যেও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন কিছুটা সাফল্যলাভ করে। পিটার ক্যালভোকোরেসী, তাঁর ওয়ার্লড পরিটিক্স সিন্স ১৯৪৫ গ্রন্থে লিখেছেন যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তিনভাবে, ঠাণ্ডাযুদ্ধের বিস্তার রোধ করে। প্রথমত, নিজেরা কোন গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ না করে ঠাণ্ডা যুদ্ধের গতিরোধ করে। দ্বিতীয়ত, একজোট হয়ে দুই বিশ্বশক্তিকে বাধ্য করেতাদের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে এবং, তৃতীয়ত, রাষ্ট্রসংঘে এবং জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বারংবার নিজেদের মতবাদ তুলে ধরে বিশ্বের প্রতিটি দেশকে তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করে।

এছাড়া, তৃতীয় বিশ্ব সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা তেকেই জন্ম নেয় 'নব আন্তরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর' (New International Economic order) ধারণা। তৃতীয় বিশ্বর উন্নয়নশীল দেশগুলি, ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র দশকে তাদের নতুন অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে যে আন্দোলন চালায়, তার আরম্ভ, নেহরুর আমলের তৃতীয় বিশ্ব সহযোগিতার ধারণা থেকেই উদ্ভূত হয়।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও, অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্যের নজির রেখেছে।

প্রশ্ন ১। 'জোটনিরপেক্ষ' তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা আপনি কি যথার্থ বলে মনে করেন?

৪.৮ ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সাফল্যের অন্যতম নিদর্শন হল ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা। আপনারা আগেই দেখেছেন যে জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। (অধুনা-১১৫)। প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের দুই সদস্য (অধুনা স্বাধীন রাষ্ট্র তুর্কমেনিস্থান এবং উজবেকিস্থান এখন এই গোষ্ঠীর সদস্য। সম্প্রতি, বেলোরুশ এবং ডমিনিক প্রজাতন্ত্রও সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। অন্যান্য সোভিয়েট ইউনিয়নের অংশীদারদের মধ্যে, আর্মেনিয়া, আরেজবাইজান, গিরগিজস্থান, ইউক্রেন এবং রাশিয়া, চেকপ্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরী, রোমানিয়া, স্লোভানিয়া, বরগেরিয়া, স্লোভাকিয়া এবং বসনিয়া হার্জেগোভিনা যথাক্রমে পর্যবেক্ষকের পদ এবং অতিথি রাষ্ট্রের পদ গ্রহণ করেছে।

অপরদিকে পশ্চিমী গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কানাডা, জার্মানী, গ্রীস, ইটালি, নেদারল্যারডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড এবং সুইজারল্যাণ্ড, অতিথি রাষ্ট্রের পদে অভিষিক্ত। দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রদের মধ্যে ব্রেজিল এবং মেক্সিকো, পর্যবেক্ষকের পদে আসীন।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন আক্ষরিক অর্থেই তার বিশ্ব সহযোগিতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনও বর্তমান অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের (globalisation) পটভূমিকার, আরো তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে, যার প্রমাণ, স্থানীয় ক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিস্তার লাভ (Regional Economic Co-operation)। এছাড়া, বিশ্বব্যাপী আণবিক অস্ত্র বিলোপ, নতুন অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গঠন, ইত্যাদি ক্ষেত্রেও, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, অধুনা দক্ষিণ (South) গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কাজ করে চলেছে।

প্রশ্ন ১। ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন কিভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে?

৪.৯ সারাংশ

স্বাধীন ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ণে প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর গুরুত্ব অপরিসীম। এই পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল, জোটনিরপেক্ষ নীতি, যাতে ভারত, প্রথম বা দ্বিতীয় কোন গোষ্ঠীরই সদস্য হতে অস্বীকার করে। এই পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, বিশ্ব রাজনীতির এক জটিল পটভূমিকায়, যখন একদিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতার ফলে এক মেরুকরণ প্রক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। অপরদিকে, প্রাক্তন ইউরোপীয় উপনিবেশগুলি 'তৃতীয় বিশ্ব' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের ফলে ভারত এই তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির নেতৃত্ব লাভ করে। জোট নিরপেক্ষ নীতি অবশ্য কোন নেতিবাচক নিরপেক্ষ নীতি ছিল না। শুধুমাত্র সামরিক জোটের ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতা বজায় ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

নেহরুর নেতৃত্বে 'তৃতীয় বিশ্ব' সহযোগিতার প্রসার ১৯৪৭-এর পূর্বেই লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ এবং ১৯৪৯ সালে এশীয় সম্মেলনে এবং ১৯৫৫ সালের ব্যনদুং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই জোট আরো সংঘবদ্ধ হয়। এবং, ১৯৬১ সালে প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রগতি অব্যাহত থাকে, নেহরুর মৃত্যুর পরও। অধুনা, ১১৫টি দেশ এই গোষ্ঠীর সদস্য। কিছু ক্ষেত্রে অসফল হলেও, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রভাব কিছুটা সীমিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া, রাষ্ট্রসংঘে এবং নতুন অর্থনীতি গঠনের দাবিতে জোটনিরপেক্ষ আনোদলন বিশ্ব রাজীনতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। একদিকে নতুন দেশগুলির এই গোষ্ঠীতে যোগদান এবং অপরদিকে 'দক্ষিণ' (South) গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার কাজ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করেছে।

৪.১০ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন ১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতির পটভূমিকা কেমন ছিল?

প্রশ্ন ২। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গঠনে নেহরুর ভূমিকা কি ছিল?

প্রশ্ন ৩। ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতিতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রসাঙ্গিকতা কতখানি?

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। Bipan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, *India After Independence* (1999).
২। V. P. Dutt, *India and the World* (1990).
৩। V. P. Dutt, *India's Foreign Policy* (1984).
৪। S. Gopal, Jawaharlal Nejru : A Biography, Vols. 2 and 3 (1979 and 1984).
৫। B. R. Nanda (ed.) *Indian Foreign Policy : The Nehru Years* (976).
৬। B. N. Pande (ed.) *A Centenary History of the Indian National Congress*, Vol. IV (1990).
৭। J. Bandyopadhaya, *The Making of Indian Foreign Policy* (1979).
৮। A. Appadorai and M. S. Rajan, *Indias Foreign Policy and Relations* (1985).